প্রথম প্রকাশ। চৈত্র, তেরশ' ছিয়াশি।

প্রকাশক। শ্রীঅলোকনাথ বাগচী, দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেড, বারো, লউডন ষ্ট্রীট, কলকাতা-সতেরো।

প্রচ্ছদ। শ্রীঅন্নদা মুন্সী

মুদ্রক। শ্রীমতি মিত্রা দাস, ওরিয়েণ্ট এন্টারপ্রাইস্
আট / এক এ, হরিপাল লেন, কলকাতা-ছয়।

BANHI BIPLAB a narration of Revolutionary movement upto 1914 by Kironendu Bagchi.

গৈরিশযুগের সঙ্গীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচী, বাণীকণ্ঠ সরস্বতী মহাশয়ের
পুণ্যস্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত
দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
বারো, লউডন ষ্ট্রীট, কলকাতা-সতেরো

চন্দননগরে বিপ্লবী মতিলাল রায়ের গৃহে আত্মগোপনকারী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। পৃঃ ৪৮৭ (প্রবর্তক সঙ্ঘের সৌজন্যে)



১৯০৮ সালে ছয়ের এক ডিগ্রীর এই পবিত্র প্রকোষ্ঠে সাধক

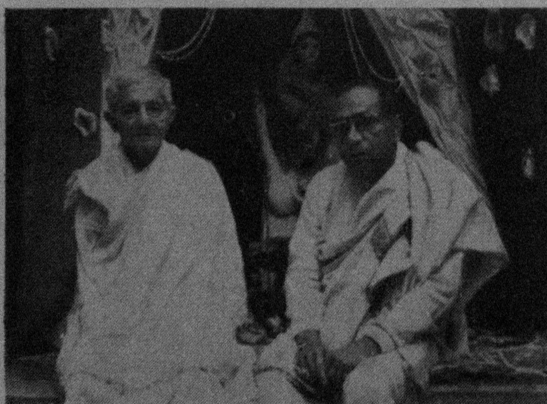
উৎসর্গ

ভারতের মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে "বহ্নিবিপ্লব"-কে তুলে দিলাম।

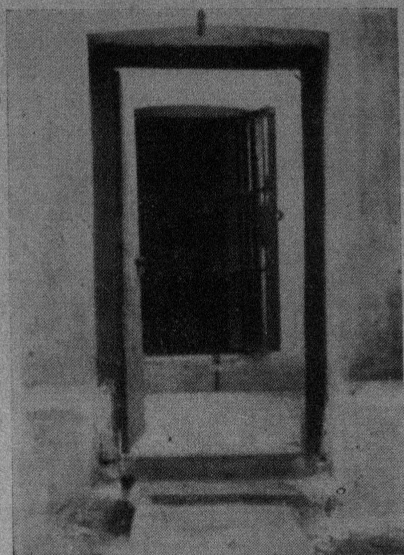
লেখক



গুপ্ত সমিতি ও মাণিকতলা বোমার মামলার নায়ক বিপ্লবী বারীণ ঘোষ। পৃঃ ২২৪ (অরবিন্দ মন্দিরের সৌজন্যে)



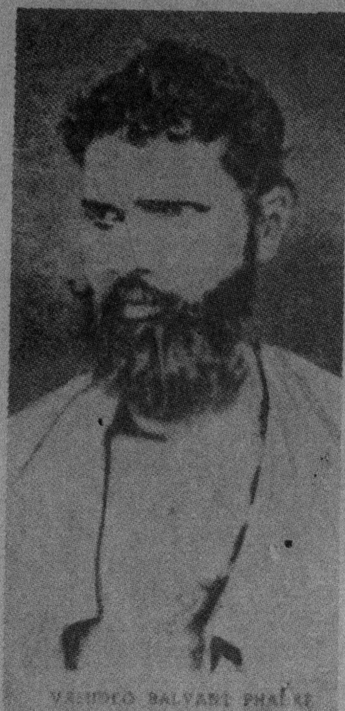
প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি বিপ্লবী অরুণচন্দ্র দত্ত ও লেখক



৪৪ ডিগ্রীর ১নং কক্ষ। নরেন বধের পর ফাঁসীর আগের দিন সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কানাইলালের নির্জন বাস। (পৃঃ ৩৬২)



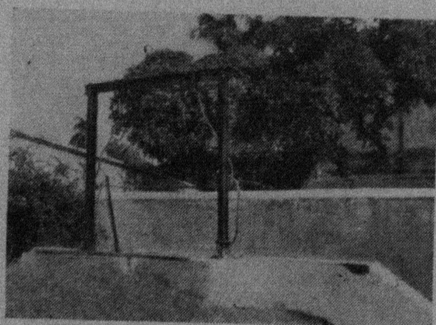
৪৪ ডিগ্রীর ২নং কক্ষ। নরেন বধের পর ফাঁসীর আগের দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত সত্যেনের নির্জন বাস (পৃঃ ৩৬২)



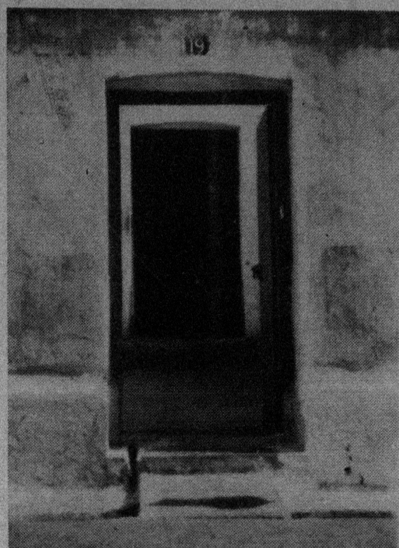
বীর বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত
ফাড়কে (পৃঃ ৪৮)



৪৪ ডিগ্রীর দুই এবং এক নম্বর। নরেন বধের পর কানাই এবং সত্যেনের নির্জন বন্দী শিবির। (পৃঃ ৩৬২)



কানাই, সত্যেন, চারুচন্দ্র, বিরেন্দ্রনাথের বিপ্লবযজ্ঞে শেষ জয়যাত্রা (পৃঃ ৪৮৬)



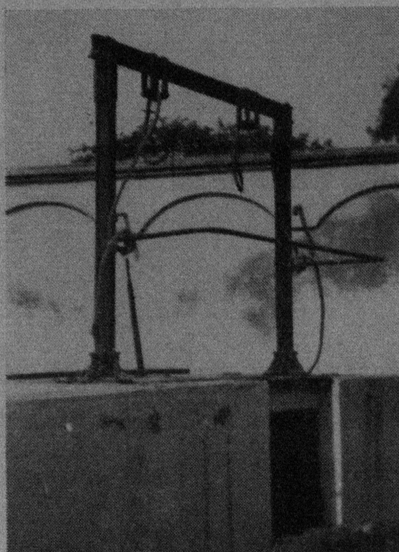
৪৪ ডিগ্রীর ১৯ নং। ফাঁসীর পূর্ব রাত্রিতে কানাই এবং সত্যেন পরপর বন্দী ছিল এই প্রকোষ্ঠে।



৪৪ ডিগ্রীর ২১ নম্বরের ভেতর দিয়ে কানাইলাল এবং সত্যেনের ফাঁসীর মঞ্চে শেষ যাত্রা (পৃঃ ৩৯২)

"প্রাক-কথন"

১৯৩০ সাল থেকে বঙ্গশ্রী, দেশ, পুষ্পপাত্র, মাসিক-বসুমতী, হোমশিখা, জয়শ্রী, নবান্ন-ভারতী, প্রবর্তক, সংহতি, ছদ্মবেশী এবং নানান পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয় গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লেখার পর ১৯৭১ সালে সরকারী চাকরীতে ছেদ টেনে দিয়ে, বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তথ্যবহুল কিছু বিবৃতি দশের কাছে উপস্থিত করতে লেখনী পরিচালনা করলাম। কৈশোরে দেশের ও দশের কাজে নেমে পড়ি। বেশ কিছু বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে মনটা আমার সেই দিকেই ধাবিত হয়। স্বর্গত নিরঞ্জন সেন আমাদের ক'জনকে নেতৃত্ব দেন বহরমপুরে। পুলিসের নজর এড়াতে পারিনি। গ্রেপ্তারকে এড়িয়ে দু'বছর আত্মগোপন ক'রে থাকি রাজস্থানের আজমীরে। পরে অবিভক্ত বাঙলায় ফিরে এসে, আই. বির চোখে ধূলো দিয়ে কারাবিভাগে চাকরী গ্রহণ করি। বিভিন্ন জেলে কর্মরত অবস্থায় বহু খ্যাতনামা বিপ্লবীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘ'টে যায়। এঁদের মধ্যে শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী, শ্রীপ্রতুল গাঙ্গুলী, শ্রীবীরেন গাঙ্গুলী, শ্রীমুজাফ্‌ফর আমেদ, শ্রীগণেশ ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মুখ থেকে বিপ্লবীদের বহুবিধ ঘটনা শোনার আমার সুযোগ এসে যায়। সেই থেকে বিপ্লবীদের জীবনালেখ্য নিয়ে গবেষণার জন্যে আমার মনটা প্রলুব্ধ হয়। বন্ধুবর ৺অশোক বাগচী আমাকে নানা বিষয়ে অনুপ্রেরণা যোগান ও উৎসাহিত করেন। পাণ্ডুলিপিখানি পড়ে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সভাপতি তথা প্রবর্ত্তক পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় অরুণচন্দ্র দত্ত, লেখাটির খুব প্রশংসা করেন এবং এবিষয়ে আমাকে বেশ কিছু নতুন নতুন তথ্য প্রদান করেন। পরে বইখানি ধারাবাহিকভাবে প্রবর্ত্তকে প্রকাশার্থে গ্রহণ

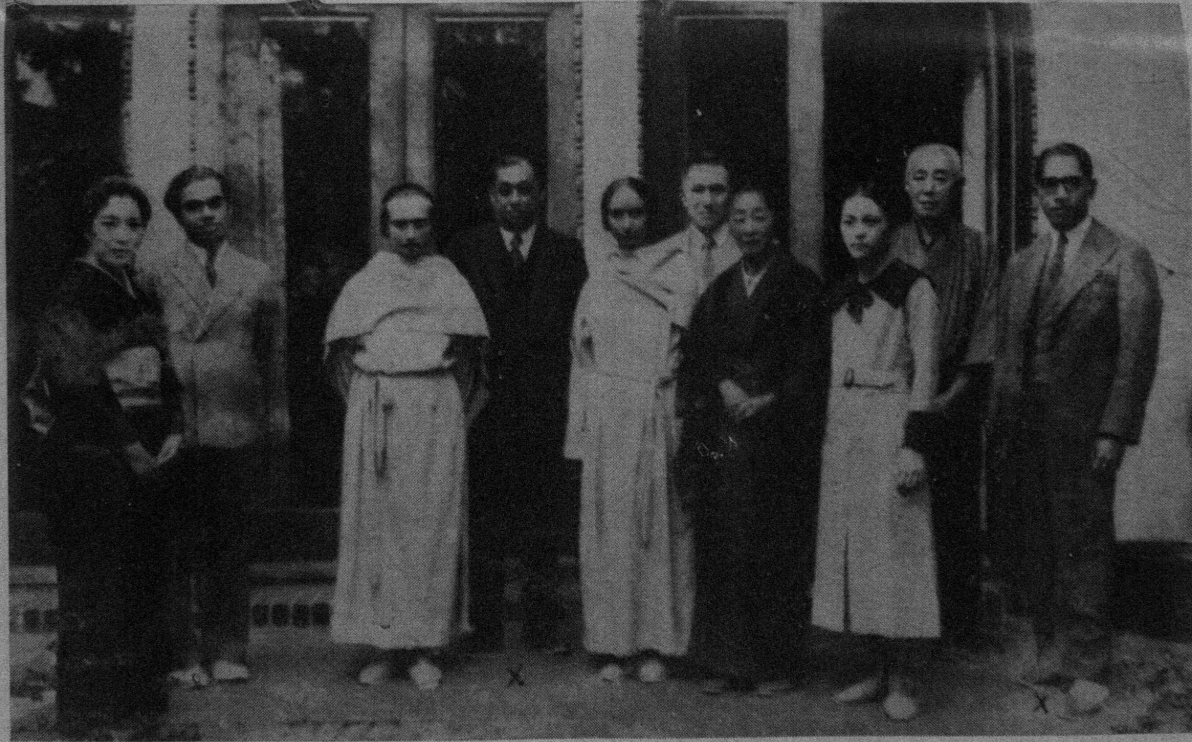


বিপ্লবী পথিক কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
পার্থিব জীবনের শেষ প্রান্ত (পৃঃ ৩৯৪, ৪১০)



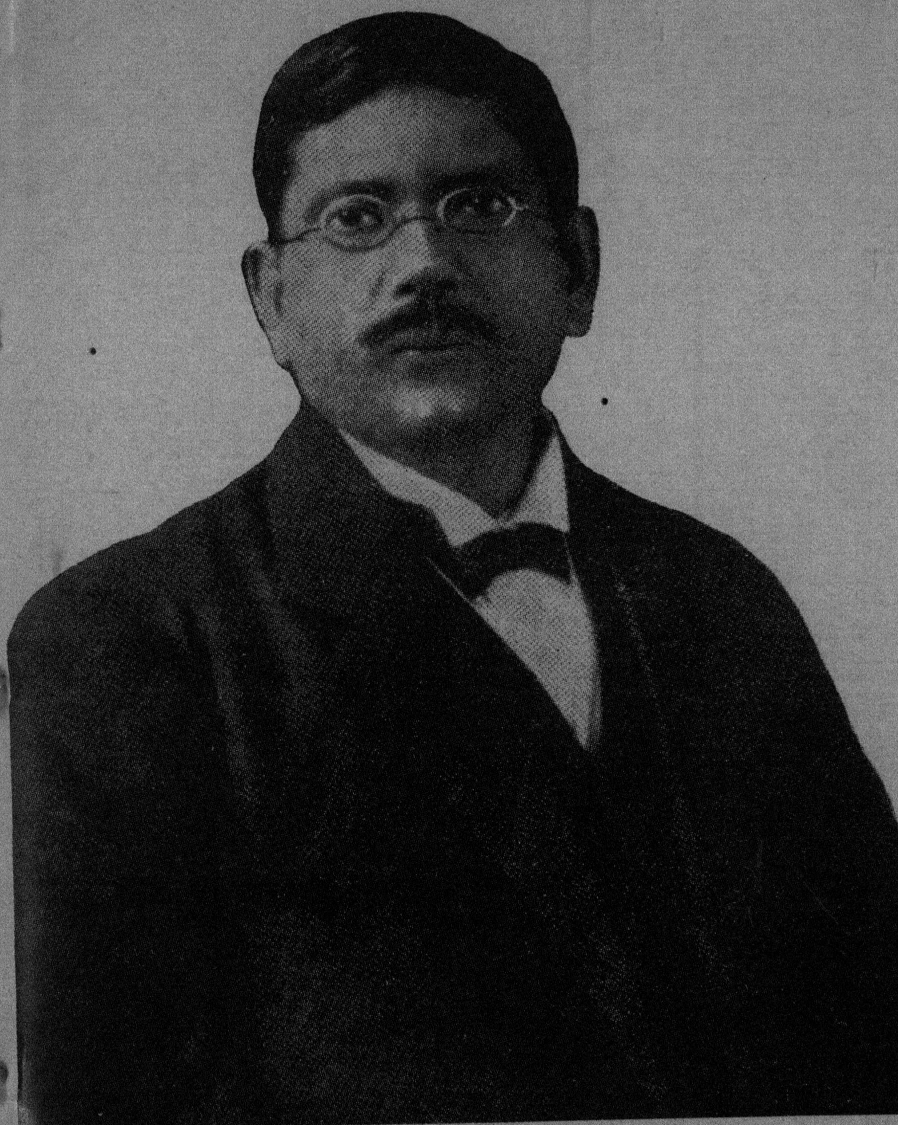
• বিপ্লব যজ্ঞে আত্মাহুতি দানের পর ঋত্বিক কানাইলাল দত্তের
চিরবিশ্রামের অভিসার (পৃঃ ৪০৪)

করেন। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে প্রবন্ধটি প্রবর্ত্তকের পাতায় দশের সামনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ধারাবাহিকভাবে। পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে অনুরোধ আসে পুস্তকাকারে জনসমক্ষে এটিকে তুলে ধরতে। দেবকণ্ঠ পাবলিশার্সের পক্ষে শ্রীঅলোকনাথ বাগচী প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে আমার পুত্র শ্রীমান দেবাশিস্, পুত্রপ্রতিম শ্রীমান শেখর সান্যাল ও সুতেশ চক্রবর্তী প্রামাণ্য পুস্তকাদি জোগাড় করে দেয় প্রেসিডেন্সী জেলের (মানিকতলা বোমার মামলার সময় যার নাম ছিল আলিপুর জেল) ফাঁসীর মঞ্চ প্রভৃতির আলোকচিত্র গ্রহণে ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীবিশ্বরূপ মুখার্জী আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বন্ধুবর শ্রী কে. এস. মখতান স্বরাষ্ট্র সচিবের আদেশবলে জেলের আভ্যন্তরীণ বিশেষ বিশেষ স্থানের আলোকচিত্র গ্রহণে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করেন। বিপ্লবী ৺মণীন্দ্র নায়েক, জীবনী লেখক শ্রীমণি বাগচি "বহ্নি বিপ্লব" রচনায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেন। এ গ্রন্থে যে মূল্যবান সংযোজনটি দেওয়া হলো সেটির জন্যে আমি বিশেষভাবে শ্রীমণি বাগচির কাছে কৃতজ্ঞ। প্রচ্ছদটি এঁকেছেন, আমার পরম বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সী। প্রেসিডেন্সী জেলের বর্তমান সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অনুজপ্রতিম শ্রীঅমিতাভ গাঙ্গুলী ১৯০৮ সালে উক্ত জেলে বন্দী বিপ্লবীদের রেকর্ড সংগ্রহে সাধ্যমত সহায়তা করেছে। শ্রীমান সৈকত সান্যাল নিপুণ হাতে প্রেসিডেন্সী জেলের আভ্যন্তরীণ বিশেষ বিশেষ স্থানের আলোকচিত্র কয়টি ক্যামেরায় সংগৃহীত করেছে। চন্দননগরের ফটোগুলি তুলে সাহায্য করেছে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার। পুত্রপ্রতিম শ্রীমান অভিজিত বাগচী বইখানিকে বৈশিষ্ট্যমূলক রূপসজ্জায় উদ্ভাসিত করেছে। ক'লকাতার শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরের কাছেও কিছু সাহায্য লাভ করেছি। বক্তব্য শেষ করার আগে



জাপানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং তাঁর পরিবারের দীর্ঘদিনের অতিথি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক বৃত্তিপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকার কর্তৃক উৎপীড়িত নিগৃহীত লেখকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশৈলেন বাগচী। মধ্যে—রাসবিহারী, সর্বদক্ষিণে—শৈলেন। (ফটো —জাপান ১৯৩৫) পৃঃ ৫০০

আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় ইউরোপীয়ান জেলার মিঃ আফসানের প্রতি। কারণ ১৯৩৫ সালে উক্ত জেলে কর্ম্মরত অবস্থায় আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত আসামীদের কারাজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সম্বলিত কাহিনীগুলি, প্রত্যক্ষদর্শী তিনি যদি না আমার কাছে আনুপূর্বিক বিবৃত করতেন, তা হ'লে হয়তো আমার পক্ষে এঁদের বিষয় এত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা সম্ভব হত না। বহুদিন আগে চাকুরীতে অবসর নিয়ে মিষ্টার আফসান ইউরোপে পাড়ি জুগিয়েছিলেন। গ্রন্থশেষে যে গ্রুপ ফটোখানি দেওয়া হয়েছে, সেটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতি ছাত্র শ্রীশৈলেন বাগচীর, জাপানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন বাগচী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে রেশম শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করতে জাপান যান। ঐ সময় জাপানে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন আহুত হওয়ায় তদানীন্তন ভাইসচানসেলার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী,—প্রিয় ছাত্র শৈলেনকে সেই বিশ্বসভায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্বের ভার অর্পণ ক'রে, তারই হাতে একখানি পরিচয়পত্র বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নামে লিখে দেন। শৈলেন বাবুকে বিপ্লবী রাসবিহারী অন্যত্র কোথাও যেতে না দিয়ে, তিন বৎসরের অধিক কাল নিজ পরিবারভুক্ত করে রাখেন এবং জাপান সম্রাট হিরোহিতোর সঙ্গেও পরিচয় কবিয়ে দেন। ইনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেশম শিল্পে ডিগ্রী লাভ ক'রে, জাপানের রয়্যাল এন্টমলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং ঐ বৎসর জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে রেশম শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা লাভের উদ্দেশ্যে লণ্ডন গমন করেন। জাপান সরকারের অর্থে এঁর লেখা শিল্প বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়। বৈদেশিক সরকারের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক বৃত্তি লাভ ক'রে শৈলেন বাগচী শুধু কি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই, না, সমগ্র ভারতবর্ষের



অরবিন্দ পক্ষে ব্যারিষ্টার সি. আর. দাস

(পৃ: ৪১৪)

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চৌধুরীর সৌজন্যে।

মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন ? রাসবিহারীর ভালবাসা, জাপান সরকারের আন্তর্জাতিক বৃত্তি এবং পুস্তক প্রকাশে সহায়তা করা শৈলেন বাবুর ভবিষ্যৎ জীবনের কণ্টক স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। গত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারের হাতে তাঁকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হ'তে হয় এবং বেশ কিছুদিন কারারুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয়। এই উৎপীড়ন শরীর এবং মনের ওপর অত্যন্ত চাপ সৃষ্টি করায় অকালে ১৯৪২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই সন্যাস রোগে তাঁর জীবনদীপ নিবাপিত হয়। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হেতু যেসব মহান বিপ্লবীদের এখানে উপস্থিত করতে পারলাম না, ইচ্ছে থাকল, আমার এই বিষয়ে দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থে "আবার বহ্নি বিপ্লব"-এ তাঁদের উপস্থিত করব। বাঘা যতীন, ভগৎ সিং, বিনয়-বাদল-দীনেশ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বীর সাভারকর এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রই এতে বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

কিরণেন্দু বাগচী

তারিখ ৮ই চৈত্র, ১৩৮৬
"মালতী কুঞ্জ"
বহরমপুর, পশ্চিম বাঙলা।
পিন ঃ ৭৪২১০১

ভুমিকা

বাংলা দেশের "অগ্নিযুগের" ইতিহাসে কানাইলাল দত্ত একটি বিশিষ্ট এবং আবিস্মরণীয় নাম। ভারতবর্ষের স্বাধানতার বেদীমূলে অতি তরুণ বয়সে কানাইলালের নিঃশেষে আত্মদানকে কেন্দ্র ক'রে শ্রীকিরণেন্দু বাগচী মহাশয় "বহ্নিবিপ্লব" নামে যে তথ্য বহুল এবং বেশ বড় একখানি পুস্তক রচনা করেছেন সেই বইখানি শুধু যে সকলের পক্ষেই সুখপাঠ্য হয়েছে তাই নয় বইখানি বর্ত্তমান যুগের তরুণ তরুণীগণের খুব উপযোগী এবং তাদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় একখানি বই হয়েছে। বইখানির ভিতর ভাষার কঠোরতা কিম্বা ইতিহাস ভিত্তিক বর্ণনার জড়তা অথবা গতানুগতিকতা কোথাও চোখে পড়ল না; বরং বইখানিতে এমন কি বহু গুরুতর ঘটনার বিবরণ ভঙ্গীর সহজ ও সাবলীল গতি যে কোন পাঠকেরই মন আকর্ষণ করবে। বইখানি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, গ্রন্থকার দীর্ঘদিন ধরে এবং অসাধারণ পরিশ্রম ক'রে ভারতের বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের বহু উপেক্ষিত সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে পাঠ করেছেন এবং সেই ইতিহাসকেই অতি সঠিক ভাবে একটি আকর্ষণীয় ও নূতন ধারায় চিত্রিত ক'রে জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করেছেন; এক কথায় বলা যায় আমাদের দেশের কঠিন এবং কঠোর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে জনজীবনের ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন। একথা একটি ইতিহাস সম্মত সত্য যে পলাশী প্রহসনের অব্যবহিত পর থেকেই অর্থাৎ বৃটিশ দস্যুরা যে সময় থেকেই ভারতবর্ষের উপর নিজেদের আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে এবং দেশের জনগণের সম্পদ শোভন অশোভন এবং নির্দ্দয় ও পাপপূর্ণ রূপে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে লুন্ঠন করে নিয়ে যাওয়া আরম্ভ করেছে প্রায় ঠিক সেই সময় থেকেই, (১৭৬৩, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ বিশেষ ক'রে ভারতের কৃষকেরা ওই ইংরেজ দস্যুদের বিরুদ্ধে

ভারতে তাদের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সশস্ত্র পন্থায় সংগ্রাম করে গিয়েছে।

একথাও অবশ্য ইতিহাস সম্মত সত্য যে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি এবং দুইটি বিভিন্ন ধারায় কিন্তু একেবারে পাশাপাশি সমান্তরাল গতিতে চলেছে, একটি পূর্ব্বের ন্যায় সশস্ত্র পন্থায় এবং অপরটি শান্তিপূর্ণ অহিংস পন্থায়। এ কথাও অবশ্য আমাদের অতি দুঃখের সাথে স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে ১৭৬৩ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় একেবারে শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের যত সম্মিলিত সশস্ত্র সংগ্রাম (বিদ্রোহ) অনুষ্ঠিত হয়েছে তার কোন সঠিক এবং বিস্তারিত তথ্য এবং সেই সকল সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় বীরগণের ও সেই সকল জাতীয় মুক্তি প্রচেষ্টায় যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের ও যথাযত নাম এবং পরিচয় আজও জানা যায়নি, এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার সময় ইংরেজরা পরিকল্পিত ভাবে বহু পরিমাণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং বহু সংখ্যক দলিল দস্তাবেজ গোপনে নষ্ট ক'রে চলে গিয়েছে তার ফলে এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের কোন সঠিক এবং বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই বোধহয় নাই।

ভারতের অগ্নিযুগের (১৮৯৭-১৯৩৪) জাতীয় মুক্তি অর্জ্জন প্রচেষ্টা সমূহকে "বিপ্লবী ঘটনা" অথবা "বিপ্লবপন্থী কর্ম্মসূচী" বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। এ কথা আদৌ অর্থহীন নয়; এর ভিতরও একটি ইতিহাস সম্মত সত্য রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের একেবারে প্রায় শেষ পর্য্যায়ে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পুণা জেলার সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চিৎপবন ব্রাহ্মণ বংশীয় চাপেকর ভ্রাতৃগণের একটি কঠিন আঘাত দেবার প্রচেষ্টার সাথে সাথে যখন "অগ্নিযুগের" উন্মেষ দেখা দেয় সেই সময় থেকে যে সকল

দেশপ্রেমিক বীর ওই পন্থায় বিশ্বাস করতেন এবং ওই পথ গ্রহণ করেছেন তাঁদের সকলেরই সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে একমাত্র ব্যাপকতম ভারতীয় জনগণের সফল সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ করা এবং তাদের আধিপত্য ধ্বংশ ক'রে, তাদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব; অন্য কোন পথেই নয়। তাই অগ্নিযুগের দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্ম্মীগণ অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদিরাম কিম্বা কানাইলালের ন্যায় প্রায় একাকী অথবা অতীব স্বল্প সংখ্যায় সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও তাঁদের প্রত্যেকের এবং তাঁদের সকলের লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি অর্জ্জন প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত দিয়ে তাঁরা যে প্রায় অবশ্যম্ভাবী রূপে নিঃশেষে আত্মদান ক'রে যাবেন তাই-ই দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে আকর্ষণ করবে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। ইংরেজ শাসকেরা এই সকল প্রচেষ্টাকে "সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা" ব'লে জনগণের সম্মুখে ওই সকল প্রাতঃস্মরণীয় শহীদগণকে হেয় করবার ও তাঁদের নির্বোধ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন অত্যাচারী অমানুষ ইংরেজ শাসক অথবা দেশদ্রোহী গোয়েন্দাকে হত্যা করবার বাস্তব উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি অবশ্যই নয়; উদ্দেশ্য ছিল অনুরূপ অপর অত্যাচারী শাসককে সতর্ক ক'রে দেওয়া এবং প্রয়োজন হ'লে, ওই প্রচেষ্টায় নিঃশেষে আত্মদান ক'রে জনগণকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। অগ্নিযুগের বিপ্লবীগণের এই প্রচেষ্টাকেই কবির ভাষায় বলা যায়, "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ"।

"অগ্নিযুগের" দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্ম্মীগণের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসকগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারকে উৎখ্যাৎ ও বিতাড়িত করে ভারতের আভ্যন্তরীন অবস্থার একটি আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা। সেই

অর্থেই সশস্ত্র সংগ্রামের পন্থায় বিশ্বাসী সেই যুগের দেশপ্রেমিক তরুণগণকে সঠিক ভাবেই বিপ্লবী অথবা বিপ্লবপন্থী বলা হ'য়ে থাকে।

আলোচ্য বইখানিতে "অগ্নিযুগের" সুচনাকালের ঘটনা সমূহেরও কিছুটা উল্লেখ আছে, অর্থাৎ পুণা জেলার চাপেকার ভ্রাতৃগণের অবিস্মরণীয় বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সমূহের কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে, এবং তা ভিন্নও তারও ২০ বৎসর পূর্ব্বের মহারাষ্ট্রের অবিস্মরণীয় দেশ প্রেমিক বিপ্লবী বীর বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ইংরেজ শাসকগণের বিরুদ্ধে যে দুর্দ্দমনীয় সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তারও কিছুটা বিবরণ রয়েছে। বাংলা দেশের নারী জাগরণ এই গ্রন্থের অপর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। কারান্তরালের অনেক তথ্য লেখক বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছেন এবং সকলের অবগতির জন্য এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

এককথায় বলা যায় আলোচ্য গ্রন্থখানি সশস্ত্র বিপ্লব পথে ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টার একখানা সংক্ষিপ্ত আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস। এ ছাড়াও ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন ক'রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যে অকাট্য যুক্তিসমূহ আদালতে রেখে ছিলেন আলোচ্য বইখানিতে দেশবন্ধুর সেই "সওয়াল" ও সংযোজিত হওয়ায় বইখানির আকর্ষণ বহু পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বহু সংখ্যক অমর শহীদের যথাযথ জীবন আলেখ্য অঙ্কনে লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। আমি আন্তরিক ভাবেই এই বইখানির বহু প্রচলন কামনা করছি।

৩১-৩-১৯৮০ —গণেশ ঘোষ

শুদ্ধিপত্র

২০ পৃষ্ঠায়, প্রথম তৃতীয় লাইনের পর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সংশোধন।

১০ই মে রাত্রিতে মীরাটে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপক ভাবে দেখা দেয়। ১৩ই মে দ্বিতীয় বাহাদুরশাকে দিল্লীর লাল কেল্লায় বাদশার আসনে বসিয়ে জাতীয় সরকার গঠিত হয় সাময়িকভাবে। এর পূর্বে ফেব্রুয়ারীর শেষে ব্যারাকপুরে ১৯ নম্বর রেজিমেণ্টের সিপাহীরা গরুর রক্ত এবং শূয়োরের চর্বি মাখান কার্তুজ দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে অস্বীকার করল: হিন্দু সিপাহীরা সকলেই বেঁকে দাঁড়াল কেউ কার্তুজ স্পর্শ করবে না। মুসলমানরাও ঐ একই কারণে শূয়োরের চর্বি লাগান বলে, অস্বীকার করল কার্তুজ ব্যবহার ক'রতে। সরকার থেকে খবর এল ১৯ নম্বর রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়ার। এই অপমানে ৩৪ নম্বর রেজিমেণ্টের বেশ কিছু সিপাহী ক্ষেপে উঠল এবং এই রেজিমেণ্টের বাঙালী সিপাহী মঙ্গলপাণ্ডের সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় ২৯শে মার্চ সে একাই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ৩১শে মের নির্দ্ধারিত দিনের অনেক পূর্বেই, মঙ্গল, পর পর তিন জন ফিরিঙ্গী মিলিটারী অফিসারকে খতম করল ব্যারাকপুর প্যারেড গ্রাউণ্ডে। কর্ণেল হুইলার ছুটে গেলেন, জেনারেলের বাংলোয়। জেনারেল আর্স একদল ফিরিঙ্গী সৈন্য নিয়ে ছুটে এসে বহু চেষ্টায় তাকে গ্রেপ্তার করলেন, তার নিজের গুলিতে আহত অবস্থায়। কোর্টমার্শালের বিচারে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ৮ই এপ্রিল, ১৮৫৭-তে মঙ্গলপাণ্ডে ফাঁসী কাঠে ঝুলল। ফিরিঙ্গী কবলিত হিন্দুস্থানে মঙ্গল প্রথম শহীদের যশ মাথায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেল।



বহ্নিবিপ্লব

॥ এক ॥

দড়াম্। দড়াম্। দড়াম্।

রিভলবারের তিন-তিনটে গুলীই শিরদাঁড়াটা ভেদ ক'রে বুকে গিয়ে ঢুকেছে।

অব্যর্থ, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ!

মুখ থুবড়ে পড়ল শ্রীরামপুর জমিদার বংশের যুটযুটে ছেলে নরেন গোঁসাই, প্রেসিডেন্সী জেলের গোরা ডিগ্রীর কাছে তাঁত কামানের সামনে, রাস্তার ওপর ছিটকে।

পালিয়ে যাবে কোথায় তুমি বেইমান? একটা গুলীও হাতে রাখিনি। সব কটাই তোমার কাজে লাগিয়েছি; পাছে তুমি বেঁচে যাও, ভরসা পাইনি।

আত্মহত্যা? নাঃ, সে আমি করব না। হাসি মুখে ফাঁসীর দড়িতে গলা বাড়িয়ে দেব। সকলে দেখবে কানাই মৃত্যুভয় করে না। কানাই মৃত্যুঞ্জয়!

অনেকগুলো নিরীহ লোককে তুমি ধরিয়ে দিয়েছ, অরবিন্দ ঘোষের নামটাও গুপ্ত সমিতিতে জড়িয়ে দিয়েছিলে। তুমি বেঁচে থাকলে আরও কত লোকের সর্বনাশ করতে কে জানে! অরবিন্দকেও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ফাঁসীতে ঝোলাতে তুমি কুণ্ঠিত হতে না। রাজসাক্ষী হয়েছিলে

তুমি তাই না? কিসের লোভে তুমি এত সব পাপ কাজ করছিলে? দৃঢ় মনোবল যার নেই সে করবে দেশের কাজ? ছি, ছি, ছি, বিপ্লবের কাল সাপ, বাঙালী নামের কলঙ্ক তুমি!—এইবার ঠিক হয়েছে কেমন না? সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সত্যেনের হাত থেকে রেহাই পেলেও আমার কাছে তোমার রক্ষে নেই। সত্যেনকেও দোষ দিই না। সে বেচারা কি করবে! তার রিভলবারে যে, মাত্র একটাই গুলী ছিল। রিভলবারটা ছুঁড়েছিল ঠিকই—তোমাকে লক্ষ্য ক'রে। বুকে না লেগে উরুতে কেন লাগল? তাই তো বুঝতে পারছি না! সেই সুযোগে তুমি দৌড়ে পালিয়ে গেলে হাসপাতালের বাইরে। কিন্তু শমন যে তোমার শিয়রেই দাঁড়িয়েছিল! যাবে কোথায় তুমি পালিয়ে?

…দেখি, দেখি,—না না না আর নড়ছে না। সব স্থির হয়ে গেছে। বেইমানের তাজা খুনে অনেকখানি জায়গা ভেসে গেছে।

কই 'মিষ্টার ক্যাবেজ'—বাঁধাকপি জেলার! রিভলবার হাতে নিয়ে উন্মত্ত কানাইলালকে ছুটে আসতে দেখে কোথায় সটকান দিলে তুমি? বপুখানাতো তোমার কম নয়! তাই বুঝি এখানকার বাসিন্দেরা বাঁধাকপি জেলার নাম দিয়েছে তোমার? কোথায় গেল তোমার চিফ হেডওয়ার্ডার? সেও ভয় পেয়ে পালিয়েছে? তোমার সঙ্গেকার সেপাই-সান্ত্রিরাই বা গেল কোথায়? এই বুঝি তোমাদের কারারক্ষার নমুনা? একটা রিভলবার দেখেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালে রথী-মহারথীর দল। আমাকে নরেনের পেছনে ধাওয়া করতে দেখে সামনে থেকে চোঁচা দৌড় দিল সকলে!

ঐ, ঐযে! দেখ! দেখ! বড় জমাদার বেচারা জালার মত ভুঁড়িটা নিয়ে বড় ড্রেনের গর্তে পড়ে কোঁকাচ্ছে! ওকে ধরে তোল তোমরা!

আমার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছ? ভয় নেই। আমার রিভলবারে

আর একটাও গুলী নেই। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এই দেখ হাত থেকে ফেলে দিচ্ছি ওটাকে।

আমাকে তোমরা ধরবে না? ধরবে এস! শীগ্গীর এস! আমি খুন করেছি। নরেনকে আমি খুন করেছি! নরেনকে আমি খুন করেছি! আমি খুনী। আমি খুনী।

সে কি উল্লাস কানাইয়ের।

দিনটা ছিল ৩১শে আগষ্ট। নরেনের জীবনে বড়ই অশুভ দিন! ১৯০৮ সাল।

সকাল প্রায় আটটা তখন—নরেন বিদায় হল।

বিপ্লবী নরেন নামের কলঙ্ক ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে ফাঁসীর রজ্জু থেকে বাঁচাল কানাইলাল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান দলকে, নিজে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিয়ে।

আরতো সেই কবে শ্রীকৃষ্ণ বাঁচিয়েছিলেন রাখাল ছেলেদের, কালিয়নাগকে বধ ক'রে।

যে কানাই—সেই তো কৃষ্ণ!

একনিষ্ঠ, মহাযোগী, বাঙলার ঘরে ঘরে তুমি নারায়ণের আসনে বসে আছ।

তোমাকে জানাই অবনত মস্তকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

অন্য দিকে চোখ মেলে দেখি—যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলকে ধন্য করেছিলেন অদ্বৈত মহাপ্রভু, মহাপ্রভু জগৎবন্ধু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, নলিনী বাগচী আরও কত কে। সেই কুলকে অচিরে অতলগর্ভে তলিয়ে দিতে নরেন তুমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলে না? এমনই কুলাঙ্গার তুমি?

জানি তোমারই আত্মীয়তাপাশে আবদ্ধ ছিল কালাপাহাড়*। তার

* কালাপাহাড়ের নাম ছিল কালাচাঁদ রায়। বাল্যকালে রাজু নামে পরিচিত ছিল। নয়ানচাঁদ রায়ের পুত্র। জগদানন্দ রায়ের বংশে জন্ম (জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের বংশ কুভর-কৃত্তিবাস) এবং এঁর উপাধি ছিল

অপকর্মের বিশেষ একটা কারণ ছিল সত্য। কিন্তু কোন মোহের বশবর্তী হয়ে এমন একটা জঘন্য পাপে ডুব দিলে তুমি ? নিয়তি তো তোমার ইচ্ছাকে সফল হতে দিল না !

এ সমাজের কেউ কি আজ পর্য্যন্ত সে পাপের খেসারত দিয়ে উঠতে পেরেছে ? কেউ কি দিতে পারবে তোমার ঐ ঘৃণিত অপকর্মের মূল্য ফেরৎ !

ভাদুড়ী। কালাচাঁদ রায়ের পৈতৃক ভিটা ছিল রাজশাহীর অন্তর্গত মান্দা থানার অধীনে বীর জাওন গ্রামে। সুপ্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে কালাচাঁদের জন্ম। কালাচাঁদের পিতা গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁর পদবী ছিল ভুঁইয়া। বাজুব অল্প বয়সেই তার পিতার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। পিতৃহীন কালাচাঁদকে মাতামহ ঐ সময়ে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে যান। সেইখানেই সে মামার বাড়ির প্রভাবে বড় হতে থাকে। এখানে সর্বদা হরিনাম শুনত সে। মাতৃকুল ছিল তার বৈষ্ণব ধর্মে প্রবল বিশ্বাসী। এই কারণেই ঐ আবহাওয়ায় কালাচাঁদ অল্প বয়স থেকেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং খুবই হরিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পরে, জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দু দেবদেবীর ওপর ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং সে উন্মত্ত প্রায় হয়ে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস করতে সুরু করে।

(তারিখ-ই-খাজেহান, তারিখ-ই-পেরসাহী, পারসী ইতিহাস অবলম্বনে দুর্গাচরণ সান্যাল কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত।)

॥ দুই ॥

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সুসজ্জিত চন্দন কাষ্ঠের চিতা পালঙ্ক অগুরু চন্দনে চর্চিত। তদুপরি বিল্বপত্র আর পুষ্পস্তবকে সজ্জিত বাসর-শয্যা।

কত যেন শান্তিতে, কত আনন্দে ফুলশয্যায় ঘুমোচ্ছে কানাইলাল।

দিব্যকান্তি, সৌম্যমূর্তি, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুদুটি, মুখে মৃদু হাসি, বদ্ধ ঠোঁট দুটিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—প্রতিহিংসার ক্রুদ্ধতা, আজানুলম্বিত হস্তদুটি

মহাযোগীর রুক্ষ কেশদাম ইতঃস্তত বিন্যস্ত, পরিধানে পট্টবস্ত্র, রজ্জুটানে কিঞ্চিত অবনমিত স্কন্ধদুটিব পাশ দিয়ে প্রশস্ত বুকের কোলে হাওয়ায় হিল্লোলিত কুঞ্চিত রেশমের উত্তরীয়খানি, গলদেশে পুষ্পমাল্য, কপোলে এবং ললাটে মায়েরা নতুন ক'রে এঁকে দিয়েছে থাকে থাকে চন্দনবিন্দু, ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে সিন্দুর তিলক। সে যেন এক অভিনব বরবেশ।

তখনও অজস্র গীতা, ফুল-চন্দন, ধূপ-গুগগুলের বর্ষণ চলেছে সেই ফুলশয্যায়, মরদেহের পথপরিক্রমায় যেমন চলেছিল গীতা আর পুষ্প-বর্ষণ। এখন যেন আরও বেশী। মুহূর্তের জন্যও নিবৃত্তি নেই।

প্রত্যুষ থেকে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হতে চলল, এখনও জনসমুদ্র কানাইলালের চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। ভারতবাসীর সঙ্গে বিদেশীয় ও ইংরেজ নরনারী, অশ্রুসিক্ত নয়নে। কার ক্ষমতা এই প্রচণ্ড তরঙ্গের গতি রোধ করে। মুহুর্মুহু সমুদ্র গর্জনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে বিবর্ণমুখ ধরিত্রী যেন ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে। রবিরশ্মির মৃদু পরশনে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সর্ব্বাঙ্গ এক জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

চিতানল ধীরে ধীরে বীরের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে নবানুরাগে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল।

মিনিটে মিনিটে কলসী কলসী ঘৃত, মণে মণে চন্দন কাঠ, সেরে-সেরে সুগন্ধির গুঁড়ো যজ্ঞকুণ্ডে অর্পিত হতে লাগল। এর আর শেষ নেই, কে আনছে, কোথা থেকে আসছে কে জানে?

পরম বিস্ময়ে চেয়ে আছে শ্মশানবন্ধুরা। এমন তো কখনই দেখা যায় না!

অশ্রুজলে মহাশ্মশান প্লাবিত....

....গগনচুম্বী হোমানল বীর শহীদের জীবনালেখ্য এইভাবে লিখে দিল আকাশের গায়ে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তপর্য্যন্ত।

'বন্দেমাতরমের' কি সুমধুর মহিমা, একুশ বছর বয়সের তরুণ যে কী ঘটাতে পারে ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশসিংহ লালবাজারের গিরিকন্দরে বসে দুরু দুরু বক্ষে সচকিত নয়নে তা উপলব্ধি ক'রছিল।

রক্তাম্বর পরিধান করে সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে কানাইলালের অপেক্ষায়। রথতুরঙ্গের বল্গা কিঞ্চিৎ প্রশমিত। রথের কিয়দাংশ ভাগীরথী কূলে শ্মশানবক্ষে নিমজ্জিত হয়েছে, মহাযোগীর অভিসারে। কানাইলালকে এরা অব্যাহতি দিলে তাকে সঙ্গে নিয়ে দিনমণি যাবেন অস্তাচলে।

তখনও সেই একই অবস্থা। চিতানলে সেই ঘৃতাহুতি, সেই চন্দনবৃষ্টি, এর যে শেষ নেই। কানাইলালের শোকে এ কী উন্মাদনা? এরা যে কেউই মায়ের দুলালকে ছেড়ে দিতে চায় না।

এইভাবে অগ্রসর হ'তে থাকলে সন্ধ্যা কোথায় গড়িয়ে যাবে, চিতা নেবা যে অসম্ভব! শবানুগমনকারী প্রথম সারির সকলেই এখন পরিশ্রান্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। সেই ভোরে বেরিয়েছে শবযাত্রা।

কানাইলালের নশ্বর দেহ তো কখন পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেছে! তবে আর কেন?

মতিলাল রায় সজলনেত্রে এক কলসী গঙ্গাজল এনে চিতাকুণ্ডে

নিক্ষেপ করলেন, কানাইলালের অগ্রজ ডাক্তার আশুতোষ দত্তও এক কলসী জল দিলেন। সুরু হ'য়ে গেল বহু কলসীর আনাগোনা।

সামান্য কয়েক মিনিটে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হ'ল।

যেই একমুষ্ঠি চিতাভস্ম অস্থি-সমেত গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হ'ল, সূর্য্য গেলেন অস্তাচলে।

এইবার ভস্ম সংগ্রহে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

মতিলাল একটি রৌপ্যাধারে সামান্য চিতাভস্ম সংগ্রহ করলেন বহু চেষ্টায়। অস্থির সবই তো নিঃশেষ। অগণিত জনতা স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে কেউ সোনার কৌটায়, কেউ রূপার, কেউ বা আবার হস্তিরদনির্মিত কৌটায়, কেউ অন্য কিছুতে আবার মা বোনেদের কেউ বা আঁচলে ভস্ম সংগ্রহ ক'রে কানাইলালের চিন্তা বুকে নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাড়ি ফিরে চললেন।

আশুতোষের দল চন্দননগরের বাড়িতে ফিরে কানাইয়ের বিধবা জননীকে প্রণাম জানালেন। পুত্রশোকে মুহ্যমানা বীর প্রসবিনী মাতা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'হাঁগো বাবারা! কানাইয়ের কী কলকাতার চাকরীর ছুটি হয়ে গেল? এখন বুঝি সাগরপারে পাকা চাকরী নিয়ে গেল? আর ফিরবে না, না? ওযে কোনদিন মিথ্যে কথা বলে না! তাহলে সত্যি খোকা চাকরী করছিল? হাঁারে, আমাকে যে তাই বলে গিয়েছিল?'

মায়ের এই প্রশ্নে কেউ আর স্থির থাকতে পারে না; সকলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে।

১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার (২৫শে কার্তিক ১৩১৫)। আজই ব্রাহ্ম মুহূর্তে কানাইলাল দত্ত হাসতে হাসতে আলিপুর, প্রেসীডেন্সী জেলের ফাঁসী কাঠে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করে অমরাবতীতে মহাপ্রস্থান করেছে।

আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ কানাই ধাপে ধাপে পা ফেলে ফাঁসীর মঞ্চে উঠেই, জেল জীবনে ঘনিষ্ঠ সেই আইরিশ ওয়ার্ডারকে কাছে ডেকে তার দিকে মাথাটা ফিরিয়ে হাসতে হাসতে বললে—"কাল রাত্রিতে তোমার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয় তখন আমি কত খুসী ছিলাম বলতো? এমন শুভ মুহূর্তের আমার যেন অপেক্ষা সহ্য হচ্ছিল না। তাইতো তোমার সঙ্গে অত হাসি তামাশা করেছিলাম। তুমি বরং আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে—বলেছিলে 'মরার ভয়ে ঠোঁট-দুটো আমার কালো হয়ে যাবে।' কিন্তু হ'ল কি মিঃ ফুকারিয়া? আমি সে ধাতুতেই গড়া নই। বিশ্বাস না হয় আমার মুখের ঢাকাটা উঠিয়ে এখনও দেখ না ছাই কেমন তুমি আমাকে দেখছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ আর একটা কথা—কাল রাত্রিতে তোফা ঘুম দিয়েছি। এসেছিলে কিনা জানি না। এসে থাকলে নিশ্চয় দেখেছ! সকালে ডেকে ওরা আমার ঘুম ভাঙ্গাতেই পারে না। কী হাসির কথা বলতো?"

মঞ্চে উঠে কানাইয়ের কী ভীষণ কৌতূহল—ফাঁসীর কায়দা-কানুনগুলো সবই একসঙ্গে জেনে নিতে চায়। দড়িটা নিজের হাতেই গলার মধ্যে গলিয়ে দিয়েছে।

—"না, না, না, সে কী করে হয়? তুমি কেন কষ্ট করবে জল্লাদ? ফাঁসীর দড়িটা আমার হাতেই দাও না! আমি পরে নিচ্ছি গলায়। সে রকম নরম হয়নি তো? দড়িটা বড্ড শক্ত। ছি ছি সরকারের বুঝি সামান্য পয়সাটাও ছিল না? ঘি, সাবান, কলা, চিনি কিছুই কি তোমাকে দেয়নি জল্লাদ, দড়িটা নরম করতে?"

॥ তিন ॥

শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে কংসের লৌহ নির্মিত কারাকক্ষে। কানাইলালের আবির্ভাব ঠিক জন্মাষ্টমীতে ১৫ই ভাদ্র ১২৯৫, ইংরাজীর ১৮৮৮র ৩০শে আগষ্ট ভোর পাঁচটায় মাতুলালয়ে চন্দননগরে।

তবে ভুল করিনি নিশ্চয়, 'যে কানাই সেই কৃষ্ণ' বলে।

চন্দননগরে বসবাস। পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী জেলার খরসারি—বেগমপুর গ্রামে। দুটি সহোদর। কনিষ্ঠ সর্ব্বতোষ। কিন্তু সে নাম কবেই তো মুছে গিয়েছিল। জন্মাষ্টমীতে জন্মেছিল বলেই তো সর্বতোষ হ'ল কানাই। কানাইলালের ভগিনী ছিল পাঁচটি। বাবা চুনিলাল দত্ত আর মা ছিলেন ব্রজমণি দাসী। জাতিতে তন্তুবায় এঁরা।

চুনিলাল থাকেন বোম্বাইয়ে। সেইখানেই তাঁর অন্ন সংস্থানের জায়গা। ভারতীয় মেরিন ডিপার্টমেণ্টে একাউণ্টেণ্টের চাকরী করেন।

পাঁচ বছরে পা বাড়িয়েই কানাইকে যেতে হ'ল বোম্বাইয়ে। আর্য্য মিশন হাইস্কুলে ভর্তি হ'ল সেখানে। স্বভাব, চরিত্র, লেখাপড়া সব দিকেই চৌখস। শিক্ষকমহাশয়দের মন জয় ক'রে ফেলল সামান্য কটা দিনে। তাঁদের কাছ থেকে কত সুন্দর সুন্দর বই উপহার পেল কানাই। একরত্তি ছেলে। মাত্র তিনটে বছরেই স্কুলে বেশ আধিপত্য বিস্তার করে ফেলল নিজের স্বভাবগুণে।

ন বছরে পড়তেই কানাই এল চন্দননগরে। ভর্তি হ'ল এখানকার ডুপ্লে কলেজে। এই কলেজের আগের নাম ছিল Ecle-Se-Santa-Mariá, মাদার মেরীর নামে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ফাদার বার্থ,

এই সময় থেকে প্রায় বছর চল্লিশ আগে। ১৯০১ সালে ফরাসী সরকার এখানে এফ. এ. ক্লাস খুলে পূর্বের নাম বদলিয়ে শিক্ষায়তনের নাম রাখলেন Dupleix College। এক বছর এখানে পড়ে কানাইকে আবার যেতে হ'ল বোম্বাইতে।

ছোটবেলা থেকেই দুধমুড়িতে ছিল তার খুব লোভ। মা, দিনে আড়াই সের ক'রে মোষের দুধ খাওয়াতেন কানাইকে।

পরে বড় হয়ে যখন বিপ্লব দলের গন্ধে গন্ধে চন্দননগর থেকে কলকাতায় পাড়ি দিল সে, সেদিনও সে মার হাত থেকে দুধমুড়ি খেয়েই রওনা দিয়েছিল।

গর্ভধারিনীকে বলেছিল-'সত্যবাদী কানাই'—চাকরী করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ সত্যি কথাই তো! সে যে চাকরী নিয়েছিল ভারত জননীর দপ্তরখানায়।

হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম—সেই দশবছর বয়স থেকে অর্থাৎ ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত এক নাগাড়ে বোম্বাইতে কাটিয়ে লেখাপড়া করল কানাইলাল।

প্রথম জীবন থেকেই কেমন যেন উদাসীন ভাব। নেই পোষাক-আষাকের কোনও আড়ম্বর। প্রাচুর্য থাকলেও কোনদিনই সে দিকে ছিল না তার নজর। গরীব বন্ধুদের দলে এক হয়ে মিশে যেত সে। খাওয়ার জিনিষে ছিল না কোন লোলুপতা। দরিদ্র—মহারাষ্ট্রীয় ছেলেদের সে বড় ভালোবাসত। বিষ্ণুগণেশ পিংলে ছিল তার সহপাঠীদের বিশেষ একজন। কতদিন মার কাছে বন্ধুদের নিয়ে এসে ভূরিভোজন করিয়েছে সে। তাদের মধ্যে "টোষা" কানাইয়ের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। টোষার বাবা-মা তার ছেলেবেলাতেই প্লেগে মারা গিয়েছিলেন, তাই বোধহয় কানাইলালের এত দরদ ছিল তার ওপর।

কাগজে কানাইয়ের শেষ খবর পেয়ে টোষা চোখের জলে ভিজিয়ে একখানা চিঠি দিয়েছিল চন্দননগরে।

অদ্ভুত মেধা; সব সময়েই বই মুখে নিয়ে প'ড়ে থাকতনা কানাই। পরীক্ষার মাসখানেক বাকী থাকতে বই হাতে নিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারী সুরু হয়ে যেত তার। কেবল বইয়ের পাতাগুলো সব একবার উল্টে নিতে পারলেই তার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। ব্যস, এতেই সে ক্লাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় একটা জায়গা কেড়ে নিতই।

চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজ থেকে সে এণ্ট্রান্স পাস ক'রে, পরে এফ. এ. পাস করল। হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিল। ১

সে যখন ফাঁসীর আসামী, তার বি. এ. পাশের খবর বেরুল। সরকার রাগে তার সে ডিগ্রী কেড়ে নিল। তাতে তার বড় বয়েই গেল।

সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, বিনয়ী নম্র স্বভাবের ছেলে।

কোন দিন বাবামার চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলেনি। কিন্তু যখন দেখেছে সত্যের অপলাপ হচ্ছে তখন তাঁদেরকেও রেহাই দেয়নি। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান সে বরাবর দিয়েছে কিন্তু তাঁদের অন্যায়কে সে কোন দিনই মেনে নেয়নি। সামান্য একটা ঘটনা থেকে তার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

কানাইয়ের ছেলেবেলায় তার মাতুল তাকে রোদ লাগাতে বারণ করেছিলেন। ছেলের দল রোদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, কানাই ছাদের টিনের চালার নীচে ব'সে ঘুড়ি ওড়ান দেখছে। মামা তাকে ডেকে এনে রোদ লাগানোর জন্যে প্রহার করলেন—কানাইলালের কোন কথাই শুনলেন না। সত্যের অপলাপ সে তো করেনি। তবুও কেন তাকে মিথ্যাবাদী বানান হবে! এরপর দুঃখে সে জল পর্যন্ত মুখে দিল না। মাতুল বিপদে পড়ে ওর সমবয়সী ছেলেদের কাছে জিজ্ঞেস করে যখন জানলেন, সে রোদ লাগায়নি, তখন আবেগে কানাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অপরাধ স্বীকার করলেন। অমনি সব দুঃখ মন থেকে মুছে ফেলে দিল সে। শুধু কি আত্মীয় স্বজন, যার সঙ্গেই যখন সে মিশেছে সকলেই জানত কানাইলাল সত্যের অপলাপ কখনই করে না।

॥ চার ॥

ভারতবর্ষ কি ভাবে ইংরেজদের পদানত হল তার কিছুটা আলোচনা হওয়া এখানে প্রয়োজন। ক্রমে আলোচিত হবে ভারতে যুব জাগরণ। বহ্নি বিপ্লব।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান এত সুদৃঢ় যে, এরোপ্লেনের আগের যুগে একে কুক্ষিগত করা কোন বহিঃশত্রুর পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু তা ঘটেছে যৌথ শক্তির অভাবে।

এই স্বর্ণ প্রসবিনী সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা দুর্ভাগা ভারতবর্ষ পুরাকাল থেকেই বহিঃশত্রুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে কোন দিন নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

যদি আমরা অনেক পেছন দিকে চলে যাই দেখতে পাব এই শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মান্ধাতাই এক সময়ে একদিন উত্তর পশ্চিম গিরিপথ ধরেই, এসে হাজির হয়েছিলেন এদেশের মাটিতে* সময়টা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ৩৪৫৭। অনু ও পুরুবংশীয় রাজারাও ঐ একই সময়ে এসে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়েন।

---

* কথিত আছে—রামচন্দ্রের ইক্ষ্বাকুবংশ অতি প্রাচীন আর্য্যজাতি। এই বংশের রাজারাই একাদিক্রমে একশ বাইশ জন ২১৫৮ বৎসর এই পৃথিবীর বুকে রাজত্ব চালিয়ে এসেছিলেন—খৃষ্টপূর্ব ৩৭৯৫ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৬৩৭ পর্য্যন্ত। ঐ ৩৭৯৫ খৃষ্টপূর্ব অব্দে রাজা ইক্ষ্বাকু ইরানে রাজত্ব করতেন। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে সমাজ সভ্যতা প্রচুর প্রসারতা লাভ করেছিল।

এই ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মান্ধাতা এদেশের লোভ সামলাতে না পেরে পার্বত্য পথ ধরে এসে ভারতের জমিতে নিশান গাড়লেন। অনু ও পুরু বংশীয়েরা এ সুযোগ হেলায় হারান নি। মহিষাসুরের তখন এদেশে প্রবল প্রতাপ। মহিষাসুর বহিঃশত্রুকে বাধা দিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লঙ্কার রাজা প্রথম রাবণ, তিনিও মান্ধাতাকে এদেশ থেকে তাড়াতে যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে হিন্দুস্থানকে আক্রান্ত হতে হয়েছে শক, হুণ, পাঠান ও মোগলের হাতে। এরাও এসেছিল ঐ উত্তর পশ্চিম গিরিপথ ধরে। আক্রমণ চালিয়েছে এদেশের ওপর। এ সময়ে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যৌথ বাধা প্রদানকারী রাজশক্তির অভাবে বহিঃশত্রু সহজেই জয়লাভ করেছে।

এরপরে একে একে সমুদ্র পথে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের অছিলায় এসে এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসল। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আরমেনীয় সকলেই পরপর এসে ভারতভূমিতে আস্তানা গাড়ল। ১

স্যার টমাস রো এল ইংরেজ রাজের দূত হয়ে। আদব কায়দা আর ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে টমাস, সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে অবনত মস্তকে আবেদন জানাল এদেশের মাটিতে সামান্য কিছু বাণিজ্য করবার অনুমতি চেয়ে।—ঠিক যেন সেই বামনরূপী ব্রাহ্মণের বলিরাজের কাছে তিন পা জমি চাওয়া। যেই খোসমেজাজী বাদশা জাহাঙ্গীর তথাস্তু বললেন অমনি ভারতবর্ষের দুর্যোগের দিন ঘনিয়ে এল।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কালভুজঙ্গ ফণা বিস্তার ক'রে বিষ উদ্গীরণ করতে লাগল। বিষের আগুনে ভারতবর্ষের চতুর্দিক জ্বলে

শুম্ভ বধের পর খৃষ্টপূর্ব ৩০৬৪তে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা হরিশচন্দ্র ভারতে কায়েমীভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বিগতকালে ভারতবর্ষে নানা বিপর্যয় ঘটে যায় কিন্তু অনার্য্যদের দাপট তখনও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

রাজা হরিশচন্দ্রের বত্রিশ পুরুষ পরে অজপুত্র দ্বিতীয় দশরথ—এই শাখার তেত্রিশতম পুরুষ, তখন রাজাসনে—সময়টা হল ২১৫৮ খৃঃ পূঃ এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকবার অনার্য্য নিধনের চেষ্টা ও রাবণদের বধের চেষ্টা হয়েছিল এঁদের দ্বারা। অবশেষে দাশরথি রামচন্দ্রের পক্ষেই এই কার্য্য পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। তিনিই পেরেছিলেন এদেশের অনার্য্যদের ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে (সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৮৩ পৃঃ ৩৮৪)।

উঠল। নানান ষড়যন্ত্র জাল ইংরেজরা বিস্তার করল। বাণিজ্যের নামে জাহাজভরতি অস্ত্রশস্ত্র এনে বন্দরে বন্দরে ঘাঁটি গাড়ল।

দেখতে দেখতে পলাশীর মাঠে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার সেই ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডের রূপ নিয়ে দেখা দিল। এর মূলে ছিল ইংরেজ কূটনীতি আর সেনাপতি ইয়ার লতিফ, দুর্লভরায় আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে। সুড়ঙ্গপথে ক্লাইভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল উমিচাঁদ। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা ইংরেজরা দখল করল।

কোম্পানীর শাসন সম্বন্ধে ক্লাইভের নিজের উক্তি—"They thought of nothing but the present time, regardless of the future ; they said, 'Let us get what we can to-day, let to-morrow take care for itself.' They thought of nothing but the immediate division of the loaves and fishes."

বাঙলার মসনদের পর ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষ শক্তিশালী করে তুলল। এরপর নজর পড়ল তাদের দিল্লীর সিংহাসনের ওপর। ১৮০৩ সালে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুরশাকে পরাস্ত করে ইংরেজরা কেড়ে নিল দিল্লীর তখ্‌ৎ এ তাউস।

হল ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের অবসান।

এইবার বেনিয়া ইংরেজদের সুরু হল শাসন ও শোষণ। প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করে ভারতবর্ষকে কঙ্কালসার করে দিল এরা। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীরা কোমর সোজা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল, ভারতবর্ষকে যারা প্রকৃত ভালবাসত। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় সে খবর ফাঁস হয়ে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তা আরম্ভেই শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশীয় সামন্ত রাজারা।

পর পর অনেকই বিদ্রোহ দেখা দিল কিন্তু একটিও ফলপ্রসূ হল না।

হ'ল বরকন্দাজ বিদ্রোহ। তারপর তিতুমীরের বিদ্রোহ। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর দু'তিন বছর আগে থেকেই নানাসাহেবের গুপ্তচরের দল গোপনে দেশীয় নৃপতিদের মনে ইংরেজ বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছিল—এরাই সিপাহীদের মনেও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের একটা বিশিষ্ট দিনও ধার্য্য করা হয়েছিল। একই দিনে এই আগুন জ্বলেছিল বাঙলার ব্যারাকপুরে—বহরমপুরে; মীরাট, আম্বালা, লক্ষ্মৌ, কানপুর এবং ঝাঁন্সীতে। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে ওয়াহাদি ষড়যন্ত্রের কর্ণধাররাও চেয়েছিল মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে। এইসব কারণেই এসব বিদ্রোহকে বিপ্লব বলা চলে না।

বিপ্লব কথার অর্থ হ'ল—চলতি শাসন ব্যবস্থা অহিংস উপায়ে পরিবর্তন করে উন্নততর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন। ধনতান্ত্রিক যুগে সামন্ততন্ত্র ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা বিপ্লব নয়—প্রতি বিপ্লব। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকেই বিপ্লব নাম দেওয়া যেতে পারে; কারণ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শাসনব্যবস্থাই মধ্যবিত্ত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা

তাদের মিলল কই?

স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর স্ফুলিঙ্গ এইবার যুবশক্তিতে অগ্নি সঞ্চার করল। স্বামীজী চাইলেন বীর্যবান যুবক। বললেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর্য্য প্রকাশ কর। পৃথিবী ভোগ কর; তবে তুমি ধার্মিক। আর লাথি ঝাঁটা খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরকালেও তাই।"

স্বামীজী আরও বললেন—"Believe first in yourself, then in God. Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free and you will be."

শিবশক্তি বিবেকানন্দ প্রচার করলেন—"আত্মার জাগরণ আগে, পরে আর সব।"

তিনি জগতের সম্মুখে অঙ্গীকার করলেন, প্রকৃত মানুষ গড়াই হবে তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি যুবকদের আহ্বান করে বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "দেশের এই দুর্গতি মোচনে তোমরা কি কেহ নাম-ধাম, ধন-জন, পুত্র-পরিবার, এমন কি নিজের দেহের প্রতিও মমতা ত্যাগ করতে পারো?...সেই বজ্রকঠিন সঙ্কল্প কি তোমাদের আছে—যাহার বলে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাও নিমেষে অপসারিত হয়।"

স্বামীজীর এই বজ্রনিনাদে সমগ্র যুবশক্তির ক্লীবত্ব তড়িৎ প্রবাহে দূরীভূত হয়ে অগ্নি ঝঙ্কারে স্পন্দিত হয়ে উঠল। এই সঙ্গে যুক্ত হল ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক গ্যারিবল্ডির অলৌকিক কাহিনী।

সত্যিই তো! গ্যারিবল্ডি যদি মাত্র এক হাজার অনুচর নিয়ে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে তুলতে পারেন, কেন মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকরাই বা পারবে না সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে!

এই সত্য চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বীর্যবান যুবশক্তির বুকের রক্ত টগবগিয়ে ফুটতে লাগল। চোখ, মুখ কান দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরিয়ে এল।

ঘর ছাড়া হ'ল তারা। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করল। 'বন্দেমাতরম্', 'বন্দেমাতরম্' হুঙ্কার দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সংগ্রামে।

শাসক সরকারের প্রতিনিধি স্যার আর্থার কটনের মন্তব্য ভারতবাসীর অন্তর থেকে মুছে যায়নি। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত এই চৌদ্দ বছর ইংরেজশাসিত ভারতের জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'Public Works'এ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিল, কেবলমাত্র ম্যানচেষ্টার শহরের অধিবাসীদের জন্যে জল সরবরাহে অনেক বেশী অর্থ ছড়িয়েছিল এই চৌদ্দ বছরে। শাসক গোষ্ঠীর এই অবহেলা ভারতবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। ঐ সময়ে আর্থার কটন, শাসিতের ক্ষতবিক্ষত দেহে নুনের ছিটে দিয়ে এই বলে নিজের লোকদের হুঁসিয়ার করে দিলেন—

"Public works have been almost entirely neglected throughout India. The motto hitherto has been, - Do nothing, have nothing done, let no body do anything. Bear any loss ; let the people die of famine, let hundreds of lakhs be lost in revenue for want of water or roads, rather than do anything."

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা, পর পর শাসকগোষ্ঠীর অনেক অপকীর্তিই তাদের চোখ এড়িয়ে যায় নি।· সহ্যের সীমা অতিক্রম হ'তে চলেছে। না আর নয়! একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে।

১৮৫৭তে হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল।

এই বিদ্রোহের মূলে ছিলেন দুই রমণী—ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ আর মাতাজী মহারানী তপস্বিনী। পশ্চাতে থেকে সিপাহীদের উত্তেজিত ক'রে এক একটিকে জীবন্ত আগুনের গোলা তৈরী করে

ছিলেন।

ফল হল অব্যর্থ। এখন আর নির্বিবাদে সিপাহীরা রাজশক্তির উৎপীড়ন মেনে নিতে চায় না।

১০ই মে মীরাটে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে, গরুর চর্বি মাখান কারতুজ দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে অস্বীকার করল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সিপাহী সকলেই বেঁকে দাঁড়াল—কেউ কারতুজ স্পর্শ করবে না। মুসলমানরাও ঐ একই কারণে শূয়োরের চর্বি লাগান বলে, অস্বীকার করল কারতুজ ব্যবহার করতে।

অনেকদিন আগে থেকেই এই দুই মহীয়সী রমণী চেষ্টায় ছিলেন কোন না কোন অছিলায় ভারতীয় সিপাহীদের ভেতর বিদ্রোহের বীজ বপন করে মহীরূহের সৃষ্টি করতে।

সামান্য কারতুজই অবশেষে এই বিস্ফোরণের সৃষ্টি করল।

এদের দমন করতে ইংরেজ জাতটাকে বেশ নাকানি-চোবানি খেতে হল।

বাঙলার বহরমপুরে আর ব্যারাকপুরে সিপাহীরা ঐ একই সঙ্গে একই কারণে বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ রাজকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সামান্য একজন সিপাহীর ক্ষমতা কতখানি। কিন্তু নিজেদের ভুলে এদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

এর প্রতিশোধ নিতে কুটনীতিতে পারঙ্গম ইংরেজ এইবার ভারতবাসীর ওপর নতুন নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করল! দুটি মাত্র অস্ত্র—দারিদ্র্যের সৃষ্টি হল প্রথম ; পরেই এল ভেদনীতি।

—এইবার বোঝ ভারতবাসী, ইংরেজ জাত কি ভয়ঙ্কর! আমরা কিভাবে তোমাদের শ্বাসরোধ ক'রে মারতে পারি!

দেখতে না দেখতেই প্রথম অস্ত্র রূপ নিল—মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে (Man made famine)। দ্বিতীয়টি তো আগে থেকেই তারা সুরু করে দিয়েছিল—শাসনদণ্ড হাতে নিয়েই ভেদনীতি সৃষ্টি করেছিল ইংরেজরা। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্ত্তন করলেন চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য হ'ল নতুন একদল জমিদার সৃষ্টি করা।

এর পর লর্ড বেন্টিঙ্ক বললেন—"If security was wanting against extensive popular tumult on revolution, I should say that the permanent settlement, though a failure in many other respects and in most important essentials, has this great advantage at least, of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of people."

মিষ্টার হিউম, বড়লাট লর্ড ডাফরিণের কাছে সুপারিশ করলেন, ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হতে দেওয়ার জন্যে।

ইনি ডাফরিণকে বোঝালেন—"Congress will act as 'a safety valve' for the escape of great and growing forces, generated by our action, urgently needed and no more efficacious safety valve than our congress movement could possibly be devised."

১৮৮৫র ডিসেম্বরে সরকারের সহায়তায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হ'ল বোম্বাই শহরে।

কংগ্রেস-নাম্নী ছিদ্র জলপোতে যাঁরা মাঝি মাল্লা সেজে বসলেন, তাঁরাই 'Moderate' বলে চিহ্নিত হলেন।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয় ভারতবাসীর শত্রু নয়—দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কার এই তিনটি বস্তুই ভারতবাসীর আসল শত্রু। তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের সদাশয় সরকার বাহাদুর বুঝি বা এই তিন শত্রুকে সমূলে উৎপাটিত করতে তাঁদের যথোপযুক্ত

সাহায্য করবেন।

আনন্দমোহন বসু তো গদগদ হয়ে বলেই বসলেন—"The educated classes are the friends and not the foes of England—her natural and necessary allies in the great work that lies before her."

অদ্ভুত কথা!···এই মোহে প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এক আশ্চর্য রকমের ভুল ক'রে বসলেন। তাঁরই কলমে বেরল—"ইংরেজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে দিতে পারিতেছে না, সেজন্যও আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচিলে তবে তাহাদের কৃপণতাও ঘুচিবে।....নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা, নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব।.... যখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজদের সহযোগী হইব, তখন ইংরেজকে আমাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলিতে হইবে।"

এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত রবীন্দ্রনাথকে নিজেই করতে হয়েছিল সময়-কালে।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল কলকাতাতে।

এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করলেন।

স্যার সৈয়দ আমেদ মনে মনে গভীর বিদ্বেষ পোষণ করছিলেন। এইবার তিনি তা সর্ব্বজন সমক্ষে ব্যক্ত করে ফেললেন। লক্ষ্ণৌয়ের এক বিরাট জনসভায় সেই বিষ উদ্গিরণ করলেন। বললেন—"মাদ্রাজ কংগেসে তৃতীয় অধিবেশনে বাঙালীর জুতো চাটতে যাওয়া মুসলমানের কখনই উচিত হবে না। অধিবেশন বয়কট কর।"

১৮৮৯ এ কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে আব্রু ত্যাগ করে সর্ব-প্রথম দুইজন বঙ্গললনা যোগদান করলেন। এঁদের একজন কংগ্রেস নেতা জানকীনাথ ঘোষালের সহধর্মিনী 'সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী' স্বর্ণকুমারী দেবী এবং দ্বিতীয়জন—বিশিষ্ট নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী, প্রথম

ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। এঁরাই পরবৎসর কলকাতা কংগ্রেসে স্বকীয় অংশ গ্রহণ করলেন। উভয়েই প্রতিনিধি মনোনীত হ'লেন। অধিবেশনান্তে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে কাদম্বিনী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। কাদম্বিনীর এই বক্তৃতাকে উল্লেখ ক'রে আনি বেসাণ্ট বলেছিলেন—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারীজাতীরও উন্নতির দ্যোতক এ ব্যাপারে তাহাই সূচিত হ'ল।"

এই নারী জাগবণ—রানী ভবানী, রানী রাসমণি, স্বর্ণময়ী, শরৎকুমারী জাহ্নবী, দিনমণি, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ক্রমে ক্রমে প্রতিভাত হতে থাকে এবং অচিবকাল মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

১৮৯০ সালে বিখ্যাত ঐতিহাসিক জি, বি, ম্যালিসন বললেন—"Congress was started by the noisy and cowardly Bengalees but not countenanced by the real people of India."

প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে এই মডারেট দলের মুখে কেবল কথাব তুবড়ি ছুটত। এদের দ্বারা দেশের সাংগঠনিক কোন কার্য হওয়াই সম্ভব হত না।

কংগ্রেসের এই 'ইংরেজ-ভজা-নীতি' যুবসমাজকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলল। তারা এখন ভেতরে ভেতরে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এই মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পথের দাবীর' সব্যসাচীর মুখ দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলালেন, "কংগ্রেসের নেতারা গভর্ণমেণ্টের কাছে জোড় হাতে আবেদন করতেন, আমাদের গলায় দড়ি বেঁধেছ ক্ষতি নেই কিন্তু দোহাই সাহেব, দড়িটা একটু লম্বা করে দাও যাতে আমরা চরে খেতে পারি।"

দুঃখ কষ্টে জর্জরিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষাজীবি ছাত্র, সামান্য বেতনের কেরানী আর ক্রম-বর্ধমান বেকার

সম্প্রদায়। এঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে পুরুষসিংহের অভাব হ'ল না। বাঙলা থেকে এগিয়ে এলেন, বিপিন পাল আর অরবিন্দ ঘোষ, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক আর পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। এই বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠি এঁদের সাদরে নেতারূপে বরণ করলেন।

কংগ্রেস এঁদের চরমপন্থী আখ্যা দিলেন।

চরমপন্থীরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা চলবে না। চাই নতুন পথ—নতুন মত।

অরবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন—"কংগ্রেস দিন দিন ক্ষয় রোগে ক্ষীণ হচ্ছে। কংগ্রেস নেতারা ব্যবস্থাপক সভার শ্বাসরোধকারী পরিবেষ্টন থেকে তরুণ সম্প্রদায়ের বলগা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। দেশের এখন প্রয়োজন দেশাত্মবোধ, যা অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হবে।"

বীতশ্রদ্ধ দেশবাসী দেখল কংগ্রেস তিন দিন বাৎসরিক অধিবেশন ছাড়া আর কিছু করে না। শ্রীঅরবিন্দ তাই ১৮৯৩ এর আগষ্ট থেকে ১৮৯৪ এর মার্চের মধ্যে, বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশে' অনেকগুলো শ্লেষ ব্যাঞ্জক প্রবন্ধ লিখলেন, 'New Lamps for Old' শিরোনামা দিয়ে।

১৮৯৬ সালে ১২ই জানুয়ারী তিলক দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বজন সমাদৃত পত্রিকা 'কেশরী'তে লিখলেন—"For twelve years the Congressmen had been shouting hoarse, but it produced no more effect on the Government than the sound of a gnat. Let us now try"

চতুর্দিকে বিক্ষুব্ধ জনমত সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল।

এই অবস্থার ভেতর বড়লাট লর্ড কার্জনের এক-জেদি মনোভাব সর্বনাশকে আরোও বেশী করে ডেকে আনল। • ১৯০০ সালে কার্জন লিখলেন—"The Congress is tottering to its fall and

one of my greatest ambitions, while in India, is to assist it to a peaceful demise."

বাঙলা এবং দাক্ষিণাত্যের চাষীদের স্বদেশীমন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বদ্ধপরিকর হ'লেন। ইতর ভদ্র সকলকে একই মন্ত্রে বাঁধতে পারলে তবেই ইষ্টলাভ করা যাবে। স্বদেশীই জন জাগরণের একমাত্র পথ। মাতৃভূমিকে ভালবাসতে হলে স্বদেশীর দ্বারাই তাকে জাগাতে হবে, এই হল তাঁর একমাত্র চিন্তাধারা।

What is nationalism ?

অরবিন্দ এর সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন—"Nationalism is not a mere political programme. Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism is a creed in which you shall have to live. It is an attitude of the heart, of the soul. What the intellect could not do, this mighty force and passionate conviction, born out of the very depths of the national consciousness, will be able to accomplish."

বিপিন পাল সুন্দর ভাবে এই দেশাত্মবোধের অর্থ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন।

তিলক বললেন—"Swaraj is my birth-right and I will have it."

অরবিন্দ বললেন—"There are some who fear to use the word freedom , but I always used the word because it has been the *mantra* of my life to aspire towards the freedom of my nation."

এই সময় মডারেট দলের লব্ধ প্রতিষ্ঠ সদস্য গোখলে বললেন—"Only mad men outside Lunatic Asylum could think or talk of independence.....We owe it to the best

interest of the country to resist the propaganda with all our energy and all our resources. There is no alternative to British rule, not only now, but for a long time to come, and any attempt to disturb it, directly or indirectly, are bound to recoil on our own heads."

গোখলের মত একজন ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞের এইরূপ মনোভাবে বেশ অনুমিত হয় এবং পরিষ্কার দেখা যায় যে, মডারেট পার্টির ভাব-ধারা তাঁর মধ্যে কি ভাবে শেকড় গেড়ে বসেছিল। গোখলে এবং তাঁর পার্টির বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ভারতবর্ষ অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে এবং তাদের স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মায়নি, কিন্তু উগ্রপন্থীরা এসব কিছুই মানতে চায় না।

মডারেট দলের এই হীন মনোভাব এবং ভুল ধারণাকে নস্যাৎ করে দিতে অরবিন্দ গর্জে উঠলেন। বললেন—"Political freedom is the life-breath of a nation to attempt social reform, educational reform, industrial expansion. The moral improvement of the race without aiming first and foremost at political freedom is the very height of ignorance and futility."

বিপিন পাল বললেন--"The new spirit accepts no other teacher in the art of self-government except self-government itself. It values freedom for its own sake and desires autonomy, immediate and unconditioned, regardless of any considerations of fitness and unfitness of the people for it; because it does not believe serfdom in any shape or form to be a school for rest, freedom in any country and under

any conditions whatever. It holds that the struggle for freedom itself is the highest tutor of freedom which, if it can once possess the mind of a people, shapes itself the life, the character and the social and civic institutions of the people, to its own proper ends.

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তখন একমাত্র অধিকার ছিল, জাতির পক্ষ হয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলা। মডারেট দলের কুক্ষিগত কংগ্রেস তার কিছুই করত না।

১৮৯৮ থেকেই তুষের আগুনে ভারতের চতুর্দিক ধিকি ধিকি জ্বলছিল। জনজীবনে কোথাও ছিল না শান্তি। দুর্ভিক্ষ মহামারী, অভাব, অনটন, উৎপীড়ন, ভারতবাসীকে অগ্নিদগ্ধ করে তুলল! কার্জন এসে অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করলেন।

১৮৯৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হ'ল। ক'লকাতার পৌরসভার কমিশনারদের সংখ্যা ৫০ থেকে ২৫শে নামিয়ে এনে তাদের কাজ করবার স্বাধীনতা প্রায় কেড়ে নেওয়া হ'ল।

আর এক জায়গায় ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ল। সরকারী নীতিতে শিক্ষিতেরা ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন।

॥ ছয় ॥

বিপ্লবী ভারতে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা বহুদূর বিস্তৃত। এই ব্যক্তি সম্বন্ধে এখানে আলাদা করে কিছু বলা নিস্প্রয়োজন; তবুও তাঁর জন্ম তারিখটির বিষয় কিছুটা উল্লেখ করতে হচ্ছে আলাদা ভাবে কারণ সেটি বড়ই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভোর ৪টে ৫০ মিনিটে কৃষ্ণধন ঘোষের তৃতীয় পুত্র স্বর্ণলতা দেবীর গর্ভজাত সন্তান মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ, ভারতের রাজধানী, ক'লকাতার থিয়েটার রোডে, কৃষ্ণধনের বন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হলেন।

এই ১৫ই আগষ্টেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাসমাধিস্থ হন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের মহাসমাধি হয় ৩১শে শ্রাবন ১২৯৩, ১৬ই আগষ্ট ১৮৮৬ খৃঃ রাত্রি ১ টা ৬ মিনিটে কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ("আমার জীবন কথা" স্বামী অভেদানন্দ ও "শিশুদেব রামকৃষ্ণ"—স্বামী বিশ্বশ্রয়ানন্দ)। ইংরিজি মতে ঠাকুরের মহাসমাধি ১৬ই আগষ্ট হলেও বাঙলা হিসাব মতে রাত্রি ১টা ৬মিনিটকে সেই দিনই ধরা হয়

কুমারী মেরীর পার্থিব প্রকৃতি এই শুভ ১৫ই আগষ্ট ঐশ্বরীক প্রকৃতিকে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং ভগবত প্রসাদ লাভ করেছিল যীশুর আবির্ভাবে। কালক্রমে ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্ট ধরায় অবতীর্ণ হলেন মেরীর গর্ভজাত সন্তানরূপে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি—"These are the facts concerning the birth of Jessus Christ—His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But while she was still a virgin she became pregnant by the Holy spirit. Then Joseph, her fiance being

a man of stern principle, decided to break the engagement but to do it quietly, as he didn't want to publicly disgrace her. As he lay awake considering this, he fell into a dream, and saw an angel standing beside him 'Joseph ! son of David', the angel said, 'don't hesitate to take Mary as your wife ! For child within her has been conceived by the Holy spirit ! And she will have a son, and you shall name Him Jessus (meaning 'Savior'). For He will save His people from their sins. This will fulfill God's message through His prophets—Listen ! The virgin shall conceive a child ! She shall give birth to a son, and He shall be called—Emmanual (meaning 'God is with us'). When Joseph awake, he did as the angel commanded, and brought Mary home to be his wife. But she remained a virgin until her son was born ; and Joseph named Him—'Jessus'." *

[From 'The Greatest is love.'—The living New Testament by Ken Taylor]

* কুমারীর গর্ভ থেকে যীশুর জন্মের চাঞ্চল্যকর কাহিনী খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একটি প্রধান অঙ্গ। সন্ত ম্যাথ্যু লিখছেন : এই সব ঘটনা ঘটেছিল ঈশ্বরকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণে যা উচ্চারিত হয়েছিল পয়গম্বরের মুখে : অহো গর্ভধারণ করবে এক কুমারী, সে জন্ম দেবে এক পুত্রকে, তার নাম রাখবে 'ইমানুয়েল'। পয়গম্বর ইসাইয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ম্যাথ্যু সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন টেষ্টামেন্টের গ্রীক অনুবাদ থেকে। সে বাক্যটিতে পাওয়া যাচ্ছে কুমারী—দ্যোতক গ্রীক শব্দ 'পার্থেনস্'। কিন্তু ম্যাথ্যু যদি মূল হিব্রু টেষ্টামেন্টে ফিরে যেতেন, তাহলে দেখতেন যে পয়গম্বর ইসাইয়া ব্যবহার করেছিলেন 'আল্‌মা'

১৯৪৭ সালের এই শুভদিনেই অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল।

শিশুকাল থেকেই ভগবানের ছায়ামূর্ত্তি অরবিন্দের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। বাল্যকালে দার্জিলিংএ পাঠ্যাবস্থায়—এই সময় তিনি একদিন ঘুমের ঘোরে দেখতে পেলেন, একরাশ ধোঁয়া ছুটে এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। অবশেষে সেই ধোঁয়ার সবটাই ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরাত্মায় প্রবেশ করে লীন হয়ে গেল।

ইংলণ্ডে অবস্থান কালে এ রকম ঘটনা তাঁর প্রায়ই ঘটতো।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে আসার পর আর এক নতুন ব্যাপার ঘটতে লাগল তাঁর শরীরে। আগের সেই ভাবটা গেল কেটে। এবার তিনি প্রায় সম্মোহিত হতে লাগলেন।

শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের পটভূমিকাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু হবে।

অরবিন্দ নিজে পথ প্রদর্শক হলেও কোনদিনই প্রত্যক্ষ ভাবে অস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া, বোমা তৈরী করা, অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা অথবা বিপ্লবীদের সামরিক প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করেন নি। তিনি বিপ্লবীদের অন্তরে সদাসর্বদা অনুপ্রেরণা যোগাতেন: নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ় রেখে আরব্ধ কাজে অগ্রসর হতে। বস্তুতঃ এই যজ্ঞে তিনি সর্ব্বজনবিদিত নেতা ছিলেন।

অরবিন্দ দেশের ডাকে ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় ইস্তফা দিয়ে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার জন্যে গায়কোয়াড়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে, এখানে চাকরি নিয়ে এলেন।

শব্দটি, যার অর্থ শুধুই 'তরুণী'। হিব্রু ভাষায় 'কুমারী' বোঝাতে 'বেথালা' শব্দটি প্রচলিত এবং ইসাইয়া ও শব্দটি আদৌ ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ পয়গম্বরের ভাষায় কোনো অতিপ্রাকৃত জন্মকাহিনীর আভাসমাত্র নেই। এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে মাতা মেরীর কৌমার্যের ব্যাপারটি একটি তুচ্ছ অনুবাদের ভ্রান্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

(যীশু কে ছিলেন?—কেতকী কুশারী ডাইসন। 'দেশ' ৪৫ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠা ৯ই আষাঢ় ১৩৮৫।)

স্বদেশী মন্ত্রে দেশের যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে মন তাঁর ছটফট করেছে বিলেতে থাকতেই।

এখানে এসে ধরলেন কলম।

নানাভাবে তা ব্যক্ত হতে লাগল। তীব্র বিষ মাখান লেখনীর শরসন্ধানে ইংরেজ সরকারকে জর্জরিত করে তুললেন।

লিখলেন, মডারেট দলের তোষণ নীতির ওপর।

কলম চলল, তরুণ মনে আগুন ছড়াতে।

চাইলেন, তাঁর লেখার প্রতিটি স্ফুলিঙ্গ যেন ইংরেজের সরকারী কাঠামোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

১৯০১ সালে অনুজ বারীন্দ্র যখন বরোদায় এলেন, অরবিন্দ তাঁকে বাঙলার সাংগঠনিক কাজে হাত দিতে বললেন। কিন্তু ১৯০২ এর আগে তেমন কিছুই অগ্রসর হ'ল না।

স্বামীজী পরামর্শ দিলেন বাছাই করা আত্মনির্ভরশীল যুবক নিয়ে ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তোলা হোক হাজারে-হাজারে।

এই সময় মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে।

উদয়পুরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মে ছিলেন ঠাকুর সাহেব। বোম্বাইয়ের গুপ্ত সমিতির সভা। তিনি ভারতীয় গুপ্ত আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র এবং নিকটবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে বোম্বাইয়ের ঐ সমিতি তাঁকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিল।

তাঁর আর একটি বিশেষ কাজ ছিল, ভারতীয় সৈন্যদের স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করা। হ্যাঁ, পারলেনও তিনি তা; অনতি কাল মধ্যে দু'তিনটি সৈন্যদলে বিদ্রোহের বীজ ঢুকিয়ে দিলেন।

অরবিন্দ এ সত্যতা যাচাই ক'রে দেখতে কয়েকবার মধ্য ভারত সফর করলেন। পেলেন ঠাকুর সাহেবের যোগ্যতার পরিচয়, সৈন্যদলের

কিছু অফিসারের কাছ থেকে। খুব খুসী হলেন।

গুজরাট গুপ্তচক্রের সভাপতির নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা সেনা বিভাগের অশ্বারোহী সৈন্যের কাজে ইস্তফা দিয়ে ক'লকাতায় চলে এলেন এবং গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হলেন। অরবিন্দই তাঁকে এ কাজের ভার দিয়ে পাঠালেন।

পরে এলেন বারীন্দ্র। বারীন্দ্রের ওপর দায়িত্ব পড়ল যুবক ও ছাত্র সমাজে এই বীজ ছড়াতে।

যুগান্তর দলের সৃষ্টি হল।

ইত্যবসরে যতীন্দ্র, জনা কয়েক বিত্তশালীকে পাকড়াও করে সংগ্রামের জন্যে বেশ মোটা অঙ্কের কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন।

১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত এই তের বৎসর বরোদায় অধ্যাপনা ও যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও, অরবিন্দ স্বদেশের কথা কোন সময়েই মন থেকে মুছতে পারেন নি। বরোদা কলেজের ভাইসপ্রিনসিপ্যালের কাজ এবং আধ্যাত্মিক সাধনাকে ব্যাহত ক'রে বিপ্লব যজ্ঞে নিজের জীবনকে আহুতি দিতে কৃত সিদ্ধান্ত হলেন। যে সব গুপ্তচক্র এই সময়ে ইংরেজ শাসনের কবল থেকে ভারতের মুক্তির পথ খুঁজছিল তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই সম্বন্ধে কয়েকজন নেতার সঙ্গে পরামর্শ হয়ে গেল; সময়কালে তিনি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

গুপ্ত সমিতির প্রধান কার্যসূচির মধ্যে ছিল স্বরাজ-বয়কট-স্বদেশী।

ভগিনী নিবেদিতা যখন মিস্ মারগারেট এলিজাবেথ নোবল্ নামে বিলেতে পরিচিতা, তখন সেখানে তিনি রুশীয় বিপ্লবী প্রিন্স ক্রোপট্‌কিনের প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

কেমব্রিজে অধ্যয়নের সময় অরবিন্দ ঘোষ আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা পার্নেলের দ্বারা ঐ একই সময়ে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তখন এঁদের দুজনের কেউ কাউকে চেনেন না; কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা, সময়কালে অরবিন্দ এবং নিবেদিতা একই মঞ্চে নামলেন।

বাঙলার বিপ্লবীদের দীক্ষাগুরু হয়ে এলেন অরবিন্দ, আর নিবেদিতা এলেন শিক্ষাগুরু হয়ে।

উভয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের জাতীয় ইতিহাসে সৃষ্টি হল 'রক্তরাঙা' অধ্যায়।

এই রকম সমিতি ছিল আয়ারল্যাণ্ডে, ইটালিতে আর রাশিয়াতে।

এই বিপ্লববাদ ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল মহারাষ্ট্রে আর বাঙলা দেশে।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের ভার নিয়ে এসেছিলেন বাঙলা দেশে।

বারীন্দ্র অন্য পথ ধরে এগিয়ে এসে শেষে প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বরোদায় অবস্থান কালে অরবিন্দ কয়েকবারই গোপনে বাঙলায় এসেছিলেন। বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে গুপ্ত সমিতির গঠন সম্পর্কে আলোচনাও করেছিলেন।

১৯০২-এর প্রথম এবং শেষের দিকে মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র কানুনগোর সঙ্গে দুবার সাক্ষাৎ করেন অরবিন্দ। রংপুর, ঢাকা, খুলনা ঘুরে বুঝলেন দেশ বেশ কিছুদূর এগিয়েছে।

যুগান্তর দলের বারীন্দ্রের সহকর্মী দেবব্রত বসুর সঙ্গে কয়েকটি চক্র ঘুরে দেখলেন। হেমচন্দ্রকে ঐ সময়ে অরবিন্দ গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। অন্য সব দীক্ষার্থীকেও সত্যপাঠ পড়ালেন।

হেমচন্দ্র জানালেন, ভারতবর্ষের প্রতিটি জায়গায় গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছে; করদ রাজ্য, পার্বত্য জাতি এবং বহু সৈন্য এই সমিতিভূক্ত হয়েছে। বাঙলার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও অরবিন্দের ডাকে সাড়া দিলেন।

অরবিন্দ বুঝলেন—বাঙলায় অস্ত্রশস্ত্রের অভাব হবে না, তবে প্রয়োজনবোধে পরিচালকের স্বল্পতা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ অবরোধ করতে পারে।

অরবিন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা ইতিপূর্বে সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচার করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ; কাজেই তাঁকে নেতারূপে গ্রহণ করতে সকলেই উৎসুক হয়ে পড়লেন।

বরোদায় কাটানর সাত-আট বছর পর অরবিন্দ বাঙলায় বিপ্লব সমিতির প্রতিষ্ঠার জন্যে একনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন সেখানকার নিয়মিত কাজের ফাঁকে।

১৯০১ সালে তিনি মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন কিন্তু এইটিই আশ্চর্য্য, দেশের জন্যে মনের এই ব্যাকুলতার কথা তিনি তাঁর সহধর্ম্মিনীকে কিছুই জানতে দেন নি।

মৃণালিনীর বিবাহিত জীবন বিচ্ছিন্ন ভাবেই কেটে গেছে।

অরবিন্দের বিপ্লব দর্শনের মূল মন্ত্র ছিল 'অগ্নি ও রুধির'। ছোট্ট ছোট্ট এই কথা দুটির মাধ্যমে তিনি দেশে ইংরেজ বিদ্বেষ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। এক হাতে গীতা আর অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে বিপ্লবের এই সত্যপাঠ গ্রহণ করতে হোত সংগ্রামীদের।

॥ সাত ॥

কানাইলালের বয়স তখন বছর তের হবে। পুনায় 'আর্য্য-মিশনের' ছাত্র। ওর সহপাঠী-সমবয়সী বিষ্ণু গণেশ পিংলে। বড় বড় চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করে জ্বলে। দেখলেই মনে হয় বুদ্ধিমান্ ছেলে, অত্যন্ত মেধাবী। এই বয়সেই সে একটি কিশোরকে হার মানায়, এত বুদ্ধি তার। যা তার একবার কানে ঢোকে সে জীবনে তা আর ভোলে না। স্বাস্থ্যবান তেজী ছেলে সে, ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয় তার। দুজনে হৃদ্যতাও খুব। দুই বাড়ীর সকলে তা জানেন।

ঐটুকু ছেলে পিংলে। স্বদেশপ্রেমের বীজ তখনই তার শরীরে এক মহামহীরুহের সৃষ্টি করেছে। আশ্চর্য্য! এই বয়সেই মনটা যেন তৈরী হয়ে গেছে।

সে একদিন, চারজন স্বদেশপ্রেমী বীর মারাঠীর ফাঁসিতে ঝোলার ঘটনা কানাইলালকে বললে, স্কুলে এসে। কানাইয়ের সঙ্গে মনের মিল তার খুব। ঘটনাটা বলবার জন্যে মনটা তার উসখুস করছিল। সে তৈরী হয়েই এসেছিল। এ কথা শুনতে কানাইলালের খুব আগ্রহ।

স্কুলের ছুটির পর দু'জনে বাড়ী ফিরছে।

পিংলে কানাইকে বললে—শুনছি তোমাদের বাঙলা দেশে স্বদেশীর ঢেউ এসেছে?

কানাই বললে—আমি তত খবর রাখি না।

—তুমি না রাখ, আমি কিন্তু রাখি! আমাদের দেশও কম যায় না, জান! অনেকদিনই জেগেছে। একটা ব্যাপারে তোমার বাঙলাকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুনলে অবাক হবে। চাপারকারদের নাম শুনেছ?

—কৈ না তো!

—চাপারকার ভাইদের নাম শোননি? তবে শোন! বাবার কাছে চাপারকারদের আত্মত্যাগের কথা শুনে বুকটা আমার ফুলে উঠেছিল। আমার কি ইচ্ছে হয় জান? বড় হয়ে আমিও এদের মত নাম রেখে যাব। এই ভাই তিনটির সাহসের কথা শুনলে তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হবে। এদের সঙ্গে আর একজনও ছিল। নাম তার রাণাড়ে। ওরা দু-দুটো সাহেবকে খতম করে দিয়েছে, জান! একদম মেরে ফেলেছে। সেই জন্তেই তো ওদের ফাঁসী হ'ল। চাপারকার ভাইদের নাম কে না জানে ভারতবর্ষে! তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাণাড়ে। এই তো সেদিনের ব্যাপার, তাও খবর রাখ না?

—কি বললে? সাহেব মেরেছিল ব'লে ওদের ফাঁসী হ'ল?

—হ্যাঁ, তাই। সাহেব দুটো ভারি অত্যাচারী ছিল। পুণায় তখন প্লেগের হিড়িক লেগেছে। সেই সময় ওদের অত্যাচার সুরু হ'ল।

—কি করেছিল বলতো?...চল পার্কে বসে শোনা যাক। দেরী হয়ে গেলে তুমি আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবে, মার কাছ থেকে দুধ মুড়ি খেয়ে আসবে। তোমাকে দেখলে মা আর আমাকে বকবেন না। জানতো, মা তোমাদের কত ভালবাসেন! তুমি আমার বাড়ীতে এসেছিলে জানলে তোমার মাও তোমায় কিছু বলবেন না। দু'জনেই মারের হাত থেকে বেঁচে যাব।

—তাই চল। ঐ কোণটাতে বসা যাক। লোকজন কেউ যাবে না ওখানে।

...বল এইবার শুনি।

—চাপারকাররা তিন ভাই। তিনটিই যেন 'মানুষ খেকো বাঘ'। কি তাদের সাহস: কি তাদের বুকের পাটা! বড় ভাই দামোদর, মেজ বালকৃষ্ণ, সবার ছোট বাসুদেব, আঠার উনিশ বছর বয়সের হবে। সাংঘাতিক কাণ্ড করল এরা।

—কি করল বলই না ছাই ভনিতা বাদ দিয়ে! তাইতো শুনতে

চাইছি।

—'কেশরী' পত্রিকা পড়েছ?

—না।

—পড়ে দেখো, তিলক দেশের লোককে কেমন ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। আমি সুযোগ পেলেই পড়ি।

—দূর ছাই, ওকথা এখন থাক, যা বলতে এসেছ তাই বল!

—পুণায় প্লেগ সুরু হয়েছে, তারই সুযোগ নিয়ে লাল মুখ, র‍্যাণ্ডের অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হয়ে গেছে. নিরীহ পল্লীবাসীর ওপর! বোম্বাই আর পুণায় তখন কাতারে কাতারে লোক মরছে প্লেগে। যে বাড়ীতে রোগটা একবার ঢুকছে সেই বাড়ীর সব কটাকে শেষ ক'রে তবে ছাড়ছে। তার ওপর ঐ বাঁদর শয়তানটার অত্যাচার। বদমাসটা ছিল সাতরার য়্যাসিস্‌টেণ্ট কলেকটর। বদলী হয়ে এলো এখানে প্লেগ কমিশনার হয়ে। সে প্লেগ তাড়াবে! আস্ত পাগল ছিল লোকটা। তার ব্যাপার স্যাপার দেখে সারা দেশ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। পাছে সাহেব পাড়ায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে সেই ভয়ে বেটা করল কি জান? সে নাকি এইভাবে প্লেগ তাড়াবে—ভারতবাসী ধনে প্রাণে মরলে তার কি ক্ষতি। যদি সে শুনেছে কোন বস্তিতে একজন ও প্লেগের রোগী পাওয়া গেছে, অমনি গোরা সেপাই দিয়ে বস্তী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিয়েছে। কাউকে ঘরের কোন জিনিস সরিয়ে নেওয়ারও অবকাশ দেয়নি!

—কি বলছ! গরীবদেরও না?

—না। কত কান্নাকাটি তারা করেছে। কে শোনে! বেটা তৈমুরলংয়ের রাজত্ব সুরু করলে। কত দিন আর দেশের লোক এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবে বল? প্রথমটা কাগজে প্রতিবাদ জানাল তারা। মহারাষ্ট্রের 'কেশরী' আর ক'লকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় স্তম্ভে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকারকে একটা কমিশন বসাতে হ'ল, এই অভিযোগ সত্য কিনা

বিচার ক'রে দেখবার জন্যে।

বিচারের ফলাফল দেশের লোক কেউ জানতে পারল না তখন। হ্যাঁ দিন কতক পরে রিপোর্টটা গোপনে জানা গিয়েছিল। সে রিপোর্টটা আমার কাছেই আছে তোমাকে দেখাচ্ছি।

—কি লিখেছে? দেখি, দেখি, ব'লে—কানাই সিংহের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করল, "The system of discovering plague cases by house to house visitation is absolutely intolerable to the people who looked upon the plague measures as more horrible than the plague itself." তাজ্জব! এতখানি মিথ্যে কথা কেউ বলতে পারে? লোকগুলো কি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

—অন্ধ তো বটেই! র‍্যাণ্ডের হ'ল নতুটি। লাভের মধ্যে পাগলটা গেল বেশী ক'রে ক্ষেপে। এরপর যা চরম অত্যাচার হয়েছিল তা শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। ফুঁচলদটা [illegible] র‍্যাণ্ডের ক্রোধ কি ভাবে তুলল জান? হুকুম দিল চালাও। আর কি বেয়াই আছে? রাইফেলে বেয়নেট লাগিয়ে ফিরিঙ্গী সেপাইগুলো এক একটা পাড়া ঘিরে ফেলে, ঘর থেকে টেনে টেনে বাইরে বার ক'রে নিয়ে আসে মেয়ে-পুরুষদের, গা থেকে জামা কাপড় সব টেনে খুলে নিয়ে সকলকে উলঙ্গ অবস্থায় ছাগল ভেড়ার মত এক জায়গায় জড় ক'রে রাখে প্লেগের পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে। এটা একটা প্রহসন মাত্র। ঐ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখে। ডাক্তারী পরীক্ষা চলতে থাকে। শালা বেটারা দেয় ঘরগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে। দাউ দাউ ক'রে চারদিকে আগুন ধরে ওঠে। ঘরের শেষ জিনিষটুকু বাঁচাবার জন্যে ছোটা-ছুটি করতে থাকে তারা নগ্ন দেহে। আনন্দে পৈশাচিক হাসি হেসে উল্লাস করে ওঠে বর্ব্বর ফিরিঙ্গী সেপাইয়ের দল।

—কি বলছ কি: এমন জঘন্য প্রবৃত্তি ঐ জাতের?

—বিশ্বাস হচ্ছে না। তাই না? বিশ্বাস না হবারই কথা। এই

দেখ তার নজির। ১৮৯৭ সালের ১১ই মার্চের 'মিত্র' পত্রিকা এর সাক্ষী। এই নাও পড়ে দেখে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর। কি লিখেছে দেখ।

পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে ঐ জায়গাটা কানাই গড়গড়িয়ে পড়ে ফেলল—"The men are completely stripped in presence of others and made to wait in that position for some time, while the women are asked to undo their cholies (bodices) and to hold up their wearing apparrel in presence of others."

পড়া শেষ করে স্তম্ভিত হয়ে কানাই গালে হাত দিয়ে বসে রইল।

—এরপর কি হয়েছিল শোন। এই অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে ১২ই এপ্রিল ১৮৯৭এ একটা ডেপুটেশন গেল র‍্যাণ্ডের কাছে। অবিলম্বে এই নারকীয় অত্যাচার বন্ধের জন্যে। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগ দিলেন। সেটা কিন্তু ভুলবার নয়! শয়তানটা জবাব কি দিয়েছিল জান? "পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদের আমি রেহাই দিতে পারি, কিন্তু হিন্দু মেয়েদের ঐ অবস্থাতেই পরীক্ষা দিতে হবে। পুরুষদের বেলায় নিয়ম যা আছে তাই বহাল থাকবে। আমার হুকুম এর থেকে আর একচুলও নড়চড় হবে না। [illegible] ঐ ভাবে সকলের সামনে ডাক্তারদের কাছে পরীক্ষা দিতেই হবে।"

বালগঙ্গাধর তিলকের লেখনী গর্জে উঠল। 'কেশরী' কেশর ফুলিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল দেশবাসীর উদ্দেশে—"তোমরা দেখ! দুঃশাসন আজ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ক'রে পৈশাচিক উল্লাসে হাস্য করছে।

দর্পহারী মধুসূদন! কোথায় তুমি? তোমার সুদর্শনচক্র কেন আমার সময় কি আজও হয়নি চক্রপাণি? মহারাষ্ট্রে কি একজনও ভীমসেন জন্মায়নি, যে দুঃশাসনের বক্ষ চিরে রক্ত পান করতে পারবে?"

কানাইলাল যেন পাথর হয়ে গেছে, স্তম্ভিত হয়ে শুনছে পিংলের কথাগুলো।

আবার বললো পিংলে,—তারপর শোন। মহারাষ্ট্রের তরুণরা রাগে ফুঁসতে লাগল, পত্রিকার প্রতিটি অক্ষর তাদের বুকে শেল বিদ্ধ করছে।

—আমার মনে হয় বাঙালী নিশ্চয় এ অত্যাচার সহ্য করতো না! জবাব, তারা একটা দিতই।

—বাঙালীই বল আর মহারাষ্ট্রীয়ই বল, যার তার পক্ষে অসম্ভবকে সম্ভব করা এত সোজা নয়। চাই বুকের কলিজা—বুকের পাটা। হিম্মত দরকার, অদম্য সাহস থাকলে তবেই না পারবে এই 'অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে, হ্যাঁ, এমন ছেলেও মহারাষ্ট্রে ছিল।

চাপারকার বাড়ীর তিনটি রত্ন।

তিন ভাই তারা। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেব। বোম্বাইয়ের ছেলে। অদম্য অদ্ভুত সাহস দামোদরের। কুস্তীগীর, লাঠিয়াল দামোদর; 'কেশরীর খবর পড়ে গুলী খাওয়া বাঘের মত ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। স্থির ক'রে ফেলল, যে কোন উপায়ে হোক সে র‍্যাণ্ডকে হত্যা করবেই করবে। তবে দূর থেকে বোমা ছুঁড়ে নয়। সে তো ভীরুতা। কাপুরুষতার লক্ষণ। যাবে সে পুণায়। ছোট ভাই দুটিকে আর বন্ধু রানাড়েকে তার সঙ্কল্পের কথা জানাল। দামোদরের পদাঙ্ক অনুসরণে সকলেই মন স্থির করে ফেলল।

তিন ভাই, তাদের গর্ভধারিনীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সোজা পুণায় এসে হাজির হ'ল। সঙ্গে রাণাড়ে।

তারপর, ভাগ্য তাদের বেশ সুপ্রসন্নই হ'ল বলতে হবে।

—তা হলে নাটকটা বেশ জমে উঠেছিল বল?

—জমবে না আবার। জমা বলে জমা। স্বয়ং দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ যে তাদের সহায়। ওরা এখানে এসেই আশ্রয় পেয়ে গেল লৈখাদিপুর মহল্লায়, লছমি মাঈর মন্দিরে। সরকারী প্লেগ নিবারণী শিবিরের খুব কাছে। ভাগ্যিস প্লেগের ভয়ে এখানকার পুজারীটা পালিয়েছিল, তাই সুযোগ ঘটে গেল। দামোদরকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখে সকলে

অনুরোধ করল লছমি মাঈর পুজোর ভার নিতে তাকে। দুপক্ষের কেউই জানেনা—চেনেনা তাদের। নিষ্ঠাবান একজন ব্রাহ্মণ পেয়ে খুশীই হ'ল সকলে। কদিন ধরেই মাঈর সেবার ব্যাঘাত ঘটেছে। দামোদরের হাতে মাঈর দায়িত্ব দিয়ে সকলে নিশ্চিন্ত হয়।

সত্যিই তবে, ঠাকুরের অসীম কৃপা বলতে হবে।

এইবার শোন আরও সুবিধে ওদের ঘটে গেল কি ক'রে। ভগবান যেন একে একে সুযোগগুলো এদের হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। মন্দিরের পাশের মাঠেই ঠিক সেই সময়ে, বোম্বাই নেটিভ-ইন্‌ফ্যানট্রির চতুর্দশ বাহিনীর তাঁবু পড়েছে। দামোদরকে ওরা ওখানে নিয়ে গেল। রেজিমেন্টের কয়েকজনের সঙ্গে ওর খুব ভাব জমে উঠেছে। তক্কে তক্কে থেকে দামোদর ঐ রেজিমেন্টের দুটি রাইফেল আর দুখানি তলোয়ার আত্মসাৎ করে এনে মন্দিরের বেদীর নীচে ঢুকিয়ে দিল।

মন্দির তল্লাস ক'রে রেজিমেন্টের কেউ তা হদিস করতে পারল না। ভাগ্যিস্ বেদীর নীচটা খোঁজাখুঁজি করেনি।

ছোট ভাই বাসুদেবের ওপর ভার পড়ল চাতালে ব'সে কেবল ঐ অস্ত্রগুলো পাহারা দেওয়ার।

বালকৃষ্ণ আর রাণাড়ে ভোর থেকে ঘুরে ঘুরে র‍্যাণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য রাখে। কখন কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরছে, কে সঙ্গে থাকছে সব। বেশী রাত্রিতে মন্দিরে ফিরে দামোদরকে সব রিপোর্ট দেয়।

এইভাবে তিন তিনটে মাস কাটতে চলল। এরই মধ্যে দামোদরের এক মস্ত সুযোগ জুটে গেল। মিলিটারী বন্ধুদের কাছ থেকে খবর বের ক'রে সে একদিন কোথা থেকে দুটো পিস্তল যোগাড় করে আনল।

স্থির হয়ে গেল র‍্যাণ্ডের গায়ের ওপর গিয়ে প'ড়ে তাকে গুলী করে মারতে হবে সুযোগমত, আর তার সহকারী আয়ার্স্টকেও ঐ সঙ্গে খতম করতে হবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না।

—সে কি করে হয়! এমন সুযোগ হাতে পাওয়া কি সম্ভব?

—হাতে পেতেই হবে! যতদিন ঠিকমত সুযোগ তাদের হাতে না আসছে, ততদিন তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক হয়ে গেল দামোদর, র‍্যাণ্ডকে আর বাণাড়ে, আয়ার্স্টকে শেষ করবে। দেখতে দেখতে ঠিক এই সুযোগ তাদের ভাগ্যে একদিন সত্যি-সত্যিই এসে গেল।

—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। শোননা উপায়টা কি ক'রে এসেছিল।... সেদিন কুইন ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উৎসব, ১৮৯৭এর ২২শে জুন সন্ধ্যে থেকেই আলোর মালা বুকে প'রে পুণা সহর ঝলমল করছে। ইতর ভদ্র সকলেই উৎসব নিয়ে মেতেছে।

কমিশনার র‍্যাণ্ডের আজ কত কাজ। এখানে সেখানে সভা।

পথে লোক চলাচল অনেক বেশী অন্য দিনের চেয়ে। কে কাকে সন্দেহ করে। এই তো সুবর্ণ সুযোগ। জমসেদজী জীজাভায়ের বাড়ীর কাছে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। গাড়ির গতি এখানে স্তিমিত করতেই হবে।

দুজন ছোটো পিস্তল নিয়ে— দামোদর আর বাণাড়ে একটা বড় গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যে তখন সাড়ে সাতটা।

গভর্নমেন্ট হাউস থেকে দুখানা ব্রুহাম গাড়ী বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। প্রথমটিতে আছে র‍্যাণ্ড, আর পেছনের গাড়িতে আছে আয়ার্স্ট এবং তার স্ত্রী। গাড়ী দুখানি প্রায় পঞ্চাশ গজ ব্যবধানে এগিয়ে চলেছে। বাঁকের মুখে আসতেই কোচম্যান ঘোড়ার লাগাম টানল। গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। বালকৃষ্ণ সংকেত দিতে দামোদর নক্ষত্রবেগে দৌড়ে গিয়ে এক প্রচণ্ড ঘুঁষিতে গাড়ীর পেছনে দাঁড়ান সহিসকে ধরাশায়ী করে লাফিয়ে উঠল পেছনের পা দানিতে। গাড়ীর মাথার ওপরকার ঢাকনার পেছনের ফুটোটা দিয়ে সে পিস্তল সমেত দৃঢ় মুষ্টিটা ঢুকিয়ে দিল র‍্যাণ্ডের মাথা বরাবর।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে আঙ্গুল পড়তেই গুড়ুম করে গর্জে উঠল পিস্তল।

র‍্যাণ্ডের মাথার খুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল গুলীটা। পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাণ্ডের গলার স্বর একবার আর্তনাদ ক'রে চিরদিনের মত মিলিয়ে গেল।

লুটিয়ে পড়ল অত্যাচারী র‍্যাণ্ড, ব্রুগামের গদির ওপর।

সামনের গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শুনে আয়ার্স্ট যেই গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে দেখতে গেছে ব্যাপারটা কি, অমনি রাণাড়ের অনায়াসলব্ধ স্বর্ণ সুযোগ এসে গেল। কালবিলম্ব না ক'রে লক্ষ্যভেদ করল রাণাড়ে।

রক্তাপ্লুত স্বামীর দেহটিকে কোলে নিয়ে মিসেস আয়ার্স্ট ছুটলো হাসপাতালে। এগার দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে আয়ার্স্ট মারা গেল।

—সত্যিই অদ্ভুত! অদ্ভুত সাহসী এরা। এই না হলে দেশের ছেলে!

—এখন বুঝলে, কেন তারা দিন গুণছিল এই সুযোগের জন্য! অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করবে এই তাদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

—হ্যাঁ, বীরপুরুষ বটে!

হাত দুখানা জোড় ক'রে কানাই ওঁদের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

—দামোদর পাকড়াও হ'ল ৯ই আগষ্ট ১৮৯৭ খ্রী বছরেই। পালিয়েও পুলিসের হাত থেকে রেহাই পেল না। তখন এদের দলের আর কেউ ধরা পড়েনি।

অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু হ'ল দামোদরের ওপর। অপর তিনজনের ব্যাপারে সে মুখ খুলল না কিছুতেই। কেবল বলল সে নিজেই র‍্যাণ্ডকে মেরেছে। অত্যাচারী পাপিষ্ঠটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারায় সে খুব খুশী। আরও বলল, কিছুদিন আগে কুইন ভিক্টোরিয়ার ষ্ট্যাচুটার গলায় জুতোর মালা দেখে দেশময় যে

হৈ হৈ রব উঠেছিল, সেটিও তারই কীর্তি।

—এই তো চাই! গর্ব্বে বুকটা আমার ফুলে উঠছে। আচ্ছা ভাই! আমরা চেষ্টা করলে এর মত হ'তে পারব না?

—নিশ্চয়! আলবৎ হব।

—বাকি তিনজন কবে ধরা পড়ল?

—ওরাও ধরা পড়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত। কিভাবে শোন। আমার মুখস্ত হয়ে গেছে। সরকার ঘোষণা করল, জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় এদের একজনকেও ধরিয়ে দিতে পারলে, ২০ (কুড়ি) হাজার টাকা পুরস্কার পাবে, সে যে লোকই হোক!

এত টাকার লোভ, গণেশ আর রামচন্দ্র দ্রাভিদ দুই ভাই, সামলাতে পারল না। দুজনেই নামকরা গুণ্ডা। জালীয়াতিতে সিদ্ধ হস্ত আর মিথ্যা সাক্ষী দিতেও ওস্তাদ। তারাই পুলিসকে খবর দিল বালকৃষ্ণ হায়দ্রাবাদে পালিয়েছে।

ভারত সরকারের কাছ থেকে নিজাম সরকারে চিঠি গেল, বালকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার ক'রে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে। ১৮৬৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী নিজাম নিজেই যে হায়দ্রাবাদের মালিক আর রামকৃষ্ণের যা কিছু তিনিই করবেন, এই কথা যেমনই তিনি ইংরেজ সরকারকে জানিয়েছেন, ওমনি এক ধমক। সুড় সুড় করে বালকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিতে পথ পান না নিজাম।

বালকৃষ্ণ ইংরেজ সরকারের খপ্পরে এসে পড়ার পর ঐ ঘোষিত বিশ হাজারের দশ হাজার টাকা ভারত সরকার, নিজাম সরকারকে পাঠিয়ে দিল।

বালকৃষ্ণ তো গ্রেপ্তার হয়েছে।—কাকস্য পরিবেদনা, কোথায় পুরস্কারের টাকা? গণেশ আর রামচন্দ্র আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। এরাই তো বালকৃষ্ণের হায়দ্রাবাদে পালানোর খবর পুলিসকে দিয়েছিল। তবে কেন তারা সরকারের ঘোষিত টাকা পাবে না? টাকা পাওয়ার লোভে, আহাম্মকরা ২রা ফেব্রুয়ারী পুণা থেকে 'টাইমস-অফ-ইণ্ডিয়া'

কাগজে গণেশ দ্রাভিদের সই দিয়ে এক বিবৃতি দিয়ে বসল। এরপর, টাকা তারা কিছুটা পেল ঠিকই সরকারের কাছ থেকে; ২৬০ টাকা আয়কর কেটে নিয়ে দশ হাজারের বাকি টাকাটা সরকার পাঠিয়ে দিল এই দুই ভাইকে। অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ঐ যা পেল তারা।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বিশ্বাসঘাতকদের খবর জানতে পেরে, দামোদরের ফেলে যাওয়া পিস্তলটা নিয়ে বাসুদেব ছুটল ওদের পেছনে।

—সাবাস! কি সাহস রে বাবা ঐটুকু ছেলের।

—হ্যাঁ, তাই দেখ। তার প্রতিজ্ঞা, যা করেই হোক এ দুটোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে সে।

বাসুদেব আর রাণাড়ের ধরা পড়ার জন্যে অপেক্ষা না করেই সরকার দামোদর আর বালকৃষ্ণের বিচার শুরু করে দিল।

রাণাডে অনেকদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেল।

১৯ বছরের কিশোর বাসুদেব খুঁজে বার করল গণেশ আর রামচন্দ্রের ঠিকানা। ওরাই তো ওর দাদাকে সনাক্ত করবে—মামলায় সাক্ষী দেবে। সব কিছু খবর সংগ্রহ করে একদিন সন্ধ্যের সময়ে বাসুদেব পুণার একটেরে এক কুখ্যাত পল্লীর ভেতর দ্রাভিদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। গায়ে তার, পুলিস সাহেবের পিওনের চাপরাস লাগান পোষাক। বাড়ীটাতে জুয়া আর মদের আড্ডা বসেছে তখন। বাসুদেব, গণেশ আর রামচন্দ্রকে ঘরের বাইরে ডেকে এনে নমস্কার জানিয়ে বললে, এস, পি সাহেব তাঁদের এখুনি একবার থানায় ডাকছেন কালকে কিভাবে সাক্ষী দিতে হবে এইসব আলোচনা করবার জন্যে।

ওরা বলল—তুমি যাও, আমরা এখুনি আসছি।

ওখান থেকে সরে এসে কাছেই একটা ভালমত নির্জন জায়গা

দেখে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল বাসুদেব।

যেই তারা কাছাকাছি এসেছে দুই গুলীতে দুটোকে ধরাশায়ী করল সে।

গণেশের দেহটা একটু নড়েই স্থির হয়ে গেল। রামচন্দ্রের, একটা গোটা দিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

কাজ হাসিল হয়ে গেছে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনের আনন্দে বাসুদেব নাচতে নাচতে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

—জবরদস্ত ছেলে যা হোক বাসুদেব। চাপরাসীর পোষাক পরে কি চালাকিটাই না খাটিয়েছিল!

—তাই তো বলছি কি চমৎকার নাটকীয়ভাবে এত বড় কাজটা তারা সমাধান করল। নিরাশ হয়নি কোনটাতেই এরা। তা ছাড়া কতখানি মনেরবল দেখ সকলের। সবই দর্পহারী মধুসূদনের চক্রান্ত বুঝলে ভাই!

—তারপর ওদের কি হ'ল?

—তারপর যা ঘটতে পারে তাই হ'ল। কাজীর বিচারে ওদের চারজনেরই ফাঁসী হয়ে গেল জারবেদা জেলে।

দামোদর চাপারকরকে ফাঁসীতে ঝোলান হ'ল—১৮৯৮এর ১৮ই এপ্রিল।

বালকৃষ্ণকে লটকান হ'ল ১২ই মে, ১৮৯৮।

বাসুদেব ঝুলল এর পরের বছর ১৮৯৯এর ৮ই মে।

দু দিন পরেই ঐ ১৮৯৯এর মে মাসের ১০ই রাণাড়েকেও ফাঁসীর রজ্জুতে লটকে দেওয়া হ'ল।

—ওদের কেউ ফাঁসীতে ঝোলার আগে ভয় পেয়েছিল?

—দূর পাগল, ওরা কি সেই ধাতুতে গড়া! বাসুদেবের কি দুর্দান্ত সাহস জান। ফাঁসীর হুকুম শুনে ভয় পাওয়াতো দূরস্থান, সে নাকি

বিচারের রায় শুনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজকে প্রশ্ন করেছিল, সে যখন দুজনকে মেরেছে, তখন তার কেন দুবার ফাঁসী হবে না।

—সত্যিই সাহসী বটে। এমনি না হ'লে কি পুরুষ মানুষ। এদের কথা কখনই ভুলতে পারব না।

—শুনলে তো মারাঠীর প্রতিশোধ নেওয়া। ইতিহাসে এরা চির অমর হয়ে থাকবে। এ ঘটনা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, তাইতো তোমায় গুছিয়ে বলতে পারলাম। আমি কিন্তু ভাই সুযোগ পেলে এদের মতই হব।

—তুমি শুধু একাই হবে? আমি হব না? আমিও নিশ্চয় হব। দেখবে!

—প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেও না কিন্তু, মনে থাকে যেন। চল এবার ওঠা যাক। সন্ধ্যে কখন উতরে গেছে, বাড়ীতে খুব ভাবছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, সোজা আমাদের বাড়ী যাই চল। দু'জন, দুজনকে ম্যানেজ করতে হবে তো। মার কাছ থেকে ক্ষীর মুড়ি খেয়ে তবে তুমি বাড়ী যাবে। মা, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, তার জন্যে তোমার চিন্তা নেই।

॥ আট ॥

যদিও বাঙলাদেশ, বিপ্লবে ঝাঁপ দেবার মতলব অনেকদিন থেকেই আঁটছিল কিন্তু কে সেই ভারতবাসী যে এই পতাকা সর্ব্বপ্রথম বহন করবে? সেইটিই তখনও কেউ জানত না।

কোন্ রাজ্যের ছেলের এমন বুকের পাটা হবে সবার আগে, যে এই পতাকা হাতে নিয়ে ভারতবাসীকে বিপ্লবের পথ দেখাবে? মাতৃভূমিকে শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্যে আত্মাহুত দেবে?

এগিয়ে এল বাসুদেব। মহারাষ্ট্রের বীর যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কে। মাত্র তেত্রিশ বছর ক'মাস বয়স তখন তার।

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের দল সংগ্রহ ক'রে আর সেই দলে মারাঠী উপজাতির রুমোশীদের কয়েকজনকে নিয়ে, দেশে বিদ্রোহবহ্নি জ্বালিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যে টলিয়ে দিতে পারা যায় তা বাসুদেব দেখিয়ে দিল।

১৮৭০ সাল। খবর এল বাসুদেবের মার খুব অসুখ। মাতৃভক্ত ছেলে বাসুদেব। গর্ভধারিণীর মৃত্যু শয্যায় চাকরীর খাতিরে শেষ বারের মত মায়ের সঙ্গে দেখা না হওয়ায়, ছেলের মনে বিদ্রোহের আগুন হুহু শব্দে জ্বলে উঠল।

ঘটনা সামান্যই ঘটে কিন্তু কিসে যে মানুষের মন তেতে ওঠে কেউ তা বলতে পারে না।

নিজেকে তৈরী করতে লেগে পড়ল বাসুদেব। যুবকদের নিয়ে গোপন বৈঠকে বসে পড়ল। সভা করল, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিতে সুরু করল, ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাড়াতে। সে চায় ইংরেজদের তাড়িয়ে এই সোনার ভারতে আবার স্বাধীনতার নিশান গাড়বে।

মাতৃভূমির একনিষ্ঠ পূজারী বাসুদেব। ছিল না তাঁর অর্থবল। ছিল না তাঁর সৈন্যবল। তবে কি করে করবেন তিনি দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত? নিঃস্ব হয়েও তিনি ছিলেন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী : সেটি ছিল তাঁর মনোবল। এই বস্তুটিকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় কার সাধ্য। কোনদিন কেউ তা পারেনি।

পুণায় মিলিটারী একাউন্টসে সুদক্ষ কর্ম্মী। কাজের খাতিরে বড় সাহেবের স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি বটে। তবে কেন তিনি পেলন না অফিস থেকে ছুটি মৃত্যুপথযাত্রী মার মুমূর্ষু মুখখানি শেষবারের মত দেখতে যাওয়ার জন্যে? চাকরীর মায়া না করে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি ঠিকই বিনানুমতিতে মায়ের শয্যা পার্শ্বে, মা-ই যে তাঁর জীবনের সর্ব্বস্ব। কিন্তু হ'ল না শেষ দেখা। বুক চাপড়ে তিনি খুব খানিক কাঁদলেন।

ফিরে এসেছেন। সাহেব কৈফিয়ৎ চাইল। কিসের কৈফিয়ৎ? তেড়ে অপমান করলেন লালমুখো জাঁদরেল বড় সাহেবকে প্রতিবাদ জানিয়ে। সাহেব রেগে গরগর করতে লাগল। ভাগ্যিস সেখানে আর কেউ ছিল না। সাহেব সে অপমান তখনকার মত হজম করল। চাকরী থেকে বরখাস্ত করল বাসুদেবকে। চাকরী গেল ছেলেটির।

সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন তিনি। যুক্তি দেখিয়ে বোম্বাই সরকারকে চিঠি দিলেন। ফিরে পেলেন চাকরী বাসুদেব। 'লড়কে লেঙ্গে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আদায়ও করলেন ঠিকই। বসলেন আবার নিজের চেয়ারে সেই অফিসেই।

কর্তারা তাঁকে আর সুনজরে দেখল না কোন দিনই। বছর ঘুরতে মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আবেদন পত্র পেশ করলেন ছুটির।

সরাসরি নামঞ্জুর হ'ল।

হিন্দুর ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ, এতদূর স্পর্দ্ধা খৃষ্টান জাতের? এ অপমান সহ্য করা যায় না। প্রতিশোধ তিনি নেবেনই এই হ'ল তাঁর একমাত্র পণ।

বিদ্রোহের অঙ্কুর পিতামহের রক্ত থেকে তাঁর জীবনে অঙ্কুরিত।

অনন্তরাও ছিলেন, কারনালা অঞ্চলের মস্ত জমিদার, বাসুদেবের পিতামহ। তিনি তাঁর নিজের দুর্গে বাস করতেন। ১৮১৮তে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে হুকুম দিল—'হটযাও হিঁয়াসে।'

অনন্তরাওয়ের গর্বিত কণ্ঠস্বর হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'নেহি হটেঙ্গে।' যুদ্ধ বাধল। দুর্গ রক্ষার জন্যে তিন দিন সমানে যুদ্ধ চালিয়ে অনন্তরাও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। পরাস্ত হলেন। তবে ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধে বুঝেছিল অনন্তরাও কি ভীষণ পরাক্রমী।

এঁরই তো পৌত্র বাসুদেব! এঁরই স্বাধীন চিত্তের রক্ত সদাসর্বদা বাসুদেবের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত।

দলগড়া সুরু হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হতে লাগল অর্থের বিনময়ে। অতৃপ্ত জীবন তাঁকে সর্ব্বদাই পীড়া দিত।

এর মধ্যে বাসুদেবের, সাধুসন্ন্যাসীর কাছেও যাওয়া আসা সুরু হয়ে গেছে। নরসিংহ মন্দিরের পুরোহিতের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে অনেক জ্ঞান অর্জন করলেন বাসুদেব। কুলদেবতা 'শ্রীদত্তকে' তিনি সব সময় চোখের সামনে দেখতেন। আশীর্ব্বাদ কামনা করতেন তাঁর।

একে একে জীবনের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলেন। কেবল ঐ একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে, কতখানি ত্যাগ করলে দেশকে স্বাধীন করা যায়? এই তাঁর প্রশ্ন।

কোন এক মহাশক্তি যেন সর্ব্বদাই তাঁর অন্তরে অনুপ্রেরণা জাগায়—'বাসুদেব জাগো! জেগে ওঠ!'

উদ্দেশ্য তাঁর একই, ইংরেজদের দেশ থেকে দূর করে দিয়ে সাধারণতন্ত্র কায়েম করা।

একদিকে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন, অন্যদিকে শত্রুর সংহারচিন্তা। উন্মাদ হয়ে উঠলেন বাসুদেব। একটানা ন'টি বছর ধরে তাঁর সাধনা চলল। 'সন্তানদল' গড়লেন। এখন তিনি নিজের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শিখেছেন। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান সেনাদল তাঁর নিজ হাতে

পড়া। সকলেই প্রস্তুত। অস্ত্রও সংগ্রহ হয়েছে কিছুটা।

কত শক্তিধর ফিরিঙ্গীরাজ তোমরা এখন তা টের পাবে! বাসুদেবই বুঝিয়ে দেবে। তোমাদের শক্তি, সন্তান সেনাবাহিনী কাছে অতি তুচ্ছ।

পবিত্র উন্মত্ততায় শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী তাঁর ঝঙ্কৃত হ'তে লাগল। স্থির করে ফেললেন আর ইংরেজ সরকারের গোলামী নয়। গোলামী যদি করতেই হয়, হবেন তিনি নিজের দেশের গোলাম, ভারতমাতার গোলামী করবেন।

অল্পবয়সী যুবতী স্ত্রী। মনের অভিপ্রায় সবই খুলে বললেন তাঁকে। স্ত্রীর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করলেন।

শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে গোপন পরামর্শে বসে পড়লেন।

—কে কে বিদ্রোহের খাতায় নাম লেখাতে চাও? বল, তোমরা কি চাও? আমরা কি ইংরেজের কুকুর হয়ে এমনিভাবে তাদের পা চাটব? তারা যা খুসী, যেমন খুসী এমনি ভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে? আমরা পড়ে পড়ে কেবল মারই খাব? আর নয়, অনেক সহ্য করেছি। অফিসের মাইনের টাকা দিয়েই তো কাজ সুরু করেছি। অস্ত্রশস্ত্র যা সংগ্রহ হয়েছে তা তোমরাই সংগ্রহ করে এনেছ। তোমাদের বহিন কেবল টাকা জুগিয়ে গেছেন।

স্ত্রী-ধন বলতে যা কিছু ছিল তাও পেলেন বাসুদেব সহধর্ম্মিনীর কাছ থেকে। দ্বিধাহীন চিত্তে সবই তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

কবেই তো সুরু হয়ে গেছে স্বামী-স্ত্রীর কষ্টের দিন। সবই তো চলে যায় ওদিক সামলাতে। খাবেন তাঁরা কি? দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া জোটে না, কোথায় সে টাকা? কৃচ্ছ্র সাধন করে চললেন উভয়ে। স্ত্রীর দিক থেকে নেই কোন বিরক্তি, নেই কোন অভিযোগ, হাসিমুখে সহ্য করছে সব কষ্ট।

একটা শুভলগ্ন দেখে এইবার তবে বেরিয়ে পড়া যাক, দলবল আর হাতিয়ার যা সংগ্রহ হয়েছে তাই নিয়েই; দেরী করলে চলবে না।

এমনিতেই দেখতে দেখতে কটা বছর বেশ দেরী হয়ে গেছে।

দেশ স্বাধীন করতে হ'লে চাই বিরাট সৈন্যবাহিনী। তার সঙ্গে চাই প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, দু'বেলা এদের আহারের সংস্থান। কোথায় সে টাকা? আছে একটা উপায়! করতে হবে ডাকাতি লুট-পাট। প্রয়োজনে ওপড়াতে হবে রেল লাইন, কাটতে হবে টেলিগ্রাফের তার, বন্ধ করতে হবে ডাক যোগাযোগ। আগে চাই টাকা। টাকা কাজে লাগাতে হবে। দলের সকলেরই এক মত।

তবে চল ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়া যাক।

পথে স্ত্রীজাতীর সংস্রব ত্যাগ করতে হবে, সন্তানদের দীক্ষার এটি একটি অঙ্গ।

বাসুদেব স্ত্রীকে কাছে ডেকে বললেন—আর নয়, অনেক দিন তো সংসার করলে, এইবার পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চলে যাও।

—একি? তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদছ? ছি! ছি! ছি! মুছে ফেল? তুমি না ভারতের নারী? তোমার তো ভারতসাধিকাদের কথা কিছু অজানিত নয়! এতদিন আমার কাছে কি শিক্ষা লাভ করলে তবে? তোমার তো এ শোভা পায় না। তুমিই না আমাকে উৎসাহ দিয়েছ কত কাজে! কতদিন অনাহারে—অর্দ্ধাহারে কেটেছে। সবই তো হাসিমুখে সহ্য করেছ! মাইনের টাকা, তোমার গায়ের অলঙ্কার সবই তো নিঃশেষ করে দিয়েছে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে নিজের হাতে, তবে কেন কাঁদছ? চোখের জল মুছে ফেল। এভাবে চোখের জল ফেললে সন্তানদের যে অকল্যাণ হবে তা কি বোঝ না?

এই তো চোখ মুছে কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমার মুখখানি! মৃগ নয়ন দুটিকে বড় বড় করে খুলে আমার চোখ দুটোর ওপর রাখো দেখি!

বাঃ কি চমৎকার লাগছে এখন তোমার হাসি হাসি মুখখানি। বলতো এ মুহূর্ত্তটা কত সুন্দর!

আর দেরী নয়। গাড়ী অনেকক্ষণ যাবৎ দরজায় অপেক্ষা করছে। চল গিয়ে উঠে পড়।

এস। কিছু ভেব না। দেশ স্বাধীন হ'লে আবার দেখা হবে। কটা দিন মাত্র সবুর কর। ইংরেজ কটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে আমরা আমাদের দেশকে বুঝে নেব। তখন কি মজা হবে বলতো? দেশে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। দেখবে তখন হায়দ্রাবাদের নিজাম আর আমার মধ্যে কোন তফাৎ নেই, থাকবে কেবল—সেও মানুষ, আমিও মানুষ। তার যতটুকু অধিকার আমারও ঠিক ততখানি অধিকার, একই রাস্তায় পাশাপাশি দুজনে হেঁটে যাব। দেখবে, ঝাড়ুদার রামদেও আমার পাশে পাশে বুক ফুলিয়ে হাঁটছে। সব একাকার হয়ে গেছে। আরও দেখবে, কারনালা ভূস্বামী অনন্তরাওয়ের নাতিবৌ আর রামদেওয়ের বৌএর মধ্যে নেই কোন তফাৎ।

বা! বা! তুমি হাসছ? এই তো দেখছি তুমি মন খুলে হাসছ! আমার এখন কতখানি আনন্দ হচ্ছে বলতো! হাসিরই কথা বটে! সত্যিই দেখবে, এখন যা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, দেশ স্বাধীন হ'লে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

বাজে কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। আর দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি উঠে পড় গাড়িতে।

হ্যাঁ, আজ রাত্রিতেই আমরা বেরিয়ে পড়ছি, অফিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছি।

স্ত্রী, স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে গাড়িতে উঠল।

—জয় শ্রীদত্ত!—ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

পুণার বাসাবাড়ী বন্ধ হ'ল।

সেই রাত্রিতেই সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন বাসুদেব খুব গোপনে, কড়ায়-গণ্ডায় শোধ তুলে নেবেন এই অভিপ্রায়ে। অন্তর্জ্বালায় তিনি দগ্ধে মরছেন। অক্কাল কোটের স্বামী মহারাজের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাত্রা সুরু হ'ল বাসুদেবের।

১৮৭৯র ২৩শে ফেব্রুয়ারী ধামরি গ্রামের ওপর 'সন্তানদল' প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুটপাট ক'রে বেশ কিছু মূল্যবান গহনাপত্তর

আর অর্থ সংগ্রহ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল তারা। টাকা চাই প্রচুর। এ সামান্যতে কি হয়? ইংরেজ সৈন্যর সম্মুখীন হ'তে হ'লে সেই রকম জবরদস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন। ক'টি মাত্র গাদা বন্দুকে কোন কাজ হবে না। যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, সাহসী, দেশপ্রেমিক সন্তান সৈন্য চায় হাজারে হাজারে। সময় লাগবে প্রচুর, তা না হ'লে ওজাতকে সায়েস্তা করা যাবে না।

চারিদিকে দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলতে লাগল এর ফাঁকে।

ডাকাতি চলতে থাকল একের পর এক। দাক্ষিণাত্যকেই প্রথম এরা বেছে নিল।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতেই বাসুদেব তাঁর পূর্বের ভোল সম্পূর্ণ পালটে ফেলেছেন। এ চেহারা যেন এক নূতন ধরণের।

গৈরিক বসনে সজ্জিত সন্ন্যাসী। পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা। হাতে কমণ্ডলু, প্রয়োজনে আগ্নেয়াস্ত্র। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সিংহের কেশরের মত মাথায় একরাশ এলোমেলো কেশদাম। গুম্ফ-শ্মশ্রু সমাবৃত মুখমণ্ডল। গুলবাঘের দৃষ্টির মত তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি যেন শিকারের সন্ধানে।

দলের সকলে ডাকে এঁকে 'মহারাজ' বলে। বাইরের লোকে জানে ইনি সাধু-মহারাজ। এমন কি পুলিসও জানে ইনি কাশীধামের সন্ন্যাসী।

বাসুদেবের জীবন সংগ্রামে ধর্মের প্রাধান্যই ছিল বেশী।

ইনি 'আত্মজীবনী'তে এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, "যদি কিছু সাউকর প্রত্যেকে আমায় পাঁচ হাজার করে এ কাজের জন্যে টাকা দিত, বিদ্রোহকে ঘনীভূত করবার জন্যে দলের দু চারজন লোককে চতুর্দিকে পাঠাতে পারতাম, তা হ'লে ব্রিটিশ পুঙ্গবের কি বিপদই না হোত! ডাক বন্ধ হোত—টেলিগ্রাফের তার কাটা পড়তো—রেল রাস্তা বিচ্ছিন্ন হোত। এইভাবে খবরাখবরের সব পথই বন্ধ হোত।

জেল ভাঙবার কি চমৎকার সুবিধেই না হোত তাহলে! ব্যাস, সমস্ত জেল-বন্দী আমাদের দলে এসে মিলে যেত। কারণ তারা পুনরায় ধরা পড়লে আবার জেলে যেতে হবে এই ভয়ে নিশ্চয় আমাদের দলেই মিলে থাকত। যদি দু-শো লোকও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত, তা হ'লে আমরা ধনাগার লুঠ, না ই বা করতাম! এ সুযোগ ঘটলে কয়েদীদের নিশ্চয় জেল থেকে মুক্ত ক'রে আনতে পারতাম। দু-শো দূরের কথা, বাইরের মাত্র পনের জন আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।"

এ কথাগুলো লেখার পরও বাসুদেব কোন দিনই নিরুৎসাহ হননি। চলেছে তাঁর অব্যাহত শিকার দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে' দিনের পর দিন, আজ এখানে কাল সেখানে। লুঠপাট করে, সন্তানদল পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ঐ সেই গভীর জঙ্গলে—গিরি কন্দরে।

পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে চলতে লাগল এই ব্যাপার দিনের পর দিন।

ভাল লোকের সঙ্গে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মেকী লোক সন্তানদলে ঢুকে পড়ল। এদেরকে বাসুদেব প্রথমটা চিনে উঠতে পারেন নি। দলভারী হওয়ার প্রয়োজন। কাজ অনেক। তাই ওদিকে এতটা নজর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এইবার সরকারী অর্থও পথে লুঠ হ'ল।

ইংরেজের ভাল করে টনক নড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কে সন্দেহ করবে 'ছদ্মবেশী মহারাজ'কে এত বড় বিদ্রোহী দলের নায়ক বলে। সাধারণের মধ্যেই তো সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়ান!

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশে নেমে এসেছে। অনাহারে-অর্দ্ধবস্ত্রে দরিদ্র ভারতবাসীর লাঞ্ছনার অবধি নেই। সেই সঙ্গে মৃত্যুর বিভীষিকা। এই বিভীষিকা ১৮৭৬-৭৭ সালে দাক্ষিণাত্যে ভীষণ রূপ ধারণ করেছিল, এখনও তার জের চলছে। ক্ষুধার তাড়নায় কত শত লোক মারা যাচ্ছে। ভারতবাসী মরুক আর বাঁচুক সেদিকে

ইংরেজদের নেই তেমন কোন দৃষ্টি। নিজেদের প্রাপ্য কর ঠিকমত আদায় করতে পারলেই তারা খুসী।

এর একটা বিহিত করতেই হবে। চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না, এই হ'ল বাসুদেবের জ্বালা।

সে সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের বাঁচাবার জন্যে ইংরেজ সরকার যে কি সাহায্য দিয়েছিল সেটি বাসুদেবের আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে।

তিনি লিখেছেন—"ভারতের অধিবাসীরা ইংরেজ শাসনের গুণে অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হয়েছে।··ইংরেজরা দুর্ভিক্ষের সময়ে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের উপকারের জন্যে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু সেগুলো কার্যত কি হয়েছিল, কেউ কি তা অনুসন্ধান করে দেখে-ছিলেন? প্রতিটি দুর্ভিক্ষপীড়িতকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সাহায্য দেড় আনা পয়সা মাত্র। অথচ ঐ সময়ে টাকায় পাঁচ সের করে চাল বিক্রী হচ্ছিল। এই দেড় আনা পেতে হ'লে প্রত্যেককেই কর্তা ব্যক্তিদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণে কাজ দিতে হ'ত। এই সাহায্য দেওয়া, মুখের মিষ্টি কথা ছাড়া আর কি হতে পারে? মুখে আওড়াচ্ছে খাও খাও কিন্তু রাঙা চোখে ইশারা করছে, খেলেই পিঠের চামড়া উঠবে। এ সবের অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল অর্থ সংগ্রহ করা, এ দেশকে বিদেশীতে পরিপূর্ণ করা এবং এদের ধর্ম নষ্ট করা। আমি সাত বছর থেকে চিন্তা করে আসছি, কি উপায়ে অভুক্ত ক্ষীণ কঙ্কালসার দীন দরিদ্র ভাইদের জীবন রক্ষে করতে পারি, কিন্তু খুঁজে তার তেমন কোন পথ বার করতে পারছি না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের এ কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সরকার বহাল তবিয়তেই আছে।"

মনবেদনায় বাসুদেবের অন্তর গর্জে উঠল। সাধ্যমত সাহায্য সে দিয়ে যাচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে, সংগৃহীত অর্থ থেকে। কিন্তু এ সামান্য টাকায় এত বৃহৎ যজ্ঞের কি হয়? সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য মাত্র।

বাসুদেবের স্বাক্ষরিত পত্র গেল সরকারী দপ্তরে, রাজ্যপাল,

জেলাশাসক, মহকুমাশাসক সকলেরই নামে পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় লেখা—"যদি দুর্দশাগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের উপযুক্ত সরকারী সাহায্য না দেওয়া হয়, এর বিষময় ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। একজনেরও ঘাড়ে মাথা থাকবে না। এখন চিন্তা ক'রে দেখ কি করবে ?"

তাঁর এই অসম সাহসিকতায় সমগ্র ভারতে এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। বিলেতের পার্লামেণ্টে এ নিয়ে কম আলোড়ন হ'ল না।

এই নির্ভীক ভারতবাসীটি কে ? কি এর পরিচয় ? কার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, ইংরেজকে চোখ রাঙায়—মৃত্যুভয় দেখায় ?

কর্তাদের এ অযোগ্যতায় পার্লামেণ্ট থেকে কৈফিয়ৎ তলব করল। এই লোককে খুঁজে বার না করা পর্য্যন্ত সরকারের চোখে ঘুম নেই। গোয়েন্দা পুলিসও হিমসিম খেয়ে গেল পুলিসের সঙ্গে, খোঁজ করে কোন হদিসই করতে পারছে না।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেই 'সন্তান বাসুদেব' এদের মধ্যে দিব্যি ঘোরাঘুরি করছেন। কে সন্দেহ করতে পারে এই গৈরিকবসনধারী লোকটার ভেতর এমনি এক বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে।

ডাকাতি-লুণ্ঠন অব্যাহত।

এই সামান্য সময়ের মধ্যে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের ইংরেজ বিদ্বেষী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন বাসুদেব। হয়তো বা আরও কিছুদিন সময় পেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে টলিয়ে দেওয়া অসম্ভব হ'ত না তাঁর।

চকিতে এ কি সর্বনাশ। একি সর্বনাশ হয়ে গেল ? এই দলের লোকই তো লুঠের মাল আত্মসাৎ করে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করছে। কেউ আবার সেই টাকা মেরে নিয়ে দল ছেড়ে বাড়ী পালাচ্ছে।

দু'তিন জায়গায় এই ঘটনা ঘটার পর বাসুদেব মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। আত্মগ্লানিতে ভারাক্রান্ত হয়ে স্থির করলেন শৈলদেবের মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে আত্মাহুতি দেবেন।

ছুটে গেলেন সেখানে। খড়্গ উত্তোলন ক'রে নিজ শিরচ্ছেদে উদ্যত। মন্দিরেব পূজারী এসে পশ্চাৎ হ'তে তাঁর হাত দুখানি চেপে ধরলেন।

—কেন? কেন তুমি আমাকে নিবৃত্তি করলে? এ তুচ্ছ প্রাণ আমি রাখতে চাই না। বিশ্বাসঘাতকেরা আমার মস্তকে কুঠারাঘাত করেছে। সবাই কি তবে সন্তান নয়?

—সে বিচার পরে করো বৎস! এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। সন্তানের এ কাপুরুষতা শোভা পায় না। তোমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি!

মিলিটারী নামল। বিদ্রোহীদল কোথায় পালিয়ে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে তাই তারা দেখবে।

দলে ভাঙন ধরেছে।

কতদিন আর মিলিটারীর হাত এড়িয়ে থাকা যায়।

সেনাবাহিনী চারদিকে জাল ফেলেছে।

অবশেষে সন্ন্যাসী বাসুদেব গ্রেপ্তার হলেন। বহু চেষ্টার পর মেজর ডানিয়েল, তাঁকে এবং তাঁর অনুগামী জনকয়েককে ধরে ফেলল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই।

সেসন্স কোর্টে বিচারের শুনানী চলল। তড়িত-ঘড়িত বিচার শেষ হয়ে গেল। জজ, বাসুদেব বলবন্ত ফাড়্‌কেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে দীপান্তরে পাঠানর আদেশ দিলেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রিকায় পরদিনই এ খবর ছাপা হয়ে গেল।

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়তে লিখল—"Wassudeo Bulwunt Phadke possesses many of the traits of

those high-souled men who are now and then sent in this world for the accomplishment of great purposes! He was an angel tempted by the devil and seduces. His heart was sound, but his reason led him astray. Yet the noble feelings of a Washington, a Tell and a Garibaldi animated his breast, and if he is not appreciated in this country where, patriotism is unknown, he will be better appreciated in England and other Western countries. As a dacoit his crime must be detested. Yet it is but due to him that his is a noble soul! His heart overflowed with love for India and what Indian can regard such a heart with indifference? .. He is the most unselfish of men and his diary breathes a spirit of unselfishness which is truly divine. Whatever he had, he was willing to offer for his country, even his life. The very idea of establishing a Republic shows the unselfish nature of his mind. He had no intention to establish a *raj* of his own. Eminently pious, he always fervently prayed to God for the regeneration of his country."

স্থির ছিল কারাজীবন ভোগ করতে বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কেকে আন্দামানেই পাঠান হবে। কিন্তু না, তা হ'ল না। হঠাৎ সরকারের মত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। ভয় পেয়ে, তাঁকে পাঠিয়ে দিল এডেনের জেলে। এছাড়া আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল, সেখানে তাঁর ওপর চরম অত্যাচার চালালেও গর্জ্জে উঠবার জন্যে তাঁর পাশে কোন ভারতবাসী

থাকবে না। সশস্ত্র প্রহরায় ১৮৮০র জানুয়ারীতে এডেন কারাগারের উদ্দেশ্যে বাসুদেবকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় জাহাজে তুলে দিয়ে ভারত সরকার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ঠিকই তাই। সেখানে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার আর নিগ্রহ শুরু হ'ল। রক্তমাংসের শরীর আর কত সহ্য করতে পারে। সুযোগ খুঁজতে লাগল বাসুদেব, কি উপায়ে জেল থেকে পালান যায়। সুযোগ একদিন এসে গেল। পালালেন বাসুদেব সুরক্ষিত এডেনের জেল থেকে।

সর্ব্বনাশ! খাঁচা ভেঙে বাঘ পালিয়েছে।

খোঁজ—খোঁজ, কোথায় গেল? কোথায় গেল? পথ-ঘাট তো তার এখানে জানা নেই—চেনা নেই!

সত্যিই তাই। পালানর রাস্তা বার করতে না পারায় তিনি ধরা পড়ে গেলেন।

এইবার চরম উৎপীড়ন, অত্যাচার চলতে লাগল তাঁর দেহের ওপর। কর্তৃপক্ষ বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাঁকে এডেনের কারাগার কি জিনিষ।

আর সহ্য করতে পারলেন না ফাড্‌কে অবশেষে মারাই গেলেন ঐজেলে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে।

বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কে জন্মেছিলেন, মহারাষ্ট্রের শিরধোনে ১৮৪৫ এর ৪ঠা নভেম্বর।

বাসুদেবের অনুচরেরাও এ অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেল না। এছাড়া বাসুদেবের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল ছিল তাদেরও ধরে ধরে এনে ইংরেজ সরকার কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ঠা বোধ করল না।*

* বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব সবেমাত্র সুরু হয়েছে। বাসুদেবের সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন—"আনন্দমঠ" যুবশক্তিতে আগুন ধরাতে।

লেখাটি প্রকাশ পেল 'বঙ্গদর্শনে'।

'আনন্দমঠ' থেকেই পেয়েছি আমবা মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কববাব মূল মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। হিংসা অথবা অহিংসার পথ ধরে যাঁরাই স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছেন 'বন্দেমাতরম্' কথাটিই ছিল তাঁদের কাছে আত্মত্যাগের মূলমন্ত্র। সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিক আনন্দমঠেব প্রেরণায় মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে ব্রিটিশেব লাঠিতে, বন্দুকের গুলীতে, ফাঁসীর মঞ্চে হাসি মুখে জীবন বলি দিয়েছেন। ইংরেজ রাজেব বিরুদ্ধে মহাশক্তিশালী হাতিয়ার ছিল 'বন্দেমাতরম্'। বাঙালীব জীবন উদ্বুদ্ধ হয়েছে আনন্দমঠের ভেতর প্রবেশ ক'বে। আনন্দমঠই এনে দিয়েছিল ত্যাগের মন্ত্র, বীর্য্যহীনেব বীর্য্য।

বাসুদেব বলবন্ত ফাডকেব বিচাবেব পবেই বঙ্কিম লিখলেন, 'আনন্দমঠ'। নানা ক্ষেত্রে ফাড্‌কের জীবন ধারার সঙ্গে আনন্দমঠেব মিল দেখতে পাওয়া যায়। আনন্দমঠেব উৎস যে ফাড্‌কের জীবনী থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যদিও তা স্বীকাব করেন নি, এই কারণেই বঙ্কিমেব এই কাহিনী এক কঠোর বিতর্কেব সৃষ্টি করেছে। বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কেব সন্তান দলের নাড়ীব সঙ্গে জড়িয়ে আছে আনন্দমঠের সন্তান দল। সত্যানন্দ আব বাসুদেব যেন যমজ ভাই। আনন্দমঠেব সত্যানন্দের সহচববা সকলেই 'সন্তান' হিসেবে পবিচিত। বাসুদেব, ইংবেজেব বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাব সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে 'সন্তান' বলে পবিচয় দিয়েছেন। ধর্মের প্রাধান্য বাসুদেবেব জীবনে বিশেষ ভাবে শেকড় গেড়েছিল, আনন্দমঠে প্রায় একই বকম।

বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহেব তথ্যকে হঠাৎ আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণে যে রকম গুরুত্ব দিয়েছেন, আচার্য যদুনাথ সবকার এখানে তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকাব কবেছেন। আনন্দমঠেব স্ত্রী-পুরুষ চবিত্রের সঙ্গে উত্তববঙ্গের বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদেব মিল দেখা যায় না। বঙ্কিম লিখেছেন, 'সন্তানেরা' বাঙালী ব্রাহ্মণ কায়স্থেব ছেলেরা। কিন্তু যে সব সন্ন্যাসী ফকিবেবা সত্য সত্যই ইতিহাসের লোক এবং উত্তববঙ্গে (বীবভূমে নয়) অত্যাচাব চালায়, তাবা এলাহাবাদ, কাশী, ভাজপুব জেলার লোক এবং অনেকেই তারা লেখাপড়া জানত না। আনন্দমঠেব সন্তানদল শিক্ষিত বৈষ্ণব আর এদের মধ্যে যাবা সত্যিই সন্ন্যাসী ছিল তারা শৈব।

সত্যকার সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যারা জড়িত ছিল সেই সব ফকিরেরা ছিল

পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, ছিল তারা লুঠেড়া, এদের মধ্যে কেউ কেউ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করত, ওরা দেশের মঙ্গল চিন্তা কোন দিনই করেনি। ইতিহাসকে সামনে রেখে বিচার করলে আনন্দমঠের অংশগ্রহণকারীদের কার্য-কলাপ (ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে এদের দু'টি খণ্ডযুদ্ধ বেধেছিল) অনেকাংশে সত্যাশ্রয়ী নয় এবং এই বইটিকে কোন মতেই ঐতিহাসিক বলে চালান যায় না।

আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় ১৮৮২ সাল থেকে আনন্দমঠই বাঙালী তথা ভারতীয়ের কাছে ইংরেজ সরকার বিরোধিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ লেখাকালীন যিনি ব্রিটিশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী) দেখাতে চেয়েছেন, মুসলমান আধিপত্যের বিরুদ্ধেই সন্তানদের সংগ্রাম। তাঁর—ধরি মাছ না ছুঁই পাণি ভাবে লেখার কারণ অতি সহজেই বোধগম্য।

ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে ছেড়ে দিলেও এমন কোন্ বস্তু বঙ্কিমকে আনন্দমঠ লিখবার জন্যে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে ছিল? বিশেষ কোন পটভূমিকার সন্ধান না পেলে ভারতীয় সাহিত্যে আনন্দমঠের মত উপন্যাস রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবত কঠিন হ'ত। এর পূর্বে রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার ঐতিহ্য এদেশে দৃষ্ট হয়নি।

এখন দেখা যাক বাসুদেবের সন্তানদলের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সঙ্গে কোথায় কোথায় আনন্দমঠের মিল আছে।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই মিলগুলি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন—

ধর্মের প্রাধান্য বাসুদেবের জীবনে এবং আনন্দমঠে প্রায় একই প্রকার।

গৃহদেবতা শ্রীদত্তের প্রতি বাসুদেবের অগাধ ভক্তি ছিল। পুণায় সরকারী চাকরিতে থাকাকালীন তিনি নিয়মিত নরসিংহ মন্দিরের পুরোহিতের নিকট শাস্ত্রপাঠ করেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার আগে তিনি, অক্কালকোটের স্বামী মহারাজের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, তাঁর নিজ উদ্দেশ্য সাফল্যের জন্যে। আনন্দমঠেও ধর্মের প্রাধান্য-প্রধান নায়কেরা সন্ন্যাসী। বাসুদেব ব্রত উদযাপনের সময় সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহী সন্তানদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের সংস্পর্শে আসা নিষিদ্ধ ছিল। মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপ দেবার পূর্বে, স্ত্রীর কাছে বিদায় নেয়ার সময় বাসুদেব বলেছিলেন—"কার্য্য সিদ্ধি না হওয়ার পূর্বে আর দেখা হবে না।"

বাসুদেবের সন্তানদলের ছিল, বনে-জঙ্গলে আশ্রয়, আনন্দমঠেও তাই। পাহাড়ের ওপর যুদ্ধ উভয়ত এক।

বাসুদেব তাঁর আত্মজীবনীতে দুঃখের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন, যে, তাঁর দলের লোকেরা লুঠের মাল আত্মসাৎ করে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হয় একবার কিছু হস্তগত করতে পারলে তাই নিয়ে দল ছেড়ে পালায়। আনন্দমঠে উল্লেখ আছে, বিজয়ী সন্তান সেনারা লুঠ করতে বেরিয়েছে, তাদের কাউকে কাজের জন্যে পাওয়া যাচ্ছে না।

আপনদলের লোকেদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে বাসুদেব, শৈলদেবের মন্দিরে আত্মবলির জন্যে খড়্গ উত্তোলন করেছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত বাসুদেবকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন অনেক বুঝিয়ে। বাসুদেব মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন, সাফল্যের অনিশ্চয়তায় হতাশ হয়ে। তাঁর ছিল একই সঙ্কল্প—"প্রজাভক্ষক ইংরেজদের নিশ্চিন্তভাবে থাকতে দেব না। মৃত্যুর পরেও আমি তাদের ছাড়ব না" (বাসুদেবের আত্মচরিত বঙ্গানুবাদ)। আনন্দমঠে শেষ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ দুঃখের সঙ্গে বলেছেন, "এইখানে এই মাতৃপ্রতিমার সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।" দেশজননীকে শত্রু কবল মুক্ত করতে পারেননি বলেই তাঁর এই আত্মগ্লানি।

১৮৭৬-৭৭ সালে দাক্ষিণাত্যে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেশবাসীকে গ্রাস করেছিল, বাসুদেবের জীবনকে তা বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। আনন্দমঠের সূচনাতে সেই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের পটভূমিকা।

বাসুদেবের 'সন্তানদল' গড়ার পশ্চাতে এক গভীর মনস্তত্ত্বের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন তিনি—"সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য অতি গুরুতর। পিতামাতা সহায় না হলে সন্তান কোন মতেই পালিত হইতে পারে না। আমি তোমাদের কাছে একটি সামান্য অসহায় শিশুমাত্র। আমি দুই মণ ভার কোন মতেই উত্তোলন করিতে পারি না, কিন্তু একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা পুরুষ অনায়াসে সে ভার উত্তোলন করিতে পারিবে। শিশুর পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অনেক দিন লাগে।

"আমার এখন শৈশব। আমার মত শিশু যদি তোমাদের ন্যায় পিতামাতার সাহায্য না প্রাপ্ত হয়, তবে সে সংসারে কি কাজ করিতে সমর্থ হইবে? আবার পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে সন্তানই তাহাদিগকে রক্ষণা বেক্ষণের একমাত্র উপায়। আমি তোমাদিগের সন্তান। তোমরা যদি এখন আমাকে রক্ষা কর, আমার

সহায় হও, তাহা হইলে শেষে আমিও তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব। আমি যখন ইংরেজ শাসন উচ্ছিন্ন করিব, তখন তোমরা আমার নিকট পুরস্কার পাইবে।" আনন্দমঠে সত্যানন্দের সহচররা সকলেই সন্তান নামে পরিচিত। বাসুদেব নিজেকে দেশের নাগরিকদের সন্তান বলে ঘোষণা করেছেন। আনন্দমঠের সন্তানরাও দেশমাতৃকার সন্তান।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাসুদেব প্রথম ব্রতী এবং কেবলমাত্র যার সূচনা। তাইতো বাসুদেব নিজেকে শিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ একই 'সন্তান' শব্দটির ব্যবহার খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।

ফাড়্‌কের জীবনের সম্পূর্ণ তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে জানা খুবই সহজ ছিল, কারণ সে সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংবাদ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বিচার-কাহিনী নিশ্চয় কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র তা নিশ্চয় পড়েছিলেন। কাজেই এখান থেকে আনন্দমঠের জন্যে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করা একেবারে অমূলক না হতেও পারে।

আনন্দমঠের প্রকাশ প্রাপ্ত প্রথম প্রতি সংস্করণেই বঙ্কিম নানা রূপ পরিবর্তন এনেছেন। কারণ অতি সহজেই বোধগম্য। ইংরেজের রোষ চক্ষু থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্যে তিনি বাসুদেবের বলবন্তের পরিবর্তে আনন্দমঠে সন্ন্যাসীদের আশ্রয় দিয়েছেন আর ইংরেজদের বদলে এদের বিরোধ দেখিয়েছেন মুসলমান শাসকদের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে আনন্দমঠে কাহিনী অদল-বদল করে ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' এবং প্রথম সংস্করণে জীবানন্দের শত্রু ইংরেজ, এর পরেই দ্বিতীয় সংস্করণে শত্রু হল যবন। দেশের জন্যে সত্যানন্দের অর্থ সংগ্রহের উপায়কে প্রথমে লেখক দস্যুবৃত্তি বলেননি কিন্তু পরের সংস্করণে বলেছেন পাপ ও দস্যুবৃত্তি। তৎকালিক বিবরণ থেকে জানা যায় বঙ্কিমের এই উপন্যাস লেখার জন্যে সরকার তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তাদের তুষ্ট করতে তিনি প্রতি সংস্করণেই অদল-বদল করেছেন। এই উপায় অবলম্বন না করলে আনন্দমঠ সম্ভবতঃ বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

উপসংহারে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এমন কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না যার দ্বারা বলা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র বাসুদেব বলবন্ত ফাড়্‌কের আত্মজীবনীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন আনন্দমঠ লিখতে। বঙ্কিমও স্বীকার করেননি খাতায় কলমে। তবুও বাসুদেবের জীবনের সঙ্গে আনন্দমঠের কাহিনী যেন

॥ নয় ॥

৪ঠা জুলাই, ১৯০২।

নরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ স্বর্গারোহণ করলেন। আরব্ধ কাজ তাঁর আর শেষ করা হল কৈ?

শিষ্যা নিবেদিতাকে সবই বলে গেলেন।

বেলুড় মঠে, গঙ্গাতীরে স্বামীজীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে ভগিনী নিবেদিতা আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পরাধীন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ করলেন।

এদেশ থেকে ফিরিঙ্গী তাড়ান, একমাত্র ধ্যান হ'ল ব্রহ্মবান্ধবের।

দুঃখ কিছুটা প্রশমিত হ'লে, স্বামীজীর পূর্বাদেশমত ভগিনী নিবেদিতা ছুটলেন অরবিন্দ সকাশে, বরোদায়। স্বামীজী, অরবিন্দকে যা বলতে বলে গিয়েছিলেন, একে একে সবই তাঁকে বললেন।

শ্রীঅরবিন্দের সাংগঠনিক শক্তির কথা নিবেদিতা পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। বাঙলার এই দুর্দিনে এমনই একজন দৃঢ় মনোবল-সম্পন্ন নেতারই তো প্রয়োজন।

বহু আলোচনার পর অরবিন্দ নিবেদিতার কাছে সত্যবদ্ধ হলেন। নিবেদিতাও তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, ভারতের মুক্তি সাধনায় ভগিনীর ন্যায় তিনি সর্ব্বদাই তাঁর পাশেপাশে থাকবেন।

স্বামীজী লোকান্তরিত হওয়ার পর ব্রহ্মবান্ধব কিছুদিনের জন্যে

ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তারই সূত্র ধরে বোঝা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় নয়। বলা যেতে পারে এক জলন্ত স্বদেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত।

(তথ্য—"আনন্দমঠের উৎস", শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, যুগান্তর, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৪)

পাড়ি দিলেন বিলাতে, বেদান্ত প্রচারে, মাত্র তিরিশ টাকা সম্বল ক'রে। উদ্দেশ্য তাঁর আরও ছিল।

অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কয়েকবার বক্তৃতা দিয়ে সেখানকার প্রত্যেকটি লোকের মন জয় ক'রে নিলেন। সেখানে হলেন তিনি প্রতিষ্ঠিত।

এই সব বক্তৃতার কয়েকটি অনুলিপি ক'লকাতার 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল।

এর পরেই অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এই আকর্ষণেই কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে বাঙলায় ফিবে নামতে হল দেশের কাজে।

ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কেশব সেনের কাছ থেকে। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন তাঁর নাম রাখলেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কিছুকাল পরে ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন ব্রহ্মবান্ধব। এরপর প্রথমে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান তারপব আবাব হলেন রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত। নাম কিন্তু তাঁর রয়েই গেল, কেশব সেনের দেওয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ভবানীচরণ নাম আর ফিরে এলনা।

১৯০২ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলাদেবী আর কেদারনাথ দাসগুপ্তেব উৎসাহে 'ডন সোসাইটি' স্থাপিত হ'ল।

ধর্মগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন' পত্রিকা মারফৎ তরুণ মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াতে লাগলেন। 'গুপ্ত সমিতি'র পথ এতে অনেকখানি সুগম হ'ল। এই সোসাইটিতে, ভগিনী নিবেদিতার জ্বালাময়ী বক্তৃতা তরুণ হৃদয়ে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করল।

আবার এই সালেই ক'লকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়,

মহারাষ্ট্রের মনীষী বীরসন্তান সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুণীজনেরা শিবাজী উৎসবে যোগ দিলেন।

সখারামও বাঙলার জাগরণে বিশেষ অংশ গ্রহণ করলেন।

এর চব্বিশ বছর আগে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' লিখেছিলেন। এই পুস্তকের অনেকাংশ জনজাগরণকে প্রবুদ্ধ করে।

বাঙলার জনচেতনার মূলে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীঅরবিন্দ আর ভগিনী নিবেদিতা।

অরবিন্দের বিপ্লবদর্শনের মূলমন্ত্র 'অগ্নি ও রুধিরের' সত্যপাঠ সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন, যতীন্দ্র, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, সত্যেন বসু (অরবিন্দের মাতুল), দেবব্রত বসু, ভূপেন দত্ত (বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর) এবং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই অবিনাশই ছিলেন অরবিন্দের দেহরক্ষী ও পার্শ্বচব। বরোদা থেকে বাঙলায় এসে যে চাব বছর অরবিন্দ ক'লকাতায় ছিলেন 'অবি' সব সময়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে অরবিন্দ প্রথম থেকেই ইংরেজের কাছে কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির বরদাস্ত করেননি। 'ইন্দুপ্রকাশে' অরবিন্দ অনেকবার কটূক্তি কবেছেন; এখনও তিনি তা ক'রে চললেন।

আমেবিকা থেকে ফিরে এসেই বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় কংগ্রেসের ভিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করলেন।

অরবিন্দের সঙ্গে বিপিন পালের সাড়া পেয়ে বাঙলার গুপ্তসমিতির পথ অনেকখানি প্রশস্ত হ'ল। দেবব্রত বসু 'নিউ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে আগে থেকেই জড়িয়েছিলেন।

স্বদেশীতে ঢুকলেন, পি. এন. মিত্র,—ব্যারিষ্টার, প্রমথনাথ মিত্র। ইনি 'অনুশীলন' সমিতিতে যুবকদের ব্যায়াম চর্চা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে বিপ্লবের বেদী গড়লেন।

পি. এন. মিত্রও, তিলকের মত চাইতেন না রাজনীতিতে ধর্মের স্থান দিতে, যেটি চাইতেন অরবিন্দ।

কংগ্রেসের—'যো হুকুম' নীতিকে ইনিও কোন দিন বরদাস্ত করেননি।

এই ১৯০২ সনের দোল পূর্ণিমার দিন ক'লকাতার ২১ নং মদন মিত্র লেনে, সতীশচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন' সমিতির জন্ম হ'ল।

পি. এন. মিত্র হলেন এব অধিনায়ক।

এছাড়া অনুশীলন সমিতির প্রথম সারিতে এলেন—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আর চিত্তরঞ্জন দাস।

জাপানী শিল্পী কাকুজো ওকাকুরা স্বামীজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে ছিলেন। বললেন ইনি—"উদ্ধত পাশ্চাত্য জাতির কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেতে হ'লে 'এশিয়া এক' এই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে।"

ওকাকুরা পি. এন. মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ ক'বে নিজের মতবাদ প্রচারে এগিয়ে এলেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার কাছে। তিনি চান না ভারতবাসী ইংরেজদের পদানত হয়ে থাকে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙলার জাগরণের প্রথম বছর। বছরটা তাই বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

মহারাষ্ট্রবীর সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙলার জনজাগরণে নিজেকে একনিষ্ঠ ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে বাঙলায় শিবাজী উৎসব ক'রে, তিনি মহারাষ্ট্র আর বাঙলাকে এক সূত্রে বেঁধে দেন।

অরবিন্দ তাই বলেছিলেন—দেউস্করের দেশপ্রেম যেন খাঁটি সোনা। দেউস্কর সুন্দর বাঙলা জানতেন ও লিখতেন।

'হিতবাদী' পত্রিকার সঙ্গে তিনি পনের বছর জড়িয়ে ছিলেন, ১৮৯৭ সাল থেকে।

বারীন্দ্র তাঁকে গুপ্তসমিতিতে নিয়ে আসেন। ক্রমে ক্রমে সখারাম ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও শোচনীয় দারিদ্র্যের কথা সখারাম 'দেশের কথা'র মাধ্যমে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন।

॥ দশ ॥

১৯০৩।

বাঙলার সর্ব্বস্তরের তরুণদের মনে তখনও আগুনের ঝড় ওঠেনি। কারো কারো কণ্ঠে অতি ক্ষীণ স্বরে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। কারও বা কানে তাও আবার পৌছুচ্ছেনা। নৈতিক জীবনের ভিত তখন বড়ই স্পর্শকাতর। অবসাদ, ভীতি চতুর্দ্দিককে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে রেখেছে। ঘুনধরা মনোবল নিয়ে অনেকেই পারছে না দেশের কোন সদানুষ্ঠানে একসঙ্গে মিলিত হতে। যারা আবার কর্মযজ্ঞের স্তবকার তাঁদের বীণার তারও মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী এর অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন রাজনীতির আকাশে এই ঘন খাপছাড়া কাল মেঘ। স্থির করলেন—না! উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগে এ ব্যাধি দূর করতেই হবে। তিনি উঠেপড়ে লেগেছিলেন। গদ্যে, ছন্দে এঁকে দিয়েছিলেন, ভারতমাতার কঙ্কালসার দেহচিত্র প্রতিটি বাঙালীর মনোমন্দিরে।

এরপর বাঙলার যুবশক্তিতে যেটুকু বা আগুনের ঝড় উঠেছিল তাও গেল সীমিত হয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের লোকান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে।

বিপ্লববাদীরা হাল ছাড়লেন না। গোপনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসলেন, নিবেদিতা, যতীন্দ্র, বারীন্দ্র, দেবব্রত, ভূপেন্দ্র, সত্যেন, সতীশ-চন্দ্র আর প্রমথনাথ। অরবিন্দকে পরামর্শের জন্যে ডেকে আনা হ'ল।

স্থির হয়ে গেল,—যে কয়েকটি বীর্যবান যুবককে ইতিমধ্যে তাঁরা দীক্ষিত করতে পেরেছেন, তাদেরই দিকেদিকে পাঠাতে হবে সংগঠনের কাজে।

ছুটল নির্ভীক তরুণের দল এই মহামন্ত্র তাদের হৃদয়ে নিয়ে। জোয়ারের স্রোতের গতিতে তারা এগিয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র প্রবেশ করল জোয়ারের জল। মরানদীগুলো যেন ফুলে ফেঁপে উঠে ক্রুদ্ধ আবেগে হিস হিস শব্দ করতে লাগল। এ জোয়ারের আঘাত গিয়ে আছড়ে পড়ল বাঙলার দিকে দিকে; গিয়ে লাগল চন্দননগরের যুব গোষ্ঠির গায়ে ফরাসী উপনিবেশে।

॥ এগার ॥

চন্দননগরের ছেলে মতিলাল রায়। নেমেপড়ল কাজে, নতুন পথ ধ'রে। সেবা ধর্মের নামে সৃষ্টি করল একটি সংঘের। নাম হ'ল তার "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়," রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাকে আশ্রয় ক'রে। প্রবাসী বাঙালী কানাইলাল দত্ত তখন চন্দননগর ডুপ্লে কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে এসেছে। সে তখন এখানকার ছাত্র।

মতিলালের এই সংঘের কাজ হ'ল, পাড়ায় পাড়ায় দরিদ্রের সেবা, মৃতদের সৎকার, অসহায় দুঃস্থজনের সাহায্য প্রভৃতি।

কানাই ভেতরে ভেতরে অর্থাৎ বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে এই দলকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দিতে সুরু করে দিল। প্রকাশ্যে তো নয়ই! কারণ বাড়ীর কঠোর শাসন তার সকল উদ্যমকেই প্রশমিত ক'রে রেখেছিল।

একা কি কানাই? ওর সমগোত্রীয় কর্মী যে অনেকেই ছিল! ছিল শ্রীশচন্দ্র ঘোষও এই গোষ্ঠিভুক্ত।

পাথরের বোল্ডার ফেলে পাহাড়ী নদীর স্রোতকে সাময়িকভাবে বাঁধা হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রবল বর্ষায় সে ক্রুদ্ধ আবেগে চতুর্দিক প্লাবিত করে ছুটে চলল সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে।

"সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ে" একটি সখের নাট্যশালা জন্ম নিল। তাও গেল ভেঙে কিছু দিন যেতে না যেতেই। একে একে মতিলালের সব প্রচেষ্টাই ভেঙ্গে চুরে যেতে লাগল। শেষ চেষ্টা করেও মতিলাল নাট্যশালাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলনা কিছুতেই।

সহজে দমে যাবার ছেলে নয় সে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেই কেন্দ্র ক'রে এখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল —সেই "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়।" দলগঠন ও দরিদ্র নারায়ণ

সেবাই হ'ল এই সম্প্রদায়ের এবারকার প্রধান কর্মসূচী।

ধর্ম কর্মে কানাইলালের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, তাই অনেক সময় সে এ বিষয়ে মতিলালের সঙ্গে এক মত হ'তে পারেনি।

এখান থেকে কিছু দিনেব জন্যে কানাইলাল গাঢাকা দিল মতের মিল না হওয়ায়।

ছুটো বছর সে অন্য দিক দিয়ে নিজেকে তৈরী করতে লাগল। এই সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার এফ. এ. পরীক্ষা।

কানাইলালের পারিবারিক অবস্থা তখন অর্থসঙ্কটের মুখে। এই সরে থাকাটা তার কারণ কিনা, ঠিক বলা যায় না।

এই সময়ের মধ্যে সে আবার ই. আই. রেলওয়ের এজেণ্ট অফিসে একটা চাকরী জোগাড় করেছিল, কিন্তু দেড়মাসের বেশী সেখানে তার টি"কে থাকা সম্ভব হয়নি।

সে তার নিজের চরিত্রবল এবং সত্যের ওপর নির্ভর ক'রেই চলত। যা ভাল বুঝত তাই সে করত। কোন পরামর্শ তার একনিষ্ঠ মনকে কোন দিনই প্রশমিত করতে পারেনি।

॥ বার ॥

কাজ কর্মে বিশেষ অসুবিধে হওয়ায় ১৯০৩ সালে অক্সফোর্ড মিশনের খুব কাছে অনুশীলন সমিতির কার্যালয় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল ৪৯নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটে, ২১নং মদন মিত্র লেন থেকে।

এই অনুশীলন সমিতি পরে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একত্রে কাজ সুরু করেছিল। গুপ্তসমিতির একটি শাখাও খোলা হয়ে গেল ঢাকা সহরে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ মানুষ গড়াই ছিল এদের আসল উদ্দেশ্য। শারীরিক ও নৈতিকবল অর্জনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন যুবকদের তা নিখুঁতভাবে এখানে শিক্ষা দেওয়া হোত।

দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে—

১। ন্যায়নিষ্ঠা আর শিষ্টাচার সম্বন্ধীয়।

২। ব্যায়ামের সাহায্যে শরীর ও মনকে সুদৃঢ় করা।

ব্যায়ামচর্চার মূল অঙ্গছিল—ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, তলোয়ার চালান, মুষ্টিযুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতি। এ ছাড়া সামরিক কায়দায় ড্রিল ও মক্‌ফাইট শেখান হোত, সঙ্ঘের প্রতিটি সভ্যকে।

প্রমথনাথ মিত্রই বিশেষভাবে এই শাখাটির পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন।

ঝিমিয়ে পড়া বাঙলা যখন আবার একটু একটু ক'রে জাগছে এই সময় বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ব্রিটিশ বিরোধী এক রূপক রচনা করলেন,—রাবণবধকে অবলম্বন ক'রে। এই গান স্কুলের ছোটছোট ছেলেদের দিয়ে গাওয়ান সুরু হয়ে গেল—ছুটির পর। নিউ ইণ্ডিয়া স্কুলের বাড়ীতে এবং মহেশালয়ে, ছেলেরা রোজই ঐ গান গেয়ে চলল।

শিশু মনে যাতে প্রথম থেকেই ইংরেজ বিদ্বেষ জেগে ওঠে সেই ভাবেই ঐ ধরনের কলিগুলো তৈরী হয়েছিল—(তার কিছুটা এখানে দিচ্ছি)।

"সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ও মা,
দে মা অস্ত্র দয়া ক'রে, বেটাকে তাড়াই দূরে।
ও তোর অশান্ত বলে আর নাহি ভয় মা,
শক্তি পূজা করতে দেখে 'বেটা' কটমটিয়ে থাকে।
সে তো নাহি মনে ভাবে, আমরা তোর—তনয় মা।"

বিবেকানন্দের বাণীতে পাশ্চাত্য জাতি একদিন জেনেছিল, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের ভাবধারা, ভারতের হিন্দুধর্ম কি বস্তু।

পরে বিপিন পাল, ব্রজেন শীল, ব্রহ্মবান্ধব পাশ্চাত্যে গিয়ে উৎপীড়িত ভারতের শোষিত রূপটা সাধারণের চোখের সামনে কিছু কিছু ক'রে তুলে ধরেছিলেন বটে কিন্তু বিবেকানন্দ যে ফল সংগ্রহ করে এনেছিলেন, এঁরা তার কিছুই পারলেন না।

স্বামীজীর তিরোধানের পর আয়ারল্যাণ্ডের কন্যা মারগারেট—স্বামী বিবেকানন্দ যাকে, হাতে ক'রে গড়ে তুলেছিলেন, সেই দীপ্তিময়ী রমণী—ভারতের ভগিনী নিবেদিতা দেখলেন, হিন্দুস্থানের ক্ষয়িষ্ণু জাতির মনোবল গড়ে তুলে ইংরেজ শাসনের ওপর চরম আঘাত হানতে হবে। এখন প্রয়োজন জাতির জাগরণ, জাতির অভ্যুত্থান।

যে মনোবল দেখা যায়নি লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক বা বিপিনচন্দ্র পালের ভেতর সেই চেতনা এক বিধ্বংসী রূপ নিয়ে গর্জে উঠল নিবেদিতার কণ্ঠে।

গুপ্ত সমিতিকে জাগিয়ে তুলতে এই বিদেশিনী তাঁর সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করলেন। প্রতিটি বিষয়ে সহায়তা দিয়ে গুপ্ত সমিতির মেরুদণ্ডকে সোজা ক'রে ধরলেন এই মহীয়সী নারী।

অরবিন্দ 'অগ্নি ও রক্তস্নানে' সমিতিকে পূত ও পবিত্র করে তুললেন।

নিবেদিতা, বিপ্লববাদের বাছা বাছা বিদেশী বই এনে সমিতির গ্রন্থশালায় উপস্থিত করলেন। দিকে দিকে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ ক'রে এনে সমিতির ঝুলিতে ফেলতে লাগলেন। যুবকদের ঝিমিয়ে পড়া মনোবলকে মাঝে মাঝে শ্লেষবাক্যের কষাঘাতে উত্তেজিত করতে লাগলেন, আবার প্রয়োজন বোধে কুণ্ডলিনী শক্তিতে নিদ্রাচ্ছন্ন যুবকদের ধীরে ধীরে ভৈরব মূর্তিতে জাগিয়ে তুললেন।

লর্ড কার্জনের দুষ্প্রবৃত্তি বাঙালীর মরা মনে প্রতিহিংসার জ্বালাময়ী স্রোত বইয়ে দিল। চিরবিদ্রোহী ব্যথিত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান এক যোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়ল।

অরবিন্দ এবার সক্রিয়ভাবে ফিরে এলেন রাজনীতিতে। তখনও তিনি বরোদায়।

ভগিনী নিবেদিতা সারা বাঙলায় কাজ সুরু করে দিলেন। পূর্বে যা কেন্দ্রীভূত ছিল সেটিকে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন।

সংগ্রামের ধারা এবার নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে চলল। গতিবেগ ক্রমে ক্রমে চঞ্চল উন্মাদনায় ধাবিত হল। কীর্ত্তিনাশা ইংরেজ স্পর্দ্ধার শাল্মলী বৃক্ষকে সমূলে গ্রাস করতে কৃতসঙ্কল্প; বন্যার ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে কার্জনের সামনে ফুঁসতে লাগল।

এই আন্দোলনকে উদ্দেশ্য ক'রে সুরেন্দ্রনাথ বললেন,—"It is not mearely an economic or a social or a political movement co-extensive with the entire circle of our national life, one in which are centred the many-sided activities of our growing community. It is the shibboleth of our unity and industrial and political salvation. It would have tremendous appeal to the masses—Deccan peasant or the Bengali rustic—who are indifferent to politics."

॥ তের ॥

১৯০৩ সাল * থেকেই দেশে জনজাগরণ যে নতুন রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, সেই আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ সুরু হ'ল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

ভারতের জনজাগরণকে অনুপ্রাণিত করতে একটি দৃষ্টান্ত সময়মত উপস্থিত হয়ে উৎপীড়িতদের মনের আগুনে ঘৃত সেচন করল।

১৯০৪ এ হ'ল রুশ-জাপান যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে জাপানীদের কাছে রুশ জাতির পরাজয় ভারতবাসীর মনে এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করল। প্রাচ্যের এই ক্ষুদ্রজাতির কাছে পাশ্চাত্যের এক শক্তিশালী জাতি পরাজিত হওয়ায় বাঙলা তথা ভারতের বিপ্লবীদের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রচুর বেড়ে গেল। জাপানের সাহস দেখে ভারতবর্ষের চোখ খুলল।

সারা এশিয়াবাসী যেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল।

এই সময়ে ভারতীয় যুব শক্তির অগ্রগতি যে, কিরূপ নিয়েছিল তার বর্ণনা সরকারী এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায়:—

'At Calcutta and Dacca youths belonging to

* বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন চলেছিল ১৯০৩ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯১১ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসে বাঙ্গলাকে এক করবার আদেশ দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কথাই ঠিক হ'ল। অর্থাৎ যখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বলে চলেছে যে বঙ্গভঙ্গ 'Settled fact' সুরেন্দ্রনাথ জাতির পক্ষ থেকে তার উত্তরে বললেন যে এ ব্যবস্থাকে Unsettle করতে বাঙালী দৃঢ় সঙ্কল্প। শেষ পর্যন্ত 'Unsettled' করিয়ে তবে ছাড়লেন। বঙ্গভঙ্গ হ'ল না কিন্তু পরে বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

respectable families who had begun with drilling and club exercises had passed into swords and daggers and were studying the use of pistols and explosives. The conspirators were all supplied with money, were bound together with stringent vows, were fuming with racial hatred and firm belief, that they could initiate a national rising.' এই নোটটি থেকেই বুঝতে পারা যায়, রাজশক্তি ঐ অবস্থায় কি পরিমাণ ভীত হয়ে পড়েছিল।

ব্রহ্মবান্ধব দেখলেন ইংরেজদের ঘাবড়ে দিতে হ'লে এই সুযোগে নতুন ধরনের কিছু লেখার প্রয়োজন। বাঙালীকে উৎসাহিত করতে হবে লেখনীর মাধ্যমে। অঙ্কুরিত করতে হবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে উষ্মা।

১৯০৪, ১৬ই ডিসেম্বর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রকাশ করলেন দৈনিক পত্র 'সন্ধ্যা'।

দেশের জনজাগরণের সঙ্গে সমতা রেখে প্রয়োজন মত নরমে-গরমে লিখে চললেন, নতুন ধরনের লেখা। 'সন্ধ্যা'র চাহিদা গেল বেশ বেড়ে।

কাজ হয়েছিল যথেষ্ট। কাগজের জ্বালাময়ী ভাষাস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে-ছিটকে পড়ল গ্রামে-গ্রামান্তরে, সহরে-গঞ্জে।

॥ চোদ্দ ॥

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৫।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন। চ্যানসেলার লর্ড কার্জন অভিভাষণে কটাক্ষ করলেন, "প্রাচ্য-দেশবাসীরা অত্যুক্তিবাদী ও অতিরঞ্জনপ্রিয়।"

সংবাদপত্রের ক্রোধটা ছুঁড়ে মারলেন কার্জন, ভারতবাসীর চরিত্রে।

কার্জনের এই অশালীন উক্তির সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

ভারতীয়ের হ'য়ে তাঁর নিজের দেশের একজন মহিলাকে এমনি কটূক্তি করতে দেখে কার্জন স্তম্ভিত হ'লেন, রাগে জ্বলে উঠলেন, কিন্তু নিবেদিতার কোন শাস্তি বিধানে সাহস পেলেন না।

২০শে জুলাই ১৯০৫ এ যখন পাকাপাকিভাবে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করার মঞ্জুরী এল ভারত সচিবের কাছ থেকে, বড়লাট কার্জনের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন, রাজা-মহারাজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এক জোটে।

'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন..."আমরা প্রশ্রয় চাহিনা। প্রতিকুলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ।"

'সঞ্জীবনী' লিখল, 'দীক্ষামন্ত্র—বিদেশী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ। এতেই ইংরেজ জব্দ হবে'।

সুরেন্দ্রনাথ বয়কট মন্ত্রের সর্ব্বাধিনায়ক; তাঁর এই দীক্ষামন্ত্র বাঙালী জাতি কায়মনবাক্যে গ্রহণ করল।

'হিতবাদী'তে সখারাম লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একই সঙ্গে গর্জে উঠলেন। রামেন্দ্রসুন্দর, মা বোনদের একই মন্ত্র গ্রহণে উৎসাহিত করলেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছিল 'স্বদেশী ভাণ্ডার'। প্রকাশিত হ'ল এই নামে একখানি পত্রিকাও। সহায়তা করলেন, সরলা দেবী আর কেদারনাথ দাসগুপ্ত।

স্বদেশী শিল্পে গ'ড়ে উঠল তিনটি সংস্থা তিন জায়গায়। দু'টি সংস্থার, একটির নাম হল 'স্বদেশী ভাণ্ডার' আর একটির নাম হ'ল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'।

পি. এন. মিত্রের ক'লকাতার অনুশীলন সমিতিতে শক্তিচর্চা সুরু হয়ে গিয়েছিল আগে থেকেই। এর একটি শাখা একই সঙ্গে ঢাকায় জন্মলাভ করেছিল পুলিন দাসের নেতৃত্বে। যুবকেরা সেখানেও শক্তিচর্চায় মেতে উঠল। ক'লকাতা অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু।

সরলা দেবীর যুব-আখড়ার সঙ্গে একত্রিত হয়ে পি. এন. মিত্রের দল বীরাষ্টমীতে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করল।

সরলা দেবী চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের-দেবী চৌধুরাণীর 'ভবানী পাঠকের' চরিত্রে যুবকদের শিক্ষা দিতে।

'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হ'ল সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ঘুষি বনাম দেশী কিল' স্বদেশী মন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে।

অলিতে-গলিতে, গ্রামে-সহরে, হাটে-বাজারে, আকাশে-বাতাসে নদী তরঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের সঙ্গে 'বিদেশী বর্জন স্বদেশী গ্রহণ' সমগ্র বাঙলা জুড়ে।

বিপিন পাল এই সময়ে সবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি বললেন—"Every large human movement, essentially

a movement of thought has, whether consciously or unconsciously, some philosophy of life behind it."

এই কর্মযজ্ঞে যোগ দিলেন বিপিন পালের সঙ্গে, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রবীর বাল গঙ্গাধর তিলক। লাল-বাল-পালের একত্র অভিযান এবার সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে ছুটে চলল ভারতের দিকে দিকে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেনই এই যজ্ঞে আগে থেকে। ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঘর ছেড়ে বেরুলেন।

অরবিন্দ জাতির উদ্দেশে আগেই বলেছিলেন—"In the ideal of nationalism which India will set before the world, there will be an essential equality between man and man, between caste and caste, between class and class all being as Mr. Tilak has pointed out, different but equal and united parts of the VIRAT PURUSH, as realised in the nation,"

ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর, পাঁচকড়ি, কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার তাঁদের সুতীক্ষ্ণ কলমের ফলকে পাতার পর পাতা ভরে বিষ ছড়িয়ে চললেন শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে নীলকণ্ঠ করে তুলতে।

বরিশালের অশ্বিনীকুমার জাগলেন—বরিশালকে জাগালেন। দিবা-নিশি তাঁর চোখে আর ঘুম এল না। ব্যবহারজীবী আব্দুলরশিদ ইংরেজদের এই চক্রান্তের প্রতিরোধে একই ছত্রতলে এসে দাঁড়ালেন।

মৌলভী আবু হোসেন, হিন্দু-মুসলমানকে 'রাম-লক্ষণ' বলে অভিহিত ক'রে, দুই সম্প্রদায়ের হাত ধরে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন ছাত্র-সঙ্ঘ গ'ড়ে পথে পথে স্বদেশী গান গেয়ে বাঙালীর মনে আগুন ধরাতে লাগলেন।

অরবিন্দ আবার উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—"Patriotism is only a phase of that universal brotherhood which humanity aims at"

চোখের নিমেশে আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল। বিলিতি বস্ত্রের বাজারে আগুন ধরল। বিলিতি আসবাব পত্র ভেঙ্গে খান খান হতে লাগল।

ম্যাঞ্চেষ্টার ল্যাঙ্কেশায়ারের ব্যবসায়ে একে একে তালা পড়ছে দেখে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা আর্তনাদ করে উঠল।

ভারতের শাসক সরকার, তাদের সান্ত্বনা দিতে সেখানে লিখে পাঠাল—ধৈর্য্য ধর আন্দোলনের শেকড় আমরা সমূলে উচ্ছেদ করতে কৃতনিশ্চিৎ। কয়েক দিনের মধ্যেই ফল ফলবে। চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

ইংরেজ ছাড়বার পাত্র নয়। এই ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। ছাড়ল না কিছুতেই। বিভেদ সৃষ্টি করল হিন্দু-মুসলমানের ভেতর। লাগাল দাঙ্গা। যতই ঐক্যের বাণী শোনান তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি, সে কথা কারুরই কানে যায় না।

বেশ তো লেগে গেছে। ইংরেজ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

দিল বেটারা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে পেছন থেকে উস্কে হিন্দুর বিরুদ্ধে। ওদের নীতিই হ'ল-'হিন্দু মুসলমানকে এক জোটে কাজ করতে দেব না'।

কোথায় ভেসে চলে গেল দেশব্যাপী স্বদেশী সংগ্রাম। এখন হিন্দু-মুসলমান আপন আপন প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বাঙলার সব জায়গায় এ আগুন ছড়াতে পারেনি এই যা রক্ষে।

১৯০৫, ৭ই আগষ্ট।

ক'লকাতা টাউন হ'লে আহুত হ'ল এক বিরাট প্রতিবাদ সভা। বঙ্গভঙ্গ' রোধ করতেই হবে। কাতারে কাতারে লোক জমতে সুরু হ'রল। বাইরের বহু দরদী জমায়েত হ'লেন বাঙালীর সঙ্গে। কোথাও আর তিল ধারনের জায়গা থাকল না, এমন ভীড় টাউন হলে। অবশেষে হলের সামনেকার রাজপথও জন সমুদ্রের ধাক্কায় আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল। শুধু কেবল মাথা আর মাথা। ঢেউয়ের পর ঢেউ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হোতা। কাশিম-বাজারের মহাবাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি।

এই সভাতে চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' মাতৃমূর্ত্তি জেগে উঠল, বঙ্গজননীর তথা ভারত জননীব দশপ্রহরণধারিনী রূপ নিয়ে মানব হৃদয়ে।

সুরেন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে শাসালেন—"আমি এ বিধান বদ করবই বাঙলা ভাগ হতে দেব না কিছুতেই।"

সভায় রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

"বাংলার মাটি, বাংলাব জল, বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল।
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।......
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা সময়োপযোগী গানটি সভার সকলকে মুগ্ধ করল।

বড়-ছোট অনেকেই বক্তৃতা দিলেন।

এক বাক্যে ঘোষিত হ'ল—"ইংরেজদের বয়কট কর, স্বদেশী গ্রহণ কর"।

এই মহতী সভার পর সকলেই ভাবল নিশ্চয় কার্জনের মনে এবার

সুবুদ্ধির উদ্রেক হবে। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতিটি বাঙালী প্রতীক্ষা করতে লাগল, কার্জন কি করেন ?

ভবী ভুলবার নয়। আবেদন-নিবেদন, আস্ফালন-প্রতিবাদ, সমালোচনা, চোখরাঙানি কিছুতেই কিছু হ'ল না। কার্জন যা মনে মনে স্থির করেছেন, তা' তিনি করবেনই; পার্লামেন্টের কাছেও ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছেন। 'নগণ্য প্রজার চোখ রাঙানীতে ভয় পেলে রাজ্যশাসন করা চলে না'।

সেদিনকার সভাশেষে হাজার হাজার তরুণ, ছেলে-বুড়ো সকলেই হলুদ রংয়ের পাগড়ী মাথায়, বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে ক'লকাতার রাজপথে মিছিল ক'রে বেবিয়ে পড়লেন। পুরোভাগে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইংরেজের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় উদ্যত।

॥ পনের ॥

টাউন হলের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশ দেখে চন্দননগরের মতিলাল রায় ত্রবং তার বন্ধুদের বুকের তাজা রক্ত প্রবল উষ্ণতায় টগবগিয়ে ফুটে উঠল। উত্তেজনায় তারা চন্দননগরে ছুটে এসে কাজে নেমে পড়ল।

বেরিয়ে পড়ল ছেলের দল খোল করতাল নিয়ে সেই রাত্রিতেই। পথে পথে তারা গেয়ে চলল—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক···"আরও গাইল—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে-রে ভাই, দীন দুখিনী মা যে তোদের এর বেশী আর সাধ্য নাই··· ।" মাতৃবন্দনায় অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই সংকীর্ত্তনে যোগ দিল। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। কেউবা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সজল নয়নে উপলব্ধি করছে গানের সুমধুর কলিগুলোকে; কেউ বা আবার ছেলের দলকে উপহাস করছে।

মানুষের চরিত্র বোঝা ভার।

কানাইলাল আর নিজেকে ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখতে পারল না, ছুটে এসে মতিলালের গলা জড়িয়ে ধরল

এই চরম মুহূর্তে তার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হ'ল। এতাদন যে আগুন কানাইয়ের অন্তরে ধিকিধিকি জ্বলছিল, এখন তা লেলিহান শিখা বিস্তার করল।

কানাইলাল সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলল।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী'কে আশ্রয় ক'রে একদল তরুণ এই সময় চন্দননগরে 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' সংগঠন ক'রে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে ছিল; যার কর্মি ছিল সাগরকালী ঘোষ, সত্যচরণ কর্ম্মকার, ননীলাল দে আর যার হোতা ছিল মতিলাল।

শ্রীশচীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন দৃঢ়চেতা বন্ধুকে নিয়ে কানাইলাল দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যপথ ধরে, চারুচন্দ্র রায়কে গুরু করে।

এই শ্রীশ ঘোষের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এদের মধ্যে। সে ছিল বর্ণচোরা আম। গায়ের রং ও ছিল 'কালাপাহাড় আমের' মতই কাল—যা পাকলেও বাইরে থেকে বোঝার যো থাকে না। কাজও ছিল তার ঠিক সেই রকম 'অন্তর্মিষ্ঠ' সুচিন্তিত সুগঠিত। বহু অসম সাহসের কাজ সে সমাধান করেছে সুকৌশলে। সরকার তার বুদ্ধির কাছে কোন দিনই দাঁড়াতে পারেনি। গোয়েন্দার চোখে ধূলোদিয়ে সে অনায়াসে অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করেছে।

যুবশক্তির প্রলয়হুঙ্কার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। অনাশক্ত বীর্যবান তরুণের দল রুদ্র মূর্তি ধারণ করল।

'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' স্বদেশীর জোয়ারে কোথায় ভেসে গেল। কানাই আবেগে মতিলালের গলাটা আবার জরিয়ে ধরল। আত্মহারা হয়ে তার গালে একটা চুম্বন করল। যদিও মতিলাল বয়সে বেশ কিছু বড় ছিল কিন্তু হৃদ্যতার বন্ধন তাদের এমনি ভাবেই আকৃষ্ট করেছিল।

'স্বদেশ, মন্ত্রেনতুন সমিতি জন্মনিল চন্দননগরে।'

॥ ষোল ॥

ঐ ১৯০৫ এর ১লা সেপ্টেম্বরেই ধুরন্ধর প্রতিনিধি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন সিমলা শৈলশিখরে ব'সে সরকারী ফতোয়া জারি করলেন—'বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত।'

প্রথম খণ্ডে—ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগ আর তার সঙ্গে যুক্ত হবে আসাম, যা এতদিন চিফ কমিশনারের অধীনে আছে। এই কয়টি একত্রে হবে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর, ঢাকা রাজধানী থেকে।

অবশিষ্ট বাঙলার যেটুকু থাকল তা বিহার, উড়িষ্যার সঙ্গে একত্র হয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নামে অভিহিত হ'ল; রাজধানী ক'লকাতা। এখানেও একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর থাকবেন রাজকার্য পরিচালনার জন্যে।

পাকাপাকি ভাবে বাঙলা দু'ভাগ হয়ে গেল।

ভারতীয় সংবাদপত্র এই দুঃসংবাদ পৌঁছে দিল বাঙলার ঘরে ঘরে। খবরটা ঠিক শেলের মত এসে বিঁধল বাঙালীর বুকে।

২রা সেপ্টেম্বর বাঙালী, অশৌচের দিন হিসাবে পালন করল।

ভোর হতেই দলে দলে ক'লকাতাবাসী সকলে চলল নগ্নপদে গঙ্গাস্নানে। পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশিষ্টেরা নগ্নপদে। গঙ্গার পবিত্র বারি স্পর্শ ক'রে বাঙালী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল। সমবেত সকলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে একই সুরে, সুর মিলিয়ে গাইল—

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান"।

গঙ্গার স্নান সেরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল—

"বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।”

পুনরায় একত্রে ধ্বনি দিয়ে উঠল—

‘এক জাতি এক ভগবান্, এক দেশ এক মন প্রাণ।’

পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হ’তে থাকল—

বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

গর্জনে গর্জনে গঙ্গাবক্ষ প্রকম্পিত প্রতিধ্বনিত। বাতাসের ঢেউয়ে যেন তা উদ্ধত।

রক্তরাগে রাঙিয়ে নতুন সুতোর গুচ্ছ বেঁধে দিল একে অপরের হাতে। এই ‘রাখীবন্ধন’ হ’ল প্রতিটি বাঙালী তথা ভারতবাসীর একের সঙ্গে দ্বিতীয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন।

স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক’রে সরলাদেবী সূচনা করলেন রাখীবন্ধনের। এই উৎসবের পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকলেরই এক মন্ত্র। সকলেই এক সূত্রে বাঁধা।

লোহিত সূত্রের এই রাখী গ্রহণ, মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে বিপদ বরণের স্বীকৃতি।

কানাইলাল এবং মতিলাল সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে এসেছিল চন্দননগর থেকে, অশৌচের দিন পালন ক’রে এই পবিত্র বন্ধনে নিজেদের বাঁধতে।

২২শে সেপ্টেম্বর টাউন হলের আর এক মহতী সভায় কর্ম নির্দ্ধারিত হ’ল লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে। বাঙলার সর্ব্বত্রই প্রতিবাদ সভা আহূত হ’ল।

সভায় সভায়, বিলিতী বস্ত্রের বহ্নুৎসব সুরু হয়ে গেল।

বরিশালে বিরাট শোভা-যাত্রার আয়োজন করলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। পুরোভাগে চলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন

সুন্দর শোভাযাত্রা ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই প্রথম। দুঃখের বিষয়-পুলিস লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রীদের বেশী দূর অগ্রসর হ'তে দেয়নি।

এই মাসেরই ২৫শে, ক'লকাতা ময়দানে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদ সভায় সরকারী নীতিকে ধিক্কার দিতে থাকে। অনেক ছাত্রই স্কুল-কলেজ বয়কট করে সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থেকে একদল পুলিস লেলিয়ে দেওয়া হ'ল ছাত্রদের পেছনে। পুলিস নির্দয়ভাবে লাঠি চালিয়ে বহু ছাত্রকে গুরুতররূপে আহত ক'রে, তাদের স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। এরপর থেকেই জনসাধারণের ওপর সরকারী উৎপীড়ন সুরু হয়ে গেল।

এই প্রচণ্ড ভুলের মাশুল ইংরেজ শাসককে ভালভাবেই দিতে হয়েছিল উত্তর কালে। লাঠি চালানর ফল হয়েছিল উল্টো।

নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্রদের প্রতি নির্মম বর্ব্বরের ন্যায় পুলিসী অত্যাচারে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের লোকও অগ্নিমূর্তি ধারণ করল।

প্রতিটি স্তরের ভারতবাসী জেহাদ ঘোষণা করল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এরপর কোন আপোষই হ'তে পারে না ও জাতের সঙ্গে।

এদের মনে সাহস যোগাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন তখনকার রাজাপরিষদের মূর্ত্ত প্রতীক সুরেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, ভূপেন্দ্রনাথও এসে যোগ দিলেন। বিপিন পাল তো ছিলেনই।

কে বলে বাঙালী দুর্বল? ভগ্নচিত্ত? নিরুপায়? পরাধীন?

গুলীবিদ্ধ শার্দুলের ন্যায় বাঙালী জাতি প্রবল গর্জনে দশদিক প্রকম্পিত ক'রে তুলল। দিকে দিকে জনসভার মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠীকে হুঁসিয়ার করে দিল—'আমরা আর সহ্য করব না এই অত্যাচার, উপযুক্ত উত্তর আমরা দেবই। নিরস্ত্র বাঙালী আর নীরবে মার খাবে না। হাতে না পারি, ভাতে মারব। বেনিয়াদের ব্যবসা বন্ধ করব। ইংরেজের পেটে হাত পড়লেই বেশ বুঝতে পারবে বাঙালী

আর যথেচ্ছাচার সহ্য করবে না। বুঝিয়ে দেবে রাজশক্তিকে প্রজাশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় কি না! বিলিতী দ্রব্য আমরা আর কোনদিনই স্পর্শ করব না। স্বদেশীই আমাদের মূলমন্ত্র। স্বদেশী আমাদের ধ্যান, স্বদেশী আমাদের জ্ঞান, স্বদেশী আমাদের প্রাণ।'

ঢাকায় নেতৃত্ব দিলেন আনন্দ রায়। ফরিদপুরে অম্বিকা মজুমদার আর বরিশালে দিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাঙালীর কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে আসমুদ্র হিমাচল গর্জে উঠল 'বন্দেমাতরম্'।

মহালয়ার দিন অতি প্রত্যুষ থেকে দলে দলে পঞ্চাশ হাজারের ওপর ইতর ভদ্র এসে কালীঘাটের মা কালীর সামনে শপথ নিল—

"আমি আন্তরিকভাবে তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি মা! জীবনে আমি বিদেশীদ্রব্য স্পর্শ করব না। বিদেশী পণ্যশালা থেকে এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করব না যা ভারতীয় কারিগরের দ্বারা নির্মিত হ'তে পারে। যে কাজ ভারতবাসীর দ্বারা সম্ভব, এমন কোন কাজে কোন বিদেশীকে নিয়োগ করব না।"

জাগরণের নতুন প্রভাতে বিপ্লবের নবানুরাগ কানাইলাল এবং বেশ কিছু যুবকের অন্তঃরাজ্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করল। ক'লকাতা—চন্দননগর একই আলোর স্পর্শে রাঙা হয়ে উঠল।

স্বদেশীর বন্যা কলকাতাকে ভাসিয়ে দিয়ে চন্দননগরকে প্লাবিত করল।

কানাই ভাসল।

শুধু কি কানাই?

কানাইলালের সঙ্গে ভাসল মতিলাল, নরেন, সাগরকালী, ননীলাল, শ্রীশ ঘোষ, বিশ্বনাথ সিংহ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আর বিশ্বনাথ সরকার—ভেসেছিল আরও কত কে।

জাগরণের এই প্রবল বন্যায় বাঙলার দিকে দিকে কত শত ভাসল, হাবুডুবু খেল, উঠল। কেউ বা ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দূরে

পালাল। কতজন এর ধাক্কায় চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। যারা এই বন্যাতে বুক বেঁধে যুঝে চলল তারাই কূলে এসে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। কেউ বা বাঙলার বাইরে সরে গিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিল।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীদের ডেকে বললেন,—"আত্মশক্তির দ্বারা ভেতরের দিক্ থেকে দেশকে সৃষ্টি কর। কারণ, সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে, দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকে ব্যাপক ক'রে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি—আত্মার প্রকাশ।"

—কংগ্রেসকে কটাক্ষ ক'রে বললেন—"ইংরেজ রাজ,—সরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়। এই জন্যই বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে হারাই···দেশের সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এই জন্যেই দেশ আমার প্রিয় এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টি কার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কানাইলাল এবং তার সহকর্মীদেব অন্তরে বজ্রের মত গিয়ে আঘাত হানল। তার প্রতিটি সহকর্মী এই বাণীর পূর্ণ মর্যাদা দান করল।

দেশব্যাপী 'রাখীবন্ধন' উৎসব পালনের জন্যে ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ (বাঙলা ১৩১২ র ৩০শে আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার প্রকাশিত হ'ল।

এই ১৬ই অক্টোবর বাঙলাদেশ সরকারী ভাবে বিভক্ত হয়ে

যাওয়ায় বাঙালীরা অপমানিত হয়ে, সারা বাঙলাদেশ জুড়ে এই দিনটিতে অরন্ধন পালন করল। একটি লোকেরও বাড়িতে সেদিন হাঁড়ি উঠল না উনুনে।

রাখীবন্ধনের অর্থ বড় সুন্দর, উদ্দেশ্যও চমকপ্রদ—কোন সুতীক্ষ্ণ রাজতরবারি এই অচ্ছেদ্য বন্ধনকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না কোনদিনই।

বাঙলায় যখন পথে ঘাটে ভদ্র ঘরের নারীদের মুখ কেউ বড় একটা দেখতে পেত না, সেই আবরুআনার নাগ-পাশকে ছিন্ন ক'রে আজকের এই পবিত্র ৩০শে আশ্বিনকে সর্বতভাবে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে মুর্শিদাবাদের মা-বোন-কুলবধূরা একজোটে অন্দরমহলের অবগুণ্ঠনকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথম বাইরে বেরিয়ে এলেন এই ব্রত উদ্‌যাপনে। দলে দলে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। পাঁচ শ'র ও ওপর ভদ্রপরিবারের মা-মেয়েরা এসে জড় হ'লেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাসভবনে।

পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন তাঁবা, মনোনিবেশ সহকারে। সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনলেন, রামেন্দ্রসুন্দর রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' তাঁরই মুখ থেকে। পালন করলেন, এই দিনটিতে অরন্ধন এবং জনে জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, স্বদেশী গ্রহণে—বিশেষ করে বিলিতী বস্ত্র বর্জনে। এঁরাই, মুর্শিদাবাদের (কান্দীর) মা বোনেরা চোখ খুলে দিলেন সমগ্র বাঙলার স্ত্রীজাতির।

এরপর ক'লকাতা এবং বাঙলার বিভিন্ন জেলার নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমবেত হয়ে স্বদেশী ব্রত পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। বিদেশী দ্রব্য-বিশেষ করে ইংরেজের তৈরী প্রতিটি বস্ত্র বর্জনের জন্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। 'বঙ্গ-ভঙ্গই' নারীজাগরণের একটা বিশেষ দিক বলা যেতে পারে। বাঙলার বাইরেও এর প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল। দেখতে দেখতে চারদিকে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়ে গেল।

প্রবল উদ্দীপনা ও উত্তেজনার মধ্যে এই পবিত্র দিনটি পালিত হ'ল ক'লকাতাতে। পূর্ণ হরতাল পালিত হ'ল দিনটিতে। দিগন্ত প্রসারী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ইংরেজ শাসকের কানে তালা ধরিয়ে দিল।

দলে দলে নগরবাসী সেদিনও গঙ্গাস্নানান্তে পবিত্র মনে 'রাখী বন্ধন' দ্বারা একে অপরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রন্থি যুক্ত করল।

সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে দুই মাইল প্রসারী অনূ্যন পঞ্চাশ হাজার শোভাযাত্রা নগ্নপদে ক'লকাতার বিশেষ বিশেষ রাজপথ পরিক্রমা শেষে এক মহতী সভায় এসে যোগদান করল। এই সভাতেও সকলে বিদেশী বর্জন আর স্বদেশী গ্রহণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হ'ল। জীবনের বিনিময়ে এই ব্রত উৎযাপনে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

স্বদেশী বিপ্লবের পুষ্টিসাধনে এই সভাতেই সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হ'ল।

প্রথমে যদিও সভার সকলের উদ্দেশ্য ছিল না বিদেশী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এই দুটিকেই উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে বেছে নিতে হ'ল সকলকে এক জোটে।

বিদেশী বর্জন দেখতে দেখতে এমনই অলৌকিক শক্তিতে এগিয়ে চলল যা দেখে ইংরেজ বাহাদুরের হৃতকম্প উপস্থিত হ'ল।

ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র ব্যবসা বাঙলার বাজারে প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ১৯০৪ সালে সেপ্টেম্বরের ৭৭,০০০্ টাকার বিক্রী, ১৯০৫ এর সেপ্টেম্বরে নেমে এসে দাঁড়াল ১০,০০০্ টাকায়।

মাড়োয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স, ম্যানচেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের কাছে এই ভীতিপ্রদ খবর পাঠাল।

ষ্টেটস্ম্যানের কাছে সঠিক খবর জানতে চাওয়া হ'ল। ষ্টেটস্ম্যান জানাল, বাঙলাদেশের মাত্র আটটি জেলা মিলিয়ে এই ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। সব একত্র করলে কি দাঁড়াবে বলা কঠিন।

॥ সতের ॥

রাখীবন্ধনের ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল এবং তার সহকর্মীদের উদ্যোগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চন্দননগরে এক প্রতিবাদ অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে পালিত হ'ল। কর্ম্মসূচী দেশব্যাপী সুষ্ঠভাবে পালনের জন্যে কানাইলালের অদম্য প্রচেষ্টা চন্দননগরকে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করল। অতি প্রত্যূষে ছেলে বুড়োর দল নগ্নপদে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। সামনের সারিতে কানাইলাল, মতিলাল আর তাদের সহকর্ম্মীরা। নগর পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান শেষ ক'রে দ্বৈতকণ্ঠে সেই মন মাতান গান সুরু করল শোভাযাত্রীরা—

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন

......এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

গান শেষে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—

এক জাতি—এক ভগবান, এক দেশ—এক মনপ্রাণ।

বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে 'রাখীবন্ধন' পর্ব্ব শেষ হ'ল।

কানাইলাল, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, বিশ্বনাথ সিং, নগেন ঘোষ, বিশ্বনাথ সরকার, ননীলাল, সাগরকালী প্রভৃতি একশ' দেশভক্ত দিনান্তে সামান্য কিছু ফল খেয়ে থেকে এই পবিত্র দিনের মর্য্যাদা রক্ষা করল।

এই সময় কীর্ত্তন ক'রে নগর প্রদক্ষিণের সময় মতিলাল এবং শ্রীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর আগে মতিলাল এবং শ্রীশের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না।

সন্ধ্যের পর জনসভায় স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন সম্বন্ধে কয়েকজন বক্তা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন।

কানাইলাল স্বচ্ছ সরল ভাষায় অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়ে দিল, "স্বদেশী আমাদের বাঁচবার একমাত্র পথ। ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোষ নেই। ও জাতকে ভাতে না মারলে সায়েস্তা হবে না। এ সংগ্রামের জন্যে প্রাণ দিতে হয় তাও স্বীকার। বাঙালী যে কী, আমরা তা কার্জনকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।"

যে শান্তশিষ্ট ছেলেটির মুখ থেকে কেউ কোনদিন উঁচু গলায় কথা শোনেনি তার কণ্ঠে একি অগ্নিময়ী ভাষা? সভার সকলে স্তম্ভিত।

শরীর চর্চ্চার সঙ্গে কানাই স্বদেশী যুগের খবরের কাগজগুলো মন দিয়ে পড়ে। এর মধ্যে বাছাই করা কয়েকখানার সে বেশ ভক্ত— 'সন্ধ্যা', বঙ্গদর্শন', 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', 'ডন', বিপিন পালের 'নিউইণ্ডিয়া' প্রভৃতির। নতুন কোন পত্রিকা বেরুলেই কানাই সেখানি জোগাড় ক'রে আনে।

এইসব লেখা নিয়ে মনের মত সহপাঠী ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে কোথা দিয়ে যে দিনরাত কেটে যায় সিদ্ধান্তে না পৌঁছান পর্য্যন্ত, আর খেয়াল থাকে না।

দেশের চিন্তায় কানাইলালের রাত্রিতে ঘুম নেই। মুক্তিপথের সন্ধান সে করতে থাকে গোপনে। কার সহযোগিতায়, কি উপায়ে এই দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করা যায় অহর্নিশি এই চিন্তা তাকে ঘিরে থাকে। মাঝে মাঝে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লম্বা ছিপ্ ছিপে দেহে মাথার লম্বা চুলগুলো তখন তার খাড়া হয়ে ওঠে। বড় বড় চোখ দুটোতে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। চোখের মোটা কাঁচের চশমাখানা খুলে সে, বারবার মুছতে থাকে; সবই যেন তার চোখে ঘোলাটে হয়ে যায়। উন্নত গ্রীবার শিরা উপশিরাগুলো যেন চামড়ার ভেতর থেকে ফেটে বেরোতে চায়। এই উত্তেজনা প্রশমনে মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, চোখে জলের ঝাপটা দিয়েও সে, নিজেকে সামলাতে পারে না।

মুক্তির সন্ধানে সে ঘোরে ফেরে। কোথায় গেলে প্রশ্নের জবাব

সঠিক মিলবে? পৃথিবীতে এসে পঙ্গু বাঙালীর ভূমিকা নিয়ে জীবনটাকে জিইয়ে রাখা বৃথা। এমন একটা কাজ তাকে করতে হবে যাতে সে, স্বদেশের কিছুটা কাজে লাগে। এই মহাযজ্ঞে সে তো কবেই নিজেকে উৎসর্গ করবে বলে স্থির করছে কিন্তু কোথায় বাধা তার? সে বড্ড চাপা। বাইরে শান্ত শিষ্ঠ। মনের অভিপ্রায় সে এখনও কাউকে জানায়নি।

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অকুতোভয়, নিরহঙ্কার দুষ্টদমনে সিদ্ধহস্ত কনাইলাল, দেশের সামান্য কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে।

একদিন সত্য সত্যই সকল বাঁধন ছিন্ন ক'রে কানাইলাল ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই কাজে।

দেশের লোকও এখন অনেকটা সংঘবদ্ধ। ১৯০৫এ বার্ণ কোম্পানীতে ষ্ট্রাইক হ'ল। ভারতীয় কর্ম্মচারীরা এক জোটে বাইরে বেরিয়ে এল। সাহেবদের গোলামী ছাড়তে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ছা-পোষা কর্ম্মীরা অন্নকষ্টে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

চারুবাবু ডাকলেন কানাইকে।—"সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে না উঠলে লোকগুলো তো খেতে না পেয়ে মারা যায়। ব্যবস্থা কি করেছ?"

গুরুজীর হুকুম। কানাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে লেগে গেল অর্থ-সংগ্রহে।

অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তারা ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিল।

পরেই এল চন্দননগরে স্বদেশী সভার অধিবেশন। কানাইলালের সক্রিয় ভূমিকা সকলকেই মুগ্ধ করল। পাল-পার্বনে, খেলার মাঠে, গঙ্গাপুজোর ভীড়ে যেখানেই বহু লোকের সমাগম, সেইখানেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে কানাই সাহায্য দিতে এগিয়ে গেছে।

সেবার ম্যালেরিয়া জ্বর কানাইকে বেশ কাবু করে দিয়েছে। রোজই ১০৫° জ্বর উঠছে। ভীষণ আগুন লাগল চন্দননগরে একটা

পাড়ায়। যেই সে কথা কানাইয়ের কানে পৌঁছেছে, কোথায় গেল তার জ্বর, ঐ অবস্থায় তেড়ে ফুঁড়ে গিয়ে খড়ের চালের ওপর উঠে, কলসী কলসী জল ঢালতে লেগে পড়ল আগুনের মধ্যে। আগুন আয়ত্বে এলে, সে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নেতিয়ে পড়ল।

জ্বরটা একটু বাগে আসতেই সুরু ক'রে দিল বিদেশী বর্জ্জনের সংগ্রাম। মতিলাল, কানাইলাল, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ, সাগরকালী প্রভৃতি দলবল নিয়ে দোকানে দোকানে আরম্ভ করল পিকেটিং। কার সাধ্য এক টুকরো বিলিতী জিনিষ কেনে *।

*বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বাঙলার দিকে দিকে আনুমানিক তিন হাজার জনসভা হয়ে গেল প্রতিবাদ জানিয়ে, যার প্রতিটি সভায় পাঁচশ' থেকে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। এটা কম বড় কথা নয়।

॥ আঠার ॥

এই বিপ্লব-যজ্ঞের চিতাবহ্নিতে মতিলাল অনেকই ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। কর্ম্মযজ্ঞে ইনি কানাইলালের দোসর। একটি মহৎ প্রাণ। বিহারীলাল রায়ের পুত্র মতিলাল—সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

জন্ম—বেড়াই চণ্ডীতলা, চন্দননগরে, ১২৮৮ সালের ২২শে পৌষ, শুক্রবার (ইং ৬ই জানুয়ারী ১৮৮২)।

জাতিতে—চৌহান বংশীয় ছেত্রী রাজপুত।

এঁর পিতামহ গোলকনাথ, উত্তর প্রদেশের মৈনপুর জেলা থেকে চন্দননগরে এসে বসবাস শুরু করেন।

তৃতীয় পুরুষে মতিলাল রায় খাঁটি বাঙালী বনে গেছে।

কে এখন বুঝবে সে উত্তর প্রদেশের ছেলে। বাঙলা দেশকে যে, সে এখন, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতে শিখেছে। এখানকার পুর' নাগরিক সে তাই।

আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তায় সে পুরোদস্তুর বাঙালী।

বাঙলা মায়ের শৃঙ্খল মোচনে সে ই তো কত তরুণ বাঙালীকে টেনে নামিয়েছে দেশের এবং দশের কাজে।

কানাইলালের কলেজ জীবনের সুরু থেকেই মতিলাল তার ছায়া-সঙ্গী। এগিয়ে যেতে যেতে এই কাণ্ডে আমরা এঁর অনেক কিছুই পরিচয় পাব।

কর্ম্মজীবন বহুল গুণপণায় বিস্তৃত মতিলালের*।

---

* বিপ্লবী জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে মতিলাল ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীঅরবিন্দের আদেশে যৌবনকাল থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন সুরু করেন। পরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দননগরে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনে অগ্রণী হন এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য নানা সংপ্রতিষ্ঠান গড়ে

তোলেন। চরকায় সুতাকাটা, কলের সুতোর বস্ত্র-দেশী সুতোয় কাপড়-চোপড় এবং স্বদেশী শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেশের স্ত্রী পুরুষকে নিয়োগ করে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মহাত্মা গান্ধীর বাঙলাদেশে চরকা যজ্ঞের প্রবর্ত্তনের অনেক আগে থেকেই মতিলাল চন্দননগরে চরকায় সুতা' কেটে, এই দিয়ে তাঁতে বস্ত্র বয়ন সুরু করে দেন। এছাড়া স্থানীয় গরীব-দুঃখী ছেলে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন ও নতুন শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন।

মতিলালের ঐকান্তিক চেষ্টায় বেড়াই-চণ্ডীতলায় নিজবাটির সন্নিকট গঙ্গা পার্শ্বে অনেকখানি জমির ওপর 'প্রবর্ত্তক মন্দির' গড়ে ওঠে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনেকগুলি শাখা লোক শিক্ষার জন্যে ধীরে ধীরে ভারতের নানাস্থানে আত্ম-প্রকাশ করে।

এই ভগবৎ-বিশ্বাসী একনিষ্ঠ যোগী পুরুষ উত্তরকালে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের 'সঙ্ঘগুরু' আখ্যালাভ করেন এবং এঁর সহধর্মিনী রাধারাণী 'সঙ্ঘজননী' নামে ভক্তদের দ্বারা আখ্যায়িতা ও পুজিতা হন।

পুলিশের ডি. এস. পি. শামসুল আলমকে হত্যার মাত্র তিনদিন আগে ১৯১০-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় অবস্থানকালে ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে গোপনে খবর পেলেন তিনি গ্রেপ্তার হতে চলেছেন, এখবরের পরে তিনি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—"I was at the Karmoyojagin offiice and we came to know about the search that was going to be made evidently with the object of arresting me. There were some people there and Ram Chandra Majumdar was there preparing to give fight to the Police and so many ideas were flying about when suddenly I heard a voice from above-saying. "No, go to Chandernagore." এই দৈববাণী অরবিন্দের কানে আসা মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে বাগবাজারের ঘাট থেকে তাঁর নৌকা পাল তুলে দিল গঙ্গার বুকের ওপর চন্দননগরের উদ্দেশ্যে। নৌকা এসে ফরাসী উপনিবেশের ঘাটে ভিড়ল। আত্মগোপন করে থাকার জন্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের আশ্রয়প্রার্থী হলেন কর্মযোগী অরবিন্দ। তিনি এখানে আর কাউকে তো চেনেন না। পুলিস আজও তাঁর পেছু ছাড়েনি জেনে

চারুবাবু তাঁকে আশ্রয় দিতে দ্বিধাবোধ করলেন। যদিও তখন মতিলালের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন পরিচয় ছিল না তথাপি এই মতিলালই ছুটে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে, নৌক থেকে স্বাদর আহ্বান জানিয়ে অরবিন্দকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। স্বদেশীতে লিপ্ত থাকায় মতিলাল তখন তাঁর বহির্বাটিতে স্বস্ত্রীক নির্বাসিত। আগন্তুককে চুপি চুপি নিয়ে গিয়ে তুললেন, বহির্বাটির সেই একটি কক্ষে যেটি সচরাচর খোলা হত না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনাব উল্লেখ করছি যা আমি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেব সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণ দত্ত মশায়েব মুখে শুনেছি। ঘটনাটি এইরূপ—সঙ্ঘজননী সেই সময় প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে বহির্বাটি প্রক্ষালন করতেন ছোট একখানি শাড়ী প'রে। প্রত্যহ সকালে, উঠানে খাবাবেব ঠোঙা প'ড়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁর স্বামীকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করতেন। সঠিক জবাব পেতেন না। এর পরে একদিন ঝাঁট দেওয়াব সময় তিনি ভাবলেন, বাহিব থেকে শিকল দেওয়া ঘরটি অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি, ঐ কাবণে যেই তিনি ঝাঁটা হাতে দরজার শিখল খুলে ঘবেব ভেতরে পা বাড়িয়েছেন, দেখেন, মাথায় ঘাড় অব্দি লম্বালম্বা চুল, গুম্ফ-শ্মশ্রু সমন্বিত এক যুবা পুরুষ যোগাসনে বসে ধ্যান নিমগ্ন। সচকিত অবস্থায় তিনি দ্রুত দবজাটি বাহিব থেকে টেনে দিয়ে, সবে এসে স্বামীর কাছে প্রশ্ন রাখলেন। জবাব পেলেন। এই ঘটনাব পব, সংসার থেকে দুবেলা নিজেদেব দুজনের যে আহাব মিলত, তা সেই যোগীপুরুষের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া সুরু হ'ল, মার্চ্চ মাসেব শেষ পর্যান্ত, অবশিষ্ট যে দিনকটি শ্রীঅববিন্দ তাঁদের আশ্রয়ে ছিলেন।

পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ মতিলালেব সঙ্গে ববাবব যোগাযোগ রক্ষে করে চলেছিলেন। চিঠির ভাষাতে 'তন্ত্র' কথাটি থাকলে Revolution-এর 'বেদান্ত' কথাটি থাকলে ধরে নিতেন আসলটি কি, যাতে পুলিশেব হাতে চিঠি গিয়ে পড়লেও তারা কিছু বুঝতে না পাবে এই কাবণে। পত্রে এই সাংকেতিক কথা দুটি ব্যবহার কবতে অববিন্দই মতিলালকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আর একটি বিশেষ ঘটনা যা শুনেছি—কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ তখন মতিলালকে ধববার জন্যে ব্যস্ত। বিপ্লবীদের খাতায় তখনও মতিলালের নাম। ১৯১২ সালেব অনেক পরে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে মতিলালকে চন্দননগব থেকে ডেকে পাঠালেন। মতিলাল এসেছেন। গান্ধীজীর নিকট তখন পুলিশের

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে 'স্বদেশী মণ্ডলী' জন্ম নিয়েছে জেনে, বরোদা থেকে অরবিন্দ বিপিন পালের কাছে পুস্তিকাকারে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। এই পুস্তিকাতে তাঁর নাম ছিল না। (No Compromise) 'নো কম্‌প্রোমাইজ' প'ড়ে সুরেন্দ্রনাথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চমকে উঠলেন।'

এই সময়ে বাঙলার দিকে দিকে স্বদেশী ডাকাতিও সুরু হয়ে গেছে।

বড় কর্তা উপস্থিত। মহাত্মাজীর প্রশ্নের জবাবে এবং তিনি তাঁকে বিপ্লব থেকে সরে আসতে বলায়, মতিলাল বলেছিলেন "আমি এখন বিপ্লবীদের মধ্যে নেই, বর্ত্তমানে ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেছি, ভবিষ্যতে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেব কিনা তা এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।"

পুলিশ অবিশ্যি এরপর গান্ধীজীর কথাতেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক মতিলালকে গ্রেপ্তারের প্রয়াস ত্যাগ করে।

গান্ধীজী মতিলালকে, চন্দননগরবাসীর চরকা গ্রহণের কথা বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, তা বহুপূর্ব থেকেই চন্দননগরে সরু হয়েছে। মহাত্মাগান্ধীকে আহ্বান জানিয়ে সেখানে নিজ বাটিতে নিয়ে যান (২২শে বৈশাখ ১৩৩২ মঙ্গলবার, ইং ৫ই মে ১৯২৫ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে) এবং তিনি তাঁর গড়ে তোলা স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ও খদ্দরের প্রচার কার্য্য দেখান। এইরূপ নানান ঘটনা, সদালাপি শ্রদ্ধেয় অরুণদার মুখে আমি শুনেছি।

॥ উনিশ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাতীয়তাবাদী নেতারা বাঙলা দেশে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ'ড়ে তুলবার চিন্তা করছিলেন। আচার্য্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষা পরিষদকে রূপায়িত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম সুরু করলেন।

১৯০২ সালে 'ডন' সোসাইটি সৃষ্টি ক'রে 'ডন পত্রিকা'র মাধ্যমে পরাধীন জাতির মনের ভেতর এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করেছিলেন সতীশচন্দ্র।

সতীশচন্দ্রেব চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত।

তিনি চিন্তা করলেন, জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্যে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন—সুশিক্ষা, প্রয়োজন—নিজেকে চিনতে শেখা, স্বজাতিকে জানা, নিজের দেশকে ভালবাসা, জাতির ঐতিহ্য বজায় রাখা, জাতির স্বার্থ চিন্তা, জাতির শিক্ষার মূল্যায়ণ করা।

আচার্য্যের যুক্তিতে প্রভাবান্বিত হ'য়ে নেতৃস্থানীয় অনেকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন এঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে।

এই সময় দেশের রাজনৈতিক চেতনা বেশ খানিকটা দানা বেঁধে উঠেছে।

সতীশচন্দ্র নেতাদের বুঝিয়ে দিলেন, জাতির বনেদ শক্ত করতে প্রয়োজন হবে, তরুণদের জাতীয় শিক্ষা পর্ষদে শিক্ষা দান করা এবং সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে 'ন্যাশনাল কাউনসিল অব এডুকেশন।'

দেশে ইংরিজী শিক্ষার বাহকরাই এই সময়ে এমনই একটি শিক্ষা কেন্দ্রের আশু প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন।

অনতিবিলম্বে আলোচনা সভা আহুত হ'ল।

রথী মহারথীরা সকলেই এলেন। সভা বসল পার্ক স্ট্রীটে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স য়্যাসোসিয়েসনের কার্য্যালয়ে ১৯০৫ এর ১৬ই ডিসেম্বর। অনেক বিতর্কের পর জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পে একটি কমিটি তৈরী হ'ল।

প্রথম কমিটিতে এলেন—স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। স্যার তারকনাথ পালিত, ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিন চন্দ্র পাল, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস আর 'মিরার'—সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন।

এঁরা সকলেই এর প্রয়োজনীয়তা বুঝে কেউ আর না করলেন না।

ঠিক পর দিনই পান্তীর মাঠে প্রায় পনের হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ'ল।

ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর অবদানও এতে বড় কম ছিল না।

প্রথম পদক্ষেপে অর্থাভাবে পরিষদের কাজ সুরু হ'তে যাতে বিলম্ব না হয় এই বিবেচনা ক'রে সুবোধ মল্লিক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি এক লক্ষ টাকা দিচ্ছি। আর দেরী নয়। কাজ আরম্ভ ক'রে দেওয়া হোক।"

সুবোধ মল্লিকের প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করলেন ও বিশেষ উৎসাহিত হলেন। বিনা দ্বিধায় স্বদেশের জন্যে একলক্ষ টাকা এক কথায় বার করে দেওয়া যার তার কাজ নয়; বাঙালীরও এই প্রথম। সুবোধ মল্লিকের দরাজ মনের প্রসারতা দেখে বাঙালীরা তাঁকে 'রাজা সুবোধ মল্লিক' আখ্যা দিয়ে, রাজা বলেই ডাকতে সুরু করলেন।

পটলডাঙ্গার মল্লিক পরিবারে সুবোধ মল্লিকের জন্ম। ব্যারীষ্টারী পড়তে প্রথম জীবনে কেমব্রিজে যান। পড়া শেষ হওয়ার আগেই পারিবারিক ব্যাপারে দেশে ফিরে এলেন এবং ১৯০১ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (এখন যা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)।

এই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলনের ঘাঁটি।

॥ কুড়ি ॥

জাতিকে 'অগ্নি ও রক্ত স্নানে' বিশুদ্ধ করবার ব্রত নিয়ে অরবিন্দ বাঙলা মায়ের চরণে আত্মোৎসর্গ করলেন। আর বরোদায় যোগ সাধনা নয়! প্রতি হিংসায় দগ্ধ চিত্ত। মা ভবানীর চরণে দেহ মন সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে 'অগ্নি ও রক্তের' তিলক এঁকে দিলেন বাঙলার তরুণ ভালে এই মহাপুরুষ।

১৯০৬ এর এপ্রিলে স্থায়ীভাবে ফিরে এলেন বাঙলা দেশে শ্রীঅরবিন্দ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদে যোগ দেওয়ার জন্যে আগেই তাঁব কাছে আহ্বান গিয়েছিল বরোদায়।

অরবিন্দ এসে উঠলেন সুবোধ মল্লিকেব বাড়িতে। বেশ কিছুদিন কাটালেন এই বাড়িতে সুবোধ মল্লিকের অতিথি হয়ে।

তিনি বাঙলায় ফিরেছেন জেনে নেতারা সকলেই এসে জড়ো হলেন তাঁর কাছে। ঘণ্টাব পর ঘণ্টা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন; যা হয় কিছু একটা করতেই হবে। ইংবেজদের আর বাড়তে দিলে চলবে না!

অরবিন্দ তো তাই এবার পাকাপাকি ভাবেই ক'লকাতায় এসেছেন তাঁর ঐ ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে, 'জাতিকে অগ্নি ও রক্ত স্নানে পরিশুদ্ধ করতে হবে'।

তাঁর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে 'সন্ধ্যা' অভিনন্দন জানাল।

বরোদা থেকে রওনা হওয়ার সামান্য কদিন আগে অরবিন্দ বাঙলার বিপ্লবীদের, মৃত্যু ভয়হীন ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে 'ভবানী মন্দির' নামে ইংরিজিতে ষোল পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা রচনা করে বারীন্দ্রকে দিয়ে কলকাতায় : পাঠিয়ে দিলেন।—সঙ্গে সঙ্গে তার

বঙ্গানুবাদও হয়ে গেল।

'ভবানী মন্দির' কী? তার নিগূঢ় উদ্দেশ্যই বা কী?

অগ্নিহোত্রীরা সকলেই তা বুঝে ফেলল। 'উপলব্ধি করল।'

শুধু কি এর উদ্দেশ্য বিপ্লবী দুর্গ নির্ম্মাণ?

তাতো নয়! মা যে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিতা হ'তে চাইছেন!

কোথায় এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হবে? কোথায় মা ভবানীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে? সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরলেন অরবিন্দ—বারীন্দ্রও ঘুরলেন ঐ একই খোঁজে। মা'র মন্দির কোথায় গ'ড়ে উঠবে সেই চিন্তা।

—ভারতবর্ষের কোন এক দুর্ভেদ্য মনোরম স্থানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পবিকল্পনা ১৯০৬ সালেব প্রথম দিকেই অরবিন্দ স্থির করে ফেলেছেন।

অরবিন্দ ছিলেন একেশ্বরবাদী।

তিনি হিন্দুব বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

একবার এমনই এক ব্যাপার ঘ'টে গেল, কালীমন্দিরে যেমনই তিনি প্রবেশ করেছেন, দেখলেন বিগ্রহের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন জীবন্ত কালীর মাতৃকা মূর্ত্তি।

......একি? মা যে জীবন্ত মূর্ত্তিতেই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করছেন!

অরবিন্দ বিস্মিত, চমৎকৃত ও সম্মোহিত হয়ে পড়লেন।

এই মাতৃ দর্শন অরবিন্দের জীবনে গভীর প্রেরনা এবং গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। মা ভবানীকে প্রতিষ্ঠা কবতে তাইতো তিনি এত ব্যস্ত!

মা ভবানীর কাছ থেকে অরবিন্দ কি চান তা মনের আবেগে লিপিবদ্ধ করলেন। ব্যক্ত করলেন মাতৃবন্দনায়।

'ভবানী মন্দির' পুস্তিকাটি আরম্ভ হয়েছে সুন্দর এই মাতৃ স্তোত্র দিয়েঃ

"মাতঃ দুর্গে! সিংহ বাহিনি সর্ব্বশক্তি দায়িনি মাতঃ শিব—প্রিয়ে! তোমার শক্ত্যাংশ জাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি,—শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানব শরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমাব আনন্দ ধামে ফিরিয়া যাই। এইবার ও জন্মিয়া তোমারই কার্যে ব্রতী আমরা, শুন মাতঃ উর বঙ্গদেশে সহায় হও॥

মাতঃ দুর্গে! সিংহ বাহিনী, ত্রিশূল ধারিনি, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর শরীরে মাতঃ জয় দায়িনী! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন, মাতঃ উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেম দায়িনি, জ্ঞান দায়িনি শক্তি স্বরূপিনি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিনি! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরেব শক্তি, অসুবের উদ্যম, দাও মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবেব চবিত্র, দেবেব জ্ঞান॥

মাতঃ দুর্গে! জগৎ শ্রেষ্ঠ ভারত জাতি নিবিড় তিমিবে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি মাতঃ গগণ প্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শবীরের তিমির বিনাশী আভায় উষার .প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ তিমিব বিনাশ কর॥

মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সর্ব্ব সৌন্দর্য্য—অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেমশক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমাব বিভূতি, এতদিন শক্তি সংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভাব স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে। এস মাতঃ, প্রকাশ হও॥

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে মহৎ কার্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা,

'বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥

মাতঃ দুর্গে! কালী রূপিণি, নৃমুণ্ড মালিনি দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুর বিনাশিনি! ক্রুর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে. বিমল নির্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা মাতঃ, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদার চেতা কর, সত্য সঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই ॥

মাতঃ দুর্গে! যোগ শক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য-সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তি শ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতি নাশিনি জগদম্বে,প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধা বিঘ্ন নির্ম্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, গগণে সহচর পর্ব্বত তলে পূত সলিলা নদী তীরে, একতার প্রেমে, সত্যে শক্তিতে, শিল্পে সাহিত্যে, বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগ বলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব অশুভ-বিনাশী, তরবারী তব অজ্ঞান বিনাশী, প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারী ঘুরাও, জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও ॥

বীরমার্গ প্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্বকার্য অবিরত পবিত্র

প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবা ব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ! উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও॥”

এর পরেও কি বাঙালী ঘুমিয়ে থাকবে?

না তা হতেই পারে না! মায়ের আরতির পঞ্চ প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনি যে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বাঙালীর ভীরুতা, জড়তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মহা বিপ্লবীকে অনুসরণ করল অনেকেই।

আবেগ ভরে বিপিন পাল ‘সন্ধ্যা’তে অরবিন্দকে “বাঙলার পথিকৃৎ” বলে আখ্যায়িত করলেন।

অরবিন্দকে সম্বোধন ক’রে উপাধ্যায় বললেন,—“অমল—শুভ্র অরবিন্দ দেখিয়াছ কি? ভারত মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল! আমাদের এই অরবিন্দ জগৎ-দুর্লভ। হিমশুভ্র বর্ণে সাত্ত্বিকতার দিব্যশ্রী। বৃহৎ ও মহৎ।...এমন বজ্রের মতো বহ্নিগর্ভ, কমল-পর্ণের ন্যায় ক্লান্ত-পেলব এ হেন জ্ঞানাঢ্য, এমন ধ্যান-সমাহিত মানুষ তোমরা ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাইবে না। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইনি ফিরিঙ্গী-সভ্যতার মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াছেন। ইহলোকের সুখ-সাধ বিসর্জ্জন দিয়া মায়ের ছেলে অরবিন্দ ‘বন্দেমাতরমের’ মহা সাধক হইয়াছেন। ইনি ঋষি বঙ্কিমের ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ স্বামী।...”

বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন—“শ্রীঅরবিন্দ দৃঢ়নিষ্ঠ সাধনার দ্বারা নীরবে আধ্যাত্ম শক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কখনো সাময়িক জয়গানের চাপে পথ ভ্রষ্ট হন নাই। শ্রীঅরবিন্দকে তখন যে দেখিল সেই বুঝিল যে, ইনি ভগবত প্রেরিত, ভগবানের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে বুঝিলাম যে, বহুকাল ধরিয়া বাঙলা দেশ যে নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এতদিনে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের অদেয় কিছু নাই। তাঁহার

-হস্তে বাঙলা তথা ভারতের সম্মান ও স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে।

'ভবানী মন্দিরের' ভবানন্দ তাঁর মর্ম্মবাণী এই পুস্তিকাতে পরিষ্কার ভাবে ব্যাক্ত করেছেন।

এ যে সত্যই এক অভিনব প্রণালী"।

বাঙলার যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল আত্মশুদ্ধির।

মা ভবানীর পূজারী হওয়া কি যার তার কাজ? এ যে বড় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য।—সন্ত্রাসবাদী ব্রহ্মচারীকে মা ভবানীর চরণপদ্মে আত্মাহূতির দীক্ষা নিতে হবে। তবেই হবে তার 'অগ্নি ও রক্তস্নান' শুদ্ধি। প্রতিটি ব্রহ্মচারীকে অর্জ্জন করতে হবে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি এবং সর্ব্বোপরি- অন্তঃহীন ও অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক শক্তি। মাতৃভূমির অঙ্গস্বরূপা যে মহিষমর্দিনী মা ভবানী সর্ব্বযজ্ঞে বিরাজিতা। সেই ভয়ঙ্করী মায়ের চরণপদ্ম ধুইয়ে দিতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে ব্রহ্মচারীকে।

মা ছিন্নমস্তা জাগলেই, সন্তানের মনমন্দিরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির আবির্ভাব ঘটবে।

মহানায়ককে সন্তুষ্ট করতে পারলেই মা নিজ হস্তে ধরিয়ে দেবেন সেই সর্ব্বজয়া খড়্গ সন্তানের হাতে।

ভারতমাতার মুখে হাসি ফুটোতে পারলেই ব্রহ্মচারীর জীবন সার্থক হবে। আত্ম নিবেদনে সেই মহাশক্তি অর্জিত হবে। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান, ধারণা, পরিকল্পনা।

অন্তঃমন্ত্রের সাধনা ভিন্ন উত্থানের পথ নেই। নির্বীর্যের স্বাধীনতা লাভ হয় না; স্বামীজী এবং অরবিন্দের একই মনস্তত্ব।

বাঙলার তরুণ দল ছুটে চলল বন্ধুর পথ পরিক্রমা ক'রে ভবানী মন্দিরের সন্ধানে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই সে, মন্দির দোর খোলা পাবে!

বরোদা কলেজের ৭৫০্ টাকা মাসিক বেতনের সহকারী অধ্যক্ষের

পদে ইস্তফা দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বাঙলায় ফিরে যেতে চান, গাইকোয়াড়ের হাতে পদত্যাগ পত্র পৌঁছুতেই তিনি যেন বজ্রাহত হলেন। অরবিন্দই যে, বরোদা রাজ্যের অর্দ্ধেক গৌরব! অধ্যাপনা ছাড়াও রাজকার্য্যে আছে তাঁর প্রচুর সহায়তা। এই অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাতে হচ্ছে!

গাইকোয়াড় অরবিন্দের হাত দুটো চেপে ধরে বললেন—আপনাকে আমি কলেজের অধ্যক্ষ করে দিচ্ছি, মাইনেও অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছি; আপনি থাকুন! আপনাকে আমি এখান থেকে যেতে দেব না! মন চঞ্চল হয়ে থাকলে চাব ছ' মাস ছুটি নিন! আবার ফিরে আসুন!

অরবিন্দের সেই একই কথা—আমি যা স্থির করেছি তাই হবে। আমাকে অনুগ্রহ ক'রে মুক্তি দিন—দয়া ক'রে থাকতে বলবেন না। আমাকে যে যেতেই হবে! বাঙলা আমাকে ডাকছে! দুটো বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আমার ওপর পড়েছে। সেই জন্যে মনটা আমার বড়ই চঞ্চল!

শুনতে চান? বলতে পারি।

প্রথমটি—ক'লকাতায় নতুন যে ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হয়েছে তার অধ্যক্ষের পদেই আমি যাচ্ছি। বেতন, মাসে মাত্র ১৫০৲ টাকা।

—সে কি কথা! আপনি কি আমাকে পরিহাস করছেন?

—না। মোটেই না! তাও হয়তো নেব না। স্বদেশী কলেজে, অধ্যক্ষকে এর বেশী বেতন দেওয়া সম্ভব নয়!

—দ্বিতীয়টি কি কাজ?

—সেটি আরও মহৎ ও বিরাট কাজ। কাজটা যে কি পরে জানতে পারবেন। এখন এই পর্য্যন্ত জেনে রাখুন। হ্যাঁ, আপনি আমাকে প্রিনসিপ্যালের পদের লোভ দেখাচ্ছেন, প্রধান অমাত্যের পদ দিলেও দেশের কাজে, এখানকার সম্মান বলুন—অর্থ বলুন সবই আমার কাছে তুচ্ছ! ও'সব মন থেকে মুছে ফেলেছি করেই!

কিন্তু পারছি না কেবল ভুলতে ঐ লাইব্রেরীটাকে। আমার নিজ হাতে গড়া এত সাধের লাইব্রেরীটাকে ছেড়ে যেতেই যা কষ্ট হচ্ছে! ওটা আপনার কলেজকেই দিয়ে গেলাম। আমার অনুরোধ, দেখবেন ওটির যেন অযত্ন না হয়!

আপনি দুঃখ করছেন কেন?—সিভিল সারভিসের স্তম্ভ, ভগিনী নিবেদিতার ধর্ম্মপিতা, রমেশচন্দ্র দত্তকেই তো ১৯০৪ এ রাজস্ব সচিব ক'রে এনেছেন! আমি চলে গেলেও তিনিই আপনার সব দিকে ছাতা ধরতে পারবেন। কারুর জন্যে কারুর আটকে থাকে না দেখবেন। আপনাব কোন চিন্তা নেই।—আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিন মহারাজ!

গাইকোয়াড় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ছল ছল চোখে অরবিন্দকে বিদায় দিলেন।

॥ একুশ ॥

বারীন্দ্র কোন প্রকারে শ' খানেক টাকা জোগাড় ক'রে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের মনস্থ ক'রে ভগিনী নিবেদিতার কাছে ছুটলেন।

নিবেদিতা এক কথায় তাঁর হাতে তিনশ' টাকা তুলে দিলেন।

১৯০৬ সালে মার্চ্চমাসে চাঁপাতলার (ক'লকাতা) ২৭ নম্বর কানাই ধর লেনে, বারীন ঘোষ 'যুগান্তর' অফিস খুললেন অরবিন্দের প্রচেষ্টায়। সম্পাদনার ভার নিলেন ডাক্তার, ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)।

বারীন্দ্রের উদ্দেশ্য হ'ল, বৈপ্লবিক আবেদন এই পত্রিকার মাধ্যমেই চালাতে হবে। দেবব্রত এবং বারীন্দ্রের লেখা দিয়েই প্রথম সংখ্যা প্রেস থেকে মুক্তি পেল। এই সঙ্গে পত্রাকারে একটি উত্তেজনা পূর্ণ আবেদন দিকে দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

গেল কয়েকটি জেলা কেন্দ্রেও।

অফিস চালানর ভার নিলেন বারীন নিজেই। কিছুদিন পরে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যুগান্তরে ঢুকলেন।

পত্রিকাখানি জনপ্রিয় ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে বারীন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দের লেখা 'আমার রণ নীতি' নামে একটি ইংরিজী প্রবন্ধ অনুবাদ ক'রে প্রথম সংখ্যাতেই চালিয়ে দিয়েছিলেন। লেখকের নাম ছিল না তাতে।

এই অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধই বাঙালীর মনে দাগ কেটে দিয়ে পত্রিকার মান অনেক উঁচুতে তুলে দিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হ'ল।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এর অধ্যক্ষের ভার নিলেন পরের এপ্রিলেই।

শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হ'লেন, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

এই সময় কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে 'ডন' প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। এই সোসাইটির সভ্যরাই প্রথম, সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হলেন। সেই সঙ্গে স্বদেশী প্রচার পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয়ে গেল।

॥ বাইশ ॥

চন্দননগর ফরাসী উপনিবেশের প্রতিটি অলিতে গলিতে কানাইলাল, এর মধ্যে বিপ্লব সমিতির ব্যাখ্যা ক'রে বহু তরুণের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। অসাধারণ মন্ত্রগুপ্তি এই ছোট্ট বয়সেব মানুষটিতে। তার কোন প্রচেষ্টাই বিফল হবে না, এই তার আত্ম-বিশ্বাস। খুবই সহজ এবং সবল পধ্যতিতেই সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধেব মত ছেলের দল এগিয়ে এসেছে কিন্তু কানাই লালেব মনের ভেতর কেউ ঢুকতে পারেনি, এমন কি তার অতি অন্তরঙ্গরা ও না।

বয়সই বা তার এমন কী? অবিশ্বাস হওয়ার কথাইতো বটে! এই বয়সে চঞ্চল মতি হওয়াই, যে কোন ছেলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

মতিলালের মনে সন্দেহ রহেই গেছে, বিশেষ ক'রে চারুবাবুর বাড়িতে কানাইয়ের ভাবগতিক দেখে। তিনি ভাবলেন, পরীক্ষা ক'রে ছেলেটাকে দেখা যাক না, 'হীরে না কাচ'!

মতিলাল তার দলের শ্রীশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলে, ছেলেটার মনোবলটাই একবার যাচাই করা যাক না! আসলে সে কি?

অতি গোপন রেখে, কানাইলালের কাছে মতিলাল একখানা উড়ো চিঠি পাঠালে—"যদি তুমি সত্যই দেশ সাধক হও, দেশ হিতে জীবন বলি দেবার স্পর্দ্ধা রাখ, তা হলে আগামী অমাবস্যার দ্বিপ্রহর নিশীথে শ্মশানের বট বৃক্ষ মূলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

...সেদিন ঘোর অমাবস্যা। রাত্রি গভীর। হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা। গরম আচ্ছাদনেও বাগ মানে না। দাঁতে দাঁত লেগে যায়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের তীব্রতা ও বেড়ে চলেছে। চতুর্দ্দিক সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত।

জনমানবহীন ধূ ধূ শ্মশান ভূমি।

উত্তরে ঝোড়ো বাতাস, ক্ষণে ক্ষণে ঝাপ্‌টা দিয়ে হিমের দাপটটা যেন অধিক তীব্র ক'রে তুলেছে।

দূরে আঁতুড়ে শিশুর কান্নার রব তুলে শকুন শাবক একটানা কেঁদে চলেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার পাখনার কর্কশ শব্দ কান ঝালা পালা ক'রে দিচ্ছে। শৃগাল কুকুরের ইতস্ততঃ ছোটাছুটির মধ্যে খেঁক খেঁক বিক্রম মাঝে মাঝে কানে এসে আঘাত করছে। তার মধ্যে বাতাসের সোঁ সোঁ রাক্ষুসে নিঃশ্বাস।

এই পরিবেশে অতি বড় সাহসীরও এখানে একলা আসতে হ'লে ভয়ে শরীরের ফুটন্ত রক্তও হিম হয়ে যায়, বুকের স্পন্দন স্থির না হয়ে পারে না।

মতিলাল বন্ধুসহ বটবৃক্ষ ছায়ায় কানাইলালের অপেক্ষায়।

নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। এখন নিদ্ধিধায় উভয়ে আলোচনা করতে লাগল—'কানাইয়ের বুকের পাটা যে কতখানি তা তো বুঝতেই পারা গেল! নিশ্চয় সাহসে কুলয়নি? আর ব'সে থেকে কি হবে! চল, এখন যাওয়া যাক। হিমেল হাওয়া আর সহ্য করা যাচ্ছে না! ঠাণ্ডাটা বেশী না হ'লে আরও কিছুক্ষণ কাটান যেত।'

তারা উঠি উঠি করছে, এমন সময় দেখতে পেল কি যেন একটা কাল জিনিষ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমটা তারা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কানাই যে এত শীতে সামান্য একখানা কাল চাদরে গা-মাথা মুড়ি দিয়ে এখানে আসতে পারে তা তারা বিশ্বাসই করে নি।

মতিলালকে দেখে, হো-হো করে হেসে উঠে কানাই বলল—'বুঝেছি! তুমি ছাড়া আমাকে পরীক্ষা করবার সাহস আর কার থাকবে? এখন খবর কি তাই বল। উড়ো চিঠির রহস্যটা কি?

মতিলাল, কানাইলালকে সে সময় কি অবস্থায় দেখেছিলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"দেখিলাম উদ্বেগশূন্য কানাইয়ের প্রসন্ন মুখখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসূচক মহত্বপূর্ণ রেখায় বড় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সত্য সত্যই সম্ভ্রমে যেন মাথাটা স্বতঃই নত হইয়া পড়িতে চাহিল, একটা জোর বাতাসে তাহার অঙ্গাবরণ ঈষৎ উড়িয়া যাওয়ায়, কটিবদ্ধে একখানি মুক্ত ফলা খুব বড় চক্‌চকে ছুরি ঝলসিয়া উঠিল, বাঙালীর এই বীরবেশ সেদিন যে, রঙ্গমঞ্চেরই সামগ্রী। জীবনের জাগ্রত ক্ষেত্রে এ দৃশ্যটি আমার হৃদয়ে দুরু দুরু উৎসাহের সঞ্চার করিল।"

কানাইলালের মনের অভিপ্রায় বুঝবার জন্যে তাকে একটা প্রশ্ন করলে মতিলাল—'বাঙলা দেশের ওপর এই অত্যাচারের কি প্রতিকার করা যায় বলতে পার কানাই? তোমার মত কি?'

কানাইয়ের মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বর গর্জ্জে উঠল। তথাপি যেন কত সহজ সরল ভাষায় সহকর্ম্মীদের বুঝিয়ে দিল— 'বাঙালীকে বিপ্লব যুগে অনেক দুঃখেই হাত রাঙাতে হবে। স্থির বুদ্ধি বাঙালী, উপেক্ষায় অপমানে অবিচল থেকে বীরত্ব দেখাতে, বাধ্য হবে! হায়রে! এই দেবচরিত্র জাতটা কাজের বশে পরাধীনতার শেকল গলায় পরে জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশে অবকাশ না পেয়ে শেষটায় নরঘাতী হয়ে উঠবে। এমন একটা শান্তিপ্রিয় হৃদয়বান জাতকে বাঁচানোর জন্যে এমনিতর মরিয়া হয়ে উঠতে হবে। আগুন জ্বলবে চারদিকে। সে আগুন সহজে নিববে না। দিন আগত ঐ! প্রস্তুত হও মতিদা! আর দেরী করলে চলবে না। শিরে তো বর্ণচোরা আম! ও কি বলছে একবারটি শুনে নাও মতিদা!'

দেখতে দেখতে কানাইলাল চন্দননগরে পাঁচ ছটি জায়গায় বিপ্লব সমিতি গ'ড়ে তুলল।

কোনটিতে মতিলাল। কোনটিতে শ্রীশ। আবর অন্য কোনটিতে এদের দলেরই আর কেউ।

কেবল ছোটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে কানাই।

প্রধান কেন্দ্র হ'ল কানাইলালের নিজের বাড়িতেই।

সবকটিতেই রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চা সুরু হয়ে গেল।

যুযুৎসুর প্যাঁচ, ছোরা খেলা শেখায় কানাই নিজে, প্রতিটি আখড়ায়। সেই সঙ্গে নানারকম পদ্ধতিতে লাঠি খেলা শিখিয়ে সঙ্ঘ সেবকদের উপযুক্ত করে তোলা হ'ল।

ভদ্রলোকের ছেলেরা লাঠিখেলায় মেতেছে দেখে নমশূদ্র, বাগদী সম্প্রদায়ের নামকরা লাঠিয়ালরা স্বইচ্ছায় এসে, আখড়াতে লাঠিখেলা শেখাতে লেগে গেল।

এরপর এদের মধ্যে এসে পড়লেন বিখ্যাত লাঠিয়াল মুর্ত্তজা হোসেন (ঢাকার পুলিনদাসের গুরু) এই সমিতিতে লাঠি খেলা শেখাতে। মুর্ত্তজা চারু রায়ের আখড়ায় প্রথম যোগ দেন। ইনি চারুবাবুরই আমদানি।

সমিতিতে ইতরভদ্রের নেই কোন প্রভেদ। সেই মহাযজ্ঞে মহামিলনের সূচনা হ'ল।

এই সময় চন্দননগরের ছেলে রাস বিহারী বসু (ইনিই উত্তর কালে বিপ্লবী রাস বিহারী বসু) এসে যোগ দিল এই দলে। চঞ্চল মন রাস বিহারী এখানে বেশী দিন নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারল না। ভারতের বিপ্লবীরা যে তাকে ডাকছিল! তাই সে ছুটে চলে গেল উত্তর প্রদেশে।

এই সব কেন্দ্রে বিপ্লবের যে কোন ছোঁয়াচ থাকতে পারে কানাইলালের বাহ্যিক ব্যবহারে বাহিরের লোকের তা বুঝবার উপায় ছিলনা। এই বিপ্লবের যুগে যদি বা কেউ কোনদিন তার প্রচেষ্টাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছে, বাচনীক ভঙ্গীতে কানাই তা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতি রবিবারেই সমিতির একটা ক'রে অধিবেশন হ'ত।

এক এক সপ্তাহে এক এক রকম আলোচনার বিষয় বস্তু থাকত।

কখন' 'ধর্ম্ম, কখন' ইতিহাস, কখন' বা দেশের কথা আলোচিত

হত এখানে।

বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীরাও এই চক্রে অংশ গ্রহণ করতেন। সঙ্ঘের ছেলেরাও স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে এই আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করত।

বিপ্লবীদের, সত্যিকারের মন তৈরী হয়েছে কিনা বুঝবার জন্যে কানাই একদিন অন্তরঙ্গদের বললে—"বাঙলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ আমাদের বিশেষ ভাবে জানা দরকার; সেই সঙ্গে পথ-ঘাট! প্রয়োজনে হয়তো বা পদব্রজে জেলার পর জেলা অতিক্রম করতে হ'তে পারে। চল বেরিয়ে পড়া যাক্! হাঁটা পায়ে রাস্তা ঘাট গুলো বেশ্ ভালভাবে চিনে নেওয়া যাবে!"

কলকাতা কেন্দ্রেও জানান হ'ল। তেমন কোন্ সাড়া পাওয়া গেল না।

কানাইলাল কিন্তু বদ্ধপরিকর। একবার তার মাথায় যা ঢুকবে, সে তা করবেই করবে। বেরিয়ে পড়ল, মনের মত জনা কয়েক সঙ্গী নিয়ে।

ষাট মাইল পথ পেরিয়ে গেছে তারা: হঠাৎ দেখা হ'ল একজন পরিচিত গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে।

তাঁর পরামর্শে দলটি এই খানেই যাত্রা স্থগিত রাখল'।

তিনি এদের পরামর্শ দিলেন—"দেশের এই পরিস্থিতিতে এমনি একটা তরুণের দল পদব্রজে বাঙলা ভ্রমণে বেরিয়েছে দেখলেই পুলিশ নিশ্চয় তোমাদের পাকড়াও করবে। সরকারের মাথায় এখন আগুন জ্বলছে। কেন অযথা জেলে পচে মরবে! কাজ করে জেলে যাও আপত্তি নেই! আমার বিবেচনায় এ পরিকল্পনা তোমাদের ত্যাগ করাই ভাল। এতে তোমাদের ভালই হবে!

ভদ্রলোক সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ালেন না।

দলের একজন বললে—"সত্যিইতো! 'টিকটিকিটা' ভাল বুদ্ধিই দিয়েছে।"

কানাই বললে—"তা ঠিক, শুনলে তো ইংরেজ গভমেণ্ট এখন ক্ষেপা কুকুরের মত ছুটে বেড়াচ্ছে, যাকে পাচ্ছে তাকে কামড়াচ্ছে! আমাদের ও কামড়াতে পারে। কাজ না ক'রে জেলে গিয়ে কোন লাভ নেই। কাজের মত কাজ করেই জেলে যাব বুক ফুলিয়ে। বেটাদের যদি বুঝিয়ে দিতে পারি বাঙালী কী না করতে পারে, তবেই না! ভদ্রলোককে তো ভালই বলতে হবে! বাজে মতলব থাকলে ক্ষতি করতে পারত। নেহাত চেনা ছিল তাই রক্ষে!"—সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেল।

সকলেই একবাক্যে বললে—"চল এখন ফেরা যাক।"

—"তবে তাই চল!"

ফিরল তারা সকলেই।

॥ তেইশ ॥

১৪ই এপ্রিল, ১৯০৬।

বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন।

অশ্বিনীকুমারের বরিশাল।

বিলিতী দ্রব্য বর্জন সর্বাগ্রে। লবণ থেকে—বিলিতী দ্রব্য—বিলিতী বস্ত্র ইস্তক সব বয়কট।

সভাপতি—বাঙালী মুসলমান, ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল।

সম্মেলনে এসেছেন,—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শ্যাম সুন্দর, কৃষ্ণকুমার এবং কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ ক'লকাতা থেকে ষ্টীমারে।

ষ্টীমার এসে ভিড়ল বরিশালের জেটিতে।

অভ্যর্থনা সমিতির অনেকেই ব্যাজ বুকে এঁটে উপস্থিত ঘাটে।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ষ্টীমারে উঠে ডেলিগেটদের জানালেন, বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন, পূর্ব্ববঙ্গের নতুনলাট ব্যাসফিল্ড ফুলারের আদেশে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছেন, শোভা যাত্রায় কেউ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলবে না।

স্থির হয়েছে, সভাতেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তোলা হবে।

সব শুনে ক'লকাতার সকলে প্রস্তুত হয়ে ষ্টীমার থেকে নামলেন

শোভাযাত্রা সুরু হ'ল। এগিয়ে চলল।

সভাপতির গাড়ি চলেছে আগে। পেছনে প্রতিনিধিদের গাড়ি। পদব্রজে চলেছে, আগে-পেছনে সেচ্ছাসেবকের দল। আচম্বিতে সুরু হয়ে গেল পুলিশের লাঠি আর গুলি। চলল সেচ্ছা সেবকদের ওপর।

প্রতিবাদ করলেন সুরেন্দ্রনাথ—“কেন মারছ” ?

লাল মুখ পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কেম্প, গ্রেপ্তার করল সুরেন্দ্রনাথকে।

ঘণ্টার পর পর ঘণ্টা তাঁকে কোর্টে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল। শুনানীর আরম্ভ হ'ল অনেক পরে।

সুরেন্দ্রনাথ কাঠগড়ায় উঠলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট, সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা চাইতে বললেন।

বর্ষীয়ান নেতা গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—"কিসের জন্যে ক্ষমা চাইব ?"

জরিমানা হ'ল চারশ' টাকা।

সুরেন্দ্রনাথ জরিমানার টাকা ফেলে দিয়ে সভামণ্ডপে চলে এলেন।

শোভাযাত্রায় রক্তের নদী বইল।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে রক্তাক্ত কলেবরে, পুলিস ছুঁড়ে ফেলে দিল পুকুরের জলে।

উপর্যুপরি লাঠির আঘাতেও কিশোর মুখে বন্দেমাতরম্ বন্ধ হয়নি।

কতজন একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সভায় এসে অরবিন্দ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—'খুনের বদলে খুন'; ফুলারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় কোন প্রশ্নের কথাই ওঠে না!

সভা আরম্ভের পূর্ব্বে রসুল সাহেবের ওপর সরকারী আদেশ জারি হ'ল, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বন্ধ করার।

রসুল সাহেবের ক্রোধাগ্নি দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল'—এতক্ষণ যা প্রশমিত ক'রে রেখেছিলেন।—ব্যাঘ্র গর্জ্জনে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—"থামবে না। চলবে। চালাও বন্দেমাতরম্।"

আবার চলল লাঠি। পুলিশ দিল সভা ভেঙ্গে।

তছনছ হ'ল সভামণ্ডপ।

প্রজ্জ্বলিত অনল বুকে চেপে অরবিন্দ কলকাতায় ফিরলেন। সহযাত্রীদের বললেন—"কোন আপোষই চলতে পারে না। শোধ

আমি নেবই। কান্নাকাটি ক'রে নয়—কাগজে কালী খরচ ক'রেও না! এইবার ইংরেজ হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাঙালীর কব্জিতে জোর আছে কিনা! আপনারা স্থির করুন কি করবেন?"

সরকারের এই অত্যাচার দেখে সেখানকার সরোজিনী বসু প্রতিজ্ঞা করলেন, বন্দেমাতরম্ ধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়া পর্য্যন্ত তিনি ডান হাতে সোনার বালা পরবেন না। সঙ্গে সঙ্গে এই সোনার বালাটি সরোজিনী দান ক'রে দিলেন, বরিশালের রাজা-বাহাদুরের হাবেলীর প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভ ভাণ্ডারে।

এই কারণে তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধিতে জাতির দ্বারা ভূষিতা হলেন।

সরোজিনীর এই প্রতিজ্ঞাকে বর্তমানে আমরা যে চোখেই দেখি না কেন কিন্তু সে সময়ে, মায়েরা যখন ঘর সংসার ছাড়া বহির্জগতের কিছুরই খবর রাখতেন না, তখন স্বদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহিলার এরূপ আকুতি দেখে দেশবাসী সত্যই চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং সমগ্র নারী সমাজকে উৎসাহিত করতে তাঁরা মহিলাটিকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধি দিলেন।

বরিশালের কলসকাঠি গ্রামের মহিলারা অনেকেই এই সময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় ততদিন তাঁরা গৈরিক বসন পরিধান ক'রে থাকবেন।

নরমপন্থী এবং চরমপন্থীতে এবার প্রবল সংঘাত সুরু হ'ল বরিশালের ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে।

অরবিন্দের দল কোন আপোষেরই আর চিন্তা করে না। কথায় কথায় নরমপন্থীদের অপদস্থ করতে সুরু করল।

প্রতিহিংসার আগুনে উগ্রপন্থীরা জ্বলে উঠেছে।

নির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থার চতুর্দ্দিকে প্রস্তুতি চলল। প্রতিশোধ চাইই!

ব্রিটিশ সিংহের তর্জ্জন গর্জ্জন তারা ভারতে চিরতরে স্তব্ধ ক'রে

দেবে এই মনোভাব।

প্রাণের মায়া তারা করে না। নরমেধ যজ্ঞের স্থির সঙ্কল্প নিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

'দেশনায়ক' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ শেষ চেষ্টা করলেন, নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের এক করতে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালাগালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে তবে তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোটবড় বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না। ....আমাদের দেশে সম্প্রতি যে-সকল আন্দোলন আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ কলহ অক্ষমের উত্তেজনা প্রকাশ তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।...

"...একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দির ভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মতো এমন কঠোর সত্য, এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কী আছে!...আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনদিন সাধ্য হইতে পারে না।...

"স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার ঈশ্বরদত্ত স্বায়ত্ত শাসন চিরদিনই

আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজরা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত-গাউন পরিয়া বিচার করুন···কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই।

"···স্বদেশের মঙ্গল সাধনের কর্তৃত্ব সিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে লজ্জা দিতেছে। হে দেশসেবকগণ এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিও না, ইহাকে পূর্ণ করো। রাজার শাসন কখনও শুভ কখনও অশুভ,···কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে শাসন তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী।.... একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানির। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রনাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।···

"যাঁহারা পিটিশন বা প্রোটেষ্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘন ঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন আমি সে দলের লোক নই। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা দেশহিত ব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা রাজপথের শুস্ক বালুকাময় অশ্রু ও ঘর্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তাহাও জানি।....দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত তবে তাঁহারা নিশ্চয় তাহাকে সেইদিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

"তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কী, এ প্রশ্ন উটিতে পারে। নায়কের কর্তব্য চালনা করা—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রম সংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে;

কারণ চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয় বললাভ করিয়াছি, নিশ্চয় আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব মোচন হইয়াছে। কখনই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়; তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নাহলে তাহার জড় মরিতে পারে না।...দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন।...অতএব দেশকে চলিতে হইবে।...

"রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়-গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে নতুবা আমাদের সার্থকতা—অন্বেষণের এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবম ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি-ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।"

হ'ল না কোন সুরাহা।

এরকম ডিক্‌টেটরীতে অরবিন্দের আদৌ আস্থা নেই।

কঠোর সঙ্কল্প যা করেছেন, তা তিনি করবেনই। মতের এক চুল পরিবর্তন হবে না, যত বাধাই আসুক না কেন।

মডারেট হ'লে ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালী। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, এ সময় লাগামটা ধরুন তিনিই।

'দেশনায়ক' লেখার উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ তাই।

॥ চব্বিশ ॥

১৯০৬ এর মে মাসে বারীন্দ্রের দল অরবিন্দের আদেশে 'ফুলার' হত্যার জন্যে ছুটে বেড়াতে লাগল।

'ফুলার' তখন শিলংএ।

অরবিন্দের শ্বশুর ভূপাল বসু শিলং সরকারের বড় চাকুরে।

সুযোগ বুঝে অরবিন্দ বারীন্দ্রের অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে, তাকে, শিলংএ শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বারীন্দ্র সেখানে গিয়ে গোপনে সব খবর সংগ্রহ করতে লেগে পড়লেন। যেই সঠিক খবর মিলে গেল, ক'লকাতায় টেলিগ্রাম করলেন—'ডেসপ্যাচ গুডস্।'

প্রথমে স্থির হ'ল কাজ হাসিলের জন্যে ক্ষুদিরাম বোসকেই পাঠান হবে, কিন্তু সে অত্যন্ত ছেলে মানুষ ব'লে তাকে শেষ পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া হ'ল।

গেলেন হেমচন্দ্র নিজেই।

—হায়! হায়! সব চেষ্টা, সব আশাই ব্যর্থ হয়ে গেল। দেশের উত্তপ্ত আব-হাওয়া বুঝে 'ফুলার' পদত্যাগ ক'রে গোপনে বিলাতে পাড়ি দিলেন। পূর্ব্বে জন্মের সুকৃতির ফল নিশ্চয়।

১৯০৬ সালের ৪ঠা জুন থেকে ১২ই জুন মহাসমারহে ক'লকাতায় শিবাজী উৎসব পালিত হ'ল।

তিলক এলেন আমন্ত্রিত হয়ে।

লোকমান্য তিলক তাঁর বক্তৃতায় শক্তি পূজার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বললেন, "মা ভবানীকে চাই-তাঁর পূজাও চাই।"

রবীন্দ্রনাথ এই সভায় স্বরচিত 'শিবাজী' কবিতা পাঠ ক'রে বাঙালীর অগ্নিদগ্ধ মনে ঘৃতাহুতি দিলেন।

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত।

'বেঙ্গলী', 'হিতবাদী', 'অমৃতবাজার', 'সঞ্জীবনী', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', "নবশক্তি', "বন্দেমাতম্', 'কেশরী'—ভারতে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতায় এক সঙ্গে হুঙ্কার দিতে লাগল।

মশাল হাতে ভগিনী নিবেদিতা অগ্নিহোত্রীদের পুরোভাগে চললেন।

মডারেট আর এসট্রিমিস্ট এই দুই দল ছাড়া এই সময়েই এর ভেতর থেকে বিপ্লবপন্থী একটি দল জেগে উঠল।

স্বদেশী আন্দোলনের বেশ কিছু আগেই বাঙলা দেশে বিপ্লববাদের পতাকা উড়েছিল।

বাঙলার বিপ্লবীদের প্রথম ঘাঁটি সৃষ্টি হল বাগবাজারে, ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে 'ভগিনীনিবাস'-এ। পাঁচজন সদস্য নিয়ে এখানে প্রথম বিপ্লব সমিতি গঠিত হ'ল। নাম দেওয়া হ'ল 'Revolutionary National Council'. সভ্যদের প্রথম দুজন হলেন, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং ভগিনী নিবেদিতা।

চিত্তরঞ্জন আর রজতনাথ হাইকোর্টের উদীয়মান দুই ব্যারিষ্টার অরবিন্দের তরীতে উঠে পড়লেন, দাঁড়ী বারীন্দ্র।

অরবিন্দ ইংরেজের ওপর প্রতিশোধের চঞ্চলতা বুকে নিয়ে কখন' থাকেন চাঁপাতলার যুগান্তর অফিসে, কখন' থাকেন সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে আবার কখন' বা থাকেন কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মেসোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়িতে।

নিবেদিতা কলম চালিয়ে এবং বক্তৃতা দিয়ে জাতীয়তার ভিত্তি মূলের কথা প্রচারের সঙ্গে বিপ্লব বাদ প্রচার সুরু করে দিলেন।

গায়ে বিপ্লবের গন্ধ থাকায় নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে সরে আসতে হ'ল।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নিবেদিতার প্রাণ সত্যিই কেঁদে ছিল

তা ছাড়া গুরুর আদেশ তাঁর মনে সর্ব্বদাই অনুপ্রেরণা জাগাত। তিনি বলতেন—"বাঙলাদেশ আমার ধ্যান—বাঙলাদেশ আমার জ্ঞান—ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টাই আমার ধর্ম্ম।"

১৯০২ সালের শেষের দিকে তাই তরুণ বিপ্লবীদের জাগিয়ে তুলতে বিদেশী বিপ্লবের বিপুল এক গ্রন্থ সংগ্রহ এনে দিয়েছিলেন নিবেদিতা, ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের বিপ্লব-কেন্দ্রের গ্রন্থশালায়। যুবকদের মনে ধিক্কার জন্মাতে মাঝে মাঝে তিনি এখানে উত্তেজনা পূর্ণ শ্লেষ ব্যাঞ্জক বক্তৃতা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না।

তরুণ মনে আগুন ধরাতে 'ডন' পত্রিকায় তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছেন।

অর্থ যা সংগ্রহ করেন দেশের কল্যাণে তা বারীন ঘোষের হাতে তুলে দেন।

এইবার নিবেদিতার নজর গিয়ে পড়ল বাঙলার নারী সমাজের ওপর। বেশ কয়েকজন নারী তখন জেগেছেন—জাগছেন।

জেমোকান্দার পর ক'লকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের মেয়েরা এগিয়ে এলেন।

কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র দেশের কাজে নেমে পড়েছেন। কুমুদিনী, তাঁর মা লীলাবতীকেও টেনে নামালেন।

সভা সমিতিতে যেতে সুরু করেছেন কুমুদিনী। লিখছেন জাতীয় সঙ্গীত।

নিবেদিতার প্রভাবে ডাঃ নীলরতন সরকারের স্ত্রী নির্ম্মলা সরকার, ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দাস, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সুবালা আচার্য প্রকাশ্যে সভাসমিতিতে না গেলেও অন্তরালে থেকে দেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের মরশুমে বিপ্লববাদে নিবেদিতার প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে তুঙ্গে উঠে পড়ল।*

বাঙলার বিপ্লবীদের কর্মিতে বল পেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। নিবেদিতার আবেদনে দেশের স্ত্রী-পুরুষ অকাতরে তাঁর হাতে অর্থ

* বাঙলার বিপ্লবে নিবেদিতার যোগসূত্র সম্বন্ধে Lizalle Reymond, Nivedita-fille-de L'Inde শীর্ষক ফরাসী ভাষায় লেখা জীবনীতে তাঁরা অনেক কথা লিখেছেন। তার ইংরিজী অনুবাদের কিছুটা :

Nivedita taught them first the mechanism of secret societies, such as Ireland had known. These samities existed already plentifully in the Indian Villages, but they remained fragmentary. There still remained a step to make them a fare so active that each man should represent the entire group and become responsible to the entire group and become responsible for the honour of all.···

Then Nivedita insisted on the absolute recurity of the immense net work of secret communication streched through out the countey like the protecting spider's webe. It was necessary that orders should be transmitted as rapidly as by post, from man to man by signs and messages learnt by heart. The appeal was heard. The couriers allowed themselves to be butchered rather than let themselves be corrupted. The ends assigned were pursued with a devotion almost super-human. From one village to anathe the cry re-echoed "We are ready."···

"Money was necessary, much", said Nivedita. All the money that fell into her hands was distributed into the villages by Barindra Kumar Ghosh, some women carried to her their jewels, some princes a part of their revenue, some Zeminders their harvest, some employes their salaries, some merchants bushels of grain. Some workers of inter-aid were born spontaneously, because the moral body of India had now nerves, muscles, blood. When one member sutfered, the whole country came to her aid.

তুলে দিতে লাগলেন। নির্দ্বিধায় মায়েরা, মণিরত্নখচিত বহুমূল্য অলঙ্কারাদি তুলে দিলেন 'ভগিনীর' হাতে ; রাজারা দিলেন রাজকোষের বিত্ত, জমিদাররা দিলেন খাদ্য সামগ্রী আর কিছু কিছু অর্থ, চাকুরিয়ারা দিলেন তাঁদের মাহিনা, ব্যবসায়ীরা দিলেন বিপ্লবীদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং শস্যসামগ্রী। অপর জনসাধারণ যার যা সাধ্য সে তাই দিল 'ভগিনীর' হাত শক্ত করতে।

অর্থের প্রয়োজন দূর হওয়ায় বিপ্লবীরা লেগে পড়লেন উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহে।

দেশবাসীর অন্তরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে, বারীন্দ্র এই সংগৃহীত অর্থের কিছু কিছু বিলি করতে লাগলেন, গ্রামের দুঃস্থ পরিবারে।

।। পঁচিশ ।।

চন্দননগরে বিপ্লব সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে অগ্নিযুগের ঋষি উপেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দিল সভার মাঝখানে। কাব্যবিশারদের স্বদেশী মন্ত্র প্রতিটি অনুরাগীর মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলল। স্বামী অভেদানন্দের মখে বেদান্তের সুললিত ব্যাখ্যা সকলকে অভিভূত করল। এই সকল সারগর্ভ বক্তৃতা চন্দন-নগরের বুকে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে বোঝা গেল।

এই সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়।

সমিতি, রাজনৈতিক সংক্রমনে আক্রান্ত অনুমান ক'রে অনেক সদস্যই গা ঢাকা দিলেন।

মতিলাল বললেন—কানাই কী দেখছ? তোমার শিষ্যেরা তো অনেকেই কেটে পড়ল! সমিতি কি আর চালাতে পারবে?

কানাই হেসে বললে—সত্যিকারের যার মন্ত্রগুপ্তি আছে সে কি আর কেটে পড়তে পারে! কেউ না থাকুক তুমি তো আছ! তুমি যে একাই একশ'! তুমিও কি আমাকে ছেড়ে পালাচ্ছ? এইটুকুই জেনে রাখ, তুমি আর শিরে সঙ্গে থাকলে আমি এক লাফে হিমালয় পর্ব্বতটাকেও টপকে যেতে পারি। এতো সামান্য কাজ; নিঃস্বার্থ ক'জন বন্ধু পেলে আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই না। তুমি কিছু ভেব' না। কাজ আমাদের ঠিকই এগোবে। এগোচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় যাকে বলে 'অগ্নি-রক্তস্নান শুদ্ধ', সেই রকম জনাকয়েককে দলে পেয়ে গেছি। বিশিষ্ট কজনকে তুমি এখনও চেননি। সময় হ'লে চিনতে পারবে কিন্তু এখন জানবার চেষ্টা কোর না।

মতিলাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে, কানাইয়ের পিঠে ছুটো থাবড়া দিয়ে বলে উঠলেন—ব্রাভো! ব্রাভো! সত্যি নাকি? ব্যাস,

তাহলেই হ'ল। তুমি দেখছি বস্তুটি তো কম নও!

কানাইয়ের উত্তর ঠোঁটের আগায় —বড় দেরীতে জানালে মতিদা, এই যা দুঃখ।

মতিলাল বললেন—কালপোহরণের প্রয়োজন নেই। চল এখন বেরিয়ে পড়া যাক। ঢাকে যখন কাঠি পড়েছে, গাজনের-সন্ন্যাসীর অভাব হবে না। যে কদিন পারা যায় পথে পথে স্বদেশী গান গেয়ে দেশটাকে চাঙ্গা করতে হবে। লোকগুলোকে আর ঝিমিয়ে পড়তে দেওয়া হবে না। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, হিতবাদী, নবশক্তি, সঞ্জীবনী, কেশরী কাগজগুলো ক'লকাতা থেকে নিয়ে এসেছি, একবার পড়ে দেখ, কি আগুন আগুন লেখা। যুগান্তরের এখন প্রত্যেকটা ইস্যুই যেন এক একটা তাজা বোমা। বারীন ঘোষ ক'দিন কলকাতায় ছিলেন না; সম্ভবতঃ ফিরেছেন। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করবার জন্যে, তোমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই মন্থর গতিতে কোন কাজই এগোবে না। একটা কিছু কর্ম্মপন্থা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে যত শীগ্‌গির পারা যায়।

কানাই উল্লসিত হয়ে বললে—কাগজের টাটকা খবর আমি রাখি ঠিকই! তোমাকে অবিশ্যি বলিনি। যাক্ ওসব কথা—সত্যটা এখন নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছ মতিদা! তাহলে বুঝতে পারছ বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'! দুই বাঙলার বেশ কয়েক জায়গায় স্বদেশী ডাকাতিও হয়েছে, পড়েছ নিশ্চয়? আজ আর স্বপ্ন নয়, উপন্যাস নয়, গল্পকথা নয়—বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। অসংখ্য সন্তান একত্রে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে সে খবর আমি কিছুটা রাখি। আমি তো যাবই! তোমার সাহায্য চাই। ছেলেবেলায় বিষ্ণু গণেশ পিংলের কাছে আমি এই প্রতিজ্ঞাই করেছিলাম। পিংলেও কম না। আমার চেয়ে মন তার অনেক শক্ত। ভারতের এই দুর্দ্দিনে সে নিশ্চয় ঘুমিয়ে থাকবে না। সে হয়তো এতদিন কাজে নেমে পড়েছে। মহারাষ্ট্রের ছেলে পিংলে।

১৯০৬ সালে ব্রহ্মবান্ধবের উদ্যোগে কাঁটাল পাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের আটষট্টিতম জন্মতিথিতে (মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পর) তাঁর বাড়িতে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কানাইলালকে সঙ্গে নিয়ে মতিলাল সেই উৎসবে যোগ দেন।

এই প্রসঙ্গে মতিলাল উৎসবের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন— "মহেন্দ্রের দীক্ষা অভিনয় হচ্ছে। প্রান্তর সমিতির কৌতুক যুদ্ধ, স্বদেশের প্রীতি মহোৎসব। সেদিন কানাইয়ের স্কন্ধে ভর দিয়ে সারাদিন সে উৎসবের আনন্দ ভোগ করেছিলাম; আজ আর সে উৎসব নয়, সত্যি মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। কানাইকে অবিশ্বাস করা যায় না। সত্যি কথা বলতে যদি অপরাধ না হয়, তাহলে বলব, সেই মুহূর্তে কানাই আমার প্রাণের দাবী করলে, আমি অবহেলে তা দিতাম; কিন্তু সে এত কথা বলার পর যা চাইল, তা বড় তুচ্ছ এবং সামান্য।"

সবেমাত্র বিপ্লব যজ্ঞ শুরু হয়েছে। চারুবাবু ইন্ধন দিচ্ছেন চন্দননগরের লোকদের। নিজের মনোমত তিন সেনাপতি বেছে নিলেন তিনি—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত আর নগেন্দ্রনাথ ঘোষকে।

সৈন্যদল গড়লেই তো চলবে না। সৈন্যদের লড়তে হ'লে চাই হাতে অস্ত্রশস্ত্র—গোলাগুলি। এদের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। সেইরকম উপযুক্ত যোদ্ধা তৈরী করতে হবে।

প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। কে যোগাবে এত টাকা এই ছোট্ট উপনিবেশ। চারুবাবুর চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ শ্রীমানীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। লোকটাকে ধনকুবের বলা চলে। বিশেষ পরিচিত। অন্যদিকে অধ্যাপক চারুচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম নয় তাঁর।

প্রথমেই খুব আশা নিয়ে টোপ ফেললেন তিনি, ভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমানীর ওপর। অনেক চেষ্টা ক'রে যদিও বা শ্রীমানীকে টোপ গেলালেন, কিন্তু খেলিয়ে তুলবার সময় শেষ পর্য্যন্ত ছিপের সুত কেটে আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

চারুবাবু দমে যাওয়ার পাত্র নন। হাল ছাড়লেন না। চন্দন-নগরের নামকরা উকিল বনমালী পালকে এ বিষয়ে তাঁর সহকর্মী হিসেবে পেয়ে গেলেন। তারপর পেলেন, পুলিশ কোতোয়াল ধ্রুবদাস কোলেকে এই দলের সহায়করূপে।

এরপর তিনি দলে জোটালেন, শ্রীরামপুর জমিদার বংশের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে। নাড়াজোলের রাজা আর উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও দলে টানলেন একে একে।

অর্থ সংগ্রহ হ'তে লাগল।

একটি দুটি ক'রে বাছাই ছেলে এনে কানাই, শ্রীশ আর নগেন নিজেদের দল ভারি করতে লাগল। ওদিকে শিক্ষা নিয়ে কানাই নিজের বাড়ির পাশের বাগানে এক আখড়া খুলে প্রায় শতখানেক ছেলে জুটিয়ে ফেলল।

বারীন্দ্রকুমারের দলের খবর চারুবাবু রেখে চলেছেন। বারীনও এখানকার খবর রাখছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ যোগাযোগ তখনও ঘটে ওঠেনি।

শ্রীশ ঘোষ দেখল' মতিলাল রায়কে যা ক'রেই হোক দলে ভেড়াতে হবে। লোকটার সংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট। 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়ে' তার দলের অনেকেই আছে।

সে মতিলালকে চারুবাবুর খপ্পরে এনে ফেলল। প্রতি রবিবারে চারুবাবুর ওখানে সেও যেতে লাগল।

চারুবাবু তাকে প্রথমেই স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু না বলে, সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়কে বড় এক প্রতিষ্ঠান ক'রে তুলতে পরামর্শ দিতে লাগলেন।

মতিলাল দেখে চারুবাবুর ঐ ছোট্ট ঘরটিতে বেশ কয়েকজন জুটে

চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্বদেশী আন্দোলন আর বিপ্লববাদ সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা চালিয়ে যায়। এখানে থাকে, কানাই, শ্রীশ, বিশ্বনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আর বিশ্বনাথ সিং সব দিনই। অন্য দু'একজন মাঝে মধ্যে এসে জোটে।

এদের হাওয়া মতিলালের গায়ে গিয়ে লাগল। মতিলালও এই দলে ভিড়ল।

এতো গেল প্রথম দিকের কথা।

বরিশালের ঘটনা দেশের অনেকেরই বুকে শেল বিদ্ধ করেছিল।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে একজন বিশিষ্ট বাঙালী রাজকর্ম্মচারী দুঃখ করে বলেছিলেন—'দেশে কি এমন লোক নেই যে, প্রাণ দিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে পারে?'

তখন ক'জন জানত এইটিই এখন সত্যিকারের বাঙালীর জাতীয় অন্তরের কথা। বাইরের কে জানত তখন, বারীন্দ্রের দল এর মধ্যেই ইংরেজ নিধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুরু ক'রে দিয়েছে।

বারীন্দ্রের 'গুপ্ত সমিতির' খবর বরিশালে পুলিশী নিগ্রহের পর পরই চন্দননগরে যুব সম্প্রদায়ের কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। এ খবর কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, কিভাবে বারীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করা যায়।

এমনই গোপনে গুপ্ত সমিতি অগ্রসর হচ্ছিল যে, উপেন্দ্রনাথও এ খবর জানতেন না। শোনামাত্র উপেন্দ্রনাথ ছুটলেন বারীন্দ্রের কাছে।

বারীন্দ্রের সংগঠনের কাজ তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে বিপ্লবকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপেন্দ্র খবর নিয়ে জানলেন, বাঙলাদেশে এমন কোন জেলা বা সহর নেই যেখান থেকে বারটি ক'রে তরুণ দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হয়েছে। আশার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন বারীন্দ্রের কাছে। শিক্ষকতার কাজ ফেলে রেখে উপেন্দ্রনাথ

কলম ধরলেন 'যুগান্তরে'। অগ্নি আরও লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করল। কার সাধ্য এ আগুন নেবায়।

গুপ্ত সমিতির আসল কর্ম্মসূচী তখনও কানাইলালের মস্তিষ্কে এসে বাসা বাঁধেনি।

কেবলই কি কানাইলাল? তখনও তরুণ বিপ্লবীদের ধারণা ছিল স্বাধীনতা লাভের জন্যেই গুপ্ত সমিতির প্রস্তুতি, স্বদেশী দ্রব্যে দেশবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধি করা, বিলিতী জিনিষের বহ্ন্যুৎসব, দরিদ্র এবং দুস্থ দেশবাসীর সাহায্য করা, সভাসমিতির অনুষ্ঠান ক'রে জনমনে দেশমাতৃকার চেতনা জাগ্রত করা।

কানাইলালের ধারণা ছিল হয়তো বা এই কাজের জন্যেই পুলিশের লাঠি কিংবা গুলিতে প্রাণ দিতে হতে পারে। তার ধারণা ছিল এরই নাম বুঝি 'অগ্নি ও রক্তস্নান'।

নিবেদিতার নিজে হাতে গড়া 'মিলন মন্দিরের' ভিত্তি স্থাপনে, রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় এক বিরাট চরিত্রের অধিকারী আনন্দমোহন বসু তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতাতে বাঙালী জাতিকে, দেশাত্মবোধের এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা শুনে বললেন—"আনন্দমোহন বসু দেশাত্মবোধের যে স্বর্ণবেদী রচনা করেছেন, বাঙালী জাতি সেই বেদামূলে চিরদিন ভক্তির অঞ্জলি অবনত শিরে প্রদান করবে।"

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন—"আনন্দমোহন নরমপন্থী ছিলেন সত্য, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি যে কারো চেয়ে কম ছিলেন না!" নিবেদিতা এই মহামানবের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন যে, তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে একথাও বলতেন—"এমন সংযত চরিত্র ও উচ্চ আদর্শবাদী পুরুষ এযুগে আর বড় একটা দেখা যায় না।"

আনন্দমোহনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল বললেন—"এই সময়কার কোন বিলাতফেরৎ বাঙালী, আনন্দমোহনের

মত দেশের লোকের কাছে এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধালাভ করেনি।”

স্বামীজী, আনন্দমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

২রা আগষ্ট ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহনের তিরোধানে বাঙলার আকাশ থেকে এক বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্যোতিষ্কের পতন ঘটল। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৪৭শে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিই ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার। ১৮৯৮এ মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন এই আনন্দমোহন বসু।

ব্রহ্মবান্ধবের চেষ্টায় আগষ্ট মাসে জাতীয় দলের ইংরিজী পত্রিকা ‘বন্দেমাতরম্’ প্রকাশিত হ’ল হরিদাস হালদারের মাসিক ৫০০্ টাকা সাহায্যে।

সম্পাদকমণ্ডলীতে এলেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বিপিন পাল হলেন প্রধান সম্পাদক।

বিপিনের বিশেষ অনুরোধে, অরবিন্দ বন্দেমাতরমের ডিরেক্টরবোর্ডে যোগ দিলেন।

১৯০৬এর ৭ই আগষ্ট থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বিপিন পাল প্রধান সম্পাদকের কাজ চালালেন।

সম্পাদনায় মতদ্বৈধ ঘটায় বিপিন পাল বন্দেমাতরমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন।

ঐদিন সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে বন্দেমাতরম্ প্রেস উঠে এল।

এখানে সম্পাদক প্রধানের কাজের ভার চাপান হ’ল, অরবিন্দের স্কন্ধে।

কেবল একটিমাত্র সর্তে তিনি রাজি হলেন—কাগজে তাঁর নাম থাকবে না।

প্রেস এবং পত্রিকার কাজ ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল।

অরবিন্দকে পেয়ে সুবোধ মল্লিক দুহাতে, পত্রিকার জন্যে অর্থ ব্যয় করছেন, সঙ্গে আছেন চিত্তরঞ্জন দাস আর রজতনাথ রায়।

পত্রিকা তার মুখ দিয়ে উগরে দিচ্ছে ঝলকে ঝলকে আগুন।

ওদিকে 'কেশরী'—এদিকে 'বন্দেমাতরম্' জাতীয়তাবাদের অগ্নিবান বর্ষণ করছে।

'বন্দেমাতরমের' প্রথম সংখ্যাতেই সরকারের কাছে দাবী করা হয়েছিল পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন আর এই ব্রিটিশ শক্তিব কাছ থেকে মুক্তি। সেই সঙ্গে পত্রিকায় পরিষ্কারভাবে আলোচিত হ'ল অসহযোগ আন্দোলনেব রূপ ও রাজশক্তিকে প্রতিহত করবার উপায়।

যে দাবী একদিন ক'লকাতা থেকে সুরু হয়ে বাঙলার জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, এখন তা ভারতের প্রতিটি রন্ধ্র থেকে উদাত্ত কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠল। 'বন্দেমাতরমেব' জ্বালাময়ী আকর্ষণ শক্তি ভারতের জাতীয়তাবাদকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করল'।

সুরু হয়ে গেল জাতীয়তাবোধের কর্ম্মযজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারে গোয়েন্দা বিভাগেব বিশেষ একটি গুপ্ত সংবাদ থেকে জানা যায়, তাবা তাদের রিপোর্টে লিখেছে—"Boy Cott—Swadeshi movement assumed an all-India character even towards the end of 1905. The progress of the movement was reported from 23 districts in U. P., 15 towns in C. P., 24 towns in Bombay Presidency, 20 districts in the Punjab and 13 districts in the Madras Presidency."

আসমুদ্র হিমাচলে 'বন্দেমাতরমের' প্রচার জনগণের সম্মুখে ইংরেজ শাসনের ব্যর্থতার বাস্তব-রূপ দিনের পর দিন সুন্দরভাবে তুলে ধরছিল।

১৯০৬এর ডিসেম্বরে বন্দেমাতরমের শেষ সংখ্যায় হঠাৎ একদিন অরবিন্দ ঘোষেব নাম প্রধান সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

তিনি এতে মোটেই খুসী হলেন না। তিনি বিশেষভাবে নিষেধ করে দিলেন ভবিষ্যতে তাঁর নাম যেন সম্পাদক তালিকাতেও কোন

দিন উল্লেখ করা না হয়।

কিন্তু তিনি অপ্রকাশ্যে এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের কার্য্য পরিচালনা করেছিলেন ১৯০৮এর ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত।

মাণিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার পর আবার এলেন বিপিন পাল সেই আসনে।

১৯০৮ এর অক্টোবরে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল।

'বন্দেমাতরমে অরবিন্দ'—এখানে একটি রূপক বর্ণনা করছি: 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদনায় অরবিন্দ ঘোষ জড়িত কিনা? কে এই কাজ করছে? অরবিন্দ হলে তাকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে।

রূপক—আহত পশুরাজ বেলভেডিয়াবের গুহায় প'ড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বন্দেমাতরমের সামান্য থাবার আঘাতেই মহাপ্রভু কুপকাত। বিষক্রিয়ায় গায়েব বেশ কয়েকটা জায়গায় ভালমত ক্ষত হয়েছে।

কে এ আঘাত হানল? আততায়ীর সন্ধান মিলছে না।

হুজুরকে সমবেদনা জানাতে দেশী-বিলিতী সব জাতের শেয়াল কুকুরের দল চাটুকাবিতায় পঞ্চমুখ হয়ে এগিয়ে এসেছে।

যন্ত্রণাকাতর পশুরাজ এদের ভীড় দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—তোমরা কী মজা দেখতে এসেছ অর্ব্বাচীনের দল! আততায়ী কোথায়? তাকে পাকড়াতে পেরেছ? কে ডেকেছে তোমাদের এখানে? যাও বেবিয়ে যাও! দূর হও!

শেয়ালপণ্ডিত আর দো-আঁসলা নেকড়ের দল মাথা নীচু ক'রে বিনীতভাবে বললে—হুজুব কিস্‌সু ভাববেন না, দোষীটাকে আমরা খুঁজে বার করবই করব!

—এতদিন কি নাকে তে'ল দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলে? যাও বিদেয় হও আমার সামনে থেকে কাম চোরের দল। ইচ্ছে করলে তোমরা সব পার! পার সুড়ঙ্গ কেটে কুমির আনতেও। কিন্তু এই সামান্য

কাজটুকু পারছ না? দূর হও এখান থেকে! দূর হও।

—হুজুর আর একটু সময় দিন! দেখবেন ঠিক কাজ হাসিল করব।

পশুরাজ রাগে গরগর করছে। অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—যত সব হতভাগা মূর্খের দল। মুখে কেবল কথার তুবড়ী ছুটবে আসল কাজে কাউকে পাওয়া যায় না! এখনও দাঁড়িয়ে কেন? আই সে, প্লিজ গেট আউট! তোমাদের আর সহ্য করতে পারছি না। যাও বলছি দূর হও চোখের সামনে থেকে!

ছুটল গোয়েন্দা শেয়াল কুকুরের দল দিশেহারা হয়ে। গোপনে অনুসন্ধান সুরু হয়ে গেল।

পশুরাজেব কাছে খবর গেল। টাটকা তাজা খবর।

মহাবিক্রমী সিংহমশায় মুখে ভেংচি কেটে বললে—খবর আর খবর। অনেক তো খবর এনে হাজির করলে, সবই তো ভূয়ো! আবার টাটকা খবর? ব্যাপারটা কি শুনি? মূর্খের দল খবরই যদি পেয়ে থাকবে, দেরী করছ কেন? জলদী পাকড়াও! আভি পাকড়ো!

সুতানটী গোবিন্দপুরের বিস্তৃত অরণ্যে হাঁকা ক'রে বহু জীবজন্তু তাড়িয়ে আনা হয়েছে। হলদে গায়ে, বড় বড় কাল ডোরা কাটা বাঘটা, ততক্ষণ ব্যাঙ্কশালে এসে উপস্থিত হয়েছে। সামনে যারা চেয়ার টেবিল জাঁকিয়ে বসেছিল, ঐ গম্ভীর আকৃতির ছুলো বাঘকে দেখে আসবাব-পত্তর আছড়ে ফেলে, চোঁচা দৌড় দিল পড়ি কি মরি ক'রে সকলে।

এ জঙ্গলের খবর বাঘ মশায়ের নখদর্পনে।

কয়েকটা অ্যালসেসিয়ান আগে থেকেই তার পেছু নিয়েছিল কিন্তু এ বিরাট শক্তির সামনে কারুর আর এগোতে সাহস হয়নি।

ইত্যবসরে সে গিয়ে ঢুকে পড়ল সিংহিমামা কিংস ফোর্ডের সংরক্ষিত এলাকায়।

পশুরাজের শ্যালক লালবাজার জঙ্গল প্রধান কিংস ফোর্ড সেখানে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট।

…রয়েল বেঙ্গল টাইগার—সে তো হেঁজি পেঁজি নয়। বুদ্ধিও সে কম ধরে না ; সোজা বিচারপতির কাছে গিয়ে আবেদন রাখল।

বিচারপতি, এ ভয়ঙ্কর বাঘটার খবর আগে থেকেই রাখে। কাজেই আবেদন তার, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহ্য হয়ে গেল। কিছুদিনের জন্য তাকে বাহিরে কালাতিপাত করবার অনুমতি দেওয়া হ'ল।

সময়কালে সেই বাঘ এসে দাঁড়াল সিংহিমামার দরবারে।

শুনানী সুরু হয়েছে।

পশুরাজের কৌঁশুলী দলবল নিয়ে মহা বিক্রম দেখিয়ে বাঘটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

বাঘ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে আড়চোখে তাদের দিকে চেয়ে ভেংচি কাটছে।

ব্রিটিশ সিংহের সবই নজরে পড়ছে। মহাবিরক্ত হয়ে সিংহিমামা সূচলো নখওয়ালা থাবা উঠিয়ে শয়তানগুলোকে নিরস্ত করলেন ;— খুব হয়েছে অর্ব্বাচীনের দল!

বাঘও রাগে গরগর করছে। কিন্তু আইনের অবমাননা সে করল না।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিচারক দেখলেন, 'পশুরাজকে' আহত করাতে এ কি করে দায়ী হতে পারে? এর নামগন্ধ তো কোথাও নেই।—না না না এ হতেই পারে না। আততায়ী তো এ নয়! ভুল! আততায়ীর নাম তোমরা ঠিক আনতে পার নি। বিচারের নামে আমি প্রহসন হতে দিতে পারি না। এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না।

বুঝদার সিংহিমামা চিন্তা করলে, বিদ্রোহী বাঘগুলো জঙ্গলটাকে তোলপাড় ক'রে তুলেছে। কখন যে এসে তারই ঘাড় মটকাবে, তার স্থিরতা নেই। এসময় একে একটা মিথ্যে সাজা দেওয়া কিছুতেই

চলতে পারে না; যত বড় আত্মীয়ই হোক না কেন পশুরাজ। এ সে কিছুতেই হ'তে দেবে না।

বাঘমশায় বেকসুর খালাস পেয়ে সগর্ব্বে এক লম্ফ প্রদান ক'রে বিচারসভা ত্যাগ করল।

বিচারপতি এও রায় দিলেন—'বন্দেমাতরম্' নামের অস্ত্রটাকে ও তো এই গুরুতর অপরাধের সামিল করতে পারছি না। এমন বড় অপরাধ তো এর কিছুই নেই। আপাততঃ এরও কোন দোষ আমি দেখছি না। একেও খালাস দিলাম।

ব্যাঙ্কশালে সেদিনকার মত বিচারসভা ভঙ্গ হ'ল।

বাঘের দল গর্জ্জন করতে করতে বনের মধ্যে চ'লে গেল।

ওদিকে একে একে শেয়াল কুকুরের সারি লেজ নীচু ক'রে অধোবদনে যে যার ডেরায় গিয়ে ঢুকে পড়ল॥

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এক বৎসর পূর্ণ হ'ল, ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট।

দিকে দিকে উৎসবের আয়োজন। নির্দ্দেশনামায় স্থির হয়েছে বাঙলার প্রতিটি গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট স্থাপন। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি। রাত্রিতে প্রতিটি গৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করা হবে।

কানাইলাল বাড়ির দরজার দুপাশে দুটি কলাগাছ পুঁতে মঙ্গলঘট স্থাপন করল। বাড়িটি তার মাতুল নন্দকুমার দত্তের; চন্দননগর গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর সরসে পাড়ার মোড়ে। মাতুলালয়েই তাদের বাস ছিল। ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এই বাড়িতেই কানাই।

নববিধান সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মসমাজী, কানাইলালের অগ্রজ মঙ্গল কলস দুটি সেখান থেকে সরিয়ে দূরে ফেলে দিলেন।

কানাইলাল গভীর দুঃখে কেঁদে ফেলল। নিজেকে সামলাতে না পেরে নির্ব্বাকচিত্তে বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে বিছানার ওপর প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে দাদার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল। মনের

দুঃখে সে সারাদিন শয্যা ত্যাগ করেনি।

নিজে অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করলেও সে, গুরুজনের সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করেনি।

এখনকার বাঙলায় যে চরিত্র সত্যিই বিরল।

মনেপ্রাণে স্বদেশী করেছে কানাই, কিন্তু স্পন্দনহীন জীবন সে কোনদিনই চায়নি। সে চেয়েছে বল্গা ছেঁড়া পক্ষীরাজের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে উড়ে চলতে।

॥ ছাব্বিশ ॥

কয়েকটি বিশেষ সভায় ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে সুন্দর-ভাবে বুঝিয়ে দিলেন, 'স্বদেশী আন্দোলন' ভারতবাসীর জীবন মরণ সংগ্রাম। আসলে এটি অর্থনীতিক বিপ্লব। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, এর উৎস মাত্র।

ভারতবাসী বুঝতে শিখল 'স্বদেশী যা'—'স্বধর্মও তাই'।

সকলে একযোগে কাজ শুরু করে দিল।

বিপ্লবীরা ওদিকে তৈরী হতে লাগল।

নিবেদিতা 'মুক্তিমশাল' হাতে নিয়ে অন্ধকার পথ আলোকিত ক'রে এগিয়ে চললেন।

পেছনে ছুটছে মুক্তিসংগ্রামী জনসমুদ্র।

আচম্বিতে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রব্রাজিকা জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন — এখন আর অন্য কিছু করার নেই। এখনকার কাজ হবে সশস্ত্র বিপ্লব।

অরবিন্দ এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়ে এ শক্তিকে অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তিবলে বিপ্লবীকে উপলব্ধি করতে হবে, মা মহামায়ার হাতে সে কেবল যন্ত্রমাত্র। সেই মহাশক্তির আদেশেই সে চালিত হচ্ছে। তিনি যা করাচ্ছেন, সে তাই করছে। তিনি যা করাবেন, সে তাই করবে। তার নিজের বলে কিছু থাকবে না।"

নিবেদিতা বললেন,—"অরবিন্দের যুক্তি অকাট্য। 'আমার' অস্তিত্বের সবটুকুই তো পরম পিতার চরণে নিবেদন ক'রে দিয়ে 'স্বদেশীকে' গ্রহণ করতে হবে জীবনের ব্রতরূপে। আত্মনিবেদন আর আনুগত্যতেই হবে এ ব্রতের উদ্‌যাপন। স্বদেশই যে সাক্ষাৎ

জগন্মাতা। অরবিন্দ নিজেও যে তাই উপলব্ধি করেছেন! তাঁর কাছে স্বদেশ কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়। তোমাকেও তাই উপলব্ধি করতে হবে। তোমাদের কোন চিন্তা নেই। অরবিন্দের ওপর নির্ভর কর। তিনি রথের সারথি হবেন।"

'ভগিনী নিবাস'

১৭, বোস পাড়া লেন, বাগবাজার, ক'লকাতা।

নিবেদিতা থাকেন এই বাড়িতে। এইখানেই জন্ম নিয়েছে বাঙলার একটি বিশেষ বিপ্লব কেন্দ্র।

স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা এই স্থান থেকেই বাঙলার তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বদেশী এবং বিপ্লবে। গুপ্ত সমিতির পীঠ স্থান ১৭ নম্বর বাড়িটি। যত কিছু গুপ্ত পরামর্শ ভগিনী নিবাসেই দানা বাঁধছে।

বিবেকানন্দের লোকান্তরের পর নিবেদিতা বেরিয়ে পড়েছিলেন গুরুদেবের ধ্বজা নিয়ে তা আগেই বলেছি।

সে এক দীপ্তিময়ী মূর্তি। যেন সদ্যঃ প্রস্ফুটিত শ্বেত কমল। অমল ধবল বসনে দেহ-বল্লরী আচ্ছাদিত, গলদেশে সদা দোদুল্যমান রুদ্রশক্তি রুদ্রাক্ষের মালা। শিবের পিনাক, যেন নিজ হস্তে তুলে দিয়ে গেছেন, স্বামীজী শিষ্যার দক্ষিণ পাণিতে। সেই সঙ্গে নিবেদিতা তুলে নিয়ে ছিলেন, বিবেকানন্দের ব্যবহৃত সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের চাবুকখানি বাম হস্তে। এই চাবুক দিয়েই বিবেকানন্দ বাঙালী জাতির ক্লীবত্ব দূর করতে চেয়ে ছিলেন। যার বিদ্যুৎ রশ্মির আস্ফালন অসাড় যুব-শক্তিতে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল।

এই জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তিশালিনী নারী, হীনবীর্য অবসন্ন প্রায় সাত কোটি বাঙালীর অন্তরে, স্বামীজীর ধিক্কারের বেত্রখানি বারংবার কষায়িত ক'রে নব চেতনার অনুভূতি জাগালেন।

প্রয়োজনে জ্বালাময়ী ভাষায় তিরস্কার করেন-ধিক্কার দেন, আবার

কোন সময়ে মাতৃ সুলভ স্নেহের আচ্ছাদনে প্রতিটি বাঙালীকে হৃদয়ের মাঝে টেনে নেন।

মহাশক্তির সংস্পর্শে তরুণ বাঙালীর শিরায়-উপশিরায় ছুটে চলল এক প্রবল শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ রশ্মি।

এইবার সসস্ত্র বিপ্লবের হাতিয়ার নিয়ে তারা একতা বদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্ম্মযজ্ঞে।

স্বদেশী আন্দলনে নিবেদিতা ; আবার বিপ্লবের পিচ্ছিল পথে ভয়ভীতি হীনা নিবেদিতাকে দেখে অরবিন্দ বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছেন। ......এই সেই নিবেদিতা যিনি বাঙলা তথা ভারতকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে জীবন উৎসর্গ করেছেন? ইনিই সেই দীপ্তিময়ী বিদেশিনী যিনি, বিপ্লবী যুবকদের বিদেশে পাঠিয়েছেন বোমা তৈরী শিখে আসতে। ইনিই 'যুগান্তরের' তরুণ বিপ্লবীদের সর্ব্বদা উৎসাহিত করেছেন। ইনিই সেই ব্রতচারিনী যিনি সংগ্রামের জন্যে ঝুলি ভরতি করে অর্থ সংগ্রহ করে আনছেন। অদ্ভুত এঁর ভবিষ্যৎ চিন্তা। ইনিতো যুবসম্প্রদায়কে ডেকে বলেছেন—"সন্তানদল হাতিয়ার তুলে ধর, ঝাঁপিয়ে পড় সংগ্রামে।"

অরবিন্দ মনে প্রাণে উপলব্ধি করলেন, স্বামীজীর মানস কন্যাই বটে নিবেদিতা! বাঙলার জন্যে যাঁর এত দরদ তিনি তো যেমন তেমন নারী নন। কাজ ইনিতো অনেক দূরই এগিয়ে রেখেছেন। এখন উপযুক্ত চালক হলেই হয়।

॥ সাতাশ ॥

বরোদায় গায়কোয়াড়কে অরবিন্দ বলেছিলেন—'বাঙলায় যাচ্ছি কলেজের অধ্যাপনা করতেই নয়। যে গুরুদায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত, তাকে আমার হাসিল কবতেই হবে। পরে সব জানতে পারবেন।'

ন্যাশনাল কলেজের (বর্ত্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষের কাজ ; অধ্যাপনা করা ছাড়াও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর কর্ম্মব্যস্ততা।

ছাত্ররা অধ্যক্ষের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারল এ যে এক বিরাট্ কষ্টি পাথরের খনি। নকল সোনার স্থানতো এখানে হবে না। মেকীটি তাঁর কাছে ধরা পড়ে যাবে। আসলকে তিনি ঠিকই খুজে বার করবেন।

ছাত্রদের সামনে তিনি মহাবীর্য্যবান্, একনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, মহাজ্ঞানী, আধ্যাত্ম চেতনা সমৃদ্ধ শিক্ষা গুরু।

ক্লাসেব পড়ার মধ্যে দিয়ে তিনি আসল কাজটিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ছাত্রদের উপদেশ দেন-"দুষ্টব্রণ হয়ে বেঁচে থাকায় কোন সার্থকতা নেই। অনেক সুকৃতির ফলে আমরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। জীবনকে উপলব্ধি কর। আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ কর। বীর্য্যবান্ তেজস্বী হও। উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে বাঙলার ছাত্র সমাজকে তোমায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই আত্মবিশ্বাস লাভ করবে ; অন্তরে পরম তৃপ্তি অনুভব করবে। মায়ের চরণে আত্মবিসর্জ্জনই তোমাতে এনে দেবে মহাশক্তি। মা ভবানী অলক্ষ্যে তোমার মনের ভেতর এক ঘোরতর বিপ্লবের সৃষ্টি করবেন। আগুনে পুড়ে পুড়ে তোমাকে হতে

হবে খাঁটি সোনা। আমি তোমার কাছ থেকে সেই আশাই করব। দেশে, তোমার মত খাঁটি সোনার চাঁদ, ছেলেকে পাওয়ার জন্যে মা চোখের জল ফেলছেন। তা উপলব্ধি করছ কি? 'মা'কে শৃঙ্খল মুক্ত যে তোমাকেই করতে হবে!"

ঋষি অরবিন্দের সান্নিধ্যে যে একবার আসে, সেই যেন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তরুণ চিত্তে বিপ্লবের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। পতঙ্গের মত দলে দলে ছুটে এসে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। সবাই চায় ভবানীমন্দিরের পূজারী হতে।

'বন্দেমাতরমে' অরবিন্দকে সায়েস্তা করতে না পাবায়, সরকারের নজর পড়ল 'ন্যাশনাল কলেজের ওপর। ওৎ পেতে ব'সে আছে কি ক'রে অরবিন্দকে পাকড়াও করা যায়। সব জেনেও কিছু করতে পারছে না, কারণ একবার অপদস্থ হয়েছে।

বিদ্রোহীর কলমের মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে। সে আগুনে দগ্ধে মরছে ইংরেজ।

আধ্যাত্মিক দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রতিটি লেখা চমৎকার ভাবে গ্রথিত ব'লে, তারা অরবিন্দের গায়ে হাত দিতে পারছে না।

অরবিন্দ দেখলেন, ধূর্ত্তজাতটা অন্য কোন উপায়ে না পারুক ন্যাশনাল কলেজের অজুহাতেই তাঁকে জেলে পুরবে, জনসাধারণকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। তাই, বছর খানেক পার হতে-না-হতেই, তিনি ন্যাশনাল কলেজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন, পরের বছর আগষ্ট মাসেই।

আর একটি বিশেষ কারণে তাঁকে সবে আসতেই হোত। যেটি বাঙলার রাজনীতিতে নিবেদিতার আকর্ষণ।

'ষ্টেট্‌সম্যান্' নানা ভাবে রাজশক্তিকে অরবিন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে চলেছে, কিন্তু আইনের ফাঁক রেখে অরবিন্দ তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ায়, সে প্রচেষ্টায়ও ফল হ'ল না কিছু।

এখানে আর একটি বিষয় সরকারকে গোল বাধিয়ে ছিল, যেটি

হ'ল, অরবিন্দের ইংরিজী লেখার ভঙ্গিকে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সুন্দর ভাবে রপ্ত করে ছিলেন। সব সময়ে তাই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হোত লেখাটি সত্যিই কার কলমের!

অরবিন্দ সরে আসার পর সতীশ চন্দ্রই ন্যাশনাল কলেজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

প্রায় দু'বছর জড়িয়ে ছিলেন অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের ঐপদে স্বল্পতম পারিশ্রমিকে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর, ছেলেগড়া। সে কাজ ব্যাহত হ'ল না। উদ্দেশ্য তাঁর সফল হ'ল।

এই কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে সুবোধ মল্লিকের দেখাদেখি ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী দিয়েছিলেন, পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি। সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী দিয়েছিলেন আড়াইলক্ষ টাকার সম্পত্তি।

স্যার গুরুদাস, কলেজের নিয়মাবলী রচনা ক'রে ছিলেন। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটে তিনি বিরোধিতা করলেন। এই সূত্রে তিনি বললেন—"জাতীয় শিক্ষা জাতীয় ভাবধারাতেই নিয়ন্ত্রিত হবে, জাতীয় শিক্ষা সরকারী শিক্ষা হ'তে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে, তৎকর্ত্তৃক কবলিত হয়ে শঙ্কব ভাবাপন্ন হবে না, কিন্তু তার সঙ্গে কোন বিরোধিতাও করবে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান অবস্থায় এটাই জাতীয় শিক্ষার সুচিন্তিত নিয়তি।"

জাতীয়-পরিষদ তাঁর সমস্ত যুক্তিই মেনে নিল।

পরিষদের কাজকর্ম কিন্তু সরকারের নজর এড়িয়ে গেল না। ক্রুর দৃষ্টি রেখে চলল এর ওপর।

গুরুদাস তা গ্রাহ্যও করলেন না। তিনি পরিষ্কার ভাবে তাদের জানিয়ে দিলেন—"আমাদের দেশের বালক এবং যুবকবৃন্দকে আমাদের মতানুযায়ী শিক্ষা দেব, এতে কারো বাধা দেবার অধিকার নেই-কারো বাধামানতেও আমরা বাধ্য নই।"

স্যার গুরুদাসের অনুরোধে, স্যার রাসবিহারী ঘোষ এই জাতীয়-পরিষদের সভাপতি হলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রাসবিহারী এর বিশেষ উন্নতি সাধনে কুড়ি লক্ষটাকা দিয়ে গেলেন।

কলকাতার অনুশীলনসমিতি এখন ভারতীয় বিপ্লবকে পথ দেখাল। বাঙলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জায়গায় জায়গায় বিপ্লবের আগুন জ্বলল।

এই ১৯০৬ সালেই পুলিনদাস পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকায় বিপ্লবী নেতার স্থান অধিকার করে অর্থ সঞ্চয়ের দিকে নজর দিলেন। মতলব। এই অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবেন। তারপর ভারত উদ্ধারে লেগে পড়বেন।

কিছুকাল আগে পি. এন. মিত্র আর বিপিন পাল ঢাকায় এসে বিপ্লবের বেদী গড়ে গেছেন। অতন্দ্রপ্রহরী পুলিন দাস বেদী পাহারা দিয়ে এসেছেন এতদিন। এখন সেই বেদীকে দুর্গে পরিণত করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন।

অনুশীলন সমিতির শেকড় ক্রমে বিস্তার লাভ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গের জেলা গুলোকে আঁকড়ে ধরল।

ইংরেজের ক্রীড়নক ঢাকার নবাব সলিমুল্লা, মুসলমানদের উস্কানি দিচ্ছে—"লাগাও দাঙ্গা হিন্দুদের সঙ্গে।"

পুলিন দাসের, হিন্দু-মুসলমান বিপ্লবীদল সলিমুল্লার কুমতলবকে ধূলিস্মাত করে দিল। 'অনুশীলন সমিতি' মেতে উঠল অর্থ সংগ্রহে। অত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? পি. এন. মিত্র প্রভৃতির কাছ থেকে যা টাকা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে তো সমিতিই চলে না! স্থির হ'ল যাদের টাকা আছে তাদের বাড়ি লুঠ করতে হবে।

ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, বন্দুক চালাতে শিখলেই তো ডাকাত হওয়া যায় না! ভদ্র ঘরের সন্তানরা দস্যুবৃত্তি করতে গিয়ে ব্যর্থ

প্রচেষ্টায় ফিরে এল।

সেপ্টেম্বর মাসে এক বিত্তশালিনী বিধবার বাড়ি লুঠ করতে গিয়ে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গতে না পেরে বোকা বেনে ফিরতে হ'ল তাদের।

'রাউলাট এক্ট' লিখল, যুবকদের এই ব্যর্থতার কথা।

ব্যর্থ তারা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কেন এ ব্যর্থতা ?

অনুশীলন সমিতি যে চাইত না বড় লোকের অর্থ লুণ্ঠন করতে গিয়ে তার প্রাণটাকেও কেড়ে নিতে।

অর্থে, বিপ্লবীদের লোলুপতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল কেন ?

সহজ সরল ভাষায় সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেত তাদের কাছ থেকে দু লাইন কবিতার ভেতর দিয়ে—

"নিবারিতে অত্যাচারে বোমা অস্ত্র হয়েছে রে।
দেশভক্ত এতে ক'রে শোধ লও হে অত্যাচারে ॥"

এই তো ছিল তাদের মন্ত্র।

॥ আঠাশ ॥

বাঙলা ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক'রে বাঙলার দুটো দলের কোন্দল দস্তুর মত জট পাকিয়ে উঠল। মডারেট ও এক্সট্রিমিষ্ট-নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে।

দেশ তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। এখানে সেখানে ইংরেজ খুন হতে লাগল।

গতিক বিশেষ সুবিধে না দেখে কার্জ্জন ভারতবর্ষ ছেড়ে সরে পড়লেন, দুটো দলে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে।

নরমপন্থীদের পদলেহী মনোভাব ত্যাগ করাবার উদ্দেশ্যে বিপিন পাল, বিরাট এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন—'আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার, মূল, ভিত্তি সম্বন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—'স্বদেশী-সমাজ, সম্বন্ধে।'

এই লগ্নেই গ'ড়ে উঠল, চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতে, 'স্বদেশী-মণ্ডলী' বিপিন পালের নেতৃত্বে!

কাশী-কংগ্রেসেই বয়কট বৈধ ব'লে গৃহীত হয়েছিল।

এই কংগ্রেস অধিবেশনে, সভাপতির আসন থেকে গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন ক'রেছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই আন্দোলন সুরু করবার জন্যে আহ্বানও জানিয়েছিলেন।

'স্বদেশী মণ্ডলীর কয়েকজন নেতাও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা হলেন ভগিনী নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি।

সবাই জানে গোখলে নরমপন্থী, কিন্তু এই কংগ্রেস অধিবেশনে

তাঁর সেভাবের কোন লক্ষণই দেখা দেয়নি। বাঙলাকে তিনি ভাল বাসতেন। তবুও অরাবন্দ তাঁকে দেশদ্রোহী-বিভীষণ বলতে ও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করলেন না।

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অরবিন্দকে আমরা বল্গাহীন অবস্থায় দেখতে পাই। তিনি নিজে যা ভাল বুঝতেন তাই ক'রে বসতেন; কোন যুক্তি তর্কের দ্বারা বিষয়টি সমাধান করবার অবকাশ বা মনোভাব তাঁর ছিল না।

'প্যাসিভরেসিসট্যান্সের' রূপকার ছিলেন অরবিন্দ।

তাঁব 'নোকম্প্রোমাইজ' পুস্তিকা পাঠ ক'রে সুরেন্দ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। ছিলনা পুস্তিকাতে গ্রন্থকারের নাম। বইটি আসে বিপিন পালের কাছে স্বদেশী মণ্ডলীব মাধ্যমে।

অরবিন্দেব প্রথম চিন্তাই ছিল বিপ্লব এবং গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তোলা, পরে চিন্তা করেছেন নিক্রিয়প্রতিবোধ।

নিক্রিয়প্রতিরোধে বিপিন পাল ছিলেন অগ্রগামী।

ন্যাশনাল কলেজ থেকে অরবিন্দের সরে আসার সঙ্গে সঙ্গে, রাজনীতির সমস্ত ভার গিয়ে চেপে ধবল তাঁকে।

দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে চলেছেন। প্রতিটি গুরুতর বিষয় তাঁকে সমাধান করতে হচ্ছে।

এই অমানুষিক পরিশ্রমের দরুণ তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে অত্যস্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডিসেম্বরের আগে আর সেরে উঠতে পারলেন না। অসুস্থ হয়ে তিনি দেওঘরে চলে গেলেন। মাঝে কিছুদিন সারপেনটাইন লেনে শ্বশুর বাড়িতে থেকে শরীরটাকে সারিয়ে তুলবাব চেষ্টা করলেন।

উপেন্দ্রনাথ এসে ঢুকেছেন যুগান্তরে; তাও বেশ কিছুদিন হ'ল।

তারপর, ১৯০৭ সালে তাঁর একটা লেখা থেকে আমরা জানতে

পারলাম যুগান্তর দলের আসল রূপটা কি ছিল।

—তখন বারীন ঘোষের বিপ্লব কেন্দ্র এই যুগান্তর অফিস।

উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন— "১৯০৬ খৃষ্টাব্দের শীতকাল। কলিকাতার যুগান্তর অফিসে আসিয়া দেখিলাম, তিন-চারটি যুবক মিলিয়া একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলী গোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।..দেবব্রত যুগান্তরের সম্পাদকিয়তায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলের সংসারের গৃহিনী বিশেষ। বারীন্দ্র তখন দেওঘরে পলাতক। —পরে বারীনের সহিত দেখা হইবার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই হইবে। ভূপেনের কারা দণ্ডের পর যুগান্তর সম্পাদনার ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম, মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের কথা বাহির করিতেছেন। হুহু করিয়া যুগান্তরের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হইতে দশ, দশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল। একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল, যুগান্তরে, যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহ সূচক ; ভবিষ্যতে এরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা তো হাসিয়াই অস্থির। আইন কিরে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট্, গভর্নমেন্ট হাউসের উত্তরাধিকারী। আমাদের আইন দেখায় কেটা?"

স্বদেশীর ঢেউ সহসা থমকে দাঁড়িয়ে সন্দিহান দৃষ্টিতে কি যেন নিরীক্ষণ করছে।

ইতিমধ্যে ক্ষয় রোগ বাঙলা মায়ের বুকটার ভেতর ঝাঁজরা ক'রে দিয়েছে। অন্তর্নিহিত অসহ্য বেদনা সময়ে-সময়ে তার মুখটার ওপর যেন কালী ঢেলে দিচ্ছে। রোগের গুরুত্বে চিকিৎসকের কোন সন্দেহ নেই। রোগের সম্বুক গতি সহসা বন্ধুব পথকে বিধ্বস্ত ক'রে দ্রুত গতিতে ছুটে চলল।

সন্তানের চোখে জল। সকলেই মায়ের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মায়ের রোগ যন্ত্রণার উপসম তাদের করতেই হবে। এই তীব্র বিষ যারা মায়ের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের ওপরেই যত রাগ।

ঐ ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে সন্তানদল দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ এটির ওপর আর বেশী হামলা করতে না পাবে। যদি বা কেউ এগিয়ে আসে, তাকে তারা খতম না ক'রে ছাড়বে না।

মাকে বাঁচিয়ে তুলতে তারা উঠে প'ড়ে লেগেছে।

এই আঘাতের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দল ক্ষিপ্ত সার্দ্দুলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

বলে না এরা কাউকে কিছু, কি ভাবে এই জ্বালা মেটাবে! পাশের লোককে দেখলেও এরা শিউরে উঠছে। বিশ্বাস এমনই বস্তু! সর্ব্ব ক্ষেত্রে বিশ্বাস হারিয়েছে এরা। এমনই মনের গতি, নিজের দক্ষিণ হস্ত কি করছে তা বাম হস্তকেও জানতে দিচ্ছে না। নিজের লোক জেনেও, এরা একে অপরকে আড়াল ক'রে চলতে চাইছে। আপন আপন দায়িত্বে কাজ ক'রে চলেছে।

গুরুতর গুপ্ত হত্যা সুরু হয়ে গেল।

সংবাদ লোক মুখে বা খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেলেও সুত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কে করছে? কেইবা করল?

হঠাৎ একদিন সংবাদ পত্রের শিরোনামায় বড় বড় হরফে দেখা

গেল, গোয়ালন্দ ষ্টেশনে, মিষ্টার এ্যালেনকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

কে করল? সকলের মনে ঐ একই জিজ্ঞাসা। নিশ্চয় কোন বিপ্লবীতরুণ? এছাড়া হতেই পারে না। চতুর্দ্দিকে জল্পনা কল্পনা। সরকার হন্যে কুকুরের মত ছুটে বেড়াচ্ছে আততায়ী সন্ধানে। বন্দুক উঁচিয়েই আছে, পেলেই গুলী করবে। যারা মায়ের চরণে আহুতি দেওয়ার জন্যে রুধিরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারাও তো জানে না কে এই বিদ্রোহী। যারা বুঝবার, তারা ঠিকই বুঝল।

—তবে কি দামামা বেজে উঠল?

গোপনে ঘর ছাড়ার হিড়িক প'ড়ে গেল তরুণদের।

কিন্তু? দীক্ষা দেবে কে? কে এই গুরু?

কোথায় ভবানী মন্দির? কোথায় মা ভবানী? মায়ের রূপই বা কি? মন্ত্রই বা কি?

পথভ্রষ্ট.যুবকের দল ছট্ ফট্ ক'রে ঘুরছে, কোথায় সেই ইষ্ট দেবীর দেখা পাবে।

॥ উনত্রিশ ॥

মতিলাল কানাইলালের দিকে চোখ ফেরাতেই কানাই হেসে বললে—কি দেখছ ?

মতিলাল জিজ্ঞাসু নয়নে প্রশ্ন করলে—এ সব কি ?—এ যে স্বপ্ন !

কানাই এক মুখ হাসি হেসে বললে—এমন স্বপ্ন এখন থেকে রোজই দেখবে ! এতদিন যা অসম্ভব বলে মনে করেছ, এখন থেকে তার সবটাই বাস্তব বলে জানবে। প্রস্তুতি পর্ব্ব সুরু করে দাও। কাজে নেমে পড়া যাক, লাভ লোকসান পরে খতিয়ে দেখা যাবে'খন।

কদিন যেতে না যেতেই কুষ্টিয়াতে আবার এক ঘটনা। ইংরেজ ধর্ম্মযাজক বিকেনবোথাসের ওপর গুলী চলল।

লোকটা তো খারাপ ছিল না ! তবে কেন তার ওপর এই আক্রমণ ?

মতিলাল বললে—খুব অন্যায়। নিরীহ লোককে মেরে কি লাভ ? এ আমি কিছুতেই সমর্থন করি না।

তড়িৎ প্রবাহে কানাইয়ের মুখ মণ্ডলের পটভূমিকার আমূল পরিবর্ত্তন মতিলাল লক্ষ্য করল।

বিশেষ গম্ভীর ভাবে সে উত্তর দিলে—তুমি যেটাকে অন্যায় ব'লে মনে করছ, যে এটা ঘটাচ্ছে, সে তো তা মনে নাও করতে পারে। বুঝতে পারছ না দিকে-দিকে সন্ত্রাস-বাদের সৃষ্টি হচ্ছে। ...এখন কি দেখছ ! সবে তো সুরু। অনেক নতুন কিছুই দেখবে দিনের পর দিন। সংগ্রাম কেবল সুরু হয়েছে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে, সেটা বোঝ না কেন ?

বাছাবাছির সময় নয় এখন। বুঝতে পারছ না বাঙালী, ব্রিটিশের অত্যাচারের প্রতি শোধ নিতে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে। উচ্ছল তরঙ্গ। এ তরঙ্গ রুধিবে কে ?

বুঝতে পারছ না হিংসার স্পর্শে বাঙলার যুবকরা সম্মোহিত!

ওদিকে তিলকের 'কেশরী'র হুঙ্কারে তখন সারা ভারত কাঁপছে।

বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনকে কেশরী সর্ব্বভারতীয় কার্য্যক্রম ব'লে তরুণ মনে আঘাত হানতে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এর জন্যে যথেষ্ট নির্য্যাতন সহ্য করতে হ'ল সরকারের কাছ থেকে-কেশরীকে।

ক'লকাতা মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণে চাঁপাতলায় 'যুগান্তর' অফিস।

একজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে খানিক বারুদ সংগ্রহ ক'রে অতি সংগোপনে কানাইলাল বারীন্দ্রের কাছে এসে হাজির হ'ল। একদিকে 'যুগান্তর' প্রকাশের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে বারীন্দ্র কুমার সোডার বোতলে বারুদ ঠাসছে। বোমা তৈরীর আদিপর্ব্ব সুরু করেছেন বারীন্দ্র এই ভাবে।

ব্যাপার দেখে কানাইলাল মনে মনে ভা-রী খুসী হ'ল। আনন্দে মনটা যেন তার ভরে উঠল।

নির্ভীক বারীন্দ্র এক রকম প্রকাশ্যেই এ কাজ আরম্ভ ক'রে ছিলেন। কোন লোকেরই এখানে আসার বাধা ছিল না। ক'লকাতার বাঙালীদের ধারণাই হয়নি বিপ্লবের সূচনা এখানে এমনি ভাবে হ'তে পারে, তাই তাদের এদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

চন্দননগরে কানাইলালের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সে ভাল ভাবেই জাল বুনেছে। বারীন্দ্রের কাছে সব কথাই সে খোলাখুলি ভাবে বলল'।

ছেলেদের নিয়ে তাকে তৈরী থাকতে বললেন বারীন্দ্র। সময় হলেই খবর পাঠান হবে। আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। খুসী মনে কানাই বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

॥ ত্রিশ ॥

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সভার অধিবেশনে তিলকের পাণ্ডিত্য ও তাঁর ওপর উৎপীড়নের কথা উল্লেখ ক'রে স্বদেশী মণ্ডলীর নেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে অরবিন্দ চাইলেন, এবারকার কংগ্রেস সভাপতি হবেন তিলক। চরমপন্থী নেতারা এক বাক্যে তা অনুমোদন করলেন।

'বন্দেমাতরমে' প্রচার সুরু হয়ে গেল তিলকের পক্ষ সমর্থন ক'রে।

এই সব দেখেশুনে মডারেট নেতা ভুপেন্দ্র নাথ বসু চুপি চুপি দাদা ভাই নৌরাজীর কাছে, কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার জন্যে চিঠি লিখলেন বিলাতে।

নৌরাজী এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ নৌরাজী সভাপতি হওয়ায় চরম পন্থীরা যদিও আপত্তি করতে পারলেন না, কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেন। বুঝলেন, এঁকে দিয়ে কোন সুফল হবে না।

হ'লও ঠিক তাই।

মডারেট-সভাপতি দাদা ভাই নৌরাজী, কংগ্রেস অধিবেশনে বয়কটের কথা বললেন না। চাইলেন-ঔপিনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। পূর্ণ স্বাধীনতার কথা মুখে আনলেন না।

শুধুই কি বয়কট? চরমপন্থীরা পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চ্ছেদ করবার মনঃস্থ করে ছিলেন, কিন্তু মডারেটরা সে যুক্তি না মানায় চরমপন্থীরা বিষয় নির্ব্বাচনী সভা পরিত্যাগ ক'রে উঠে এলেন। অরবিন্দ এর নেতৃত্ব করলেন।

ক'লকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের ঠিক পরেই ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে সরকারের উস্কানিতে 'মুসলিম লীগের' জন্ম হ'ল।

দাঙ্গা বাধল হিন্দু-মুসলমানে।

মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে সলিমুল্লা সম্ভবপর সব কিছু কুমতলবকে এগিয়ে দিলেন।

শাসক ইংরেজ ভাবল হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেছে,—এবার বোঝ্ বেটারা বিপ্লব কাকে বলে। হাড়ে হাড়ে টের পাবি'খন! নিজেরা মারামারি কাটাকাটি ক'রে মর, আমরা তফাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দেব। তেমন বুঝি, দাঙ্গাব অজুহাতে বেশ কিছুকে গুলীকরে সাবড়ে দেব। এই সুযোগে নাকে তেল দিয়ে মাঝে মাঝে দিব্বি ঘুম দেব; তখন তো আর আমাদের পেছনে লাগতে আসবিনা! ঘর সামলাবি, না সরকারকে খোঁচা দিবি?

সলিমুল্লা, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলী মীর্জ্জার কাছে গোপন পত্র পাঠালেন, 'মুর্শিদাবাদে দাঙ্গাবাধাও'।

নবাববাহাদুর-মুর্শিদাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।

সলিমুল্লাব কুপরামর্শ ফাঁস হয়ে গেল, খবরটা বেরিয়ে পড়ায় বাহিরে।

শোনাযায়, নবাব বাহাদুর মুর্শিদাবাদ ওয়াসিফ আলীমীর্জ্জা, নবাব সলিমুল্লার চিঠির জবাবে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন—"আমার জমিদারীর ভেতর তা কোন দিনই হ'তে দেব না। হ'তে পারে না। যদি কেউ আমার জমিদারিতে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবাব চেষ্টা করে, তবে উপযুক্ত শাস্তি তাকে পেতেই হবে এখানে। আমি সবকার চিনি না।"

তিনি নিজের জমিদারীতে এই মর্ম্মে এক প্রচার পত্রও নাকি পাঠিয়েছিলেন প্রজাদের হুসিয়ার ক'রে।

ওয়াসিফআলী ঢাকার নবাবকে এও লিখেছিলেন—"আপনার সুবুদ্ধির উদ্রেক হোক। আমার মনে হয় একটি পায়রা তার দুখানি পক্ষের সাহায্যে উড়ে উড়ে অনেক খেলাই দেখাতে পারে, কিন্তু

পায়রাটিব দুখানি ডানার একখানি যদি খোয়া যায় সে কি আর উড়তে পারবে? কাজেই আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন। মুসলমানদের মনে হিন্দু বিদ্বেষের আগুন জ্বালাবেন না। দেখবেন ফল ভাল হবে।”

ওয়াসিফ আলীর এই নীতিবাক্য কিন্তু সলিমুল্লাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করল না।

১৯০৭ এর মার্চ্চ-এপ্রিলে কুমিল্লার জামালপুরে ভীষণ দাঙ্গা বাধল হিন্দু-মুসলমানে। তলিয়ে যেতে বসল স্বাধীনতার সকল প্রচেষ্টা।

‘বন্দেমাতরমে’ অরবিন্দ মর্ম্মস্পর্শী তেজোদীপ্ত সম্পাদকীয় লিখলেন।

সরকারের এক তরফা সহায়তায় দাঙ্গার বলী হ'ল হিন্দুরা। হিন্দু-রমনী ধর্ষিতা, গৌরীপুরকাছারী লুঠ, দেব-দেবী বিগ্রহ বিধ্বস্ত হ'তে লাগল পূর্ব্ববঙ্গে। খুন জখম একের পর এক।

নেতাদের মুখ থেকে প্রতিবাদ উঠল দিকে দিকে।

সুযোগ বুঝে সরকাব চরমপন্থীদেব কণ্ঠ রোধ করতে উঠে প'ড়ে লাগল।

সংবাদপত্রের অফিসগুলো তছনছ করল।

২রা জুলাই ‘যুগান্তর’ অফিসে ব্যাপক খানাতল্লাসী চলল। ৫ই তারিখে স্বামীজীর ছোট ভাই যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেন দত্তকে গ্রেপ্তার ক'রে, ২৪শে জুলাই বিচারে, একবছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে কিংসফোর্ড জেলে পাঠালেন।

ফিরিঙ্গীর এই স্পর্দ্ধা দেখে বিপ্লবীরা রাগে গর্জ্জাতে লাগল।

এই সব দেখে ক'লকাতার নারীসমাজও প্রতিবাদে গর্জ্জে উঠল।

‘সঞ্জীবনী’-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহধর্ম্মিনী লীলাবতী মিত্রের পৌরোহিত্যে ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়িতে ১৩১৪র ২৪শে শ্রাবণ নেতৃস্থানীয়া দুই শতাধিক মহিলা একত্রে সমবেত হয়ে ইংরেজের এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং ভূপেন্দ্রের বৃদ্ধা জননী ভুবনেশ্বরী দত্তকে সভায় আহ্বান জানিয়ে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান

করলেন। ডাঃ প্রাণ কৃষ্ণ আচার্য্যের পত্নী সুবালা আচার্য্য এটি পাঠ করে ভুবনেশ্বরীর হাতে তুলে দিলেন বঙ্গনারীসমাজের তরফ থেকে।

৩০শে জুলাই 'বন্দেমাতরম্' অফিসে পুলিস হানা দিল। সম্পাদকীয়তে রাজদ্রোহের অজুহাতে, ১৬ই আগষ্ট অরবিন্দ ঘোষের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল'। তিনি চিফপ্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আত্মসমর্পণ করলেন পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জামীন হয়ে গেল।

১৯শে আগষ্ট ঐ পত্রিকার ম্যানেজার হেমচন্দ্র বাগচী এবং ২১শে আগষ্ট প্রিন্টার অপূর্ব কৃষ্ণ বসুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হ'ল।

২৬শে আগষ্ট অরবিন্দের মামলা উঠল চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে। ঐ কাগজের দুটি সংখ্যার দুটি লেখাই, অরবিন্দ ঘোষের লেখা ব'লে প্রমাণিত হ'ল না। ২৭শে এবং ২৮শে জুন লেখা দুটি বন্দেমাতরমে' বেরিয়েছিল।

বিপিন পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। ঐ কারণে ১০ই সেপ্টেম্বর, আদালত অবমাননায় বিপিন চন্দ্র পালের ছ'মাসের জন্যে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। তাঁকে পাঠান হ'ল বক্সা জেলে।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' মামলায় প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করেন।

অরবিন্দের এই মামলা চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ-কবিতার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। হে বন্ধু! হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি!···

শত চেষ্টা ক'রেও সরকার এবারেও অরবিন্দকে জেলে পুরতে পারল না।

চিত্তরঞ্জন দাস আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা ক'রেছিলেন।

৩১শে আগষ্ট ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং 'সন্ধ্যা'র ম্যানেজার সারদা চরণ সেনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল।

'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' 'সন্ধ্যা'র এই প্রবন্ধের ওপর সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে গভর্নমেণ্ট। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস আসামী পক্ষের কৌঁসুলি। চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের কোর্টে মামলা উঠল। আসামীর বক্তব্য রাখলেন কৌঁসুলি—

"আমি 'সন্ধ্যা'র এবং 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত আপত্তি জনক প্রবন্ধটির সমগ্র দায়িত্ব স্বীকার করছি, কিন্তু এই অবিচারে আমি কোন অংশ গ্রহণ করতে নারাজ। কারণ আমি বিশ্বাস করি—ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্বরাজ ব্রতের সাধনে আমি সামান্য যে অংশটুকু গ্রহণ করেছি সেজন্য আমি বিদেশী শাসকের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নহি।" তিনি এও বললেন—

"ফিরিঙ্গীর সাধ্য নেই আমাকে জেলে পাঠায়।"

মামলা চলা কালেই ১৯০৭ সালে ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে (বর্ত্তমান এন. আর. এস. হাসপাতালে) ব্রহ্মবান্ধব পরলোক গমন করলেন।

ক'লকাতার এক তরুণ সুশীল সেন, কোর্টের মধ্যে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়ায় কিংসফোর্ড হুকুম দিলেন, সুশীল সেনকে কোর্টের মধ্যেই হুইপিংষ্টাণ্ডে বেঁধে বেত্রাঘাত করতে।

এই নির্ম্মম বেত্রাঘাতের ফলে বিদ্রোহী যুবকরা প্রতিকারের পথ খুঁজতে লাগল। অরবিন্দ বললেন—"এই অত্যাচারকে আমরা মহৎ কষ্ট স্বীকার দ্বারা বরণ করিয়া লইব, ফলে এমন আগুন জ্বলিবে যে, সিন্ধু ও গঙ্গা এই দুই নদ-নদীর জলেও এই আগুন নিবিবে না।"

আইন পাস হ'ল, সভাসমিতি করতে হ'লে সাতদিন আগে সরকারী অনুমোদন লাভ করতে হবে।

মডারেট নেতা গোখলেও এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।

একের পর এক রাজদ্রোহের মামলায় নেতাদের হয়রানি সুরু হ'ল।

দু সপ্তাহ পর যুগান্তরের প্রিণ্টার বসন্তকুমার গ্রেপ্তার হলেন।

বারীন্দ্র বললেন—"সংবাদপত্রের মাধ্যমে শক্তিক্ষয় ক'রে কোন লাভ হচ্ছে না। ইংরেজ এতে কাবু হবে না। কাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে।"

বহু সংখ্যক দেশ সেবক একে একে দণ্ডিত হ'তে থাকলে বারীন্দ্র স্থির ক'রে ফেললেন, বোমার দ্বারাই এর প্রতিবিধান করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

অরবিন্দ তা অনুমোদন করলেন।

বারীন্দ্র কোথাও জি. বারোনি, কোথাও বুমেন বাবু আবার কোথাও বারোনি বাবু পরিচয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। সঙ্গে বারীন্দ্র কুমার নাম তো আছেই! যাঁর কাছে যে নামে পরিচয় দিলে নিজের কাজটা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে সেইভাবে, তিনি নানান ছদ্ম নামে পরিচিত হলেন। দেশের নেতৃবৃন্দের দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন, এবং সুযোগমত উপযুক্ত কর্ম্মী জোগাড় করতেও সুরু ক'রে দিলেন।

নেতারা এক বাক্যে স্বীকৃতি দিয়ে বললেন—"There is the national vengeance—you had better take it up."

চতুর্দ্দিক হতে উৎসাহিত হয়ে বারীন্দ্র বুঝলেন, দেশের সকলেইতো এই নীতির পক্ষপাতী। তাই তিনি তখন বললেন,—"We thought it was the voice of the nation and we have begun to make serious preparation"

এগিয়ে চলল। কাজ পুরোদমে এগোতে থাকার পর, মাঝপথে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল'। বাধা বিপত্তি যে অনেক! কেবলই কি দেশের লোক? না, বারীন্দ্র নিজেও রাজশক্তির কবল থেকে রক্ষে পাওয়ার অভিপ্রায়ে, কিছুদিনের জন্যে আত্ম গোপন করে থাকতে বাধ্য হলেন।

অরবিন্দ ধিক্কার দিলেন। কাতরে উঠলেন। বিহ্বলতা তাঁকে

ঘিরে ধরল। তিনি নীরব থাকতে পারলেন না।

দেশের এই চরম মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের যুবশক্তিকে আহ্বান ক'রে বললেন—

"ভাবী কাল তরুণের।

"এক নবীন তরুণ পৃথিবী গ'ড়ে উঠতে চাইছে। তরুণকেই গ'ড়ে তুলতে হবে সে-পৃথিবী। কিন্তু পুরাতনের মত হ'লে তা একেবারেই চলবে না। সে পৃথিবী হবে সত্যের, সাহসেব আর ন্যায়ের; সে পৃথিবী হবে বলিষ্ঠ উন্নত আশার, আর তার অবাধ পরিপূরণের। সেই পৃথিবীই আমবা গড়তে চাই!

"স্বার্থন্বেষী কাপুরুষ আর বাক্যবাগীশের দল, যারা গোড়ায় এগিয়ে আসে তারপব বিপদ কালে সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে, কোনও স্থান নেই তাদের সে-ভবিষ্যতে। যারা নির্ভীক, সরলমনা, অম্লান অকলুষ হৃদয়ের অধিকারী, সেই দুর্জ্জয় স্পৃহাবান্ তরুণেরাই হবে একমাত্র বনিয়াদ যার ওপর ভাবী জাতি গ'ড়ে উঠবে।

"যদি আদৌ আমরা বাঁচতে চাই, তা হ'লে ভারতের ব্যাহত মহান আত্মপ্রয়াসকে আমাদের আবার শুরু করতে হবে। সাহসের সঙ্গে বীর্য্যের সঙ্গে সে-কর্ম্মের ভার তুলে নিতে হবে। ভারতের সর্ব্বোচ্চ ভাব ও জ্ঞানের পূর্ণ অপরিসীম অর্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রয়োগ করতে হবে ব্যক্তির জীবনে আর সমাজে। প্রয়োগ করতে হবে তাকে আমাদের সাধারণ জীবন চর্চ্চায়, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে, আমাদের ধর্ম্মে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, চিন্তায় ও তত্ত্বে। আমাদের তাবৎ ক্রিয়া কর্ম্মে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রতিটি রূপায়ণে প্রতিফলিত করতে হবে সেই গভীর সত্যগুলিকে। আর যদি আমরা তা করি, তা হ'লে দেখতে পাব পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার পোষাকে যা-কিছু আমাদের মৌল আদর্শের দাবীদার হয়ে এসেছে তার যা শ্রেষ্ঠ তা পূর্ব্ব থেকেই আমাদের প্রাচীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আব তার পিছনে আছে আরও সুগভীর এক

সত্য, আর ও গূঢ় এক মর্ম্ম এবং আত্ম জ্ঞান। আমরা খুঁজে পাব সেখানে এক অপরাজেয় ইচ্ছার, সামর্থ্য, যা আরও উন্নত এক আদর্শকে রূপ দিতে সক্ষম। আমাদের কেবল দরকার, যেটি আমরা চিরকাল আত্মার গভীর উপলব্ধিতে জেনেছি, তাকে নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করা জীবনে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির সারমর্ম্ম আর ভবিষ্যৎ জীবন—পরিবেশের দাবী—এ দুটিকে মেলাবার গোপন রহস্য শুধু এই খানেই পাব, অন্য কোথাও নয়।

"আমাদের সকল চেষ্টা হবে এক বিরাট্ আর মহৎ পরিবর্ত্তনকে নিয়ে আসাব, তার পথ তৈরী করাব। আমরা বিশ্বাস করি, সেই পরিবর্ত্তনই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করবে, ভারতের ভবিষ্যৎকে রূপ দান করবে। সেই কাজটি নিষ্পন্ন করাই আমাদের চরম লক্ষ্য।

"আমাদের আদর্শ মানবতার এক নবজন্ম তার আত্মায। এই মহৎ নবজন্ম ও নব সৃষ্টিকে সফল করার জন্য আমাদের জীবন আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করবে এক প্রবল কর্ম্মশক্তি।

"আধ্যাত্মিক আদর্শই সকল যুগে ভারতের চরিত্রগত ভাবও তার সকল মহদাকাঙ্খার আশ্রয় হয়ে থেকেছে। কিন্তু কালের গতি এবং মানুষের প্রয়োজন চাইছে এক নূতন দিশা, আদর্শের এক অন্যতর রূপ। পুরাতন রীতি আর পদ্ধতি কালপুরুষের প্রয়োজন মেটাতে আর পর্য্যপ্ত নয়। ভারতকে ভবিষ্যতে যে বিরাট্ কাজগুলি করতে হবে, যে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোতে হবে, কোন সঙ্কীর্ণ সীমা রেখায় আবদ্ধ থেকে তা সিদ্ধ হবে না। আমাদের আধ্যাত্মিকতা কোন সময়েই একটা জরাগ্রস্ত জগৎ বিমর্ষ জীবনের তত্ত্ব নয়, যা ভগবানের এই প্রচণ্ড সৃষ্টিকে একটা মিথ্যা মায়া বা শোচনীয় ব্যর্থতা ব'লে মনে করে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা জীবন থেকে পিছু হটে আসা নয়, তা আত্মার দুর্ব্বার শক্তিতে জীবনকে জয় করা। আমাদের আদর্শ জগৎকে মেনে নেয় ভগবানেরই আত্মরূপায়ণের প্রয়াস বলে, কিন্তু তা চায় মানবতাকেও সমূহ রূপান্তরিত করতে; এবং তা করতে হবে

এ পর্য্যন্ত যতখানি আত্মবিকাশের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ চেষ্টার দ্বারা। সে এমনই এক রূপান্তর—যার ফলে মানুষ আর ভগবানের মাঝখানে আবরণটা খসে পড়বে, যে দিব্য মনুষ্যত্বকে আমরা বহন করতে সমর্থ, তার জন্ম হবে আমাদের জীবনে এবং আমাদের জীবন নূতন ছাঁচে গড়ে উঠবে, আত্মার সত্য জ্যোতি আর শক্তিতে বিকাশ হয়ে উঠবে। আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম হবে যিনি সকল কর্ম্মের প্রভু তাঁকে উৎসর্গ করা। আর তা হবে মানুষের বৃহত্তর সত্তার অভিব্যক্তি। সমস্ত জীবন হবে যোগ।

"পাশ্চাত্য তার আদর্শ করেছে মানুষের বুদ্ধি হৃদয়াবেগ, প্রাণ আর দেহসত্তার উন্নতিকে। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক জীবনের আরও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে সে অবহেলা করেছে। তার সব চেয়ে বড় মাপ কাঠি হল স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, যুক্তি আর বিজ্ঞান, সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষতা ও কুশলতা; এক উন্নততর রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা; জাতির একতা আর ইহজাগতিক সুখের বিধান। এগুলি অবশ্যই বিরাট আর মহৎ প্রচেষ্টা। কিন্তু পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে কেবল মনের সদিচ্ছা আর মতবাদের দৌলতে তা যথার্থ রূপে কিছুতেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাদের সত্যকার বাস্তব উপলব্ধির কেবল মাত্র সম্ভব হবে, যদি তা আধ্যাত্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য তার পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে তার বিজ্ঞান আর যন্ত্রপাতির শিল্প কৌশলে। সেই বিজ্ঞানই আজ তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। সেই যন্ত্রপাতির ভারেই আজ সে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম। এই সহজ কথাটি সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি যে, তার মহৎ আদর্শগুলিকে ফলিত করতে হ'লে একটি আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে দরকার। প্রাচ্যের জ্ঞানে আছে সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের গোপন তত্ত্বটি, কিন্তু সে সুদীর্ঘ কাল পৃথিবী থেকে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এখন সময় এসেছে সেই বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেবার, জীবন ও আত্মার মিলন সেতু রচনা করার।

"কি ক'রে তবে সেই মহামিলন ঘটবে? সেইগুপ্ত রহস্যটিও ভারতের জানা ছিল, যদিও তার যথেষ্ট চর্চ্চা হয়নি। 'যোগাৎ কুরু কর্ম্মানি' গীতার এই মহান নির্দেশে আমরা পাই সেই রহস্যের সারমর্ম। এর মূল কথা হ'ল, সকল কর্ম্মই যোগ যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন করতে হবে। আমাদের সর্ব্বোচ্চ আত্ম প্রকৃতিই হবে তার ভিত্তি। আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশ-মন, প্রাণ, দেহ, হৃদয়, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনুভূতি,—সব কিছুর উপর আত্মার প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি যে মানুষের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য শুধু তাই নয়; আমরা বিশ্বাস করি, এইটিই তার যত কিছু সমস্যা আর দুর্ভোগের একমাত্র প্রকৃত সমাধান।

"এই তাহ'লে আমাদের পরমবাণী। এই বাণীই আমরা স্মরণ করব অহরহ। এই মন্ত্রই জপ করব: তরুণ উদীয়মান ভারতের সামনে এই আদর্শই তুলে ধরব, এক আধ্যাত্ম মুখী জীবনই মানুষের সমস্ত কর্মের নিয়ামক হবে আজ যে, মহাযুগের আবির্ভাব হতে চলেছে-জগতকে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করবে। যে-ভারত সুপ্রাচীন কাল হ'তে এই মহৎ রহস্যকে বুকে ক'রে বেড়িয়েছে, সে-ই কেবল জগতকে নিয়ে যেতে পারে এই মহারূপান্তরের পথে। পুরাতন যুগের এই সান্ধ্য লগ্ন সেই প্রভাতেরই অগ্র-পথিক।

"এই তবে হোক মানবতার মধ্যে তার সেবা ও তার প্রচার: যে-ভারত একবার ব্যক্তির জীবন ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছিল এক অন্তরস্থ আধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ, তেমনি জাতির জীবন ক্ষেত্রে আজ তাকে পুনরায় আবিষ্কার করতে হবে সেই আধ্যাত্মিকতারই পূর্ণ সমষ্টি গত রূপটিকে! নিখিল মানব জাতির জন্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এক নূতন আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক তন্ত্র।

"আমাদের সর্ব্ব প্রথম কাজ হবে তা হলে এই আদর্শকে ঘোষণা করা। সকলের আগে চাই একটা পুরাপুরি আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন, সর্ব্বাধিক জোর দিতে হবে তাতে। এবং যারা সে আদর্শকে গ্রহণ করবে, তাকে সফল করতে প্রাণ পাত চেষ্টা করবে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ

করতে হবে। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে, এই ভাবধারাকে কেবল ব্যক্তির জীবনে নয়, সমষ্টির জীবনেও পূর্ণরূপ দেওয়া। বাহিরের জীবন কর্ম্মের সঙ্গে ঘটাতে হবে ভিতরের পরিবর্তন। আর যুগপৎ তাহবে যেমন একদিকে আধ্যাত্মিক প্রয়াস, তেমনই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেও হবে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়, অঞ্চল এবং জাতি। আর পরিণামে তা শুধু জাতির গণ্ডীতেও সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বমানবতার মধ্যে।

"এর অব্যবহিত প্রত্যক্ষ ফল হবে এক নূতন সৃষ্টি। এক আধ্যাত্ম-মুখী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ; আরও ঘনিষ্ঠ আরও বর্দ্ধিত এক সমাজবোধ, যার ভিত্তি মানুষেব বর্ত্তমান বিভেদ নয়—একতা। ব্যক্তির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আর বিকাশ সার্থকতা লাভ করবে অপরের সঙ্গে জীবন যোগ। সে-জীবন উৎসর্গ কববে আপনাকে জাতি ও মানবতার বৃহত্তর সত্তায়, তার সেবায়। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান কবার চেষ্টা হবে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে নয়—তা করতে হবে ভারতের নিজস্ব সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক মৌল-নীতি অনুসারে।

"তরুণ ভারতকে আমরা আহ্বান কবি। এই তরুণের দলকেই হ'তে হবে নব পৃথিবীব নির্মাতা। যারা ব্যক্তি-স্বার্থের উৎকট দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী—তাবা নয়। ধনতন্ত্র বা জড়বাদী কম্যুনিজম-ও সে-আদর্শ নয়—পাশ্চাত্য থেকে আমদানি হয়ে যা আজ ভারতের ভবিষ্যৎ আদর্শের দাবীদার হয়ে উঠেছে। কিম্বা যাবা অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারের ক্রীতদাস ক'রে রেখেছে নিজেদের, কিছুতেই যাবা আত্মার পূর্ণ প্রগাঢ় সত্যে জীবনের সমূহ রূপান্তরকে মেনে নিতে রাজি নয়, ভারতের ভবিষ্যতের ভার তাদের হাতেও নেই। কেবল তারাই—যাদের মন প্রাণ অবধি মুক্ত, যাদের হৃদয় উদার উন্নত, যারা প্রস্তুত এক দ্বিধাহীন জীবনেব অপরিসীম সত্যকে অর্জ্জন করার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করতে—তারাই গড়ে তুলবে সে-ভবিষ্যৎ। তারা হবে সেই বলিষ্ঠ মানুষ, যারা অতীতের বা বর্তমানের দিকে চেয়ে থাকবে না।

কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্যই আত্মোৎসর্গ করবে। তারা নিজেদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র সামান্য সত্তাকে বহুগুণে ছাপিয়ে জীবনাহুতি দেবে, আপনার মধ্যে আর সর্ব্বমানবের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবে, সর্ব্বান্তকরণে অক্লান্ত সেবা করবে জাতি ও মানবতার। এই আদর্শ এখন অবধি হয়তো মাত্র একটি বীজ। আর যে-জীবন সেই বীজকে বহন করছে তা হয়তো মাত্র একটি ছোট কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের ধ্রুব আশা এই বীজই একদিন বিরাট মহীরূহে পরিণত হবে। আর এই কেন্দ্রই হয়ে উঠবে নিত্য প্রসারমান নবসৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র।

"বিনাশোন্মুখ এক পৃথিবীর সংকল্পের ভিতর দিয়ে যে তরুণ মানব জাতি জন্ম নেবার দুঃসহ প্রয়াস করছে, সেই নব-মানবতার পতাকা বাহীদের মধ্যে আমরা আমাদের স্থান গ্রহণ করি দৃপ্ত আশায় আর আত্মার অবিচলিত বিশ্বাসে আর অটল প্রত্যয়ে চেয়ে দেখি ভারতের ভবিষ্যতের দিকে—যে মহাভারতের পুনর্জন্ম আদি জননীর মহাতেজা জীর্ণ শরীরকে নবযৌবন সঞ্চারে পুনরুজ্জীবিত করবে।"

শ্রীঅরবিন্দের এই মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান যুব সমাজে এক নতুন আলোর সন্ধান এনে দিল। জেগে উঠল বাঙলার যুবকরা এই মহামন্ত্রে।

রোজই দুটি চারটি ক'রে সন্তান মায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ করে ভবানী মন্দিরের আঙ্গিনায় সমবেত হচ্ছে। কত উৎসাহ উদ্দীপনা তাদের নতুনের সন্ধানে মাতিয়ে তুলছে।

চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে তরুণের দল মেতে উঠেছে আত্মরক্ষার জন্যে ছোরা খেলা, লাঠি খেলা শিখতে। পড়ছে তারা জাতীয়তামূলক সাহিত্য আর ইতিহাস। চরিত্রহীন যুবকরাও স্বদেশ-ব্রতী হয়ে অর্থের লোভে মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা না ক'রে সমিতির অনেক গোপন কথাও ফাঁস করে দিতে লেগে পড়েছে।

সেদিন যে ছিল মহান্দোলনের যুগ! তাই ভাল-মন্দের বিচার করার অবকাশ ছিল না।

আঘাতে আঘাতে অনেক মূল্য দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লব সমিতিগুলি খাঁটি কর্ম্মীকে যজ্ঞশালায় উপস্থিত করেছে।

কিংসফোর্ড আর এণ্ড্রুজ ফ্রেজারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বারীন্দ্রের মাথায় তখন জাল বুনে ফেলেছে।

অর্থ সংগ্রহ করতেই হবে। একাজে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীরা চাইতো না গৃহলুণ্ঠনে অর্থ সংগ্রহ করা। তাই তারা শেষ পর্য্যন্ত এই নীতিকেই আশ্রয় করে থাকল।

নিবেদিতা তো আছেনই; ছেলেরদলও বেরিয়ে পড়ল অর্থ সংগ্রহে। আশ্চর্য ব্যাপার বৃটিশ রাজভক্তরাই এই মহান ব্রতে অর্থ সাহায্য করতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না। প্রচুর অর্থ এসে গেল।

কিংসফোর্ড আর এণ্ড্রুজ ফ্রেজারকে হত্যা করা হবে জেনে দ্বিধাহীন চিত্তে বেশ কিছু অর্থশালী ব্যক্তি প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্যে এগিয়ে এলেন।

॥ একত্রিশ ॥

বারীন্দ্র দূত পাঠালেন চন্দননগরে। যে মুহূর্তে খবর গিয়ে পৌঁছাল মতিলাল আর কানাইলালের কানে, চন্দননগরের ছেলের দল অমনি কয়েকটি রিভলবার, ভাঙ্গাচুরো ক'টা বন্দুক যা এই সময়ের মধ্যে তারা যোগাড় করে উঠতে পেরেছিল, সেগুলোকে মাথায় নিয়ে ছুটলো বিপ্লব সমিতির অফিসে ক'লকাতায়।

ব্রহ্মবান্ধব, চন্দননগর ফরাসী উপনিবেশে একটি বিপ্লব মন্দির স্থাপনের প্রস্তাব আগেই এনেছিলেন, চন্দননগরের প্রস্তুতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে দেখে। তিনি ভেবেছিলেন, ইংরেজ অধিকৃত রাজ্যের বাহিরে যুবকদের জাতীয় ছাঁচে ঢালাই ক'রে এইখানেই 'সন্তানদল' সৃষ্টি ক'রে উপযুক্ত সময়ে তাদের কাজে লাগান হবে; ইংরেজ রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবকেন্দ্র গড়তে গেলে অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

বারীন্দ্র এসব দূরদর্শিতার কোন তোয়াক্কাই করতেন না। তাঁর আত্মচিন্তা কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধায় বিচলিত ছিল না কোনদিনই। তাই ইংরেজ রাজ্যেই এই মরণযজ্ঞের বেদী গ'ড়ে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

রাজশক্তি স্বদেশীর বিরুদ্ধে গেলেই এর নির্ম্মম প্রতিশোধ প্রবৃত্তি তরুণদের মনে সর্ব্বদা অগ্নিময় রূপ ধারণ করত। তারা যেন কিছুতেই নিজেদের সামলাতে পারত না।

চন্দননগবের একদল ছেলের হাত যেন সর্ব্বদা সুড়সুড় করত'।

এই সময়ে 'ওয়ারেণ্ট সার্কাস' এসে জুটেছে চন্দননগরে। সাহেব কোম্পানী। বিশাল এক তাঁবু খাটিয়ে সার্কাস দেখাচ্ছে।

বিদেশী কোম্পানী, দেশের লোকের শ্রমলব্ধ অর্থ লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে তরুণ দলের তা সহ্য হচ্ছে না। একে তো এই এর ওপর বিদেশী কোম্পানীর চারিত্রিক মতিচ্ছন্নতাই সর্ব্বনাশের মূল হল, কালা-আদমীদের সঙ্গে লালমুখ'দের বসবার আসনের ভীষণ পার্থক্য ক'রে। এক নজরেই গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কেন এমন হবে? দুটো কারণকে একসঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে যুবকরা স্থির করে ফেলল সার্কাস বয়কট করা।

যেমনই ভাবা অমনি কাজ সুরু।

সঙ্গে সঙ্গে জনাকতক সাহসী ছেলেকে দলে নিয়ে কানাইলাল টিকিট ঘরের সামনে পিকেটিং সুরু করে দিল। এরিনার প্রবেশ পথেও লোক রাখল, যাতে কেউ সার্কাস দেখতে যেতে না পারে।

এই দেখে সার্কাস কোম্পানীর লালমুখ' ম্যানেজার খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে কানাইলালকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ ক'রে দিল।

কানাইয়ের দলের ছেলেরাও প্রত্যুত্তর দিয়ে চলল।

এই ব্যাপার চলতে থাকার সময় আর এক শ্বেতাঙ্গ তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কানাইলালকে পুরদস্তুর কটূকাটব্য সুরু করে দিল।

কানাইলালও তার পাল্টা চালাল।

এতবড় স্পর্দ্ধা বাঙালীর?

কানাইয়ের পাল্টা কটূক্তিতে সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একখানি লাঠি দিয়ে সজোরে কানাইকে আঘাত করবার চেষ্টা করল'। লাঠিতে কানাইলালের পারদর্শিতার কথা তার তো আগে জানা ছিল না! কানাই শাঁ করে লাঠিটাকে এড়িয়ে গিয়ে বাঁ হাতের এক ঘুঁষিতে লাল মুখ'র মুণ্ডুটাকে একেবারে দিল অন্যদিকে ঘুরিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত বমন সুরু হয়ে গেল। শেষে আট দশ পাক খেয়ে সে আছড়ে গিয়ে পড়ল' তাঁবু বাঁধার মোটা খোটার ওপর।

যেমনি এই ব্যাপার ঘটেছে, চতুর্দ্দিক থেকে হৈ চৈ ক'রে লোকজন

ছুটে আসতে লাগল।

ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে ভেবে কানাই তার দলের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বেমালুম সরে পড়ল। সাহেব মল কি বাঁচল সেদিকে ফিরে চাইবার সময় তাদের ছিল না। আর থাকলেই বা কি ?

পুলিস এসে সাহেবের ঐ অবস্থা দেখে তাকে ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে পাঠাল। প্রহারকারীর সন্ধান করতে লাগল।

সে ততক্ষণ চন্দননগর পার হয়ে গেছে।

বিদেশী সার্কাসপার্টি অনর্থক অর্থ ক্ষতি ক'রে আর এখানে বসে থাকা সমীচিন মনে করল না। কারণ ঐ ব্যাপারের পর তাদের টিকিট বিক্রী বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিন চন্দননগর থেকে ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে সেলাম দিয়ে ভেগে পড়ল তারা।

কানাইলালের এই জয়লাভে তরুণের দল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচানাচি স্থুরু ক'রে দিল।

চন্দননগরে পর পব খবর আসতে লাগল, নবাব সলিমুল্লার হিন্দু বিদ্বেষ প্রচারের ফলে, ময়মনসিং এবং কুমিল্লার অনেক জায়গায় হিন্দুদের ওপর অশিক্ষিত মুসলমানরা অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে চলেছে। জামালপুরে মুসলমানের লাঠির ঘায়ে বাসন্তী প্রতিমা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে—হিন্দুব মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। হিন্দু নারীরা পথে-ঘাটে, মুসলমান অত্যাচারীর হাতে স্বামীপুত্র হারিয়ে উৎপীড়িতা—ধর্ষিতা হচ্ছে। নিরুপায় হিন্দু বাঙালী এই অত্যাচারের প্রতিকারে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে মন থেকে উবে গেছে বাঙালীর স্বদেশ সাধন।

বাঙালীর যে মনবল, যে রক্ত এতদিন ইংরেজ নিধনে অগ্নিময় হয়ে উঠেছিল, এখন তা ভ্রাতৃহত্যায় উন্মাদ হয়ে ছোটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে হিন্দু বিপ্লববাদির কিছু অংশ, ময়মনসিংহে উপযুক্ত কয়েকজনকে পাঠিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত কিছু অঞ্চল বোমার

আঘাতে উড়িয়ে দিয়ে ঐ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার মনস্থ করলেন।

খবরটা কানাইলালের কানে গিয়ে ঢুকতেই সে সেখানে ছুটে যেতে তৈরী হয়ে গেল। উদ্দেশ্য হ'ল তার, বাঙালীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান।

কিন্তু বিশেষ এক কারণে কানাইয়ের যাওয়া হ'ল না আর ; বিমর্ষ মনে ফিরে এল'।

একের পর এক—দিনের পর দিন, মানসীক আঘাত সহ্য ক'রে ক'রে কানাইলালের মন চরম বিপ্লব পন্থী হয়ে উঠল।

১৯০৭-এর বিজয়া দশমীর দিন অতি প্রত্যুষে বারীন্দ্রকুমার সন্ন্যাসীবেশে চন্দননগরে চারুচন্দ্র রায়ের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেন।

ইতিপূর্ব্বে দুই বিপ্লবীর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে ওঠেনি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চারু রায়ের স্বদেশপ্রীতির অনেক কথাই বার বার বারীন্দ্রকে বলে বলে চারুবাবুকে যেন নিজেদের লোকই ক'রে ফেলেছিলেন।

সন্ন্যাসী প্রথমে চারুবাবুর কাছে আপন পরিচয় না দিয়ে বিভিন্ন বিষয় অনেক কথাবার্তা কইলেন। শেষে পরিচয় দিয়ে, চারুবাবুকে অনুরোধ করলেন, এদিকের নেতার আসন তাঁকেই গ্রহণ করবার জন্যে।

চারু রায় রাজি হ'লেন।

এইদিন বিকেলে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে কাতারে কাতারে গঙ্গার ঘাটে লোক জমেছে। মতিলাল, কানাইলাল, শ্রীশচন্দ্র, ননীলাল, সাগরকালী, নরেন ব্যানার্জীও গঙ্গার ধারে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে জমায়েত হ'লেন। চারু বাবুকে সঙ্গে নিয়ে উপেন্দ্রনাথ এলেন। এমন সময় সেখানে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটল। উপেন্দ্রনাথ, দলের

সকলের সঙ্গে এই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বারীন্দ্রকুমারের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সেই দিনই বারীন ঘোষের নেতৃত্বে চুঁচুড়া ষ্টেশনের কাছে এক আম বাগানে, ক'লকাতার বিপ্লব সমিতির একটি শাখা খোলা হ'ল।

প্রথম দিনেই দীক্ষিত হ'লেন, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর বাবুরাম পারারকর।

বিপ্লবের ইতিহাস পড়তে কানাইলালের বড় ভাল লাগে। ভারতবর্ষের এই সব ইতিহাসকে সে চিবিয়ে খেয়েছে। চারু রায় এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রুশিয়ার নিহিলিষ্ট রহস্য, সে, বার বার প'ড়ে এক রকম কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস তার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। বিপ্লবীদের কঠোর সত্যনিষ্ঠ চরিত্র তাকে সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সব দেশের এবং বিপ্লবীদের আলোচনায় বসলে সে যেন হাতে স্বর্গ পেত। একনিষ্ঠ মন নিয়ে সে এই সকল দেশে গণঅভ্যুত্থানের এবং বিপ্লবীদের চরিত্রের গুরুত্বগুলো গভীর ভাবে উপলব্ধি করত।

১৯০৭ সালের শেষে চন্দননগরে বিপ্লব সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করার কথা। আয়োজন সম্পূর্ণ। পুলিস তা হতে দিল না। স্বদেশী তরুণ সন্দেহে সরকারী খাতায় আবার মতিলালের নামও ইতিমধ্যে উঠে গেছে। ফরাসী পুলিস অধিবেশনের জায়গাটাকে ঘিরে রাখল। সমিতির কর্ম্মীরা সভার কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হল। রবীন্দ্রনাথের আসা হল না এই সভায়।

এর মধ্যেই শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি করে হাটখোলার মাঠে অধিবেশন সুরু করে দিল ছেলের দল। ফরাসী পুলিস এ সভাও ভেঙ্গে দিল। ঘিরে ফেলল সভা, জনা পঁচিশ মাদ্রাজী পুলিস দিয়ে।

মেয়র মঁসিয়ে তার্দ্দিভেল সময় বুঝে স্থানীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটরকে অপসারিত করেছেন। অপরাধ তাঁর, এই সব ছেলেদের তিনি ভালবাসেন।

তার্দ্দিভেল হুকুম দিয়েছেন, এখানেও সভা বসবে না।

কাতারে কাতারে লোক এসেছে সভায়, কে শোনে তার হুকুম।

মেয়র তার্দ্দিভেলেরও জেদ চেপে গেছে; শেষ পর্যন্ত সভা বানচাল হয়ে গেল।

এরপর তার্দ্দিভেল এখানে স্বদেশী প্রচার বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

যুবক দল একে সায়েস্তা করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল।

নাটের গুরু শ্রীশ ঘোষ এই সব তিতিবিরক্ত তরুণদের উস্কানি দিয়ে বাড়িঘর লুট করার আলোচনা সুরু ক'রে দিল।

বাছাই করা একদল ছেলে চলে গেল গোপন পরামর্শ করতে, একটা পোড়োবাড়িতে। কম ক'রে শ'খানেক ছেলে সেখানে জড়ো হয়ে স্থির করে ফেলল, মেয়রের বাড়ি আক্রমণ করতে হবে। কথা শেষ হতে না হতেই লাঠি, সড়কী, বন্দুক, খাঁড়া এসে হাজির হয়ে গেল।

এসে পড়ল মতিলাল রায়, ননীলাল দে, সাগরকালী ঘোষ আর শ্রীশ চন্দ্র।

মতিলাল উত্তেজিত হয়ে ননীলালকে বললে—"অত্যাচারী মঁসিয়ে তার্দ্দিভেলকে ধরাপৃষ্ঠ হতে অপসারিত করতে হবে, তুমি এতে রাজী আছ কি-না?"

ননীলাল, সাগরকালী, মতিলাল এক সঙ্গে শপথ-মন্ত্র উচ্চারণ করল—"যে কোনও কারণ ঘটুক, আমরা কিছুতেই ঐক্যভঙ্গ করব না।"

ননী বললে—শপথ তো নিলাম। রিভলবার কোথায় পাব? কাজটা কি করে হবে?

চারুবাবুর নির্দেশে তরুণদের মনোবল যাচাই করতে শ্রীশের এই উস্কানি, মতিলাল আগে এসব বুঝে উঠতে পারেনি!

ইত্যবসরে কানাইলাল চলে গেছে চারুবাবুর কাছে, তাঁর অনুমোদন নিতে।

যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যখন তারা বেরুতে যাচ্ছে, কানাই ফিরে এল'।

এদের কাণ্ডকারখানা দেখে বলল—"তোমরা কি পাগল হয়েছ? এত যে সব কাণ্ড ক'রে বসেছ আমি তো জানতাম না। বিপ্লব অত সোজা জিনিষ নয়! এর প্রতিকার আমরা করবই, তবে এখনই নয়! ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, সময় হলেই দেখতে পাবে। তাদ্দিভেলের বিচার হবেই, কিন্তু এভাবে লাঠি সোটা নিয়ে হৈ-হল্লা করতে গেলে সব যাবে ভেস্তে।"

কানাইয়ের ওপর কথা কইবার ক্ষমতা হ'ল না কারুরই, এমন কি শ্রীশেরও না। কানাই এদের কয়েকজনকে কাছে ডেকে সব বুঝিয়ে দিল। শ্রীশ, ননী, সাগরকালী একজোটে বললে,—"কানাই যখন কথা দিয়েছে, বিচার একটা হবেই জেনে রাখো। এখন যে যার বাড়ি চলে যাও তোমরা।"

নেতারা বাদে সকলেই মাথা নীচু ক'রে একে-একে সেখান থেকে চলে গেল।

কানাইলাল এবার বললে—রিভলবারের জন্যে চিন্তা নেই। সে ব্যবস্থা হবে।

কানাইয়ের এই কথার পর মতিলাল ভালভাবেই বুঝতে পারল, ছেলেটি প্রকৃত বিপ্লবী, এর অসাধ্য কিছু নেই। ইতঃস্তত না করে মতিলাল কানাইয়ের সঙ্গে বিপ্লবের কাজে লেগে পড়ল।

বত্রিশ ॥

এই সেই 'ভবানী মন্দির' !

মাণিকতলার ৩২ নম্বর মুরারিপুকুর গার্ডেন রোডে, প্রাচীর ঘেরা বিরাট বাগানবাড়ি কিনেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ।

এই নির্জন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'ভবানীমন্দির' ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে।

বাহির থেকে দেখলে মনে হয় যেন সুন্দর একটি আশ্রম। আশ্রমের বাহ্যিক দৃশ্যপট সাধুসন্তের বাসস্থানের অনুরূপ সৃষ্টি করা হ'ল। সম্মুখে প্রশস্ত উন্মুক্ত বারান্দার একধারে মাছুরের ওপর বসে কিশোর যুবকের দল পাঠ নিচ্ছে। অপরপার্শে উপবিষ্ট গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসীরা গীতার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। বাগানবাড়ির বহিরঙ্গে প্রত্যহ এই ব্যাপার চলেছে।

—সামান্য কিছুটা ভেতরে সুসজ্জিত বেদীর ওপর ছিন্নমস্তা মা ভবানীর মূর্ত্তি।

অনেককটি পুরোহিত একত্রে পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করছেন।

বারীন্দ্র উপপ্রধান। আছেন উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, উল্লাসকর আরও অনেকে। সকলেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

প্রধান এবং গুরু শ্রীঅরবিন্দ।

সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য হেমচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্বেই বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত; প্যারিসে গিয়ে বোমা তৈরীর সব কিছুই সুন্দরভাবে শিখে এসেছেন।

ইনি প্যারিসে, ভারতবাসীদের কাছে অরবিন্দকে সর্ব্বজ্ঞ, মহাপুরুষ এবং আদর্শ নেতা বলে পরিচিত করেছিলেন।

এই বাড়ির অন্দরমহলে বোমা তৈরীর মস্ত বড় কারখানা।

কারখানায় উৎসাহী যুবকেরা কাজ ক'রে চলেছে। তত্ত্বাবধানে

হেমচন্দ্র ; হেমচন্দ্রের সহকারী উল্লাসকর।

বারীন্দ্রের ওপর ভার পড়েছে খাঁটি ব্রহ্মচারী সংগ্রহ। ব্রহ্মচারীদের প্রত্যেককে এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রূপান্তরিত করা ;—আর সেই সঙ্গে বিপ্লব যজ্ঞের অর্থ সংগ্রহ।

এই সংগ্রাম সমিতির নায়ক শ্রীঅরবিন্দ নিজে—আর কেউ নয়।

বারীন্দ্র সারা বাঙলা খুঁজে একটি-একটি ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীক বীর সৈনিক সংগ্রহ করে চলেছেন।

আরম্ভেই কুড়ি জন এসে গেল।

বারীন্দ্রের চুলের টিকি এখানে খুব কমই দেখা যেত'।

আশ্রমের কঠোর এবং বলিষ্ঠ নির্দ্দেশনামায়, কাজ সুষ্ঠ এবং সুন্দরভাবেই এখানে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছু দামী রিভলবার মজুত করা হয়ে গেছে আশ্রমে।

গুপ্ত মন্ত্রণালয়ে প্রথম বৈঠকেই স্থির হ'ল, পশ্চিম বাঙলার লেফটন্যান্ট গভর্নর য়্যাণ্ড্রু ফ্রেজার আর চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।

কিংস ফোর্ডই, ইংরেজ-বিরোধী কাগজগুলোর সম্পাদকদের একে একে জেলে ঢুকচ্ছিলেন।

কোথায়, কখন, কিভাবে ফ্রেজারকে উড়িয়ে দেওয়া হবে তাও ঠিক হয়ে গেল।

লাটসাহেব রাঁচির পথে মেদিনীপুর লাইনে ট্রেনে ক'লকাতায় ফিরছেন। হেমচন্দ্রের বাড়ির কাছে নারায়ণগড় ষ্টেশনের কিছু দূরেই ঘাঁটি তৈরী হ'ল। বিভূতিভূষণের ওপর ভার পড়ল কাছেই একটা জায়গায় রেললাইনের নীচে বেশ কয়েকপাউণ্ড ওজনের ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে আসার।

হুকুম মেলার যতটুকু দেরী!

৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল। আত্মগোপন ক'রে বিপ্লবী যুবক দূরে

অপেক্ষা করছে, গাড়ি গেলেই সেলুন উড়বে। আকুল প্রতীক্ষা। ট্রেন আসতেই ডিনামাইটে বিস্ফোরণ ঘটল ঠিকই। ইঞ্জিন ভালমতই জখম হ'ল। রেলের কিছুটা অংশ উড়ে গেলও বটে। কিন্তু···?

বিভূতি দুঃখে মাথা চাপড়াতে লাগল।

সুপরিকল্পিত এত বড় চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে সকলেরই মনে দুঃখ।

মা ভবানীর একজনও ভক্ত ধরা পড়ল না। কার একাজ পুলিসের মগজেই এল না।

ফ্রেজারের ব্যাপার নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন।

৭ই ডিসেম্বর (১৯০৭) মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন-কংগ্রেসের।

সেখানে রওনা হওয়ার আগেই চরমপন্থীদের এক বৈঠক হয়ে গেল ক'লকাতাতে, আসন্ন নিখিল ভারত সুরাট কংগ্রেসে তাঁরা আদৌ যোগ দেবেন কিনা এই সিদ্ধান্ত নিতে।

কংগ্রেসকে মডারেটরা অক্টোপাসের দাঁড়া দিয়ে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। ওদের হাত থেকে এটা ছিনিয়ে নিতেই হবে, যা করেই হোক।

অরবিন্দ ঘোষ তখন চরমপন্থীদের সর্ব্বপ্রধান নেতা; যদিও বয়সে তরুণ। দলের সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিল এই যুবককে দলপতি বলে।

সত্যিই অরবিন্দ নিজের যোগ্যতাকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে ত্রুটি-বিচ্যুতি রাখেন নি। ঠিক যেন সব্যসাচী।

প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে রাজনীতিকে চরম পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

এই সময়ে লোকমান্য তিলক এবং বিপিন পাল ও এই তরুণ বিপ্লবীর কর্ম্মনিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

অরবিন্দ স্থির করে ফেললেন কংগ্রেস বয়কট করা।

'বন্দেমাতরমে' পর পর দুটি সম্পাদকীয়তে তা প্রকাশও করলেন।

তিলক বললেন—"না না তা করলে চলবে না। ওপথে যাওয়া উচিত হবে না। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এতে আমাদের আত্মহত্যা করা হবে। চলনা সুরাটে! আমরা মডারেটদের হাত থেকে কংগ্রেসকে ছিনিয়ে নেব দেখবে। ঐখানেই হবে আমাদের বুদ্ধি আর শক্তি পরীক্ষা। ঘাবড়িও না, আমরা জিতবই!"

তিলকের পরামর্শ দলের সকলেরই মনে ধরল: এমনকি অরবিন্দেরও।

'বন্দেমাতরম' ভিন্ন আওয়াজ তুলে আবার গর্জে উঠল।

মেদিনীপুরে, অরবিন্দ, তিলক যা বলেছিলেন সেই কথাই বললেন।

সুরেন্দ্রনাথ বুঝে ফেললেন, চরমপন্থীরা অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সন্ত্রাসবাদ দেশের রাজনৈতিক আকাশকে ঘনঘটাচ্ছন্ন করে তুলেছে, স্পষ্টই তার ঝিলিক দিচ্ছে।

যুদ্ধ বেধে গেল—'বেঙ্গলী' আর 'বন্দেমাতরমে'।

মেদিনীপুরে, মডারেটরা বললেন, "ইংরেজের সঙ্গে আপস কর।"

জাতীয়তাবাদীরা বললেন, —"না। তা কিছুতেই না। বিপ্লব ছাড়া এর সমাধান হতে পারে না। খোসামদ নয়। আমরা চাই বিপ্লব। পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা আদায় করবই।"

এর পরেও ওঁরা বললেন রিফর্মের কথা।

এক্সট্রিমিষ্টরা বললেন—রিফর্মের কথা উঠতেই পারে না।

অনেক চেঁচামেচি-বাকবিতণ্ডার পর, শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতাই স্বীকৃত হ'ল।

চরমপন্থীরা জয়মাল্য নিয়ে ক'লকাতায় ফিরে এলেন।

॥ তেত্রিশ ॥

মডারেটরা, সুরাট কংগ্রেসে রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করবেন স্থির করেছেন।

জাতীয়তাবাদীরা স্থির করলেন, লোকমান্য তিলককে।

বহুসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে বাঙলা থেকে রওনা হলেন অরবিন্দ সুরাটের পথে। সঙ্গে গেলেন শ্যামসুন্দর, বারীন্দ্র, অশ্বিনী দত্ত, মতিলাল রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট বিপ্লবীরা।

অরবিন্দ এবং চিত্তরঞ্জনের স্বাক্ষরিত চিঠির আহ্বানে দলে দলে ডেলিগেট বাঙলা উজাড় ক'রে চলেছেন সুরাটে। টাকার অভাব হ'ল না। সকলেই চলেছেন থার্ড ক্লাসে।

হেমচন্দ্র কানুঙ্গ এবং সত্যেন বোসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গ'ড়ে তোলা একদল চরমপন্থী, মেদিনীপুর থেকে ছুটলেন তাঁদের সঙ্গে সুরাটে।

হয় এসপার না হয় উসপার একটা কিছু ক'রে ছাড়বেন এই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এক্সট্রিমিষ্টরা চলেছেন।

সুরাট কংগ্রেসে মডারেটদের সংস্রব ত্যাগ করার দায়িত্ব নিয়েছেন অরবিন্দ নিজেই।

ষ্টেশনের কাছে কংগ্রেস অধিবেশনের বিরাট মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। কাছাকাছি ছোট-ছোট তাঁবুতে আছেন মডারেট দল। একটি সুসজ্জিত তাঁবুতে আছেন বোম্বাইয়ের সর্ব্বজনবিদিত নেতা কংগ্রেস সভাপতি স্যার ফিরোজশা মেটা। সেই তাঁবুতেই আছেন বাঙলার মডারেট নেতা সুরেন ব্যানার্জী: আছেন ভূপেন্দ্রনাথ, আশু চৌধুরী আর অম্বিকা মজুমদার।

জাতীয়তাবাদীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে সহরের ভেতর কয়েকটা ভাঙ্গা মন্দিরে আর বাড়িতে। এই দলে এসেছেন. ভারতের অন্যান্য

জায়গা থেকে—তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জে, চিদম্বরম্, শিণ্ডে, হায়দাররেজা প্রভৃতি গণ্যমান্য জননেতারা। এখানকার এই বৈমাত্রিক ভাব দেখে এঁরা সকলেই ক্ষুব্ধ।

কংগ্রেস অধিবেশনের তিনদিন আগেই তিলক আর অরবিন্দ সুরাটে এসে পৌঁছে গেছেন। তাঁরা এইবার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন স্থির করেছেন।

জাতীয়তাবাদীরা সকলেই এই দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই দিনই সন্ধ্যায় সুরাটবাসীরা এক বিরাট সভার আয়োজন করেছিলেন।

বক্তৃতা দিতে উঠে তিলক বললেন—'ক'লকাতায় গৃহীত চারটি প্রস্তাবই—স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয়-শিক্ষা যেন সুরাট কংগ্রেসে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।'

এই কথাটি এখানে ওঠার বিশেষ একটা তাৎপর্য্য ছিল। কারণ অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়েরা ভয় করেছিলেন, বোম্বাইয়ের মডারেট নেতারা যদি জেদাজেদী করেন ঐ চারটি প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নেওয়ার জন্যে!

আশঙ্কা করাটা কিছু ভুল হয়নি। তাই ২৫শে ডিসেম্বর সকালে কংগ্রেস মণ্ডপে, প্রতিনিধিদের নিয়ে তিলক একটি পরামর্শ সভায় বসলেন। দুই দলের আপসের কথা উঠল।

—জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এভাবে ধ্বংস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

এক্সট্রিমিষ্ট দলের সকলে এক জোটে বললেন—'মডারেটরা যদি ক'লকাতা কংগ্রেসে প্রস্তাবিত ঐ চারটি প্রস্তাব মেনে নেন এখানকার অধিবেশনে, তাহলে জাতীয় দল ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতি নির্ব্বাচনে কোন বাধার সৃষ্টি করবে না।'

তৎক্ষণাত এই মর্ম্মে অরবিন্দ একখানি 'চরমপত্র' সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা তা মানলেন না।

আপস চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হ'ল, ২৬শে ডিসেম্বর (১৯০৭) বেলা আড়াইটেতে।

সভাপতি প্রস্তাবিত হলেন, গোখলে। সমর্থনের জন্যে উঠে দাঁড়ালেন সুরেন্দ্রনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল সুরু হয়ে গেল।...ধোঁকা দেওয়া চলবে না।...ধোঁকা দেওয়া চলবে না, চিৎকারে সভামণ্ডপ কাঁপতে লাগল।

মধ্যপ্রদেশ চিৎকার ক'রে উঠল—'কেন এবারকার কংগ্রেস নাগপুরে হ'ল না? কেন আনা হল সুরাটে? এসব ঐ মেটারই চক্রান্ত!'

বাঙলা চেঁচাতে লাগল—'মেদিনীপুরের কথা ভুললে আমরা সহজে ছাড়ব না। ধাপ্পাবাজদের দেখে নেব!'

সভাপতি প্রস্তাবিত হওয়ার সময় গোখলে, তিলকের হাতে একখানি প্রস্তাব তালিকা দিলেন। এতে কংগ্রেসের দিক থেকে চারটি প্রস্তাবই ছিল বটে, কিন্তু বাঙলা যা চেয়েছিল সব কটি তা নয়।

ভীষণ হট্টগোল বেধে উঠল। নাচা-নাচি, চেঁচা-মেচি, জিনিসপত্তর ছোঁড়াছুঁড়ি একসঙ্গে চলতে লাগল।

—বেগতিক দেখে, সুরেন্দ্রনাথ লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে বক্তৃতা দিতে সুরু করে দিলেন। কে তাঁর কথা শোনে। কেউই কর্ণপাত করলেন না।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ মালভি গোলমাল থামাবার জন্যে ক্রমাগত ঘণ্টা পিটিয়ে চললেন। কেউ তা গ্রাহ্যও করলেন না। অবশেষে তিনি ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন—সেদিনের মত অধিবেশন স্থগিত রইল।

পরদিন ২৭শে। আবার বসল অধিবেশন।

ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ তাঁর ভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন,

কিন্তু ভাষণ বেশী দূর এগোল না ; মিষ্টার তিলক গম্ভভাবেরী গিয়ে মঞ্চের ওপর উঠলেন, সোজাসুজি সভাপতির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি কিছু বলতে চাই, আমাকে বলতে দিতেই হবে।"

এই সময় দেখা গেল, কি যেন একটা বড় ধরণের বস্তু বাতাসে ভর করে তীব্র বেগে ছুটে এসে পড়ল মঞ্চের ওপরেই—এক পাট জুতো—মারাঠী জুতো। লাল চামড়ার তৈরী—সুঁচলো গোড়ালি। জুতোটার নীচটা আগাগোড়াই সীসা দিয়ে মোড়া। জুতোপাট সোজাসুজি এসেই সুরেন্দ্রনাথের গণ্ডদেশে সজোরে আঘাত ক'রে সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে ফিরোজসাহ মেটার গায়ে লাগল। তারপর মঞ্চে, এদিক সেদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল লম্বা লম্বা কাঠের টুকরো। তুমুল গণ্ডগোল আর উত্তেজনার মধ্যে গেল ভেঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

ঘটনাটা শোনা গিয়েছিল সুরাট কংগ্রেসের প্রত্যক্ষদর্শী—নেভিলসনের মুখ থেকে। একটা রিপোর্টও তিনি পাঠালেন। রিপোর্টে তিনি এও লিখেছিলেন—"সুরাটে সেদিন আমি ভারতীয় রাজনীতিতে যেন একটা নতুন যুগের সূচনাই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জুতো ছোঁড়াছুঁড়ির পর চক্ষের নিমেষে যেন কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটল' আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে জেগে উঠল একটা নতুন ভাব, একটা নতুন আদর্শ।"

দুই দলের পৃথক পৃথক সভা বসে গেল সেইখানেই।

জাতীয়তাবাদী দল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে সভাপতি ক'রে বিরাট এক সভার আয়োজন করল।

এখানে বিশেষ বক্তব্য রাখলেন লোকমান্য তিলক।

সুরাটে নানা বিপর্য্যয়ের ফলে 'কংগ্রেস রঙ্গমঞ্চে' মডারেটদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল।

অনেকদিন পরে একদিন এই প্রসঙ্গ উঠলে অরবিন্দ নিজ মুখে স্বীকার করেছিলেন,—'কংগ্রেস ভেঙ্গে যাওয়ার একমাত্র কারণ,

তিলকের সঙ্গে কোন পরামর্শ না ক'রে এব্যাপারে আমার নিজের নির্দ্দেশ দেওয়া।'

সুরাটের পাট চুকলে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিলেন বরোদায়।

এখান থেকে রওনা হওয়ায় পূর্ব্বেই বারীন্দ্র গোয়ালিয়রে শ্রী বিষ্ণু ভাস্কর লেলেকে, বরোদায় আসবার জন্যে তার পাঠালেন।

বরোদায় কর্ম্মরত অবস্থায় থাকাকালীন অরবিন্দের সঙ্গে লেলেজীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।

ইনিই শ্রীঅরবিন্দের 'আত্মসমর্পণ মন্ত্রের দীক্ষাগুরু।'

বরোদা, বোম্বাই, নাসিক, অমরাবতি, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় সভায় জাতীয়তাবাদকে নতুন ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ ক'রে অরবিন্দ সকলকে দেশপ্রেমে মাতিয়ে তুললেন। ঈশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রতিটি উদার নৈতিক ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিলেন 'জাতীয়তা' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী? প্রতিটি শ্রোতার হৃদয়ে অঙ্কুরিত করলেন—যেত শক্তিশালী অস্ত্রই হোক না কেন, কোন অস্ত্রই জাতীয়তাবাদের বিনাশ ঘটাতে সমর্থ হবে না।'

এই মর্ম্মস্পর্শী আবেদন রাখাতে, দলে দলে এগিয়ে এল' স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারত মাতার শৃঙ্খলমোচন করতে।

রাসবিহারী বসুর দলের যে যেখানে ছিল ছুটে এল এই তরুণ বিপ্লবীকে সহায়তা করতে।

বিপ্লব এবার এক নবরূপ ধারণ করল। ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের চারিদিকে।

বাঙলার জাতীয়তাবাদের ভাস্করজ্যোতি দিকে দিকে ঠিকরে পড়ে নতুন নতুন উল্কার সৃষ্টি করল ভারতের দিক্‌চক্রবালে।

১৯০৮-এর ফেব্রুয়ারীতে অরবিন্দ বাঙলায় ফিরলেন।

গুপ্ত সমিতির নেতৃস্থানীয়েরা এবং কর্ম্মীসকলে তাঁর পথ চেয়ে আকুল প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

তাঁরা ছুটে এলেন তাঁর কাছে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, তাঁর পরবর্তী কর্ম্মসূচীর বিষয়বস্তু জেনে নিতে একে একে এসে তাঁর সামনে হাজির হলেন।

দেখা হ'ল না কেবল সেই তাঁর সঙ্গে—শক্তিস্বরূপিনী ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। তিনি এই সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে ছিলেন না ; যাঁর উপস্থিতি ছিল বিশেষ প্রয়োজন।

নিবেদিতা ছিলেন তখন ইংলণ্ডে।

'বিপ্লব'—বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ হয়ে তখন যুবশক্তি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ছুটে বেড়াচ্ছে।

বিদ্রোহবহ্নির লেলিহান শিখা ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে এগিয়ে চলল। বিপুল উত্তেজনায় ভারতব্যাপী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল—যা এতদিন বাঙলা এবং মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল।

॥ চৌত্রিশ ॥

লর্ডকার্জন ভারত থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড মিণ্টো এসে এই অগ্নিকুণ্ডে পা দিলেন।

জাঁকিয়ে বসতে চাইছেন, কিন্তু এর উত্তাপ সহ্যকরা তাঁরপক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠল।

এই অগ্নি নির্ব্বাপনে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। বুরোক্রাট সরকারের প্রপীড়ন আর নিস্পেষণ নীতি অধিক ভয়াবহ রূপ নিয়ে ভারতবর্ষের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লর্ড মিণ্টোর ধারণা ছিল অর্দ্ধমৃত এই বুভুক্ষু জাতটার বুকের ওপর অত্যাচারের বুলড্রোজার চালিয়ে দিলেই এরা বুঝি ভয়ে কুঁকড়ে যাবে, এদের আর মাথা ওঠারার শক্তি থাকবে না।

কিন্তু মাতৃমন্ত্রের এমনই শক্তি যে, বিপ্লবের তরঙ্গে বড়বড় কংক্রিটের বাঁধও ভেঙ্গে উড়ে গেল।

অগ্রণী বাঙলা তার রূপকার হয়ে দাঁড়াল।

ইংরেজ দমননীতিকে সায়েস্তা করতে বাঙলাদেশ তখন মরিয়া।

চিত্তরঞ্জন দাস বললেন—"দেশের কাজ আমার ধর্মের অঙ্গ। ইহা আমার জীবনের আদর্শ। আমার দেশের কল্পনায় আমি ভগবানের মূর্তি দেখতে পাই।"

এই সময়ে সরকারী ষ্টেট সেকরেটারী লর্ডমর্লি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন—

"I must confess to you that I am watching with deepest concern and dismay the thundering sentences that are being passed for sedition, ect. We must keep order, but excess of security is not the

path to order, on the contrary, it is the path to the bomb."

অরবিন্দের আদেশ।

'গুপ্তসমিতির'—কিংসফোর্ড হত্যার প্রথম চেষ্টা হ'ল ক'লকাতার বুকের ওপর, 'বুক-বম্ব' দিয়ে।

একটা মোটা বড় বইয়ের ভেতরের খানিকটা জায়গা কেটে ফেলে দিয়ে সেখানে বোমা রাখবার সুন্দর জায়গা করে নিয়ে, বোমাটি বইয়ের ভাঁজের ভেতর এমন নিক্ষুতভাবে বসান হয়েছিল, যাতে বইটি খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই বোমাটিতে বিস্ফোরণ ঘটে।

মিষ্টার' কিংসফোর্ডের টালিগঞ্জের বাড়ীতে, বোমাসমেত বইখানি তাঁর হাতে দেওয়া হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বইখানি না খুলেই, তিনি, ঐ অবস্থায় তখনকার মত সেটাকে আলমারীর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন।

বইটি, কিংসফোর্ড, সে সময়ে একবারটি খুললে না জানি, ইতিহাসের সে দিনকার আর একটা পৃষ্ঠা অন্যভাবে লেখা হ'তে পারত; হয়তো বা! হয়তো কেন? নিশ্চয় দুটি অমূল্য প্রাণ মুকুলেই ঝরে যেত না!

—যেই না এই বোমার খবর কিংস ফোর্ডের কানে গেছে, মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব না করে তিনি কেটে পড়লেন ক'লকাতা থেকে। নিরাপদ মনে করলেন না এই অবস্থার মধ্যে আর একটা দিনও 'এখানে থাকা। ডিষ্ট্রীক্ট জাজের পদে বদলী নিয়ে মজঃফরপুরে চলে গেলেন।

॥ পঁইত্রিশ ॥

কানাইলালের বি, এ পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সে এবং তার এক তরুণ বন্ধু ছুটে গেল বারীন্দ্রের কাছে।

এই মন্ত্রগুপ্তি এত গভীর ছিল যে, কারো সাধ্য ছিল না তার তলদেশ স্পর্শ করে।

চন্দননগরের কয়েকটি বাছাই করা ছাত্রও, মুরারীপুকুরের গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিল একে একে খুবই চুপে চাপে। এদের সকলেই প্রায়, দরিদ্র ঘরের ছেলে।

চন্দননগরের ছেলেরা পাঁচ, দশ, পনের ক'রে টাকা বহু কষ্টে সংগ্রহ ক'রে বিশেষ সঙ্গোপনে গুপ্ত সমিতির তহবিলে পাঠিয়ে দিচ্ছিল এর আগে।

প্রথম যেবার বারীন্দ্র, সমিতির জন্যে চন্দননগরের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য চাইলেন, সেই মাসে, এখানকার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে মাত্র পাঁচ টাকা পাঠাতে পেরেছিল। এখানে কানাইলাল ছিল অর্থ সংগ্রহে অগ্রণী।

সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত চিন্তা এখানকার তরুণ মনে সকল সময়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি। রাত তখন বেশ কিছুটা গড়িয়ে গেছে। জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি ঝলমল করছে। পূর্ণিমার রাত্রি হয়তো হবে। গৃহত্যাগী কানাইলাল বেরিয়ে পড়েছে ভারতমাতার চরণ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কানাই সরাসরি চলে এসেছে বিদায় নিতে, তার অন্তরঙ্গ মতিলালের কাছে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে, মতিলাল দরজা খুলতেই সম্মুখে কানাইকে দেখলেন।

কানাইলালের যেন এক নতুন চেহারা—পার্থিব বন্ধনমুক্ত যুবা পুরুষ। সে যেন এক নতুন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

উভয়ের মধ্যে দেশের আলোচনা সুরু হ'ল।

মাঝে মাঝে কানাই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে।

…বাড়ি থেকে পথে বেরিয়ে এল দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাস্তার ওপর পাইচারী ক'রে চলেছে।

মাঝে মাঝে কানাই নিজের লম্বা লম্বা চুলগুলোর ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে. গোছা ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। চশমার কাঁচ দুটোতে চাঁদের আলো প'ড়ে ঝকমক ক'রে উঠছে।

মস্তিষ্ক যেন তার বড়ই চঞ্চল। সে আজ এক নতুন মানুষ।

সেই মুহূর্ত্তের বর্ণনা প্রসঙ্গে মতিলাল বলেছেন—"কি প্রফুল্ল উদার ছবিটি তার মুখ চোখে ফুটে উঠেছিল সেদিন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে কথা কইছে। সে বড়ই আত্মীয় ব'লে মনে হ'ল। এমন কুণ্ঠাহীন কথা, এমন উদার ভাব আর আচরণ, অন্য লোকের কাছ থেকে যা কোনদিন পাইনি। আমি যেন কথায়-কথায় মুগ্ধ হয়ে পড়লাম—কানাই ঠিক এই সময়ে আরও অধিক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথার উপসংহারে ব'লে উঠল—'এই আমাদের দেশ, এর স্বাধীনতা চাই—তার উপযুক্ত ব্যবস্থা চলছে খবর রাখ কি?' আমি আকাশ থেকে পড়লাম। পুলকে, বিস্ময়ে কানাইয়ের মুখের দিকে চাইলাম, কথাকটি বর্ণে বর্ণে আগুনের মত সত্য। পাহাড়ের মত শক্ত, দৃঢ়। কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে বাধল। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়? কে করছে? কানাই বললে,—'সে কথা এখন বলব না, তবে জেনে রেখো অসংখ্য সন্তান একত্র হয়ে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে। আমিও চললাম। প্রয়োজন হ'লে তোমার সাহায্য চাইব। শপথ কর করবে?' আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত উত্তর দিলাম—নিশ্চয় করব। কানাই আমার হাত দুটো ধরে

উচ্ছ্বসিত আবেগে হেসে উঠল।—তারপর চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কানাইকে সেদিন সত্যি করেই চিনলাম সে কি উপাদানে গড়া।"

হঠাৎ একদিন তার্দ্দিভেলের কথা মনে পড়ে গেল কানাইয়ের। চন্দননগরের ছেলেদের সে কথা দিয়েছে। কথার খেলাপ করলে তো চলবে না! পেছনে রেখে যাবে মিথ্যার কলঙ্ক? তা হতে পারে না। ছুটে এসেছে এক ফাঁকে ছিন্নমস্তার মন্দির থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে কানাইলাল।

মতিলালকে নিয়ে গোপন বৈঠকে ব'সে গেল কিভাবে তার্দ্দিভেলের প্রতিশোধ নেওয়া যায়। আর আসা হবে না। এখনই যা হয় একটা ক'রে তাকে ফিরে যেতে হবে। অনেক জল্পনা কল্পনার পর স্থির হ'ল 'বম্ব' দিয়ে তার্দ্দিভেলকে উড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া?…হ্যাঁ, তাই হোক। বিলম্বের সময় হাতে কৈ? অনেক দিন হ'ল সমিতির ছেলেদের কথা দিয়ে রাখা হয়েছে। তারাই বা কি ভাবছে?

১৮ই এপ্রিল (১৯০৮) মেয়র ম'সিয়ে তার্দ্দিভেল নিজের বাড়িতে নৈশভোজে বসেছেন, জানালার ভেতর দিয়ে বোমা গিয়ে পড়ল খাওয়ার টেবিলের ওপর, কিন্তু ফাটল না। তার্দ্দিভেল গেল বেঁচে। —ছি ছি।‍ এমনই অকেজ বোমাটা? কানাইলাল ক্ষোভে, মাথার ওপরকার লম্বা লম্বা চুলগুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল আর নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

মেয়রের খাবার টেবিলে বম্ব? চন্দননগরে হুলুস্থুলু প'ড়ে গেল।

পরদিন সকালে বিবর্ণমুখে কানাইলাল, মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো করে এসে মতিলালকে বললে—"I am disgusted with these attempt to murder দেখে দেখে! যেমন তোমার বম্ব? আর দেখ, কার্য্যোদ্ধারের চেয়ে পালানই যদি বড় হয় তাহলে কাজ কি ক'রে হবে? আমি আধা-খেঁচড়া কিছু পছন্দ করি না জেনো মতিদা! আমার ঐ একটাই মত, either do? or die. তা যদি

অনুসরণ করা যায়, দেখতে পাবে কাজ কত এগিয়ে গেছে। এভাবে চলতে পারে না। এর একটা সমাধান হবেই শীগ্‌গির। আমার তাই মনে হয়। তখন দেখতে পাবে বিপ্লবীর প্রতিটি প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। মন দিয়ে কাজে লেগে পড়। আর চিন্তা করবার সময় নেই মতিদা! আমি চল্‌লাম।"

কানাই হন হন করে বেরিয়ে গেল।

মেয়র তার্দ্দিভেল হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেললেন—বাঙলার বিপ্লবীকে চোখ রাঙিয়ে, জেলে পুরে দাবিয়ে রাখা যাবে না। একবার যখন বোমা পড়েছে আর রক্ষে নেই এদের হাত থেকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তল্পিতল্পা গুটিয়ে এদেশ থেকে সরে পড়াই ভাল ওদের জানতে না দিয়ে।

দু' একটা দিন কাটতে না কাটতেই, অস্থিরচিত্ত মঁসিয়ে তার্দ্দিভেল চুপে চুপে ফ্রান্সে চম্পট দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

॥ ছত্রিশ ॥

—কে যাচ্ছে মজঃফরপুর পথ-ঘাট ঠিক মত চিনে আসতে?

অরবিন্দের প্রশ্নে বারীন্দ্র জবাব দিলেন—প্রফুল্ল চাকী আর সুনীল সেন।

—ছেলেদুটিকে ঠিকমত দেখে দিয়েছ তো?

—সন্দেহ নেই।

প্রফুল্ল চাকী আর সুনীল সেন চলে গেল সেখানে। তন্ন তন্ন করে খবর নিল। নিখুঁতভাবে প্রতিটি জায়গা দেখে এসেছে। কখন? কিভাবে? কি করলে সহজে কাজটা সমাধান হয় তাও বুঝে এসেছে। ব্যাস, আর চিন্তা নেই।

কাকে কাকে আসল কাজে পাঠান হল?

পরে সে কথা।

পথটা বেশ নির্জন। বাংলোগুলোও. প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটি বেশ দূর ব্যবধান রেখে চলেছে, বড় বড় কম্পাউণ্ডের ভেতর। গাছপালা দিয়ে সুদীর্ঘ রাস্তাটা ঢাকা। এর একটিতেই তো থাকেন কিংস-ফোর্ড। ক'লকাতা থেকে, মজঃফরপুরের জেলা ও দায়রা জজ হয়ে, বিপ্লবী বাঙলার হাত থেকে এড়িয়ে এসেছেন শান্তশিষ্ট এক প্রান্তে। পালিয়ে বাঁচতে চান!

হায়রে অর্ব্বাচান! শত্রু যে তোমার পেছু ছাড়েনি! সে খবর তুমি রাখ না ঠিকই! ..সত্য।

প্ল্যানটার্স ক্লাব থেকে প্রতিদিন ঠিক এই সময়েই তো বাংলোতে ফেরেন কিংস ফোর্ড! এই ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে দিব্বি তাঁকে সাবড়ে দেওয়া যাবে। ফিটনখানা তারা খুব ভাল ক'রে চিনে রেখেছে। কার সাধ্য তাকে এইবার বাঁচায়। ভেবেছে ক'লকাতা থেকে মজঃফরপুরে পালিয়ে এসে বাঙালীর হাত থেকে রক্ষে পেয়ে যাবে। সেটি হচ্ছে না! অরবিন্দ এদের বাছাই ক'রে পাঠিয়েছেন মা ভবানীর মন্দির থেকে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দুই তরুণ.সন্তান।

॥ সাইত্রিশ ॥

রক্তপিপাসু ছিন্নমস্তার মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে করজোড়ে শপথ নিল দুই বীবকিশোর প্রফুল্লকুমার চাকী ওরফে দীনেশচন্দ্র আর ক্ষুদিরাম বসু—"হয় ঠিকমত কাজ আমরা শেষ ক'রব, না হয় মৃত্যুকে বরণ করব।"

মায়ের চরণপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে কচি বয়সের দুই তরুণ, গোপীমোহন দত্ত লেনের বিপ্লব সমিতির এক কেন্দ্র থেকে মজঃফরপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সুনীল সেনের ওপর অন্য এক বিশেষ কাজের ভার পড়ায় ক্ষুদিরাম বোসকে পাঠান হ'ল প্রফুল্লর সঙ্গে।

উপনেতা বারীন ঘোষ তাদেব আশীর্ব্বাদ ক'রে হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একটি ব্যাগ। তাতে ছিল দুটি রিভলবার, একটি বোমা—বোমাটি হ'ল, একটি হাতলওয়ালা টিনের পাত্রে ডিনামাইট।

"হ্যাঁ, এতেই আছে! খু-উ-ব সাবধান! মা তোমাদের শক্তি দিন। শুভমস্তু!"

বারীনদার পদধূলি নিয়ে বীর কিশোবযুগল ছুটে চলল।

ছদ্মনামে মজঃফরপুরে এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিয়ে সাত দিন পর্য্যন্ত কিংসফোর্ডের গতিবিধি খুব সন্তর্পনে লক্ষ্য করল দুটিতে।

কে এই প্রফুল্ল চাকী? কে-ই বা ক্ষুদিরাম বসু? কে ঐ দুঃসাহসী তরুণ দুটি, কি তাদের পরিচিত? কে এদের সন্ধান দিল বিপ্লব সমিতির? কোন সুবাদে এরা এই গুপ্ত সমিতির বিশ্বাসভাজন হল? কেমন ক'রে পেল এরা 'অগ্নি-রুধীরের' আস্বাদ? কে এদের ভবানী মন্দিরেব গুপ্তপথের সন্ধান দিল? কে এদের দেহাত্মাকে 'অগ্নি ও রক্তস্নানে' শুদ্ধ করল?

॥ আটত্রিশ ॥

রাজনারায়ণ চাকী তখন বগুড়া নবাব এষ্টেটের কর্ম্মচারী। ১০ই ডিসেম্বর ইংরিজীর ১৮৮৮। সেই দিনই তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ী ঐ জেলায় তাঁর 'বিহার' গ্রামের বাড়িতে একটি হৃষ্টপুষ্ট পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! শিশুটি তো কাঁদতেই জানে না। সর্ব্বদাই হাসিখুশিতে মসগুল।

পাড়ার গিন্নাবান্নী মায়েরা স্বর্ণময়ীকে বলেন—'একি গো! তোমার পোলা যে দেখি কান্দতেই জানে না! আঁতুড়ের শিশু কান্দে না গো? এ যুগে দেখি সবই অদ্ভুত! প্যাট থেকে পড়েই হাঁটতে চায়। দিনে দিনে আরও কতই না দেখব গা! ঘোর কলি আর কারে কয়!'

শিশুটি একটু বড় হতেই এঁরা নাম রাখলেন প্রফুল্ল।

সাধারণ মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারের ছেলে প্রফুল্ল. দু'বছর বয়স হতে না হতেই বাবাকে হারাল। নেমে এল প্রফুল্লদের আনন্দ-নিকেতনে বিষাদের ছায়া।

মা অতি দুঃখ-কষ্টের ভেতর ছেলেটিকে কোনরকমে বড় ক'রে তুলতে লাগলেন। সামান্য একটু বড় হতে না হতেই পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে, ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন গ্রামের পাঠশালায়। এই ভাবেই দীনেশের কাটল অনেকদিন।

বেশ তখন সে বড় হয়ে উঠেছে। ১৯০৪ সালে দীনেশের ভাগ্যে এক সুযোগ এসে গেল; রংপুরে গিয়ে সেখানকার জেলা স্কুলে ভর্তি হল প্রফুল্লকুমার চাকী নামে।

পড়াশোনা সে ভালই করছে; কিন্তু এই একঘেয়ে জীবন তার অসহ্য হয়ে উঠল।

এখানকার 'বান্ধব সমিতি'র খবর সে বেশ কিছুদিন থেকে রেখে

যাচ্ছে, এ তল্লাটে প্রায় ঘোরাফেরা ক'রে। কিশোরদের এখানে ব্যায়াম-চর্চ্চা করতে দেখে, মন তার সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্‌ করে। কি ক'রে সে এখানে নাক গলাবে?

একদিন সুযোগ এসে গেল। এক সতীর্থের সাহায্য নিয়ে সে ঢুকে পড়ল এই ব্যায়াম শিক্ষার আখড়ায়।

এখানে শরীর-চর্চ্চার সঙ্গে সেবাধর্ম্মেরও শিক্ষা দেওয়া হোত প্রতিটি সদস্যকে।

সঙ্ঘের নামটিও বেশ। 'বান্ধব সমিতি'। নামের তাৎপর্য্য প্রফুল্লকে মুগ্ধ করল।

শরীর-চর্চা ক'রে সামান্য কিছু দিনেই সে, দেহটাকে বলিষ্ঠ পেশীযুক্ত ক'রে বাগিয়ে তুলল। দিনের পর দিন শারীরিক এবং দৃঢ় মানসিক শক্তিতে পূর্ণ অধিকার লাভ করল সে। এই সঙ্গে দীক্ষিত হ'ল সেবাব্রতে। দরিদ্র, অসহায়, পীড়িতের সেবায় সে মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিল! ইতর-ভদ্র বাছাবাছি ছিল না তার কাছে।

উত্তরবঙ্গ তো তৈরী হতে সুরু করেছিল অনেক দিন আগেই। কিংস ফোর্ডের অত্যাচার, কার্জ্জনের অপকীর্তি, ইংরেজের জুলুম সব খবরই তারা রাখে। কিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চলে গোপনে এক গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি করলেন, জিতেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী (যাঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী মহেশ্বরানন্দ) পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তীর সাহায্য নিয়ে। প্রফুল্ল চাকীর অন্তরঙ্গ, ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী রংপুরে সরকারী কর্মচারী হলেও এই সমিতির সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ রেখে চলত। এই সুবাদে প্রফুল্লও এই সমিতির এক বিশেষ অংশীদার হয়ে পড়েছিল।

স্বামীজীর কর্মযোগ, গীতার ভাষ্য সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিপ্লব গ্রন্থের অনেক কিছুই প্রফুল্ল এর মধ্যে পড়ে ফেলেছে ও উপলব্ধি করতে শিখেছে এ গুলির সারমর্ম।

রংপুর জেলা স্কুলে মাত্র দু'বছর কেটেছে প্রফুল্লের। সেকেণ্ড ক্লাসের (এখনকার ক্লাস নাইনের) ছাত্র। এই সময় সমস্ত বাঙলা

দেশটা ভাসল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বন্যায়। সেই দুকূল প্লাবী স্রোত এসে ঢুকল রংপুরের ভেতর। জনসাধারণ ছাড়াও স্কুল কলেজের ছাত্রদের গায়ে গিয়ে লাগল সেই ঢেউ। বেশীর ভাগই স্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লর্ড কার্জ্জনের খামখেয়ালীকে নস্যাৎ করতে স্কুল কলেজের ছাত্ররা একজোটে তীব্র প্রতিবাদ তুলল। বেরিয়ে পড়ল পথে পথে। সরকার-বিরোধী কার্য্য কলাপ সুরু করে দিল। স্কুল কলেজের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে, এই সব অবাধ্য ছাত্রদের বেছে-বেছে সরকার নিজেদের শিক্ষায়তন থেকে বিদায় ক'রে দিল। প্রফুল্লকেও তাড়াল, কারণ এই কিছুইতো তাদের দলপতিত্ব করছে।

সরকারী স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়ে শেষকালটায় সে এসে ভর্তি হল রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে। বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় তখন বহু ন্যাশনাল স্কুল জন্ম নিয়েছে এই বিপ্লবকে কেন্দ্র ক'রে।

ঘোরতর স্বদেশী আন্দোলনে রংপুর উদ্বেলিত।

বারীন ঘোষ বেরিয়ে পড়েছেন, বাঙলার ঘর ঘর থেকে আত্মত্যাগী সন্তান সংগ্রহে মা ভবানীর পূজায়। এই সময়ে এসে পড়লেন রংপুরে।

ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত ছিলেন তিনি। প্রফুল্লকে এগিয়ে দিলেন ঈশানচন্দ্র তাঁর কাছে। এই রকম একটি নির্ভীক বলিষ্ঠ তরুণকে পেয়ে বারীন্দ্রের বিশেষ সুবিধে হ'ল। রংপুরের আশপাশের জেলাগুলির জন্যে বিপ্লব সমিতির দায়িত্বপূর্ণ সব কিছু কাজের ভার প্রফুল্লের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে বারীন ঘোষ ক'লকাতায় ফিরলেন।

সুরু হ'ল নবকিশোরের অগ্নিপরীক্ষা।

বেশীদিন আর তার সেখানে থাকা হ'ল না। চলে আসতে হ'ল তাকে বিপ্লব সমিতির বিশেষ এক গুরুদায়িত্বের কাজে।

পূর্ববঙ্গ এবং আসামের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে গুপ্ত

হত্যার সকল প্রকার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

কে যাবে সেই কাজের ভার নিয়ে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে?

মুবারী পুকুর বিপ্লব কেন্দ্রে প্রফুল্ল চাকীর ডাক পড়ল।

ফুলার সাহেব দার্জিলিং যাচ্ছেন। এই সুযোগেই তাঁকে শেষ করতে হবে।

অরবিন্দের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বরিশালের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

বারীন্দ্র, প্রফুল্লকে এই যজ্ঞের ভার দিয়ে পাঠালেন। কিন্তু লাভ হ'ল না কিছু; লাট সাহেবের দার্জিলিং সফর বন্ধ হয়ে গেল।

অন্তরে গভীর বেদনা নিয়ে প্রফুল্ল ফিরে এল।

এবপর বিপ্লব সমিতি মেতে উঠল কিংস ফোর্ড হত্যায়।

প্রফুল্ল উস্‌খুস করছে।

সেখানেও সেই গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল প্রফুল্লর ওপর, এতই বিশ্বাসী সে।

সঙ্গে গেল ক্ষুদিরাম বোস তাকে মদত দিতে।

কানাইলালকে একাজে পাঠাবার জন্যে ঠিক করা হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সমিতি, মত পরিবর্তন ক'রে ক্ষুদিরামকে সেই জায়গায় নিযুক্ত করলেন।

॥ উনচল্লিশ ॥

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ছ'বছরের শিশুপুত্র ক্ষুদিরামকে রেখে স্বর্গে গেলেন। পত্নীবিরহে কাতর নারাজোলরাজ এষ্টেটের নায়েব ত্রৈলোক্য নাথ বসু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ক্ষুদিরামকে অনাথ অবস্থায় ফেলে রেখে গুটি গুটি স্ত্রীর পিছু পিছু চলে গেলেন।

তিনটি ভগিনীই ছিল ক্ষুদিরামের বড়।

তিনকন্যার পর পুত্র সন্তান জন্মানতে মা-বাবা বেছে বেছে ছেলের নাম রেখেছিলেন ক্ষুদিরাম।

বড় বোন অপরূপা রায় পিতৃমাতৃহীন অসহায় ভাইটিকে নিয়ে গেল তার নিজের আশ্রয়ে মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অধীনে হাতগাছিয়া গ্রামে। সেই খানেই ভাইটিকে ভর্ত্তি করে দিল প্রাইমারী স্কুলে।

মেদিনীপুর সহর থেকে, মাইল কয়েক দূরে হবিবপুব গ্রামে ক্ষুদিরাম জন্মেছিল ১৮৮৯এ, এইখানেই তার পিতৃনিবাস।

বড় হয়ে এল সে তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে পড়তে ১৯০১ সালে। সেখানে কাটল মাত্র তার দু'বছর। ১৯০৩এ তাকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল মেদিনীপুব কলেজিয়েট স্কুলে।

ছাত্র হিসেবে ক্ষুদিরাম যে বেশ মেধাবী, তাতে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু অন্যদিকে বালকসুলভ চপলতা তাকে সকল সময়ে হাতছানি দিত। দু'তিনবার স্কুল বদলে বদলে পড়াশোনায় তার বারটা বেজে গেল। এছাড়া চঞ্চল মতিই তাকে স্কুল ছাড়ায় প্রধান সহায়তা করল।

থার্ড ক্লাসেই (ক্লাস এইটেই) ছেলের পড়াশোনাব ইতি হয়ে গেল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রতিরোধের দামামা বেজে

উঠতেই সে এক সতীর্থের পরামর্শে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্কুলের ছাত্ররা অনেকেই নেমে পড়েছে।

এই সময়ে সেই বন্ধুই তাকে বুদ্ধি দিল, মেদিনীপুরের যুবনেতা সত্যেন বসুর সঙ্গে দেখা করতে।

সত্যেনের ছিল এক তাঁতের কারখানা। আসলে কিন্তু সেখানে চলতো মানুষ গড়ার কাজ ইংরেজ সরকারের চোখে ধূল' দিয়ে।

অরবিন্দ ঘোষ যখন সারকুলার রোডের 'গুপ্ত সমিতি'র আখড়া ভেঙ্গে দিয়ে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন বসুকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, বারীন ঘোষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক'রে, সত্যেন সেই সময়ে গভীর দুঃখে ঐ দলের সকল সংস্রব ত্যাগ ক'রে, মেদিনীপুরে এসে নিজের প্রচেষ্টায় এক স্বতন্ত্র বিপ্লবকেন্দ্রের সৃষ্টি করলেন। হেমচন্দ্র, এ কাজটা এর আগেই খানিকটা এগিয়ে রেখেছিলেন এখানে।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখান থেকে বেরিয়ে এসে ঝিমিয়ে পড়েন নি। তিনিও উত্তর ভারতে গিয়ে রাসবিহারী বসুর সাহায্যে বিপ্লবী দল গঠন করলেন।

১৯০৭এর ডিসেম্বরে মেদিনীপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে অরবিন্দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সত্যেনের সাংগঠনিক শক্তি দেখে বিস্মৃত ও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তাই এর পরেই একরকম সাধ্যসাধনা করেই সত্যেনকে মুরারীপুকুর বিপ্লব কেন্দ্রে নিয়ে এলেন তাঁরা।

ক্ষুদিরাম তার বড়দিকে কিছু না জানিয়েই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে চুপি চুপি এসে সত্যেনের তাঁতের কাপড়ের কারখানায় ঢুকে পড়ল একদিন।

এই কারখানাতে তরুণ দলকে ব্যায়াম চর্চা, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, বক্সিং, যুযুৎসু, রিভলবার চালান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সেই সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, গীতা এবং নানান সৎগ্রন্থের

মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। স্বদেশী-দেশব্রতে আত্মোৎসর্গের সকল প্রকার পাঠাভ্যাস করান হ'ত। বড় বড় দেশপ্রেমিক বীরের জীবনী, গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনি প্রভৃতি দেশভক্তের জীবনী পাঠ করে সঙ্ঘের ছেলেদের শোনানো হ'ত। স্বাধীনতার জন্যে আমেরিকানদের প্রাণ বিসর্জন, ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী শুনত এরা মন দিয়ে। সত্যেনের স্বপ্ন ছিল শিক্ষার মধ্য দিয়ে সঙ্ঘের প্রতিটি ছেলের মন খাঁটি সোনার রূপ নেবে।

বাঙলা ভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল আশ্রমিক সঙ্ঘের ছেলেরা। বিদেশী জিনিষ বর্জনের জন্যে তারা দোকানে দোকানে পিকেটিং স্তুরু করেছে।

ক্ষুদিরাম যায় সকলের এককাঠি ওপর দিয়ে। লেগে পড়ল বিলাতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে, ব্রিটিশের তৈরী, নৌকা বোঝাই লবণ, জলের নীচে তলিয়ে দিতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে সত্যেনের মন জয় ক'রে ক্ষুদিরামের পারদর্শিতা সত্যেনকে বিমুগ্ধ ক'রে তুলল।

'ছাত্র ভাণ্ডারে' ভারতীয় পণ্যের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের সকল ভার, সত্যেন, ঐ বিশ্বাসী ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন। এছাড়া মেদিনীপুরের সকল প্রকার সেবা কার্য্যে, তন্তুবায়সঙ্ঘের ক্ষুদিরামের মুখই সকলের আগে দেখা যেতে লাগল। কাসাই নদীর ভয়াবহ বন্যায় সেবাব্রতে ক্ষুদিরামের নাম সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকল। নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে সে এই ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল।

১৯০৬ সালের কথা। সরকার আয়োজিত এক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ক'দিন ধরে স্নুরু হয়েছে মেদিনীপুরে। সুযোগ বুঝে ক্ষুদিরাম 'সোনার বাঙলা' নামে সরকার বিরোধী এক প্রচারপত্র মেলার মাঠেই বিলি করতে স্নুরু করে দিল। একজন পুলিস এসে যেই তাকে পাকড়াও করেছে, অমনি সে আচমকা কয়েকটি ঘুঁষি তার

নাকে মুখে চালিয়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল। আর তাকে খুঁজে পায় কে! পুলিশ বেচারীর নাকমুখ ফেটে দরদর ক'রে রক্ত ঝরছে। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে নিজেকে সামলাতে না পেরে মাটির ওপর বসে পড়ল।

এমনি বীরত্ব দেখিয়ে ক্ষুদিরাম যদি জেলে যেত, সত্যেন তাতে খুশীই হতেন, কিন্তু ক্ষুদিরামের অপ্রাপ্ত বয়সের জন্যে তিনি তার জেলে যাওয়া পছন্দ করলেন না।

এই সময়ে সত্যেন স্থানীয় কলেকটরেটের সঙ্গে একটি বিশেষ কাজে জড়িত ছিলেন। সেই সুবাদে চালাকি খাটিয়ে তিনি কোন ক্রমে ক্ষুদিরামকে এ যাত্রায় রক্ষে করলেন। পুলিস পিটিয়েও তার গায়ে আঁচড়টি লাগল না।

১৯০৭ সালে মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন মডারেট দলের নেতারূপে ;

অরবিন্দ ঘোষ এসেছেন এক্সট্রিমিষ্ট হয়ে।

এক্সট্রিমিষ্ট দলের পক্ষ হয়ে সত্যেন মডারেটদের বিরুদ্ধে এক বিরাট মিছিল বের করলেন। এখানেও ক্ষুদিরামের ভূমিকা সর্বাগ্রে। কি বা বয়স তখন তার! ছেলেটির অকুতোভয় কার্যকলাপ দৃষ্টে অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি নেতারা মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন ছেলেটি কে?

এরপর ১৯০৮ সালে ক'লকাতার 'বিপ্লব সমিতি' যখন স্থির করল মজঃফরপুরে, সেখানকার দায়রাজজ কিংসফোর্ডকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, প্রফুল্ল চাকীকে বারীন ঘোষ পাঠাচ্ছেন এই কাজে, তখন মেদিনীপুরের বিপ্লব সমিতির নেতা হেমচন্দ্র কানুনগো, যিনি এখন মানিকতলা বিপ্লবকেন্দ্রে উপস্থিত, তাঁরই পরামর্শমত সত্যেনের হাতে গড়া ক্ষুদিরামকেই, বারীন স্থির করলেন, প্রফুল্লর সঙ্গে মজঃফরপুর অপারেশনে পাঠাতে, কিংসফোর্ড নিধনকল্পে অরবিন্দের অনুমোদনে।

॥ চল্লিশ ॥

ক্ষুদিরাম এসে গেছে ক'লকাতায়।

১৯০৮এর ৩০শে এপ্রিল। সন্ধ্যে রাত্রি সাড়ে আটটার কিছু পর। ঝোপঝাড়ের ঘনিষ্ঠতায় পথের পাশের এই জায়গাটা বেশ কালকূট অন্ধকারে ডুবে আছে। জনমানব শূন্য স্থান। রাত্রিতে ক্বচিৎ পথচারীর দেখা মেলে।

একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়াল প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম একজনের হাতে আছে প্রবল শক্তিসম্পন্ন বোমা। দুজনের পকেটেই আছে রিভলবার। ফিটনের প্রতীক্ষায় আছে দু'জনে। দেরী দেখে তাদের ধৈর্য্য ধরছে না। মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

দু'জনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ প্রফুল্ল দু'পা এগিয়ে এল। ক্ষুদিরামের গায়ে সামান্য ধাক্কা দিয়ে বলল—'শুনতে পাচ্ছ ফিটন গাড়ির বেল বাজছে!'

—তাইতো!

ঘণ্টির বাজনা ক্রমশঃ কাছিয়ে এল।

চোখের নিমেষে দুজনে পথের দুপাশে স'রে গেল।

পট ক'রে পকেট থেকে রিভলবারটা টেনে বার করে হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল প্রফুল্ল; ক্ষুদিরামের হাতে বোমা।

ফিটন যেই দু'জনের মাঝখানে এসে পড়েছে, বোমা এসে পড়ল গাড়ির ওপর। সজোরে ফাটল।

ফিটনখানা ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল; দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

এর পর কি ঘটতে পারে, সে দৃশ্য দেখবার অবকাশ তাদের ছিল

না। কাজ হাসিল হয়েছে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দুজনে দুদিকে ছুটে পালাল।

পরদিন ১লা মে (১৯০৮), সকালেই স্থানীয় লোকেরা জানতে পারল অ্যাডভোকেট কেনেডি সাহেবের ফিটন অগ্নিদগ্ধ। বোমায় প্রাণ হারিয়েছেন, মিসেস কেনেডি এবং তাঁর কন্যা মিস কেনেডি, প্ল্যানটার্স ক্লাব থেকে নিজের গাড়িতে, বাড়ি ফিরবার পথে।

যাঃ সর্বনাশ হয়েছে! এ ফিটনখানাও তো ঠিক কিংসফোর্ডের ফিটনের মত হুবহু দেখতে। এত বড় ভুল হয়ে গেল? কিংস-ফোর্ডেরই তো এই সময়ে ঐ ক্লাব থেকে বাংলোতে ফেরার কথা। সে মরল না? তবে?

॥ একচল্লিশ ॥

ভগবানের অসীম কৃপা লোকটার ওপর। এতবড় দু'দুটো চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল? খিদিরপুর গ্রাণ্ড হোটেলেও তো চেষ্টা ক'রে তাকে মারা যায় নি।

হায়! হায়! দুজন অবলা নারীর জীবন তারা শেষ ক'রে ফেলেছে।

পর পর বিপ্লবের প্রতিটি চেষ্টাই তো ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন উপায়? উপায় ঐ একটি। প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে গেমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। লুকিয়ে কাজ করলে চলবে না আর। ও রাস্তা পরিত্যাগ করতে হ'বে।

—চন্দননগরে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেণ ধ্বংসের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। উল্লাসকর দত্ত নিজে মাইন তৈরী করেছিল। ডিনামাইটের সঙ্গে একটা লোহার সিলিণ্ডারে পুরে নিজেই মাইনটা নিয়ে গিয়েছিল। রেললাইনের তলায় সে নিজেই তো সেটাকে বসিয়েছিল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ঠিকমত বসান হয়নি।

ফ্রেজারকে মারার চেষ্টা খড়গপুরেও ব্যর্থ; চন্দননগরেও ব্যর্থ।

খড়গপুরেও সে মাইনটা বসান হয়েছিল, সেটাও তো খুব দক্ষহাতেই উল্লাসকর তৈরী করেছিল। কাজ যে কিছুটা হয়নি তা নয়! বাঙলার অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে সেটাও গেছে বানচাল হয়ে।

এইভাবে প্রতিটি চেষ্টাই তো ব্যর্থ হ'তে বসেছে। এ কি অকল্যাণের ইঙ্গিত? তবে কি ইংরেজের মঙ্গল গ্রহ এখন তুঙ্গে!

'গুপ্ত সমিতি'র সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। মা ভবানীর মূর্তির সামনে ব'সে সন্তানদল চোখের জল ফেলছে, দিনের পর দিন এক-একটি অকল্যাণকর ইঙ্গিতে।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

রাত্রির মসীলিপ্ত অন্ধকারের বুক চিরে দুটি 'সন্তান' দু'পথ ধরে ছুটে চলেছে।

পরদিন ২৫ মাইল দূরে পুশা রোডের কাছে ওয়ানি রেল ষ্টেশনে এসে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেল, এক মুদির দোকান থেকে মুড়ি আর মিষ্টি কিনে খাওয়ার সময়ে।

আত্মহত্যার চেষ্টা ক'রেও সে ব্যর্থ হ'ল।

সামান্য ১৮ বছর বয়স মাত্র ছেলেটির। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'মজঃফরপুরে বোমা ফেলায় তার সহকারী ছিল প্রফুল্ল চাকী। সে গেছে উল্টোপথ ধরে সেখান থেকে, ক'লকাতার পথে।'

ব্যাস্, আর যায় কোথায় পুলিস ছুটল তার সন্ধানে।

পথশ্রান্ত ১৯ বছর বয়সের তরুণ প্রফুল্লকুমার মোকামা রেল ষ্টেশনে পৌঁছে, সবেমাত্র একটা চায়ের দোকানে বসেছে, পুলিশ নন্দলাল ব্যানার্জী এসে তার কাছে হাজির হ'ল সাদা পোষাকে। সে তখন ফিরছিল, নিজের কর্মস্থল সিংভূমে মজঃফরপুর থেকে।

সেখানকার পুলিসের সাহায্য নিয়ে যেই সে তাকে গ্রেপ্তার করতে যাবে, ঠিক অমনি সময় প্রফুল্ল ঝট্ ক'রে পকেট থেকে রিভলবারটা টেনে বার করে নিজের বুকের ওপর যন্ত্রের নলটি ঠেকিয়ে ট্রিগারটা দিল টিপে*, নন্দলাল বাঙালী তাই তাকে গুলী ক'রে আগে সাবড়ে না দিয়ে।

---

* ডিকসনারি অফ ন্যাসনাল বায়োগ্রাফিতে ২৪৩ পাতায় কালিপদ বাগচী লিখেছেন—"A sub-Inspector of Police, Nandalal Banerjee, suspected Prafulla at Samastipur Rly. Station and asked

ইংরেজ পদলেহী বাঙালী পুলিস নন্দলালকে এইভাবে ফাঁকি দিয়ে সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রফুল্ল চাকী স্বর্গে চলে গেল। রাস্তার ওপর রক্তাপ্লুত অবস্থায় ঢলে পড়ল তার পার্থিব দেহটি।

বলা বাহুল্য মজঃফরপুরের এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল; বিশেষ ক'রে প্রফুল্লকুমারের এই বীরোচিত আত্মাহুতিতে দেশবাসী বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে বসেছিল দেশে এমন ছেলে আর কত আছে??

প্রফুল্ল এবং ক্ষুদিরামের দুঃসাহসিকতা তখন দেশপ্রাণ প্রতিটি ভারতবাসীর মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। এই কিশোর দুটির জয়গানে বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত।

পুলিস পরম উৎসাহে প্রফুল্ল চাকার দেহ থেকে মাথাটি কেটে নিয়ে 'স্পিরিটে' ডুবিয়ে 'লালবাজারে' পাঠিয়ে দিল। পরে ঐ মাথাটি লালবাজার এলাকার ভেতর কোন এক জায়গায় মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল।

policemen present there to seize him. Peacefully Prafulla exclaimed his agonising surprise that being a fellow country man the officer was getting a patriot arrested to benefit the foreigner. Before he could be secured, he shot himself twice in the head." এখানে আমার সামান্য জিজ্ঞাসা এই যে, আত্মহত্যাকারী কি আত্মহত্যার জন্য পরপর রিভলবারের দুটি গুলী নিজের হাতে মাথায় চালানর অবকাশ পায়? তবে হাঁ, রিভলবার চেম্বারের প্রতিটি গুলী কার্য্যকরী করতে দু'বার ট্রিগার টিপতে হয়, কালীপদবাবু হয়তো সেই কথাটিই এখানে বাহ করতে চেয়েছেন।

॥ তেতাল্লিশ ॥

কিশোর ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার ক'রে যখন মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট উডম্যানের সামনে হাজির করা হ'ল, নির্ভীক কণ্ঠে সে তার জবানবন্দী দিয়ে গেল। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন রাখেন।

ক্ষুদিরাম জবাব দেয়।

—তোমার নাম কি?

—ক্ষুদিরাম বসু।

—বাবার নাম?

—৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু।

—জাতি?

—হিন্দু, কায়স্থ।

—পেশা?

—ছাত্র?

—বাড়ি কোথায়?

—হবিবপুর, জেলা—মেদিনীপুর।

—বোমা কে ছুড়েছে?

—আমি নিজে?

—শাস্তি কি জান?

—জানি। ফাঁসী।

উডম্যানের কোর্টে মাঝে মাঝে আসামীকে হাজির করা হচ্ছে। পুলিস ইত্যবসরে কেসের নথীপত্র সব ঠিক ক'রে ফেলল।

পুলিসের প্রস্তুতি কিছুটা এগিয়ে গেলে, মিষ্টার উডম্যান, দায়রা জজের কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন ক্ষুদিরাম বসুকে, বিচারের জন্যে।

সেসন্‌সে ক্ষুদিরামের বিচারের শুনানী সুরু হ'ল।

দ্বিতীয় দিন সাক্ষ্য দিতে উঠলেন, মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, সি, উডম্যান।

ঘটনার বিবরণে তিনি ব্যক্ত করলেন—"ঘটনার সময়ে আমি আমার বাড়িতেই ছিলাম। আমি একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলাম। আওয়াজটা বেশ জোর বলেই কানে লাগল। আমার বাংলো, ঘটনাস্থল থেকে মাইলখানেক দূরে। তখন রাত্রি সাড়ে আটটার কিছু পর হবে।

"মিঃ কিংসফোর্ড নিজেই তাঁর গাড়ি ক'রে আমার বাংলোতে এলেন। তিনি আমার বাড়ির চাকরদের সঙ্গে প্রথমটা কথা বলছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই আমি ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি। তখন ন'টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

"তিনি আমাকে বললেন, 'একটা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে শুনেছেন?'

"আমি তাঁর ফিটনে উঠলাম, তাঁর ব্যস্ততা দেখে।

"আমরা যখন গাড়ি ক'রে যাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে সব বৃত্তান্ত বললেন।

"এসেই তিনি আমাকে বলেছিলেন, বোমা বিস্ফোরণে দুজন মহিলা আহত হয়েছেন।

"পথে পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা; তাঁকে তুলে নিলাম গাড়িতে।

"সোজাসুজি ঘটনাস্থলেই গেলাম।

"বিধ্বস্ত গাড়ির টুকরো-টাকরা দেখলাম। আসনগুলো এলোমেলো, ছেঁড়া ছেঁড়া কাপড়।

"এই দেখে আমরা মহিলা দুজনকে দেখতে গেলাম।

"মিস কেনেডি অতি দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মিসেস কেনেডিও কিছু বলতে পারছিলেন না।

"আমি কমিশনারের নামে তারবার্তা পাঠালাম, রাজ্যসরকার এবং আরও কার' কার' নামেও।

"গেটের বাহিরে সহিসকে দেখতে পেলাম। সহিসের শরীরের নিচের দিকটা বেশ গুরুতরভাবে জখম হয়েছিল।

"একখানা টেবিল আনালাম সেখানে, কাগজ, চেয়ার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবই আনালাম।

"একটা স্লিপে সহিসের বিবৃতি লিখলাম এবং তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম।

"আমি হাসপাতালে গেলাম এবং পুনরায় সহিসকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলাম—যদি বা তার নতুন কিছু বলার থাকে।

"স্নায়ুর ওপর আচমকা চোট পেয়ে সে ছিল কাতর; অবস্থাও ছিল উদ্বেগজনক।

"কোচম্যানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

"উইলসন, তরশীলদার খান আর ফৈজুদ্দিনের বিবৃতিও নিলাম।

"বিবৃতি নেবার সময় একবার কিছুক্ষণ ক্ষান্ত দিতে হয়েছিল; ডাকবাংলোয় গেলাম।

"এর মধ্যে এক হেড কনস্টেবলের জন্য কিছুটা বাধা পেয়েছিলাম। সে এসে বললে, সে একপাট জুতো পেয়েছে।

"টেবিল থেকে একটা লণ্ঠন তুলে নিলাম, খাল পেরিয়ে বড় গাছটার নীচে এলাম। হেড কনস্টেবল কাঁকরস্তূপের দক্ষিণে জুতোর পাটি দেখিয়ে দিল। জুতোটার কাছে একখানা চাদরও পেলাম। আরও তিনপাটি জুতো পাওয়া গেল সেখানে। ওর মধ্যে পাট মিলিয়ে প্রথমটির অপরটিকে পেলাম; বড় গাছটার কাছে আলাদা আলাদা পড়েছিল। চাদরখানায় মস্ত একটা ফুটো, ২নং

নিদর্শনের মতই।

"এই সব জিনিস পাবার পর আমি ফিরে গেলাম জজের বাংলোয়।

"সেখানকার কাজ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরে গেলাম এবং মাঝরাতের কিছু পর আবার এলাম এখানে।

"এরপর গেলাম টেলিগ্রাফ অফিসে। পুরস্কার ঘোষণা ক'রে টেলিগ্রাম পাঠালাম নানা জায়গায় আততায়ীর সন্ধানে।

"পুলিস সুপারকে বললাম, তিনি এর একটা বিবরণ সহরে প্রচার করে দিন।

"জুতোগুলো পাবার পর পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ঘটনাস্থলের একটা স্কেচ ম্যাপ করতে বলেছিলাম।

"আমি নিজেই ষ্টেশনে গেলাম। কনষ্টেবলদের পাঠিয়েদিলাম। আরও বিস্তারিত ব্যবস্থা ক'রে রাত দুটো কি তিনটের সময় বাড়ি ফিরলাম।

"আবার গিয়েছিলাম গাড়িটা পরীক্ষা করতে। কোচম্যান আব্দুল করিমের বিবৃতি নিলাম। এরপর হাসপাতালে গিয়ে সহিসের বিবৃতি নিলাম।

"এদের জবানবন্দী নেবার পর কনষ্টেবল ইয়াকুব আলীর জবানবন্দী নিলাম।

"মিসেস কেনেডি সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছিলেন।

"ওয়ানি ষ্টেশনে আততায়ীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পেলাম বেলা সাড়ে চারটেয়।

"সন্ধ্যা ছ'টা কুড়ি মিনিটে ষ্টেশনে গেলাম। ট্রেনটা সময়মত পৌঁছে গেল। ক্ষুদিরামের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য পুলিসকেও দেখলাম।

"ফিরে এলাম আমার কাছারিতে—তালাবন্ধ ছিল।

"ক্লাবে গেলাম।

"আমাকে বলা হ'ল যে, আসামী বিবৃতি দেবে। আসামীকেও

একখানা ফিটনে ক'রে ষ্টেশন থেকে ক্লাবে আনা হয়েছিল।

"আমি ক্লাবে গিয়েছিলাম কারণ ঐটাই ছিল নিকটতম জায়গা।

"আমি তখনই তার বিবৃতি নথীবদ্ধ করলাম। কোনরকম চাপ না দিয়েই বিবৃতি পাওয়া গিয়েছিল।

"আসামীর বিবৃতি বেশীর ভাগ ছিল বাঙলায়, সামান্য ছিল কিছু ইংরিজী শব্দ। অন্য একজনের সাহায্য নিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

"আমি যা নথীভুক্ত করেছি সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

"একজন বাঙালী ইন্সপেক্টরকে দিয়ে আমার উপস্থিতিতে ওটি আসামীকে পড়িয়ে শুনিয়ে ছিলাম।

"আসামী ক্ষুদিরাম শুনে বলেছে—'ঠিক আছে'।

"আমি রাত্রেও যে ছ'জন কনেষ্টেবলের বিবৃতি নিয়েছিলাম এবং যে ছেলেটি কেবল সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা সবাই আসামীকে এই ব'লে সনাক্ত করল, যে, ঘটনার আগে তারা যে দুজনকে রাস্তায় ঘোরা ফেরা করতে দেখেছে এ তাদেরই একজন।

"আমি, সাদা পোষাকের কনেষ্টেবল ফৈজুদ্দিন ও তহশীলদার খানের আরও খানিকটা বিবৃতি নিয়ে রেখেছি।

"পরদিন আমি, কনেষ্টেবল শিউপ্রসাদ ও ফতেনারায়ণের বিবৃতি নথীভুক্ত করলাম। এরাই আসামী ক্ষুদিরামকে ওয়ানি ষ্টেশনে ১লা মে (১৯০৮) গ্রেপ্তার করেছিল।

"যে লোকটি নিজেকে গুলী ক'রে মেরেছে, তার শব আনা হ'ল।

আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম।

"ক্ষুদিরামকে দিয়ে দেহটিকে সনাক্ত করালাম। ক্ষুদিরামই, তার সহকর্মী প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়ের শব সনাক্ত করল।

"ষ্টেশন প্লাটফর্মে প্রথমবার ক্ষুদিরামের বিবৃতি নথীবদ্ধ করলাম।

"প'ড়ে শোনালাম তাকে।

"বললে—'ঠিক আছে'।

"আমার কোন সন্দেহ নেই যে ঐ বিবৃতি স্বেচ্ছায় দেওয়া।

"সার্টিফিকেটটা গেঁথে দিইনি ; মনে করিনি ওটার দরকার আছে। আমার মনে হয় ওটা পরিপূরক মাত্র।

"এর পরেই আমি পুলিস সুপারিনটেণ্ডেন্টের সঙ্গে গেলাম ধর্ম্মশালায়। যে ঘরে এই আসামী থাকত, সে ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। ঘরটা তালা বন্ধ ছিল। নানা রকম জিনিস পাওয়া গেল সেখানে।

"৯ই তারিখে বিস্ফোরকের ইন্সপেক্টর এলেন। আমি তাঁর হাতে টিনের বাক্সটা দিলাম। কে, চন্দ্র (১) কে, এর ভেতরের এক জোড়া জুতো দিয়ে বললাম, জেলে আসামীকে পরিয়ে দেখতে।

"কিশোরী মোহন ব্যানার্জীর চেষ্টায়, ক'লকাতা থেকে, দীনেশ চন্দ্ররায়ের নামে যে টাকা মনি অর্ডার হয়ে এসেছিল তার ফরমটা পাঠাবার জন্যে ৬ই তারিখে পি, এম, জিকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।

"বিস্ফোরক ইন্সপেক্টর সযত্নে গাড়িখানা, বাক্সটা, থলেটা, বোমার টুকরোগুলো পরীক্ষা করলেন।

"আমারই উপস্থিতিতে ওগুলো তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

"২রা মে আমি কে, এম, চ্যাটার্জ্জি (১) র বিবৃতি নিই।

"সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ফতে সিং বললেন—'আমি আসামী ক্ষুদিরামকে চিনতে পেরেছি। আমি তাকে ওয়েষ্টার্ন ষ্টেশনের বাইরে দেখতে পাই : ১লা তারিখে এক মুদির দোকানে দেখা পাই। আমি মজঃফরপুর থেকে সকাল একটার ট্রেনে একজন সাব-ইন্সপেক্টর, আটজন কনষ্টেবল ও একজন হেড কনষ্টেবলের সঙ্গে যাই সেখানে'।"

আব্দুল করিম সাক্ষীর কাঠ গড়ায় এরপর তার জবানবন্দী দিতে উঠল

প্রফুল্ল চাকীকে ধরতে পারায় (যদিও প্রফুল্ল তাকে সে সুযোগ দেয়নি গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই আত্ম হত্যা ক'রে এবং নিজেকে খুন করার আগে নন্দলালকে বলে গেল "ইংরেজের পা চাটা কুকুর বাঙালী বলে আমার হাতে থেকে এ যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেলি।") কনষ্টেবল নন্দলাল ব্যানার্জীর অনেক প্রমোশন হ'ল ; একেবারে কয়েক ধাপে ইনস্পেক্টর হয়ে গেল, কিন্তু এই প্রমোশন তার, তিন মাসের বেশী ভোগ করার সুযোগ হ'ল না। সন্ত্রাসবাদীরা তাকে, সারপেনটাইন লেনের (ক'লকাতা) মধ্যে গুলী ক'রে মেরে ফেলল।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

আজ ২রা মে, ধ্যানে ব'সে ভোরের দিকে অরবিন্দ কি যেন এক অকল্যাণকর দৃশ্য দেখতে পেলেন।—ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়েছে, প্রফুল্ল রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেছে। পুলিস মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি ঘিরে ফেলেছে। বাসিন্দাদের হাতে হাতকড়ি-কোমরে দড়ি।

সকাল থেকেই তাঁর মনটা উদ্বিগ্ন। মনের কথা মনেই চেপে রেখেছেন। বারীন্দ্রের কাছে জরুরী সংবাদ পাঠিয়েছেন।

তবুও বারীন্দ্রের দেখা নেই কেন?

বারীন্দ্র 'নবশক্তি' পত্রিকা হস্তান্তর নিয়ে আজ সারাটা দিন খুব ব্যস্ত। তার ওপর বাগানের একটা বৃহৎ কাজ আজই সমাধান করতে হবে।

দুপুরের দিকে এক ফাঁকে একটু সময় ক'রে তিনি ছুটলেন সেজদার কাছে। দাদাকে আনমনা হয়ে দোতলার ঘরে ঘোরাফেরা করতে দেখলেন

অরবিন্দ গুপ্তসমিতির সব জায়গার খবর নিলেন। খানিক চুপ করে থেকে চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করলেন—"মজঃফরপুরের সংবাদ কিছু রাখ?"

বারীন্দ্র বললেন—"না। আজকের 'এম্পায়ার' এখনও পৌঁছায়নি।"

"—সেখানকার সংবাদ আমার যেন ভাল মনে হচ্ছে না। গুপ্ত সমিতির ভবিষ্যতেও যেন আমার সংশয় জাগছে। চোখের সামনে মুহুর্মুহু দেখছি ঘন কাল মেঘে আকাশটা ছেয়ে গেছে, ঝড় উঠল

ব'লে। মানিকতলা বাগানে আর নয়! প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যেখানে যা কিছু আছে গুটিয়ে নিয়ে সদলবলে ওখান থেকে স'রে পড় আজই রাতের মধ্যে। সম্ভব হ'লে অন্য ঘাটিগুলোকেও জানিয়ে দাও। বিপদ ছুটে আসছে। দেরী করলেই মরতে হবে!"

সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ উঠে প'ড়ে লেগেছে,—খুঁজে বার করতেই হবে, কে বা কাদের প্রচেষ্টায় এই সব ক্ষুদে ভীমরুলের জন্ম হচ্ছে! আসল চাকটাই বা কোথায়? যে কোন উপায়ে চাকটাকে খুঁজে বার করতেই হবে!

আগুন লাগিয়ে ওরা চাকের সব ভীমরুলগুলোকে এক সঙ্গে পুড়িয়ে মারবে স্থির করেছে। চাকের হদিস মিলেছে কী সঙ্গে সঙ্গে য়্যাকশন সুরু হবে।

ক'লকাতা তোলপাড় হ'তে লাগল।

সিটি পুলিস স্কোয়ার্ড চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ভুল খবরের জন্য গোয়েন্দা বিভাগের লাঞ্ছনার সামা নেই কর্ত্তাদের কাছে।

কে জানতো আগে, এই ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর গার্ডেন রোডের 'সাধুর আশ্রম'টি 'শয়তানের দুর্গ'! এরা তো কতবার ঘুরে গেছে এর আশপাশ দিয়ে, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের পিছুও নিয়েছে গোয়েন্দা-পুলিশ-একবার নয় অনেকবার! কৈ কিছুই তো টের পায়নি!

হঠাৎ ঐ ২রা তারিখেই আবিষ্কার করে ফেলল তারা, এইগুপ্ত ঘাটিটিকে আচম্বিতে।

সন্ধ্যে থেকেই এর আশপাশ দিয়ে সাদা পোষাকে পুলিশ ঘুরছে। রাত্রি একটু গভীর হ'তে না হ'তেই সশস্ত্র পুলিসবাহিনী ঘিরে ফেলেছে বাগানটিকে। শেষ রাত্রিতেই ধর পাকড় সুরু হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মা ভবানীর প্রতিটি পূজারীর শিরায় উপশিরায় আগুন ছুটতে লাগল।

ক্ষুদিরাম বোস, প্রফুল্ল চাকী দু'জনেই তো পাকা মাথার নয়। বয়সও কম। তবে হ্যাঁ, তাদের চরিত্রবল ইস্পাতের চেয়ে শক্ত, এই যা ভরসা। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি নেতারা খুবই চিন্তাগ্রস্ত কী হয়-কী হয়! বড়ই উদ্বিগ্নমনা। এদের খবর খুবই গোপন রাখা হয়েছে। এমন কি দলের দু'একজন ছাড়া, কেউ জানেনা, এদের মজঃফরপুর যাওয়ার খবর।

'এম্পায়ার' কাগজে মজঃফরপুরের খবর পাওয়া যায়। প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম, রওনা হয়ে যাওয়ার পর দিন থেকেই একখানি করে 'এম্পায়ার' প্রতিদিন গুপ্তঘাটিতে আনা সুরু হল। বাগানের কেউ না কেউ গিয়ে রোজই বেলা তিনটের পর এই একখানি খবরের কাগজ কিনে আনে। এক লোকই রোজ যায় না। লোক বদল হতে থাকে। তিনটে বাজলেই বারীন কাগজ খানার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বাগানের ছেলের দল ভাবে—কেন রে বাবা এ কাগজটার জন্যেই শুধু শুধু এত ব্যস্ত হওয়ার আছেটা কী। উঃ, বারীনদার জ্বালাতন আর সহ্য হয় না। দিব্বি ডিক্‌টেটরী চালিয়ে যাচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে যেই না একটু বসেছি, ওমনি হুকুম হ'ল। রোজই তো এক গোছা করে খবরের কাগজ আসছে বাগানে, এতেও ওঁর মন ওঠে না; 'এম্পায়ার' খানা হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেন চনমন—চনমন ক'রে ঘুরে বেড়ান।

বারীন ঘোষের সদলবলে শ্রীঘর দর্শনের ঠিক আগের দিন কাগজ আনার ভার পড়ল অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের ওপর।

—'আচ্ছা, ঝঞ্ঝাট তো? বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল। বাগানের সঙ্গে তো তার নেই কোন সম্বন্ধই, এর ওপর 'নবশক্তি'র খুঁটি নাটি সব-কিছুই তাব সেই দিনই বিপ্লব সমিতির পক্ষ হয়ে বুঝে নিতে হচ্ছে, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার কাছ থেকে। অসম্ভব কাজের ভীড়, তাও তাকেই যেতে হবে কাগজখানা আনতে। হুকুম তামিল না করলেই

মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে।

কাজকর্ম্ম মিটিয়ে, রাত্রি আটটার সময় কাগজখানা বগলে নিয়ে অবিনাশ দ্রুত পা চালিয়ে এসে ঢুকল বাগানে।

বারীন্দ্র বড়ই চঞ্চল চিত্তে বারান্দার ওপর পাইচারী করছিলেন, দৌড়ে গিয়ে ছোঁ মেরে কাগজখানা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে চোখের সামনে খুলে ধরেছেন। উপেন্দ্র এসে হুমাড় খেয়ে পড়লেন। হেডলাইনগুলোতে চোখ বুলিয়ে চললেন।

অবিনাশের দাঁড়াবার সময় ছিল না। হন্ হন্ করে পা চালিয়ে ফিরে গেল গ্রে স্ট্রীটে।

নিমেষে বারীন্দ্রের মুখের ভাব পাল্টে গেল।—যা সর্ব্বনাশ হয়েছে উপেনদা! দেখছ কি? এবারেও কিংসফোর্ড ফসকে গেল। বেটা দেখছি অমর-অক্ষয় হয়ে পৃথিবীতে এসেছে! এ য়্যাটেম্পটাও মিস হয়ে গেল। ছি, ছি, শেষটায় কিনা দুজন অবলা নারী মারা গেল! হোকনা তাঁরা ইংরেজ মহিলা, তবুও স্ত্রী লোকতো বটে! নারীর প্রাণ নাশ ক'রে বিপ্লবীর হাত কলুষিত করা যে গুপ্ত সমিতির রীতি বিরুদ্ধ কাজ। আমরা কোনসময় তা চাইনি। কে তাদের এ কথা বলে দিয়েছিল? আমি তো নই-ই। নিশ্চয় ভুল করেছে।

বারীন মাথায় হাত দিয়ে মাদুরের ওপর বসে পড়লেন।

আবার চোখ দুটো বড় বড় করে কাগজের ওপর বুলিয়ে চললেন। প্রথম পাতাতেই চোখে পড়ল,—পুলিস জানে কোথা থেকে কারদ্বারা এসব কাণ্ড ঘটছে। শীগগির এর একটা কিনারা করা হবে।

—তবে কি ওরা ধরা পড়ে পুলিসের কাছে সব বলে ফেলল? তা না হলে পুলিস কি করে এখানকার খবর জানবে? নাঃ তা হতেই পারে না। ওরা তো মা ভবানীর কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। জান্ কবুল! ওদের চরিত্রে এ সব সন্দেহ করাই অন্যায়—বারীন আপন মনে বক বক করে চলেছেন।

সেজদা তো আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছেন, আজই এখানকার

পাট তুলে দিয়ে, মালপত্তর গুটিয়ে নিয়ে যে যার মত সরে পড়তে বলেছেন।

সময়তো হাতে নেই। হুকুম দিলেই তো আর হয় না। তিনি তো ফতোয়া জারি করেই খালাস। এতবড় কারবার রাতারাতি গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়াতো আর চাট্টিখানিক কথা নয়! তবে বেশ বুঝতে পারছি উপেনদা! গতিক বিশেষ সুবিধের নয়। খু-উ-ব ঘোরাল হয়ে উঠেছে। অনেক সময় দেখি সেজদা যা বলেন তা সত্যি হয়। হতেও পারে? দেরী করলেই মরতে হবে অবধারিত। কিন্তু আজ আর সময় কোথায়?

সেই মুহূর্তে দু'জনে একান্তে গোপন পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

এইবার বাকি সকলকে কাছে ডেকে বললেন, "কাল সকালেই বাগানের মায়া কাটিয়ে, মালপত্তর যতটা পারা যায় গুটিয়ে নিয়ে যে যেখানে পার কেটে পড়। সেজদা যেন কি 'অশনি' সঙ্কেত পেয়েছেন! বিলম্বে ঝড়ের ধাক্কায় গুপ্ত সমিতির পক্ষে টাল সামলে ওঠা কঠিন হয়ে পড়বে। আজ রাত্রিতেই পালাতে পারলে ছিল ভাল! সারাটা দিন সকলের যা হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম গেছে, তাতে দেখছি আজ তো আর একাজ করা কোন মতেই সম্ভব হয়ে উঠবে না; রাত্তিটা একটু গড়িয়ে নিয়ে কাল ভোর থেকেই সুরু ক'রে দেওয়া যাবে'খন"!

উল্লাসকর বললেন—"না না কালকের জন্যে এসব কাজ ফেলে রাখা যায় না! অস্ত্রশস্ত্রগুলো বড়ই কষ্ট ক'রে সংগ্রহ করা হয়েছে। তোমরা, নতুন যারা এসেছ সকলে তো এখবর জান না! বোমা তৈরীর মাল মশলা তাও তো মূল্যবান জিনিষ। কাগজ পত্তর বহু আছে, সবই তো সরাতে হবে। এ দেখছি 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' খবর যখন একটা কানে এসেছে, রাতারাতি এর ব্যবস্থা করতেই হবে! দেশ স্বাধীন করতে চলেছি, পরিশ্রম করতে ভয় পেলে চলবে কেন? ও কাপুরুষতা আমার মধ্যে নেই। বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন সব

ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি কি শুধু শুধুই ! চলো, লেগে পড়া যাক" ?

পরেশ মৌলিক বললেন—"তুমি আবার দেখছি এক কাঠি ওপর দিয়ে যাচ্ছে। উঠল বাই তো কটক যাই" !

উল্লাসকরের ঐ একই কথা—"ওকথা বললে চলবে না ভাই। যতদূর পারা যায়, রাতারাতি জিনিষগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে বাগানের মাটির নীচে, এখুনি। ভগবান করুন বিপদ কিছু না ঘটলে বাকি যা কিছু থাকবে কাল দেখা যাবে। চল এখন লেগে পড়া যাক। বয়স বেশী বলে দাদাদের ও বাদ দিচ্ছি না ! সকলকেই হাত লাগাতে হবে"।

একসঙ্গে সকলে লেগে পড়ল।

কাজ শেষ হতেই দলের অনেকেই ভাঁজ করে জড়িয়ে রাখা সরু বিছানাটা কোন গতিকে ঘরের মেঝের ওপর গড়িয়ে দিয়ে যে যার মত শুয়ে পড়ল। কৃচ্ছ্রতা সাধকদের বিছানাতে নেই কোন পারিপাট্য। ঘুমে তাদের চোখ জড়িয়ে আসছে। আহারের চেয়ে ঘুমটাই এখন বেশী প্রয়োজন।

সকাল হওয়ার সুযোগ আর এল না।

রাত চারটে বাজতে-না-বাজতেই খড়্‌খড়্—খট্‌খট্ কড়া নাড়ার শব্দ বড় ঘরের দরজায়। বাগানবাড়ির হাতার ভেতরেই খস্‌খস্ মস্‌মস্ পায়ে চলার আওয়াজ।

পরেশ মৌলিক আর উপেন্দ্রের সব প্রথম ঘুম ভাঙ্গে। জানালার খড়খাড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বাহিরের ব্যাপার স্যাপার নিরীক্ষণ করছেন দুজনে। বারীন উঠে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিন-জনেই মুখ চাওয়াচায়ি করছেন। কারো মুখে কথা নেই।

আবার দ্বিগুণ জোরে খড়্ খড়্ খট্ খট্ কড়া নাড়ার আওয়াজ !

দরজা আর কেউ খোলে না।

এইবার দরজার ওপর দমাদম লাঠির ঘা পড়তে লাগল।

খট্ করে খিলটা খুলে বারীন সোজা একদল লাল পাগড়ীর

সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এদের ঠেলে মাঝ খান থেকে বেরিয়ে এলো লালমুখো এক পুলিস অফিসার।

"কি চাও তোমরা" ? বারীনের দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

তাঁর বুক বরাবর রিভলবারটা উঁচিয়ে ধরে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলে—"Who are you" ?

তেমনই অকম্পিত কণ্ঠের জবাব বেরিয়ে এলো—"I am the owner of the garden."

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গীটা চেঁচিয়ে তাঁকে বললে—"Hands up." একজন হেড কনষ্টেবলকে হুকুম দিলে—"বাঁধো ইস্‌কো।"

সাহেবের মুখ থেকে কথাটা বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ত্বজন দেশোয়ালী পুলিস বারীন্দ্রের হাতে, হাত-কড়ি আর কোমরে দড়ি লাগাল। বাকি তু'জন তাঁর হাত চেপে ধরে থাকল।

লণ্ঠনের আলোতে বারীনের নজর গিয়ে পড়ল বিশেষ ক'রে এক-জনের মুখের ওপর। একেই তো বারীন, বারীন কেন ? দলের অনেকেই পাশের বাগানের গাঁজাড়ীদের জুয়ার আড্ডায় আসা যাওয়া করতে দেখেছেন অনেক দিন। পুলিসের চোখ এড়িয়ে নিরিবিলি জায়গায় জুয়ার আড্ডা খুলেছে ভেবে গুপ্ত সমিতি এদের কিছুই বলেনি। কে জানতো ওটা গোয়েন্দা পুলিসের আস্তানা ! সাদা পোষাকে লোকটা চলাফেরা করত আর টেরিয়ে টেরিয়ে তাদের দিকে দেখত। সকলেই ভাবে বেটা নেশায় বুঁদ হয়ে চলাফেরা করে, তাই চোখের ঐ অবস্থা ! ভাবা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কারণ ঐ বাগানে সব সময় হল্লা চলতো।

বারীন লোকটাকে সম্বোধন করে বললেন,—"সুমুন্ধি ! যদি একবারও টের পেতাম তুমি পুলিসের গুপ্তচর ! তুমি কেন ? তোমার জন্মদাতাও কবে সাবড়ে যেতো ! যাক্, পূর্ব জন্মের সুকৃতি, এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। বরাতের খুব জোর তোমার" !

এর পরেই তিনি দলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি

হাঁকাহাঁকি সুরু করেদিলেন, "ওরে আয়রে তোরা সব বেরিয়ে আয়। মজা দেখবি আয়" !

একজনও বেরুল না।

এই ফাঁকে জনাকয়েক ফিরিঙ্গী সার্জ্জেণ্ট, কয়েকজন দেশোয়ালী পুলিস সঙ্গে নিয়ে, সামনের দরজাটা দিয়ে সুড়ুৎ ক'রে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

বাসিন্দাদের টেনে বার ক'রে এনে আম গাছের নীচে-পুকুর ঘাটের ওপর যোড়া যোড়া ক'রে বসাল। খানিক পরে উল্লাসকরকে টেনে এনে হাজির করা হ'ল ঐখানে। উপেন লুকিয়ে ছিলেন, তাঁর ঘরের পর্দার আড়ালে। ভেবেছিলেন, আত্মগোপন ক'রে থেকে এই ফাঁকে যমদূত গুলোর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলে, সুবিধে মত কেটে পড়বেন।

কিন্তু হ'ল কৈ ? ঠিক টেনে বার করেছে !

উপেনকে পুকুর ঘাটের দিকে নিয়ে আসতে দেখে, বারীন একটু মুচকি হেসে বললেন,—"আশা করেছিলাম 'চিড়িয়া উড় গেয়া'; দলের ভেতর তোমাকে না দেখে ভারী খুসী হয়ে ছিলাম। হায়, হায়, অদৃষ্ট তোমারও !"

উপেন একটু রাগত স্বরেই উত্তর দিলেন—"তখনই বলেছিলাম 'যুগান্তর পত্রিকা' ছেড়ে দিয়ে ওরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিবৃতি না দাওয়াই ভাল। তুমি আমার কথা শুনলে না ! গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে ঐ কাগজে লিখলে,—লাইনটা এখনও হুবহু আমার মনে আছে, লিখেছিলে,—'একদিন যাহা কাগজে লিখিয়াছি, এইবার তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইব বলিয়াই আমরা একদল কাগজ হইতে আজ থেকে বিদায় লইয়া চলিলাম।' যা দেখাবার ইচ্ছে ছিল তা মনে মনে রাখাই ভাল ছিল না কি ? তারপর থেকেই তো পুলিস আমাদের পিছুনিল। দ্বিতীয় কাল হল, ভবানীমন্দিরের পাশের বাগানে ঐ দলের আড্ডা; যাদের আমরা বরাবর জুয়াড়ী বলে ভুল ধারণা করে এসেছি।"

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

সন্তানদল থাকেন ভবানীমন্দিরে দুখানা ঘয় জুড়ে।

সামান্য বিছানায়, যাত্রাদলের মত কুকুবকুণ্ডুলী পাকিয়ে পড়ে থাকে সকলে। ভি. আই. পিরা থাকেন, ছোটখানিতে। আর ছেলে ছোকরারদল হৈঃ-হুল্লোড় করে, বড় ঘরটিতে। কৃচ্ছ্র সাধনে সকলেই ওস্তাদ। এ বলে, ওকে দেখ—ও বলে, একে দেখ। এক একখানি যেন সানান ইস্পাতের ছুরি!

প্রতি মুহূর্তের জন্যেই প্রত্যেকেই প্রস্তুত। পা যেন বাড়িয়েই আছে! খালি হুকুম মেলার যেটুকু বিলম্ব।

এ ছাড়া ক'লকাতার এখানে সেখানে, এমন কি ক'লকাতার বাইরেও বিপ্লবীদল ডেরা বেঁধেছে। অন্যান্য প্রদেশেও ডানা মেলেছে।

কানাইলাল, যে সময়ে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর থেকে এসে বিপ্লব সমিতিতে যোগ দেয় তখন তার চেহারা ছিল পিলে ডিগডিগে। একদিন অন্তর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, ভালুক জ্বরের মত হুঁ হুঁ করে কাঁপিয়ে তোলে তার সমস্ত শরীরটাকে।

তবুও সে কাজ চায় এই শরীরে, দৃঢ় মনোবল নিয়ে।

বারীন্দ্র তাকে বাজিয়ে দেখে, শরীরটা তার ঠিক করবার জন্যে বায়ু পরিবর্তনে পুরী পাঠিয়ে দিলেন। ইতস্ততঃ করেছিলেন প্রথমটা।

"দেখতে পাচ্ছতো বাঙলার ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার মহামারী। কোথায় পাচ্ছ ভায়া! স্বাস্থ্যবান বাঙালী যুবক। সব সময় তো আর সার্কাস পার্টির বাগানো শরীরের ছেলে মিলবে না! দেখ ভাই, এসব কাজে হিম্মত দরকার, চাই এতে বুকের পাটা। এদেরকেই তো

খাড়া ক'রে কাজে লাগাতে হবে। সেটা বোঝ না কেন ?" বারীন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন উপেন্দ্রনাথ।

সকাল কখন হবে ? পুলিসের আর তর সইছে না।

ভোর হতে না হতেই পুলিস গিয়ে রাস্তার ওপর থেকে জনকয়েক আজেবাজে লোককে সাক্ষীর জন্যে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এল। ৩২নং মুরারী পুকুর বাগান বাড়ীতে খানাতল্লাস চালাবে তাদের সামনে এই উদ্দেশ্য।

ফিরিঙ্গী পুলিস অফিসার বারীন্দ্রকে বললে—"We are going to search* your house. Search our persons if you like."

ইংরেজ পুলিস অফিসার আইনের ফাঁক না রেখে বারীন্দ্রকে সে সুযোগ ক'রে দিল।

বারীন্দ্র প্রত্যাখ্যানে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন,—"I feel ashamed to touch your bodies. You can do what ever you like."

বারীন্দ্রের ঐ একই চিন্তা—করুক না বেটারা কত তল্লাসী করতে পারে করুক। অস্ত্রশস্ত্রগুলো যেভাবে ধরিত্রী রাতারাতি উদরস্থ করেছে, না উগ্‌লে দিলেই ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। ছেলেগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খুবই পরিশ্রম করে সেগুলোকে মাটির নীচে লুকিয়েছে। ওগুলো যদি বেটারা না পায়, আমাদের করবে আর কলাটি !

জমির বুকের ওপর প্রায় জায়গায় রাত্রিতে নতুন কোদাল পড়েছে।

* কোন বাড়ি খানাতল্লাসীর সময়ে গৃহকর্তা ইচ্ছে করলে, পুলিসই হোক আর সাক্ষীই হোক, গৃহে ঐ সবের অনুপ্রবেশের আগে, তাদের কাপড়—চোপড় সবই বেশ ভালভাবে ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারে, যাতে তারা কিছু সঙ্গে এনে গৃহকর্তার গ্রেপ্তারের সহায়তায় না লাগতে পারে।

উপেন্দ্র, উল্লাসকর ছোকরাদের সঙ্গে সন্ধিহান দৃষ্টিতে চাওয়া চায়ী করছেন, এই বুঝি ওরা মাটির গায়ে কোদালের ঘা দিল !

অফিসার সামান্য মুচকি হেসে, কজন সার্জেণ্ট আর পুলিসকে বললে—"Come on let us start from the Dove's nest. Take two of the culprits to be present and two outsiders as witness."

এক ঘণ্টা তল্লাসী চালিয়ে বেচারীদের 'নীড়' দুখানা একেবারে তছনছ ক'রে ফেললে পুলিস পুঙ্গব ! পেল 'ঘণ্টা' ! দু একটা কাট্রিজের খালি খোল, কয়েকখানি চিঠিপত্র, মাটির সরাতে রশুন, এটেল মাটি, তিসির তেল, কোনটাতে বা ওগুলো একসঙ্গে মেশান ছিল। মূর্খের-দল দেখেই ভাবল বোমা তৈরীর মশলা। খুব সন্তর্পণে সে গুলো গুছিয়ে নিল। 'এম্পায়ার' কাগজখানা উঠিয়ে দেখে, মজঃফরপুরের খবরটাতে ব্লু পেনসিলের দাগ। আর যায় কোথায়, ওমান একটা লালমুখ, সেখানাকে বারীন্দ্রের চোখের সামনে তুলে ধরে বললে - "See see a very interesting news isn't it ?"

বারীন বললেন—"Why interesting ? It's a thrilling news of course !"

পরদাটা নড়তে দেখে, এরই মধ্যে একজন সার্জেণ্ট চোঁ ক'রে পাশের ঘরে ঢুকে পরদার আড়াল থেকে উপেন্দ্রকে টেনে বার ক'রে বিরাট হল্লা সুরু ক'রে দিল, যেন একটা হীরের খনি আবিষ্কার করে ফেলেছে !

অমনি চার পাঁচজন পুলিস ছুটে গিয়ে তাঁকে চ্যাংদোলা করে উলু দিতে দিতে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

উপেন্দ্র কৌতুক করে বললেন—"সুমুন্দিরা তো সবই করলে ! চতুর্দোলা তো কই দেখছি না ?"

সার্জেণ্ট ফ্রেজোনি জবাবে বললে, "Yes, yes, you need not worry ! We have arranged a beautiful funny

'Coronation car, for you in front of the garden gate."

সকলেই হো হো শব্দে হেসে উঠল।

ওদিকে আবার বাগান খোঁড়াখুঁড়ি সুরু হয়ে গেছে। এতক্ষণ তারা বাগান খুঁড়ে অনেক কিছুই বার করে ফেলেছে।

মাটির নীচে, বাঁধান ঢাকনা দেয়া চৌবাচ্চার ভেতর থেকে তারা বিপ্লবীদের সযত্ন রক্ষিত বোমা, রিভলবার, বন্দুক, কাতরুজ তার সঙ্গে কিছু গোপনীয় মূল্যবান দলিলপত্র এক এক করে টেনে টেনে ওপরে তুলল।

গভীর বেদনায় বারীন্দ্র, উপেন্দ্র এবং উল্লাসকরের মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। মনে মনে তাঁরা চিন্তা করলেন—যাঃ, এতদিনের ঐশ্বর্য সবই তো ওরা হরণ করলে। গেলতো সবই! চোখে দেখে বুক তাদের ফেটে যাচ্ছে।

বারীন্দ্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উক্তি করলেন—''যেটুকু অবশিষ্ট আছে রিক্ত হস্তে বিলিয়ে দেব। তিলে তিলে এগুলো সংগ্রহ করতে, দেশের লোকের কাছে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি! অর্থকষ্ট যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। পাঁচ দশটাকা যে সাহায্য করেছে সেও চেয়েছে 'action'—প্রশ্ন করেছে, কি করলে? 'আজ পর্যন্ত কজন ইংরেজ মারতে পেরেছ'? —কেবলই এই একই প্রশ্ন।"

এই সম্বন্ধে বারীন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন—"সে সময়ে বড় বড় কাপ্তানরা পাঁচ দশটাকা চাঁদা দিয়া লীডার হইতেন, আর ড্রইংরুমে বসিয়া বুভুক্ষু কর্ম্মশ্রান্ত আমাদের উপর ফরমায়েস করিতেন লাট-বেলাটের তাজা মুণ্ড! —একজন এ হেন কাপ্তান একবার এক হাজার টাকা এই সর্তে দিয়াছিলেন যে, আমরা ক'জনায় মিলিয়া যেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথা সম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করি। বহু চেষ্টায়ও যখন সতর্ক মাছ জালে পড়িল না, অথচ স্থানে-স্থানে তাড়া করিয়া বেড়ানোর ফলে টাকাটি খরচ হইয়া গেল, তখন

এই ধনিপুত্র কুলের দুলাল আমাদের কান মলিয়া সেই এক হাজার টাকা আদায় করিয়া লইলেন।"

বাগানে যেখানে যা কিছু ছিল, অশ্রুবিগলিত নেত্রে, বারীন্দ্র একটি একটি করে সব কিছু পুলিসকে দেখিয়ে দিলেন।

এখান থেকে পুলিস হস্তগত করল, অনেকগুলো রিভলবার, এক গাদা রাইফেল—বন্দুক, ডিনামাইট, বোমার খোল-ঢালাইয়ের যন্ত্র-পাতি, বোমা তৈরীর বই, মূল্যবান দলিলপত্র আর গুপ্ত সমিতির গঠন প্রণালীর ইতিহাস।

বিপ্লবীদের চোখের সামনে এসবগুলো হয়ে যেতে লাগল ঠিক যেন চলচিত্রের পর্দার ওপর।

বারীন্দ্রের ব্যাপার স্যাপার দেখে, দলের সকলের মুখের ওপর বিষাদের কালী ঢালা ছাপ ভেসে উঠল। ক্রোধে উপেন্দ্র, উল্লাসকর এবং হেমচন্দ্র বাক্‌শক্তি হীন।

বারীন এ সবই লক্ষ্য করেছেন।

কিন্তু কেন যে তিনি এতদূর উদার হলেন কেউই তা বুঝতে পারছে না, কেবল ক্রোধেই ফুলেছেন আত্মত্যাগী সন্তানদল।

আরও কিছু সন্ধান মিলবে ভেবে পুলিস, শচীন আর বিভূতিকে ধরে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিলে।

এমন সময় বারীন পুলিস অফিসারের কাছ থেকে একখানা সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখে দিলেন—"এখানকার যা কিছু সব আমিই জানি, সব আমিই করেছি, ওরা কোন কিছুর খবর রাখে না। এরজন্যে আমিই একমাত্র দায়ী। এরা সব নির্দোষ। যা কিছু করতে হয় আমায় কর।"

পুলিসের অনেকেই উদগ্রীব হয়ে লেখাটি পড়ল।

একজন সার্জেণ্টকে বলতে শোনা গেল—"Noble fellow!"

ব্যাঙ্গই করেছিল সম্ভবতঃ।

ভোরের সূর্য তখন স্বর্ণরাঙা মুখে পুলিসের দলকে ভ্রূকুটি করছে,

এই সময় বাগানে এসে হাজির হলেন ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের 'বিগ্ বস্' মিঃ প্লাউডেন, রামসদয় মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে।

প্লাউডেন বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন—"বারীণ্ড্র! টুমি ক'টবড় মহট লোকের ছেলে আসে। টোমার বোড়ো ডাডা বিনয়কে আমি খুব ভাল করে ছিনি। শেষে কিনা টুমিই এই কাজ করিলে? সিঃ সিঃ এ কি কাণ্ড টোমার? হামি টো বিস্ওয়াস করিতে পারি-টেছে না।"

—"সাহেব! আমি তো সব অপরাধ মেনে নিচ্ছি, লিখেও দিয়েছি। নিজেই তো সব দেখিয়ে দিলাম, তবুও এরা আমায় এমন টানা হেঁচড়া করছে কেন?

প্লাউডেন উত্তরে ক্ষুব্ধ হয়েই বললেন—"A man in your position should not expect better behaviour than this! Now tell me who is the chief of your 'Military Base'?"

বারীন্দ্র গর্বিবত ও গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আমি নিজেই"।

—অস্ট্র সোস্ট্র ক'ট আসে? কোঠা হইটে আমডানি করিলে?

—সকলকে উপেক্ষা করে সবই তো দেখিয়ে দিয়েছি। আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, খুঁজে নাও গে যাও।

—কেনো এই ঘাঁটি টৈয়ার করিযাসিলে?

—সে জবাব কোর্টে দেব।

—এই রোকোম মিলিটারী বেস, টোমাডের আউর কোটো জায়গায় আসে?

—যদি বলি সারা ভারতবর্ষে।

—সারা ভারটবর্ষে? কোঠাটা মিঠ্যা বোলনি! হটে পারে। হামি বিস্ওয়াস কড়িতেছে। খবর কিসু কিসু রাখিটেসি হামিলোগ। ডরকার হইলে টোমায় ডেখাইয়া ডিটে হইবে। হামি টোমায় কাজে

লাগাইব।

—তাতো দেখাব না সাহেব! উঃ হুঃ, সে গুড়ে বালি!

—সে গুড়ে বালি কি বলিলে? বহুট আস্‌সা! ডেখাইয়া ডিবে টাহা হইলে? কোন্ কোন্ ষ্ঠানে আসে, সেগুলির নাম বোল'?

এত দুঃখেও বারীন তার কথায় হেসে ফেললে। পরে হাসি চেপে বললে—এই তো তুমি বললে তোমরা সবই জান! ওর বেশী তো আমি কিছু বলব না সাহেব! কেন মিছি মিছি বিরক্ত করছ?

—কোটো লোগ টোমার ডলে আসে? কে, কে, টাহাডের নাম বোল?

—জানিনা। জানলেও বলব না!

—এখন বলিবে না। এক সময় বলিটেই হইবে! লালবাজারের মেঠাই খাইলে হুরহুর করিয়া বলিয়া ফেলিবে। নিশ্চয় বলিবে!

—তাও বলব না।

—অড়বিন্দ গোস টোমাডের জেনারেল আসে, টাই না? ইহা সট্য কঠা কিনা বোল?

—অবান্তর প্রশ্ন। কেন মিছি মিছি কিক করছ বলো তো? আমার কাছে কোন জবাবই পাবে না!

—অড়বিন্দ না হইলে কে আসে?

—সাফ কথা বলে দিচ্ছি, আমি নিজেই! তোমার আর কোন প্রশ্নেরই জবাব আমি দেব না। কোথায় নিয়ে যাবে চল। আর বিলম্ব কেন?

—শ্বশুর বাড়ীটে উপষ্ঠিট করিলে সব বুঝিটে পারিবে। বহুট খাপ সুরাট ছোকরী ভি মিলিবে! কি রাজি আস?

—ওলোভ আমাদের দেখিও না সাহেব! তাহলে বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে এ কাজে আসতাম না জেনে রেখো।

কবুল হামরা করাবই! টুমিটো টাডের কাসে শিশু আস। টঠাকার বিভীষিকায় কোট, গুণ্ডা বডমাস সিটা হইল। টোমাকে সিটা

করিটে দো মিনিট টাইম লাগিবে। একবার যাঁতিকলে পড়িলে সব বুঝিটে পারিবে। এটো ডিন যেটো পাপ করিয়াস টাহার প্রায়শ্চিট্ট হইয়া যাইবে। টুমি একাই কবুল কড়িবে না, ডাওয়াই পড়িলে, বাগানের সব শয়টানের মুখ হইটে ফুড়ফুড় কড়িয়া খই ফুটিটে ঠাকিবে। শ্বশুর বাড়ির আডর হইবে—বলেই প্লাউডেন হো—হো করে হেঁসে উঠলেন।

রাগে-দুঃখে বিপ্লবীদের শিরা-উপশিরায় আগুন ছুটতে লাগল। কিন্তু নিরুপায়!

এখানে সব কথা কবুল না করলেও বারীন্দ্র কোর্টে বিপ্লবী দলের সংগঠনের বিষয় অনেক কথাই জানিয়ে দিয়েছিলেন। কোর্টে এও বলেছিলেন—"Wherever we went for money we were encouraged to use explosives. Thinking that to be the voice of the nation, we submitted and begun serious preparations."

২রা মে রাত্রিতে ঐ একই সঙ্গে জাল ফেলে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে, ২রা মে সকাল পর্যন্ত বিপ্লবী সন্দেহে পুলিস অনেককেই গ্রেপ্তার করল। সেই দিনই ওই জাল বিস্তৃত হল বাঙলার দিগ-দিগন্তে। শেষে বাঙলাকে ছাড়িয়ে গিয়ে পড়ল দেওঘরের ওপর।

গ্রেপ্তার হলেন, ৩২নং মুরারী পুকুর গার্ডেন রোডের বাগান বাড়ি থেকে ১৪ জন: কলকাতার—বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, চন্দননগরের—উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ বেড়িয়ার—উল্লাসকর দত্ত, রংপুরের—নলিনী কান্ত গুপ্ত, সোনারংয়ের—শচীন্দ্র কুমার সেন, যশোহরের—ইন্দুভূষণ রায়, শিশির কুমার ঘোষ, পরেশ নাথ মৌলিক আর হেমেন্দ্র নাথ ঘোষ, শান্তিপুরের—বিভূতি ভূষণ সরকার, খুলনার—বিজয় কুমার নাগ, রাজসাহীর—নরেন্দ্রনাথ বক্সী, কুষ্টিয়ার—কুঞ্জলাল সাহা, এ ছাড়া তমলুকের - পূর্ণচন্দ্র সেন।

পুলিসের দ্বিতীয় দল ছুটেছে ১৫ নম্বর গোপী মোহন দত্ত লেনে। রাত্রিতেই ঘিরে ফেলেছে বাড়িটি। চন্দননগরের—কানাইলাল দত্ত আর শান্তিপুরের—নিরাপদ রায় একটি ঘরে দুজনে দিব্যি সুখে নিদ্রা যাচ্ছিল। সেখান থেকে তাদের টেনে বার করে আনল পুলিশ। কয়েদ গাড়িতে তুলল। বাড়ি তল্লাসী করে পেল, কিছু কাগজে লেখা বিস্ফোরক ফরমুলা, বোমা তৈরীর প্রণালী। 'মডার্ণ আর্ট অফ্ ওয়ার', 'মুক্তি কোন পথে', 'বর্তমান রণ নীতি' গ্যারিবল্ডি আর ম্যাজিনীর জীবনী এই বই কখানি।

অন্য পথে পুলিসের আর একদল গিয়ে হাজির হয়েছে ষ্টার থিয়েটারের ঠিক পাশের রাস্তায় এক বাড়িতে ৪৮ নং গ্রেষ্ট্রীটে। গভীর রাতে বাড়ীখানা ঘেরাও হয়েছে। ভেবেছে, এখান থেকে বুঝি মস্ত কিছু আবিষ্কার করে ফেলবে। অরবিন্দ ঘোষ থাকেন এখানে, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী আর কনিষ্ঠা ভগিনী সরোজিনীকে নিয়ে। তাঁর দুই দেহরক্ষীও থাকেন এই বাড়ীর নীচের তলায়—আড়বালিয়ার অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য আর সেখানকারই শৈলেন্দ্র নাথ বসু।

বোধ হয় সে রাত্রিতে ক'লকাতা পুলিসের কেউ আর চোখের চারটে পাতা এক করতে পারেনি।

ওরা, অতি প্রত্যুষে সরোজিনী নীচের তলায় নেমে এসেই দেখেন দরজার সামনে পুলিস গিস্ গিস্ করছে: অবিনাশ আর শৈলেন তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে।

সরোজিনী, দৌড়ে ওপর তলায় উঠে গিয়ে, সেজদাকে খবর দিলেন—পুলিস।

ভোর পাঁচটায় সদর দরজা খোলা হতেই অবিনাশ আর শৈলেনের হাতে হাতকড়ি আর কোমরে দ'ড়ি পড়ল।

আসবাব পত্র তছনছ করে পুলিশ ছ'ঘণ্টা ধরে তল্লাসী চালাল। খবর র'টে গেল চার দিকে। গ্রে ষ্ট্রীট লোকে-লোকারণ্য। অরবিন্দের মেসোমশায় আর ভূপেন বসু এসে হাজির হলেন।

তল্লাসী চালিয়ে পুলিস 'নবশক্তি' পত্রিকার কিছু উপাদান আর অরবিন্দের, মৃণালিনীকে লেখা এক গোছা চিঠি হস্তগত করল।

পত্রিকা সম্বন্ধে তথ্য পেল—'বিপ্লব সমিতি', মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার 'নবশক্তি' কাগজখানি নিজেদের হেফাজতে রেখে ভবিষ্যতে প্রকাশ করবে! এই ৪৮ নম্বর থেকেই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হবে! অবিনাশ এবং শৈলেনের ওপর এর দেখাশোনার ভার পড়েছে।

এই সঙ্গে পুলিস নিয়ে গেল নানারকম আজে বাজে জিনিস সেখান থেকে। আসল যে সব বস্তুর খোঁজে এসেছিল, মিললনা তার কিছুই।

হতাশার গ্লানিতে তাদের নিজেদের ধিক্কার দেওয়া ছাড়া বাকি আর কি রইল?

এতবড় ফাঁদ পেতেও পুলিস অফিসার ক্লার্ক শেষ পর্যন্ত দেখলেন —"পর্ব্বত একটি মুষিক প্রসব করল।"

অরবিন্দের ঘরেব টেবিলের ওপর পাওয়া গেল, গুপ্তধনের পরিবর্তে 'নবশক্তি'র জন্যে একটি লেখা—যা তিনি সম্পাদনা করছিলেন।

পুলিস অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার ক'রে হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি লাগাল।

শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলীর কারা কাহিনীতে ২৮০ পৃষ্ঠায় খানা তল্লাসী সম্বন্ধে অরবিন্দ যা লিখেছেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করলাম—"শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদ কুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আব কয়েকজন ইন্‌সপেক্টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী; হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক—কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল, শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীর

পুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরবিন্দ্র ঘোষ কে, আপনিই কি?" আমি বলিলাম, "আমিই অরবিন্দ ঘোষ।" অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইল। আমি খানা তল্লাসীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই বডি ওয়ারেণ্ট-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানেয় হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা আমার হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাব বিশিষ্ট আইন-ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা অপ্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদবাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি-এ পাশ করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?" আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।" সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি

আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?" দেশ-হিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরেজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।

"এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এমন ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। রক্ষিত মহাশয় অতি করুণ ভাবে এই হরণ কাণ্ড বর্ণনা করেন।...খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক; এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। বন্ধুবর বিনোদ গুপ্ত শেল্‌ফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে "অতি প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয়" বলিয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পণ করেন।...ক্রেগান পাশের ঘরে আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, তৎপরে মেয়েদের নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া ছাড়িয়া যান।...

..."নীচের ঘরগুলি ও 'নবশক্তি' অফিসের খানা তল্লাসীর পর

'নবশক্তি'র একটি লোহার সিন্দুক খুলিতে আবার দোতালায় যায়। আধ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যখন অকৃত কার্য্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটি দ্বিচক্রযান আবিষ্কার করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্টিয়ার নাম ছিল। অমনি কুষ্টিয়ায় সাহেবকে যেগুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

"প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসোমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?' আমি বলিলাম, আমি কিছুই জানি না, ইঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বডি ওয়ারেণ্ট দেখান নাই।" মেসোমহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদবাবু বলিলেন, 'মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করুণ. আমি সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া নিলাম।' ভূপেন বাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা করায় গুপ্ত মহাশয় নবহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম আমার সালিসিটার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া খানা-তল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।"

অরবিন্দের প্রতি পুলিশের এই ব্যবহারে 'অমৃত বাজার' পত্রিকা ভীষণভাবে কটূক্তি করল।

শ্রীঅরবিন্দের বাড়ি তল্লাসার সময়ে পুলিসের জুলুম এবং তাঁর প্রতি অভদ্রোচিত আচরণ দেশের প্রাতিটি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করল।

ঐ রাত্রিতেই বৃদ্ধ হেমচন্দ্র দাস ৩৮/৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে তাঁর মাতুলালয় থেকে গ্রেপ্তার হয়ে লালবাজারের খোঁয়াড়ে চালান হলেন।

১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে পাকড়াও হলেন, মুন্সিগঞ্জের-

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর তাঁর ভাই ধরনী নাথ গুপ্ত। ইনিও কবিরাজ। এঁদের বাড়ি তল্লাসী করে পাওয়া গিয়েছিল 'দু' বাক্স সাপ আব বিছে। এঁদের এই ডেরা থেকে আরও ক'জন গেলেন শ্রীঘরে; বর্দ্ধমানের বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত. নড়াইলের—মতিলাল রায় আর কালিগঞ্জের অশোক চন্দ্র নন্দী।

পুলিস গিয়ে হাজির হয়েছে হাওড়ার আর এক প্রান্তে শিবপুরে-উল্লাসকরের বাবা দ্বিজদাস দত্তের বাড়িতে। হামলা করে কিছুই যোগাড় করতে পারল না সেখান থেকে। কারণ উল্লাসকর যে, অনেকদিন আগেই এ বাড়ির মায়া কাটিয়েছেন, পুলিস নিশ্চয় আগে তা জানিত না।

১১ নম্বর হ্যারিসন রোড, ২৩ নম্বব স্কটলেন আর ৩০/২ হ্যারিসন রোডে পুলিস হানা দিল ঐ একই রাত্রিতে।

হ্যারিসন রোডের এই, ৩০/২ নম্বর বাড়ির ঠিকানায় এসে হাজির হোত বিপ্লব সমিতির যত কিছু গোপন চিঠিপত্র পুলিসের চোখে ধূল দিয়ে মুরারী পুকুরের আস্তানাটাকে মুক্ত রাখতে। ঠিক ঐ তারিখে বাহির থেকে আসা খান কয়েক চিঠি পুলিস এখান থেকে হাতিয়ে নিয়ে গেল। পেয়ে গেল বাক্স কয়েক বোমা, বিস্ফোরক তৈরীর গোটা কতক যন্ত্রপাতি ও মাল মশলা; তাও গেল নিয়ে।

১১ নম্বব হ্যারিসন রোডে, 'যুগান্তর পুস্তকালয়' খুলে ছিলেন অবিনাশ, স্বদেশী বই বিক্রী করতে। সেখানে বিক্রী হোত বিশেষ করে দুখানা নাম করা বই—'মুক্তি কোন পথে' আব 'বর্ত্তমান রণনীতি'। কিন্তু ভাগ্যের জোরে, মাত্র দু তিন দিন আগে তিনি সব কিছু এখান থেকে সরিয়ে ফেলে ছিলেন, এই যা রক্ষে। পুলিস এখানে ঘা দিয়ে কিছু না পেয়ে শেষে আঙ্গুল কামড়েছে। হতবাক্ হয়ে ফিরতে হয়েছে তাদের। কোন একজন লোক ছিল না সেখানে যাকে পাকড়াও করে সরকারের কাছ থেকে বাহবা কোড়ায়।

২৩ নম্বর স্কট লেন ছিল অরবিন্দের পূর্ব্ব আস্তানা, তাই তার গন্ধে

গন্ধে পুলিস সেখানেও গিয়ে হাজির হতে ছাড়েন। মেলেনি কিছুই।

যতদূর সাধ্য পুলিস কিছু আর বাঁকি রাখল না কাজে লাগাতে।

তবে হ্যাঁ, ক'লকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ যে, এ বিষয় খুব তৎপর তাতে কোন সন্দেহ নেই, তাইতো বলে 'স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড' গোয়েন্দা তৎপরতার ঠিক পরেই কলকাতার গোয়েন্দা পুলিসের সুনাম পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু আজ, সে যশ থেকেও যেন নেই; কত সীমায়িত হয়ে পড়েছে। এখানে ও কী রাজনীতির খেলা চলছে?

॥ ছেচল্লিশ ॥

গাড়ি গাড়ি বোমা কার্ত্যরুজ, রাইফেল, বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি বিপ্লব যজ্ঞের সাজসরঞ্জাম যখন ক'লকাতার রাজপথের ওপর দিয়ে পুলিস, মাণিকতলা ৩২ নম্বর মুবারী পুকুর গার্ডেন রোড থেকে নিয়ে চলল বন্দুকধারা পুলিশ প্রহরায়, সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! বাঙলার নবনারী তা দেখে হতবাক্। এইবার দেশবাসীর জানতে বাকী রইল না এতো স্বাধীনতার স্বপ্ন নয়! এ স্বপ্ন সার্থক হওয়াতো অসম্ভব কিছু নয়? কাজতো দেখছি এরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চেষ্টা থাকলে রাজ্যটাকে অত্যাচারী ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব কিছুই নয় দেখছি! দৃঢ় মনোবল এই ক্ষয়িষ্ণু জাতটাকে কতখানি জাগ্রত ক'রে তুলেছে! অত্যাচার, উৎপীড়ন আর কতদিন যুবকেরা মুখ বুজে সহ্য করবে? আগুন আর য়্যাসিডে পুড়ে পুড়ে এরা যেন, এক একটি খাঁটি সোনার তাল তৈরী হয়েছে। কোথাও যেন খাদের চিহ্ন টুকু তারা দেখতে পাচ্ছে না!

গুপ্ত সমিতির উদ্যোক্তাদের নামের তালিকা পুলিস এখানেই পেয়ে গেল। এই সঙ্গে মুরারী পুকুর থেকে যে সব কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেদ, চিঠি পত্র পেল, সেই গুলোকে মূলধন ক'রে তারা পরের পর সন্ধান চালিয়ে, একের পর এক ধরে ধরে অনেককেই শ্রীঘরে পুরল।

শ্রীরামপুরের-নরেন্দ্র নাথ গোস্বামী আর হৃষীকেশ কাঞ্জিলালকে, খুলনার-সুধীর কুমার সরকার, যশোহর সাগরদাঁড়ির—বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, মালদহের—কৃষ্ণ জীবন সান্ন্যাল, সিলেটের-হেমচন্দ্র সেন, ধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন এবং সুশীল চন্দ্র সেনকে গ্রেপ্তার ক'রে পুলিস জেলে পাঠাল, দ্বিতীয় পর্ব্বে ৫ই মে। শেষোক্ত তিন জনই সহোদর ভ্রাতা।

সরকারী রিপোর্টের আরও কিছু সংবাদ ঠিক এর পরেই বেরুলো- পাক্কা মোকামের খবর—"মজঃফরপুরের আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিস জোর তদন্ত চালাচ্ছে এবং অধিক কিছু ঘটবে ব'লে আশঙ্কা করা হচ্ছে"।

মাণিকতলা বাগানের পুকুর ছেঁচে আর একটা মাত্র ভাঙ্গা রিভলবার পাওয়া গেছে। আরও বোমা তৈরীর মাল-মশলা, কোন অস্ত্র-সস্ত্র লুকোনো আছে কিনা দেখবার জন্যে বৃহস্পতিবার পুকুর গুলো একেবারে জলশূন্য করে ফেলা হবে।

এই বৃহস্পতিবারেই 'এম্পায়ার' কাগজের প্রতিনিধি মুরারীপুকুরের বিপ্লবীদের বাড়ি ও বাগান ঘুরে দেখলেন। চার দিকের জমির ওপর সতর্ক প্রহরা রাখা হয়েছে। তল্লাসকারীরা ঘরের মধ্যে গাদা গাদা চিঠি পড়বার কাজে ভীষণ ব্যস্ত। পুকুর জলশূন্য করা হয়েছে। আড়াই একর বাগানটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসী করা হচ্ছে।

লালবাজারের খবর এসে পৌঁছাল লোকের মুখে মুখে। ইংরেজ সরকারের ঘোরতর সন্দেহ অরবিন্দ ঘোষের ওপর, "অরবিন্দ নিশ্চয় আছেন এর মূলে। সরকারের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্যে প্রকাশ্যে না থাকলেও নিশ্চয় তিনি এই সংগঠনের কর্ণধার। এত বড় রাজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, এমন শক্তিধর অন্য কোন বাঙালী হ'তে পারে না। এই বিরাট বোমার কারখানা গ'ড়ে তোলা যারতার পক্ষে সম্ভব পর নয়—যতই জোর গলায় বলুক না কেন বারীন ঘোষ। এই চিমড়ে দেহের লোকটাকে, যেন তেন প্রকারেন, এখানকার ষড়যন্ত্রের সর্ব্বাধিনায়ক রূপে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করতে পারলে এদের সকল তথ্য ফাঁস হয়ে পড়বে নিশ্চয়!"

৩রা মে, বিকেলের দিকে বারীন ঘোষকে একাই লালবাজার থেকে পাঠান হ'ল আই. বি. সি. আই. ডি অফিসে হাঁটাপায়ে— ট্রামে চড়িয়ে। পাহারায় ছিল পিস্তলধারী লালমুখ' এক ছোকরা

সার্জেন্ট পিস্তলে গুলী ভরে নিয়ে সতর্ক ভাবে। অফিসের ছুটির পর ট্রামে চেপে বাড়ি ফিরছেন, বড়-ছোট কর্ম্মচারীর দল। বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীতে এঁরা বারীনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন। মুখে কারও কথাটি নেই। সকলেই যেন ভয়ে সশঙ্কিত।

বারীন্দ্রকে এনে তোলা হ'ল আই. বি অফিসের বারান্দায়। এখানে না আছে বসবার বেঞ্চ—না আছে চেয়ার। দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেনই। লোকজন ঘোরাঘুরি করছে কেউ কোন ভ্রূক্ষেপও করছে না তাঁর দিকে। বেশ কিছুপরে ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট রাম সদর মুখার্জ্জী ব্যস্তভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে, নম্র সুরে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে, চেয়ার টেবিল আনিয়ে সাদর সম্ভাসনে তাঁকে কাছে বসিয়ে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানান কটূক্তি সুরু করলেন।

বারীন্দ্রের বুঝতে বাকি থাকল না, তাঁকে উত্তেজিত করার জন্যে রাম সদয় দিব্যি অভিনয় ক'রে চলেছেন।

দেখতে দেখতে টেবিলের ওপর এসে হাজির হ'ল একথালা মিষ্টি, নোনতা সিংয়াড়া-কচুরা, চা, পান-জর্দা আর প্যাকেট কয়েক সিগারেট।

একের পর এক অনেক সি. আই. ডি অফিসার এল-গেল। বারীনের সঙ্গে রাম সদয় সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলেছেন। গোপন ভাবটা হল,—ইংরেজের শত্রু বারীন ঘোষের মুখটা তোমরা ভাল করে চিনে রাখ।

বিনয়াবতার রামসদয়ের মুখে মিষ্টি আগুনের ফুলঝুরি ঝরতে লাগল। কথার ফাঁকে বোমা, পিস্তল, বিপ্লবীদের ঘাটির অন্ধি-সন্ধিরও খোঁজ খবর চলল।

বিপ্লবীর মন, ভাঙ্গে তো মচকায় না। কিন্তু এরই এক ফাঁকে শ্রীরামপুরের জমিদার বংশের নরেন গোঁসাইয়ের নামটা ক'রে ফেললেন বারীন; "নরেন তাঁর নিজের জমিদারীতে বিপ্লবীদলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডাকাতি করান।" চন্দন নগরে বোমা ফেলতে, নরেনের, তাঁদের

দলের সঙ্গে থেকে সাহায্য করার কথাও এইখানে ফাঁস হয়ে পড়ল।

রাত দশটা হয়ে গেছে, রাম সদয়ের কথা আর ফুরতে চায় না। সি. আই. ডি ব্যারাকের এক কনষ্টেবল, একথালা মুখরোচক খিচুড়ী, একগাদা ভাজাভুজি, সেই সঙ্গে রকমারী আচার ভিন্ন একখানি প্লেটের চারদিকে সাজিয়ে এনে বারীন্দ্রের সামনের টেবিলখানার ওপর এক এক করে নামিয়ে রাখল।

রামসদয় অনুরোধ করলেন—"ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হাতমুখ ধুয়ে ওটা খেয়ে নিন বারীনবাবু!"

খাওয়া শেষ হ'তে-না-হ'তেই একজন ধুরন্ধর সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর এসে হাজির হলেন। এলেন পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীও। টিকটিকির চাল চেলেও তাঁরা এখানে বিশেষ কোন সুবিধে করতে পারলেন না। ইংরেজ গভর্মেণ্টকে নিপাত করা থেকে আরম্ভ ক'রে, রুশ গভর্মেণ্ট কি পরিমান তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, গাইকোয়াড় সম্বন্ধে কত কথা কিছু আর বাকি রইল না তাঁদের এখানে টোপ ফেলে দেখতে। কিন্তু এই চতুর কাতলা মাছ যে এ টোপ গিলবে না তা এঁরা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন; গতিক সুবিধে নয় বুঝে দুজন তখনকার মত কেটে পড়লেন।

রামসদয় কিন্তু নাছোড় বান্দা। বারীন্দ্রের মুখ থেকে গালিগালাজও কম শুনলেন না। হাসিমুখে কত কত ক'রে সেগুলোকে গিলে, খোসামদের বন্যা বহিয়ে দিলেন।

শেষকালে অনিচ্ছে সর্ত্তেও বারীনকে বলতে হল, "নরেনের কথা যা বলেছি বলেছি কিন্তু এরপর আর একটিও পাবেন না! যতক্ষণ হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্র, ইন্দুভূষণ আর বিভূতিকে এখানে আনা না হচ্ছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আর কোন কথাই আমি বলব না।

অবশেষে তাই স্থির হ'ল। তখন রাত্রি একটা বেজে গেছে।

বারান্দার পাশেই একটা ঘরে, খাটের ওপর ফট্‌ফটে সাদা চাদর

মোড়া উচু নরম বিছানায় মোটা ধব্‌ধবে বালিস দেওয়া, নতুন মশারি খাটান খাটে বারীন্দ্রের শোয়ার ব্যবস্থা। একদিকে খোলা বড় জানালা, হুহু ক'রে হাওয়া আসছে।

রামসদয়, বারীন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে সেখানে শুইয়ে দিলেন।

বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর এমন বিছানায় শোয়ার সুযোগ বারীন্দ্রের আর হয়নি। গদির ওপর ধব্‌ধবে চাদরে শুয়ে উসখুস করতে লাগলেন। তার ওপর মনের চঞ্চলতা আছেই।

একজন বন্দুকধারী পুলিস সর্ব্বদার জন্যে তাঁর বিছানার পাশে ঘোরাঘুরি ক'রে, মশারির ভেতর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে।

সে রাত্রিতে নানান চিন্তায় বারীন আর চোখের পাতা চারটে এক করতে পারলেন না।

কি করবে? এই তাঁর নিজেকে জিজ্ঞাসা। সব কথা কী অস্বীকার করবে? নাঃ আর তো কোন উপায় রাখেনি। আগেই তো পুলিস তার মুখ থেকে অনেক কথাই জেনে ফেলেছে। তবে কী সমিতির সব কথা ফাঁস করে দিয়ে শহীদ হবে? ফাঁসীতে তো তাকে ঝুলতেই হবে। তবে কেন সে, সব কথা ফাঁস না করে দিয়ে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় রেখে যাবে না? দোদুল্যমান মানসিক বিকারে বাকি রাতটুকু, তিনি, বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করলেন।

পরদিন সকাল হতে-না-হতেই উপেন্দ্র আর উল্লাস করকে এনে সেখানে হাজির করা হল। বারীন্দ্রের ইচ্ছেমত পরপর সব কজন-কেই আনা হল সেখানে।

পরামর্শ সুরু হল।

হেমচন্দ্র রাজী হলেন না। এসব দোষ ঘাড়ে নিতে অপরকেও মানা করলেন।

শেষপর্য্যন্ত হেমচন্দ্রকে বাদ দিয়েই, স্থির হল, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, ইন্দুভূষণ আর বিভূতি নিজেদের স্কন্ধে সব দোষ টেনে নিয়ে দলের

আর সকলকে বাঁচাবেন।

হেমচন্দ্রের সঙ্গে মত-বিরোধ হওয়ায়, সেখান কার ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠেছে দেখে, একজন অফিসার হেমচন্দ্রকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই ধূর্ত্ত রামসদয় একখানা লেখা কাগজ হাতে নিয়ে এসে, দূর থেকে সেই লিপিখানি তাঁদের দেখিয়ে বললেন, "দেখুন হেমচন্দ্রবাবু আমার কাছে সব স্বীকার ক'রে, এই কাগজটাতে বিস্তারিত লিখে দিয়েছেন। আমি বুঝিনা, এরপর আপনাদের লিখিত বিবৃতি দিতে আর কি আপত্তি থাকতে পারে" ?

হেমচন্দ্র লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ? ব্যাপারটা কি সত্য !—এঁরা কজন হতভম্ব হয়ে আপন আপন লিখিত স্বীকারোক্তির মধ্যে হেমচন্দ্রকেও জড়িয়ে দিয়ে কাগজ কখানা সহি করে রামসদয়ের হাতে দিলেন।

রামসদয় খুসী হয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানালেন।

বেলা তিনটের সময় এঁদেরকে এখান থেকে কয়েদী গাড়িতে তুলে, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির কোর্টে হাজির করা হ'ল। লাল-বাজার থেকে গাড়ি ভরতি করে দলের বাকি সকলকে কোর্টে আনা হয়েছে।

পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেবের উপস্থিতিতে সকলের নামে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হ'ল।

এরপর এঁদের প্রত্যেককে একজন-একজন ক'রে, বার্লি সাহেবের কোর্টের কাঠগড়ায় তোলা হল।

মিঃ বার্লি, আসামীদের মুখ দেখে দেখে, নামের সঙ্গে ওয়ারেণ্ট মিলিয়ে, ওয়ারেণ্টের নীচে নীজের নাম দস্তখত ক'রলেন।

একটানা ভট্‌ভট্‌ শব্দ ক'রে, একটা দমকল, ৩২ নম্বর মুরারী পুকুরের হাতার একটি পুকুর থেকে হুহু শব্দে জল শুষে নিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। চীফ ইন্‌জিনীয়ার মিঃ ক্লুল থ্রোপের তত্ত্বাবধানে

এ কাজটা চলছে। যেটিকে ইতিমধ্যে জলশূন্য করা হয়ে গেছে, তাতে কেবল মাত্র ঐ ভাঙ্গা রিভলবারটাই পাওয়া গেছে। আর কিছু নয়! দমকল যেটি থেকে জল তুলছে এখন, সেটি হল এখানকার সব থেকে বড় দাঘি। এটা সম্ভবতঃ আজ রাতের মধ্যে খালি হবে না। এখানকার পাঁচ-পাঁচটা পুকুরেরই জল ছেঁচে ফেলে দিতে হবে। এছাড়া মাটি খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বেশ কিছুদিন ধরে চলতেই থাকবে।

পুলিসের দৃঢ় বিশ্বাস আরও কিছু জিনিষ পাওয়া যাবে নিশ্চয়! সেরকম ভাবে খুঁজে দেখতে পারলে।

জমির ওপর নানা জায়গায় চিহ্ন ক'রে রাখা হয়েছে। কয়েক জায়গায় গোঁজপুঁতে চিহ্ন ক'রে রাখা হ'ল।

সব চাইতে বিপদজনক পুকুরটির ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মানিকতলা বোমার মামলায়, ৩রা মের পাকড়াওকরা সব আসামীকেই ৫ই মের মধ্যে প্রেসিডেন্সী জেলে (তখনকার আলিপুর জেলে) এনে পোরা হয়েছে। দিবারাত্র তাঁরা আছেন, সতর্ক প্রহরাধীনে।

পুলিস এবং গোয়েন্দা অফিসাররা চেষ্টা করছে, এঁদের কাছ থেকে আরও খবর সংগ্রহ করার। উদ্দেশ্য, আরও কিছু ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করার যদি হদিস মিলে যায়।

ওদিকে আবার বোমা বিস্ফোরক দ্রব্যের যাচাই পরীক্ষাটাও শেষ হয়ে গেছে।

মোট ন'টা বোমা, টুকরো করে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি বোমা গরম জল দিয়ে খোলা হয়েছে। এক-একটা বোমাই ছিল, দু'পাউণ্ড করে পিকরিকয়্যাসিড দিয়ে তৈরী অর্থাৎ একশো গজ পরিধির মধ্যে সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার পক্ষে যথেষ্ট।

এই বিপদজনক মাল মশলার দিকে লক্ষ্য ক'রে, পুলিস কর্ত্তারা এই ভেবে অবাক, যে, বিশেষ করে য়্যাসিড থেকে অনেক দুর্ঘটনাই ঘটতে পারত' কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনিতো! একটি মাত্র লোককে হাসপাতালে পাওয়া গেছে, দুটি চোখই তার গেছে। অন্ধ অবস্থায় শয্যাশায়ী এবং শরীরের অনেক জায়গায় ক্ষতও আছে। সন্দেহ হচ্ছে, য়্যাসিড থেকেই এটা ঘটেছে।

এতবড় একটা বিপ্লবী দলকে ধরে ফেলা, পুলিসের দিক্ থেকে খুবই গৌরবের বিষয় এবং এটাকে বেশবড় রকমেরই কৃতকার্যতা বলতে হবে। খুঁজে পেতে আবিষ্কার করেছে এরা, সর্ব্বভারতীয় এক "বোমার কলেজ" কাগজ পত্রের মধ্যে একখানি বইয়ের আবিষ্কারের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ওর বিষয় বস্তু অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, বিপ্লবীরা বেশ সুচিন্তিত পরিকল্পনাই ফেঁদেছিলেন।

মানিকতলা বাগান ছিল এঁদের সদর দপ্তর এবং এটি কলেজের মত শ্রেণী বিন্যস্ত।

সারা ভারতের মানচিত্র কয়েকটা ডিভিসনে ভাগকরা। প্রত্যেক ডিভিসন থেকে দুটি করে শিক্ষার্থী আসবে এই সদর দপ্তরের কলেজে; বোমাতৈরী এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক ক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ পাঠ নেবে এখানে।

বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে এই সব তেজস্ক্রীয় বোমা তৈরী হয়েছে। এই বোমার একশ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে "সন্ত্রাসী" (Terrorist), দ্বিতীয়টির নাম "পথ-বোমা" (Street bomb), তৃতীয় শ্রেণীটির নাম "বিস্ফোরক" (Explosive)—তলার দিক থেকে একেবারে ধ্বসিয়ে দেওয়া বা সেতু ইত্যাদি উড়িয়ে দেবার বোমা।

বোমা তৈরার পাঠ্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞাতত্ত্বের পরিচায়ক। বইখানিতে ব্যাপক এক সাধারণ বিপ্লব-সাধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

এই গুরুত্বপূর্ণ মামলায় জড়িত সবকটি আসামীকে গাড়ি বোঝাই ক'রে এনে আলিপুর জেলের ৪৪ ডিগ্রীর উদরে পোরা হল।

এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রী অর্থাৎ আরও একটি স্বতন্ত্র বন্দী শিবির এই রাজ্যের অন্তঃ সীমানায় শ্রেণীবদ্ধ। এই সেল (ডিগ্রী) গুলোর সামনে দিয়ে এল (L) প্যাটার্নে একটি সিমেণ্ট বাঁধান রাস্তা পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে সোজা চলে গেছে। তার আষ্টেপৃষ্ঠে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। রাস্তাটির ঠিক প্রবেশ পথে জবরদস্ত একটি ভারি মোটা কাঠের দরজা, একদিকের প্রাচীরের মাঝ মধ্যিখানে। বাইরে থেকে চুয়াল্লিশ ডিগ্রী (ডিগ্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর) এলাকায় প্রবেশে ঐ একটি মাত্র পথ। লম্বা লম্বা একটানা প্রাচীর দুটোর উল্টোদিকে পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ২২ খানি করে সারিবদ্ধ সেল। 'এক সে বাইশ আউর তেইশসে চোয়াল্লিশ' ডিগ্রী। এই সেলের নামই, জেলের ভাষায় ডিগ্রী। জেলের বাসীন্দাদের খেয়াল খুসীতে ভেতরকার ঘর বাড়িগুলোর নাম-করণে মাঝে মধ্যে বেশ ছন্দঃ পতন ঘটেছে দেখা যায়। জেলরাজ্যে এটা নতুন কিছু নয়। আবহমান কাল ধরে এই ব্যাপারই চলে আসছে দেখা যায়। যেমন তারা ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডটারই নাম করণ করছে 'গোরাডিগ্রী'—সেলের চিহ্ননেই সেখানে নাম হয়ে গেল ডিগ্রী। আর সেই পুরোনো নামেই ওয়ার্ডটা পরিচিত 'গোরাডিগ্রী'।

৪৪ ডিগ্রীর কয়েকটি সেলের মেঝে ৯৬ স্কোয়ার ফীট অর্থাৎ ঘরখানি বার ফীট লম্বা আর আট ফীট চওড়া। ঘরের ভেতরের এই পরিধি টুকুকে ঘিরে চার দিক থেকে সমান তালে পা মিলিয়ে এগার ফীট

দেওয়াল ওপরদিকে উঠে গিয়ে খিলেন করা ছাদটিকে আশ্রয় দিয়েছে। ছাদের মাঝ বরাবর তিন জায়গায় তিনটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ভেতরের গরম হাওয়া নিকাশের জন্যে। সেই গবাক্ষ তিনটির মাথার ওপর পোড়ামাটির গামলা দিয়ে টুপি পরান সামান্য উচুতে। সেলের সামনের দেওয়ালের বুকের ওপর ছ ফীট আর তিন ফীটের একটি সুদৃঢ় লৌহ কপাট শিক পরান। ঘর খানির সামনেই তার একটি নিজস্ব অঙ্গন ঘরের মাপে। সেটিরও তিনদিকে আট ফীট উচু প্রাচীর। তার ও বুকের মাঝখানে সেলের মুখ বরাবর একটি কাঠের দরজা ঐলোহার দরজাটির মাপে। লম্বা রাস্তাটিতে বেরুনর জন্যে এই মাত্র পথ। ডিগ্রী গুলোকে একেবারে ছোট বলা না গেলেও গবাক্ষহীন সৃষ্টি ছাড়া পরিবেশ যেন ওগুলোকে জমপুরীতে পরিণত করেছে।

ঐ অঙ্গন টুকুতেই ডিগ্রীর আসামীর স্নানের ব্যবস্থা। স্নানের জন্যে, দিনে একবার মাত্র, ঘর থেকে আসামী বেরুতে পায় এই উঠানে. অবশ্যই ফাঁসীর আসামী হলে।

সাধারণের বেলায় এত কড়াকড়ি নেই।

এই ৪৪ ডিগ্রী এলাকায় প্রবেশ করলেই, নজরে পড়বে, ডানদিকে সারিবদ্ধ বাইশটি কাঠের দরজা টানা লম্বা দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। এই ২২ খানকে অতিক্রম করে পুনরায় দাক্ষিণে ঘুরলে দেখা যাবে ২৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রীর কাঠের দরজাগুলো ওমনি একটা লম্বা দেওয়ালের গায়ে হাঁ ক'রে রয়েছে।

চুয়াল্লিশখানি নির্জ্জন কক্ষের প্রতিটিতে একজন করে অপরাধী থাকার ব্যবস্থা। ওই ঘরের একটি কোণে বেয়াব্রু জায়গায় কেবল মাত্র একটি ছোট টুকরী বসান, আলকাতরা মাখান। এটিকে ব্যবহার করতে হবে লজ্জা বস্তুটিকে পরিহার করে।

৪৪ ডিগ্রীর পেছনেই, মাঠের মাঝখানে ফাঁসীর মঞ্চ।

তার ওপীঠেই প্রাচীরের বাইরে গোরা ডিগ্রী।

২১ নম্বর সেল, অপর ৪৩টির দল ছাড়া। এর সামনে যেমন

লোহার দরজা পেছনের দেওয়ালেও আছে একটি মোটা কাঠের দরজা। মাপ হল—৬'-৬" × ৩'-৬"। দরজাটির পায়ের কাছ থেকে বাহির দিকে সুরু হয়েছে একটি সরু খাড়াই রাস্তা। ধীরে ধীরে উচুতে উঠে গিয়ে ফাঁসীর মঞ্চের ওপর যাত্রা শেষ করেছে।

ফাঁসীর রজ্জুতে ঝোলানোর আগের রাত্রে মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে এনে এই ঘর খানিতে আটকে রাখা হয়। পেছনের ঐ কাঠের দরজাটি খুলে তাকে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে হাজির করা হয় ভোরের দিকে।

সম্ভবতঃ স্থান সঙ্কুলানের জন্যেই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটেছে মানিক তলার আসামীদের ব্যাপারে। বিপ্লবী দলের দুটি-তিনটিকে এক-একটি সেলে রাখার ব্যবস্থা হল, জেল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায়। ছেলে-বুড়া একাকার হয়ে গেল। জেলের কর্তাদের, সে বিচারের ছিল না কোন প্রয়োজন. কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হল সেল গুলোর ওপর।

চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর সীমানার বাহিরে গোয়ালঘরের কাছে আরও ছ'টি ডিগ্রী গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে ঐ একই রকম ব্যবস্থায়। প্রতিটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৯' × ৫', অন্য কোন ব্যাতিক্রম নেই। সেখানে রাখা হ'ল এই মামলায় জড়িত শ্রীঅরবিন্দকে।

৫ই মে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জেলে এনে পুরে দেওয়া হ'ল তাঁকে এই ছ'টির প্রথমটিতে।* এই খানেই মহাযোগী অরবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণের (বাসুদেবের) দর্শনলাভ করেছিলেন।

* বর্ত্তমানে এই সেলটিকে জেলের একটি অতি পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হয়। 'শ্রীঅরবিন্দ মন্দিরে' ঘরখানি পরিণত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে প্রতিদিন এখানে পূজার্চ্চনা হয়ে থাকে। বাহিরের বহু ভক্ত সময় সময় এখানে এসে এই স্থানটিতে অরবিন্দ চরণে প্রণাম জানিয়ে যায়। এই সেলের বাহিরে দেয়ালের ওপর প্রস্তর ফলকে (যেটি শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব

মানিকতলা বোমার মামলায় ধরা পড়া লোক গুলোকে, তেজস্ক্রীয় সজীব পদার্থ সন্দেহে, একত্রে ঠেলে দেওয়া হল ওই 'ফরটিফোর সেলে'। এর কোন ঘরে একজন আবার কোন ঘরে দুজন অথবা তিনকেও পুরে দেওয়া হ'ল।

বাহিরের অন্য কোন 'ওয়ার্ডে' দলবন্দী করে রাখলে হঠাৎ যদি বিস্ফোরণ ঘটায় এরা! বিশ্বাস নেই এদের!

সেই জন্যেই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

রাত্রি বেশ তখন খানিকটা গড়িয়ে গেছে, লালবাজার থেকে গাড়ি

মহোৎসব সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত) লেখা আছে ১।—"In this Hallowed cell Shri Aurobindo lived about a year (1908-09). As a Prisoner for freedom's cause, meditated on Life Divine and had his divine Darshan."

ঐ ছটি ডিগ্রীর প্রথম খানির সম্মুখে শ্রীঅরবিন্দের আবক্ষ মর্মর মূর্তির যে আবরণ, রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর কর্তৃক উন্মোচিত হয়েছে, ১৩ই অক্টোবর ১৯৬৮-২৬শে আশ্বিন ১৩৭৫ সালে, সেই মূর্তির নীচে প্রস্তর ফলকে লেখা হয়েছে ২। "শ্রীঅরবিন্দ ২রা মে ১৯০৮ হইতে ৯ই মে ১৯০৯ এই প্রকোষ্ঠে ছিলেন। এই স্থানে তাঁহার আধ্যাত্ম জীবনের সূত্রপাত হয়।"

শ্রীঅরবিন্দের মূল রচনাবলীতে 'কারা কাহিনীর' রচনাবলীতে ২৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ নিজের কলমে বিবৃত করেছেন—৩। 'আমিও আমার নির্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পর বৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।

আমার নির্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল, ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি সেইগুলিকে ছয় ডিগ্রী বলে।"

উপরি উক্ত তিনটি বিবৃতির কোনটি নির্ভুল বলে পাঠক গ্রহণ করবেন? এইটি লেখকের জিজ্ঞাস্য।

বোঝাই করে এনে, জেল হাজতে প্রথম দলটিকে দিয়ে যাওয়া হল ৪ঠা মে। ৫ই এলেন অরবিন্দ। সঙ্গে ছিলেন, নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি।

সকলে Div. II under trial Prisoner. এই মামলার কেউই সাধারণ কয়েদীর মর্যাদার বেশী কিছু পাননি কোর্টের কাছ থেকে। কাজেই তাঁরা জেলখানা থেকে পেয়েছিলেন, বিছানা বলতে দুখানা ক'রে কম্বল, একটি লোহার থালা আর একটি লোহার বাটি খাওয়ার পাত্র হিসেবে প্রত্যেকে!

খাবার-দাবার তাঁদের ভাগ্যে সে দিন তেমন কিছু জোটেনি পুলিসের কাছ থেকে।

৪ঠা তারিখে সবকটিকে চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর গর্ভে ঢুকিয়ে দিয়ে, জেলার বাবু চলে গেলেন। বেশ খানিক পরে ঘুরে এলেন আবার। তাঁর পেছনে কারারক্ষীর সঙ্গে চৌকার জনাকয়েক কয়েদী, নিয়ে এল নবাগতদের আহারের জন্যে গরম ভাত আর শুধু অড়হরের ডাল, বড় বড় বালতিতে, মোটা বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধের ওপর চাপিয়ে।

প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট লোহার থালা-বাটিতে, মাপ করা টিনের ডাবুতে ক'রে পরিবেশন করে দিল তারা।

ক্ষুধার তাড়নায় গরম ভাতের সঙ্গে কেবল মাত্র অখাদ্য অড়হরের ডালই সকলেই খুব তৃপ্তি সহকারে উদরস্থ করে, হাত মুখ-থালাবাটি ধুয়ে, প্রত্যেকে দুখানা করে কম্বল হাতে নিয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দেশিত সেল গুলোর ভেতর একে একে ঢুকে পড়লেন।

বাহির থেকে লোহার দরজাগুলো টেনে দিয়ে দেওয়ালের ভেতর থেকে লম্বা হুড়কো দরজার গায়ে ঢুকিয়ে আংটার ওপর তালা পড়ল দেওয়ালের খোপে খোপে।

জেলের বিছানা বলতে, সাধারণ কয়েদীর, মাত্র দুখানা করে কম্বল হয় সম্বল গরমের দিনে, শীতের মরশুমে বাড়ে একখানা করে।

একখানা কম্বল দুভাঁজ করে বিছিয়ে আর একখানা জড়িয়ে রোল ক'রে, মাথার নীচে দিয়ে সকলে নিজের নিজের মত শুয়ে পড়ল।

অরবিন্দের মুখ এই দলে দেখা গেল না।

তাঁকে নিয়ে গিয়ে, এই জেলের বিশেষ এক খোঁয়াড়ে পোরা হয়েছিল পরের দিন।

দু ঘণ্টা পর পর পাহারার সেপাই বদলে, রাত্রিতে কারোরই ঘুম হল না। বদলিতে এসে আগের জনের কাছ থেকে গুনতি ক'রে সব ক'টি জীবিত আসামীকে বুঝে নেয় নতুন ডিউটি ওয়ার্ডার।

ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে ঠং করে, আসামী আনলকের ঘন্টি পড়ল।

একজন য়্যাসিসটেণ্ট জেলার এবং চিফহেডওয়ার্ডার, ঘন্টি পড়তেই এসে হাজির হয়ে গেল। মোটা একটা গোলাকার তারে ঝুলছে একগাদা চাবি হেডওয়ার্ডারের হাতে। এঁদের, সব ক'টি সেলের দরজা এক এক ক'রে খুলে দিয়ে চলে গেল

এই সুযোগে সকলে আপন আপন সেল থেকে বেরিয়ে এসে উঠানের দরজা দিয়ে বাইরে মুখ বার করে, অন্য সেলগুলোতে কে কোথায় আছে যতদূর সম্ভব দেখে নিলেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু-কিছু খবরও সংগ্রহ করলেন। সকলের মধ্যে বিশেষ ক'রে এই পরিচিত মুখগুলি একসঙ্গে দেখতে পেয়ে অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বারীন ঘোষ, নরেন বক্সী, পূর্ণ সেন এক ঘরেই ছিলেন। উপেন আর হেমচন্দ্রের ঘরে দু'জন করে পোরা হয়েছিল। নলিনী, উল্লাসকর, কানাইলাল, ইন্দুভূষণ, বিভূতি, শচীন, বিজয় অবিনাশ, শিশির, নিরাপদ প্রায় সকলেই আছেন দেখা গেল। কনভিক্ট ওভারসিয়ার এসে বললে, বিছানা ভাঁজ করে গুছিয়ে রেখে, তার সামনে থালা-বাটি ঠিক করে রাখতে।

কয়েদী মেথর এসে ডিগ্রীর ভেতরকার ময়লার টুকরীগুলো সরিয়ে

নিয়ে গিয়ে সেখানে আলকাতরা মাখান পরিষ্কার টুকরী রেখে গেল, আর তার পাশে খানিক মাটি।

কাঠকয়লার গুঁড়ো, খড়িমাটি, ফটকেরী আর লবণ মেশান জেল ব্রাণ্ড দাঁতের মাজনের সঙ্গে বালতা করে জল দিয়ে গেল উঠানের কোণে, এই কর্ম্মে নিযুক্ত কয়েদীরা।

এর পরেই এল ব্রেকফাষ্টের মাড়ভাত—যার নাম 'লপসী' (early morning meal), বালতী থেকে এক ডাবু করে ঢেলে দিয়ে গেল ঐ লোহার থালায়। এই বস্তুটিই, সাধারণ বন্দীর প্রাত্যহিক প্রাতরাশ। উপর্যুপরি তিন দিন এর ভোল পাল্টায়। তিনদিন পরে ফিরে আসে সেই আগের দিনেরটি।—একদিন লবণ মিশ্রিত মাড়ভাত, একদিন চালের সঙ্গে কিঞ্চিত পরিমাণ ডাল এবং লবণ মেশান গলাভাত —একে খিচুড়ি বলা চলে না কোন মতেই। আর একদিন মাড়ভাত ভেলিগুড় দিয়ে ফোটান—এর নাম আবার 'মিঠালপসী'।

সাধারণ বাঙ্গালীর জন্যে সারা দিনের খাওয়ার ব্যবস্থা দশ ছটাক চাল, আড়াই ছটাক ডাল, চার ছটাক কাঁচা শাকসব্জী আলু এই সঙ্গে এক ছটাক য়্যালউয়েন্স, প্রয়োজন মত তেল-মশলা রান্নার জন্যে। গুড় দিয়ে তেঁতুল গোলা—যাকে বলে 'চাটনী'। কখন' কখন' আবার তেঁতুল গোলাতে গুড় থাকে না।

বেহারীরা পায়, সন্ধ্যেতে আটার রুটি ভাতের বদলে।

পাঞ্জাবীরা পায়, দুপুর সন্ধ্যায় আটার রুটি এক ছটাক বেশী ওজনের; ভাত পায় না এরা। এদের প্রাতরাশে ছোলা গুড় বরাদ্দ।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা পায় আরও দু'ছটাক বেশী চাল অথবা আটা।

প্রতিদিনের বরাদ্দ এক কাঁচ্চা মাছ অথবা মাংস। একসঙ্গে পরিমানে বেশী হওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায়, সপ্তাহে একদিন মাছ এবং একদিন মাংস দেওয়া হয়। কাঁটা অথবা হাড়ের জন্যে এই

পরিমাণের চার ভাগের একভাগ য়্যালাউয়েন্সের ব্যবস্থা 'জেলকোর্ডে'র সৃষ্টি কাল থেকে। নিরামিষ যারা খায়, তারা মাছ অথবা মাংসের দামে পায় দই।

দুপুরে বাল্তীতে যে জল দিয়ে গেল তাতেই কোন রকমে কাক স্নান সারতে হল।

বেলা ১২ টার পর চৌকা থেকে সেই বিরাট্ বিরাট্ বালতী ভরতি হয়ে, ভাত, ডাল, তরকারী এসে হাজির হল। ডাবুর মাপ অনুযায়ী চৌকার চালু কয়েদীরা, ডিগ্রীর ভেতর নির্দ্দিষ্ট থালা বাটিতে দিব্বি পরিবেশন করে চলে গেল—বেশী ও নয়, কম ও নয়। শেষ পাতে ঢেলে দিল খানিক তেঁতুল গোলা; কেউ নিল, কেউ নিলনা। উঠোনের কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে যে, যার মত নিজের প্রয়োজন মেটাল। আহারান্তে নিজের থালা-বাটি মেজে নিয়ে, কলসীর পাশে উপুড় করে রেখে দিতে হল সকলকে, পাহারাওয়ালার নির্দ্দেশনায়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার আগেই রাত্রির খাবার এসে গেল।

সন্ধ্যের আগেই সকলকে খাওয়া পর্ব্ব মিটিয়ে নিতে হল। 'মেনু' -দুপুরের যা তাই।

দু বেলার ভাতের চাল অত্যন্ত জঘন্য-মোটা-কাঁকর মেশান। বড় কষ্ট করেই, তাঁদের সেগুলোকে গিলতে হল।

॥ আটচল্লিশ ॥

জেলের সাধারণ বন্দীর তৎকালীক খাদ্য তালিকা "বেঙ্গল জেল কোড" থেকে আনুপূর্বিক, নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

Bengal Jail Code. Page 287

"Chapter XXXVI,—Food.

Section 1.—Diet.

Rule 1092 For the purposes of diet prisoners shall be classified as follows : —Class I,—Labouring adult male convicts in Division III.

Class II.

(1) All convicts under the age of 16 years in Division III.

(2) All femal convicts in Division III

(3) All non-labouring convicts in Division III.

(4) All Division II undertrial prisoners both male and female.

Rule 1093 All prisoners shall have three meals a day—the early morning meal before the hour of labour, a mid-day meal, and an evening meal before they are locked up for the night (See Rules 636, 642 and 643),

Rule 1094 The regular diet scale for Convicts in Division III and Division II undertrial of a jail

shall be either the Bihar or the Bengal scale, according as the prisoner is a native or resident of Bihar (and the Western Provinces) or Bengal; but he shall on first admission be allowed to choose, either of these scale and shall be warned at the time that subsequent change cannot be allowed. The diet scale be chooses shall be recorded in his history ticket, and no change shall subsequently be allowed unless recommended by the Medical officer.

Rulc 1095 The following are the scales of diet sanctioned for the Division III Convicts and Division II undertrials :—

Articles of diet	BENGAL DIET — For Bengalies and Uryas		BIHAR DIET — For natives of Bihar	
	Division III convict (ordinary Prisoner)	Division II undertrial (ordinary Prisoner)	Division III convict (ordinary Prisoner)	Division II undertrial (ordinary Prisoner)
1	2	3	4	5
For early morning meal—	Ch	Ch	Ch	Ch.
Rice ...	2	1½	2	1½
Salt .	1/16	1/16	1/16	1/16
For other meals—				
Rice ...	10	8½	5	4½
Atta ...	—	--	5	4
Dal ...	2½	2½	2½	2½
Vegetables ...	4	4	4	4
Oil ...	5/16	5/16	5/16	5/16
Salt ...	7/16	7/16	7/16	7/16
Condiments...	2/16	2/16	2/16	2/16
Antiscorbutics	.... As per rule 1099			

Articles of diet		BENGAL DIET For Bengalies and Urias		BIHAR DIET For natives of Bihar	
		Division III convict (ordinary Prisoner)	Division II undertrial (ordinary Prisoner)	Division III convict (ordinary Prisoner)	Division II undertrial (ordinary Prisoner)
1		2	3	4	5
For whole day		Ch.	Ch	Ch.	Ch.
For Central, and 1st, 2nd and 3rd class District Jail	Coal or	5	5		5
	Fire-wood	10	10	10	10
For 4th class District Jail	Coal or	6	6	6	6
	Fire-wood	12	12	12	12

Note 1,--Prisoners who are natives of Panjab, the United Province and the North-West Frontire Province, and choose to take all in both midday and evening meals, should be given II chittaks and 9 chittaks of atta according as they belong to class I and class II. They should gate I chittak gram or 1½ chittak atta and I/2 chittak Gur for the early morning meal.

Note 2,—In Darjeeling Jail the scale of coal will be 9 chittaks per head per diem and the scal of fire-wood will be 1½ seers per diem with a minimum limit or [illegible] maunds a day. Fire wood should be used only in case of failure to obtain Coal.

Rule 1096. In the case of the early meal of Prisoners of class I (Div, III Convict), one chittak

or less of Dal may, if the Medical officer deems it necessary, be added to the rice, which should then be served in the form of "Khicheri" seasoned with salt, but in this case the dal must be deducted from the allowances for the midday and evening meals (See Rule 1097), and the rice and dal must be cooked separately before mixing. When there is loss of weight among prisoners and a tendency to scurvy, mollasses or fresh gur should be given in preference to salt. When possible, and especially if there is any tendency to loss of weight, the early morning meal of all prisoners may be supplemented by issue of sweet potatoes (Batatus edulis) or other Vegetable food grown in the jail garden. It shall be the duty of Jailor to give as much variety as possible to this morning meal and its issue in the form of muri or other methods in use in Indian homes should be encouraged.

Rule 1097. The articles of diet provided for the mid-day and evening meals shall be equally, divided between such meals, except in the case of Bihar diet, in which the whole of the atta shall be given at one meal, and the whole of the rice at the other

Rule 1098. In all Jails a ration of fish at the rate of 1/2 chittak per head shall be given on alter nate day at one or other of the daily meals. If preferred by the Medical officer, this quantity of

fish can be doubled and half a chittak of dal per head deducted in lieu of the increased quantity of fish. Meat can be substitued for fish, provided the cost remains the same. For vegetarians the Superintendent, in consultation with Medical officer, may provide substitutes within the amount sanctioned for fish.

Note,—The quantity of fish or meat authorised under this rule may be issued on alternate days or accomulated and issued either once or twice a week or on every fourth day according to the discretion ot the Superintendent of the Jail.

Rule 1099, One or other of the following antiscorbutics shall be issud daily with the mid-day and evening meals to all Indian prisoners in the quantity per prisoner mentioned opposite each kind :—

	Ch. per pr.
Limejuice	1/2
Amchur	1/12
Tamarind pulp (free of husk, fiber an seed)	1/8
Putwa or roselle	1/12

This shall be in addition to the allowance of condiments, which shall consist of the following articles in the proportions stated—

Tamarind pulp (free of husk, fiber and seeds) in addition to the amount to be given as an

	Ch. per pr:
antiscorbutic	1/16
Turmeric	1/64
Chillies	1/32
Onion or garlic or both	9/128
Corriander	1/128
Total	3/16

Gur at 1/4 Chittak per prisoner per diem shall also be issued for chutney or in the early morning meal or for use in any other way at the discretion of superintendent.

Note—1/2 Chittak of gur per prisoner is to be used daily for preparation of Chutney.

1/6 Chittak of gur her prisoner per diem is to be accumulated and used for flavouring the early morning meal, either once or twice a weak at the discretion of the Superintendent.

Rule 1104 (Appendix No. 6) Especially in the rainy seasons a welcome change can be effected by issuing with the vegetables half a Chittak of the dal in form of "bori". The "bori" dal and the ordinary dal of the meal in which "bori" is issued should be of different varieties.

Rule 1107. All items of the dietary shall be weighed out to the cooks in a fully prepared state, or if this is impossible, with a full allowance for any loss which must occur in preparation by the cooks. All food shall be issued within one hour of its being cooked.

॥ উনপঞ্চাশ ॥

সন্ধ্যের বেশ কিছু আগেই ৪৪ ডিগ্রীর প্রতিটি আসামীকে একটি একটি ক'রে গুণে খোঁয়াড় গুলোতে পোরা হয়। অন্য ওয়ার্ডেও ঐ একই পদ্ধতি। প্রতিটি ঘরে, কজন কোথায় বন্দী হ'ল, চাবীর সংখ্যা কত? হেডওয়ার্ডাররা নিজের নিজের দায়িত্ব অনুযায়ী হিসেব মিলিয়ে ফাইনাল রিপোর্ট জেলারের কাছে পেশ করল; তদারকিতে একজন য়্যাসিষ্টান্ট জেলার। সকলের গুন্তি মিলিয়ে, বন্দী সংখ্যা মিলে গেলে, চিফহেডওয়ার্ডার জেলারকে সেলাম দিল। লক্ আপ বই সই হল। কাঠের প্রধান বড় দরজাটার পাশে ঝোলান, দেড়মন ওজনের পেতলের ঘণ্টাটায় লক্য়াপ ঘন্টি পড়ল ঢং ঢং ঢং। রাত্রির মত বন্দীদের ঘরের চাবীগুলোও সব বন্দী হ'ল গেটের আলমারীতে তখনই

সন্ধ্যের সময়ে জেলখানার তিনঘন্টি পড়ে গেলেই অর্থাৎ আসামী সংখ্যা মিলে গেলেই, কর্তৃপক্ষ, বন্দীর লক্য়াপ দায়িত্বে সে দিনকার মত নিশ্চিন্ত। দিন শেষের এই ঘন্টির প্রতীক্ষায় কারাকর্ম্মীরা যে যেখানে থাকে সকলেই কান খাড়া করে রাখে।

পরদিন প্রাতবাশ শেষ-হতে-না-হতেই, সাদা মোটা সুতর কাপড়ের ওপর চার ইঞ্চি ব্যবধানে, আধইঞ্চি চওয়া নীল ডোরাকাটা জাঙ্গীয়া কুরতা পরা, কাঁধের ওপর একটা কাল রংয়ের বিরলা (কাপড়ের ব্যাজ) ঝোলান, নাইট ওয়াচ ম্যানের (কয়েদী পাহারাওয়ালার) মাথায় চেপে একে একে, একখানি টেবিল, দুখানি চেয়ার এসে ঢুকল ৪৪ ডিগ্রীর এলাকায়। ঐ মোটা জমির সাদা কাপড়ের ওপর, চার ইঞ্চি ব্যবধানে পরপর লালনীল ডোরাকাটা পায়জামা এবং ঐ কাপড়ের

কোটপরা, মাথায় ঐ একই কাপড়ের টুপি দেওয়া, কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্টের মাঝখানে পেতলের প্লেটে কনভিক্ট ওভারসিয়ার লেখা তকমা আঁটা একজন কনভিক্ট ওভারসিয়ার (জেলে এরা 'মেট' বলে পরিচিত) তত্ত্বাবধানে পেছু পেছু ঘুরছে। মেটের পায়ে আছে, জেলের তৈরী চামড়ার স্যাণ্ডেল, প্রতি পাটিতে দুটো ক'রে ষ্ট্রাপ দেয়া। সরকার থেকে সব গুলোই পেয়েছে কনভিক্ট ওভারসিয়ারের পোষাক হিসেবে।

সাধারণ হাজতীর মেয়াদ হলেই জেলের ঐ বসন-ভূষণে কুরতা-জাঙ্গীয়ায় তাকে সজ্জিত হতে হবে।

যার, ইতিপূর্বে কোনদিন জেল খাটতে হয়নি তার সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হলে পোষাক মিলবে, সরুনীল ডোরার। ক্যাজুয়েল বলে সে চিহ্নিত।

যারা একাধিকবার সশ্রম সাজা পেয়ে জেলে আসে, তাদের বলা হয় 'হ্যাবিচুয়্যাল'। এরাই আধ ইঞ্চি নীল চওড়া ডোরার পোষাক পরে।

জেলের এই মেয়াদীদের পরপর প্রমোশন হয়—'নাইট ওয়াচম্যান' 'কনভিক্ট ওভারসিয়ার' 'কনভিক্ট ওয়ার্ডার'।

কনভিক্ট ওয়ার্ডারের, জেল থেকে বেতন মেলে। সংখ্যায় এরা খুব কম। খুব বিশ্বাসী না হলে সি.ও থেকে এ পদে আসা যায় না।

সি. ওদের জাঙ্গীয়া পায়জামা দুই মেলে পোষাকের অঙ্গ হিসেবে।

মেয়াদীদের, শীতের সময় পাওয়া যায় একটি করে পায়জামা আর কম্বলের কাল' কুরতা একটা। সি. ওদের মেলে ঐ জিনিষের কোট। সকলের জন্যেই একখানা করে, কুরতার কাপড়ে তৈরী গামছার ব্যবস্থা।

ক'লকাতার আলিপুরে পাশাপাশি দুটো বিশিষ্ট জেল।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকে ক্যাজুয়েল আর হ্যাবিচুয়্যালরা থাকে প্রেসিডেন্সী জেলের চার দেওয়ালের মাঝখানে। ১৯০৬ খ্রীঃ

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল তৈরী হওয়ার পর ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা হয়।

কাজুয়েলরা 'এ' ক্লাস এবং হ্যাবিচুয়্যালরা 'বি' ক্লাস নামে পরিচিত। মফঃসল জেলে 'এ' ক্লাস, 'বি' ক্লাসের পোষাকে ঐ তারতম্য। কিন্তু আলাদা করে রাখবার কোন ব্যবস্থাই এদের নেই।* ক'লকাতার মেয়ে বন্দীরা থাকে প্রেসিডেন্সী জেলে।

খাকি উর্দিপরা, মাথায় খাকি পাগড়ীতে সাদা ফ্রিঞ্জ দোলান, কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্টে পেটের ওপর চারকোনা বড় চাকতীতে আলিপুর জেল লেখা, পাগড়ীর মধ্যমণিতে আর দুই কাঁধের ওপর পেতলের হরফে বি, জে লেখা, কাঁধের খাকি দড়িতে পকেটে হুইসেল, পায়ের মোষের চামড়ার কাল বুট জোড়ার ওপর হাটু পর্য্যন্ত খাকি বনাতের পট্টি জড়ান একজন জেল ওয়ার্ডার গল্লা বেতের একখানি মাঝারি সাইজের লাঠি হাতে এদের দেখা শোনা করছে। ওয়ার্ডটি

* ক্যাজুয়েল, হ্যাবিচুয়্যালকে একত্র রাখায়, এবং নবাগত হাজতীদের তত্ত্বাবধানে 'বি' ক্লাস মেট, পাহারা রাখার ফল যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিষময় হয়ে দাড়িয়েছে তা সুপরীক্ষিত। এদের প্রভাবে প'ড়ে বহু ভাল লোককে দেখা গিয়েছে জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে, চোর, গুণ্ডা, পকেটমার, ডাকাত, বদমাইশ ছিনতাই পার্টির অংশিদার হতে। জেলের ভেতর ক্যাজুয়েল হ্যাবিচুয়্যালকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা না করে বন্দীদের যতই কেন সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা হোক, কোন সুফলের আশা করা যায় না। পর্বত ওই মুষিকই প্রসব করবে। আমার সুদীর্ঘ জেল অভিজ্ঞতায় এইটি উপলব্ধি করেছি। বর্ত্তমানে আলিপুর সেন্ট্রাল, প্রেসিডেন্সী, দমদম সেন্ট্রাল জেলে ঐ ব্যবস্থা যেন আরও শিথিল। অন্য কারাগারের কা কথা। এখন আবার তারতম্যের নিদর্শন পোষাকের ডোরা, তাও গেছে উঠে। বালাই গেছে চুকে।

দেখা গেছে বহু সুচরিত্র সৎ ব্যক্তি বিপদে পড়ে হাজতবাসের জন্যে জেলখানায় এসে এই সব ধুরন্ধর মেট পাহারার খপ্পরে পড়ে জীবনটা তার চিরদিনের জন্যে ধ্বংস করে ফেলেছে। সেদিন একটি তরুণীর করুণ কাহিনীও খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এদের হাত থেকে মেয়েটির বাঁচার আর অন্য কোন পথ নেই লিখেছে সে।

তারই চার্জে।

খানিক পরেই লম্বা চওড়া একখানা য়্যাডমিসন রেজিষ্টার বগলে নিয়ে য়্যাসিষ্টাণ্ট জেলার এসে, ধপাস করে খাতা খানা টেবিলের ওপর ফেললেন ; গতকালের ৪৪ ডিগ্রীর আগন্তুকদের ওয়ারেণ্টের গোছাটা তাঁর হাতে। একজোড়া চেয়ার টেবিল নিয়ে, টেবিলের ওপর খাতা খানা খুলে ধরে ওয়ারেণ্ট মিলিয়ে একে একে নাম ডাকতে সুরু করলেন। মেট দৌড়াদৌড়ি করে ডিগ্রীর ভেতর থেকে এঁদের এক একজন করে এনে টেবিলের সামনে হাজির করছে। আচার ব্যবহারে জেলকর্ম্মচারীদের শালীনতা রক্ষের নেই কোন বালাই। তার সঙ্গে জুটেছে মেট পাহারার দল। সাধারণ হাজতী বলেই কী চোর ডাকাতের সামিল এঁরা? তা তো নন!

কোন প্রতিবাদ নেই এঁদের মুখে, নীরবে কেবল ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে সমুদ্রের গভীরতা উপলব্ধি করছেন।

নাম, বাবার নাম, ঠিকানা ওয়ারেণ্টের সঙ্গে খাতায় ঠিকভাবে মিলিয়ে নেওয়া হ'ল আসামীকে জিজ্ঞেস করে। ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোর্ডের কোন্ কোন্ সেকশন্ আসামীর স্কন্ধে চাপান হয়েছে তাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, যে গুলো তাঁর নামের পাশেই অপর এক খোপে আগে থেকেই খাতাটিতে লেখাছিল। জাতী, ধর্ম্ম, পুরুষ বা স্ত্রীলোক সবই লেখা হল। কেবল বয়সটা লিখবেন ডাক্তার এসে, গায়ের জামা খুলিয়ে দেহের ওপরকার প্রধান প্রধান চিহ্ন দুটি, তিনটি লিখে নেওয়া হ'ল তাঁদের নামের পাশে পাশে।

লিখলেন, প্রত্যেকের হিষ্ট্রীটিকিটে, আসামীর নাম ধাম ইত্যাদি। কেসের সেকশন। কম্বল, থালা-বাটি, পরিধেয় ইত্যাদি যা যা সরকারী জিনিষ আসামীর জিম্বায় দেওয়া হয়েছে।

এর পরেই এলেন, জেলের একজন ডাক্তার। য়্যাডমিসন রেজিষ্টারের সঙ্গে, কয়েদীদের হিষ্ট্রীটিকিট এক এক করে টেনে নিয়ে তাঁর কাজ শেষ করতে লাগলেন। আবার পর পর ডাক পড়ল

সকলের। ওজন নিলেন, উচ্চতা দেখলেন, সকলের শরীর মোটামুটি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, নতুন কোন রোগ ঘোগ আছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করলেন। বয়স জিজ্ঞেস করে আন্দাজ মত একটা বসিয়ে দিলেন য়্যাডমিসন রেজিষ্টারে আর হিষ্ট্রীটিকিটে, তুজায়গাতেই বসিয়ে দিলেন ওজন আর উচ্চতা। লোকটা কি আহার পাবে—বেঙ্গল, বিহার না পাঞ্জাব ডায়েট, তাও হিষ্ট্রীটিকিটে লিপিবদ্ধ হ'ল। রোগ টোগ থাকলে তাও লিখে ওষুধ পথ্যাদির ব্যবস্থা হয়ে গেল কয়েদীর জেলখানার জীবনপঞ্জীর গায়ে।

এই হিষ্ট্রী টিকিট থাকবে আসামীর একতিয়ারে যত দিন সে কারা গৃহে বসবাস করবে।

অপরাধ করলে, আসামীর নামে, অফিসাররা রিপোর্ট ও লিখবেন এই খতিয়ানে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ওই রিপোর্টের ওপর তাকে যা সাস্তির ব্যবস্থা করলেন, অপরাধের গুরুত্ব বুঝে, তাও তিনি নিজে হাতে লিখে দেবেন এই টিকিটে। এক কথায়, বন্দীর কারা জীবনের ভাল মন্দ সব কিছু ইতিহাস তার এই জীবনপঞ্জীতে দিনের পর দিন নথীভুক্ত হয়ে যাবে।

মেয়াদ হলে এঁদের নাম উঠবে কনভিক্ট এডমিশন রেজিষ্টারে আর রিলিজ ডাইরীতে।

"মজঃফরপুর জেলার পুলিশ দারুণ সতর্ক রয়েছে এখনও পুলিসের বিশ্বাস, বেশ কিছু বাঙালী যুবক মজঃফরপুর সহর ও তার আশে পাশে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিহিংসার কল্পনা নিয়ে; কাজ সমাধান ক'রে, হয় লোক চক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে সরে পড়বার জন্যে নয়তো আরও কিছু অনিষ্ট করবার জন্যে। এটা নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, সাক্ষাৎ আততায়ীদের কুকর্মের পেছনে বহু সহযোগীর সমর্থন ও উৎসাহ ছিল এবং তারা সহর অব্দি আততায়ীদের সঙ্গ নিয়েছিল; কিন্তু নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীন নিরাপত্তার জন্যে অপরাধ

অনুষ্ঠান কালে অন্তরালে থেকেছে। টেলিগ্রাফ অফিসে সন্দেহের সঞ্চার হয়েছে যে, সাধারণ টেলিগ্রামের খবরের মধ্যে সাঙ্কেতিক কোর্ডের শব্দ সন্নিবেশ ক'রে ক'লকাতার সংগঠনের সঙ্গে মজঃফরপুরে বাঙালী ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগ রক্ষা চলেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাই সব টেলিগ্রামই সেন্সার করার আদেশ দিয়েছেন।" এটিও আসল মোকামের খবর।

॥ পঞ্চাশ ॥

নাঃ, এরকম অখাদ্য প্রতিদিন খেতে হ'লে পিতৃদত্ত প্রাণটা নিয়ে তো জেলখানা থেকে বেরন যাবে না, যদি না ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হয়। কার ভাগ্যে কী যে আছে কে জানে? মাণিকতলা বোমার মামলার আসামীরা সকলেই মনে মনে ভাবছে কী করা যায়। কী ক'রে এই আহারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

ডিউটি ওয়ার্ডারের গলাফাটান চিৎকার শোনা গেল "সরকার সেলাম"। বড় সাহেব রোঁদে এসেছেন।

প্রথম দিনের মত, দ্বিতীয় দিনও যখন বেলা ন'টার সময় ইংরেজ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমার্সন রোঁদে এলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, ইতস্ততঃ করে অনেকেই আহার্য্য বস্তুগুলির কিছুটা পরিবর্তন সাধনের জন্যে তাঁর কাছে অনুরোধ রাখলেন।

উত্তরে মিঃ ইমার্সন বললেন, অসম্ভব! সরকারী নিয়মকানুন মেনে তাকে জেলখানা চালাতে হয়, ব্যক্তি বিশেষের সুখ সুবিধে দেখতে গেলে তাঁর চলে না। পক্ষপাতিত্ব হলেই তাঁকে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে জাহাজে উঠবার টিকিট কাটতে হবে। কোর্টকে ব'লে দেখতে পারে তারা, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি কিছু সুরাহা করে দেন। সুপারিনটেণ্ডেণ্টের উপর তেমন বিশেষ কোন অধিকার দেওয়া থাকলে নিশ্চয় তিনি তা করতেন। এখানে হাত তাঁর বাঁধা।

হতাশ হলেন সকলে।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঘুরে গেলেই আসেন, চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ ডায়েলা, মধব কান্তি—সুপুরুষ চেহারা। আইরিশ ম্যান। বেশ হাস্য রসিক। অতি অমায়িক ব্যবহার। ডাক্তারের শরীরে যে গুণ গুলো থাকা প্রয়োজন সে সব গুলোই এঁর মধ্যে আছে এঁদের

মনে হ'ল।

কর্তৃপক্ষের প্রতিটি চরিত্র এঁরা বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। দ্বিধাহীন চিত্তে সবকিছু মেনে চলেন এঁরা। এ রকম দৈত্যদানবের রাজ্যে তো নিজেদের তৈরী করে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

আপন আপন সেলে ব'সে নানান কিছু মতলব আঁটেন, খবর সংগ্রহ করেন, মেট-পাহারাকে দর্শনীর লোভ দেখিয়ে কাজে লাগান। এই লোকগুলো এঁদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণে বড়ই উৎপাত করত। মিথ্যে রিপোর্ট দিত ওপর ওয়ালার কাছে। এখন এদের মুখ বন্ধ, ভেতর-বাহিরের অনেক খবরই পৌঁছে দিচ্ছে এরাই। গেছে আইন কানুন চুলোয়।

ডিগ্রীর যে নতুন মেটটা এসেছে—খুনী, বিশ বছরের সাজা খাটছে। মাথায় তার লালটুপি খুনের নিদর্শন। খুনী হ'লে কী হয় লোকটা খুব ভাল, স্বভাব ভারী মিষ্টি। জেলে অনেকদিন। তার কেটে গেছে। আইন কানুন কণ্ঠস্থ। ওয়ার্ডার থেকে শুরু ক'রে বড় সাহেবকে পর্যন্ত কী ভাবে খুশী করা যায় সবই তার নখদর্পণে বড় সাহেবের বাউণ্ডে ছত্রবাহক ছিল সে। সাহেবের রোঁদের সময়কার সুবৃহৎ রঙ্গীন ছাতাটা, সাহেবের পেছু পেছু সে, তাঁর মাথার ওপর ধরে জেলখানার ভেতরটা ঘুরত। এখান থেকে বদলী হল জেল হাসপাতালে, সেখানে চিফ্ মেডিক্যাল অফিসারের মেট। সি. এম. ও তার অনেক কথায় গুরুত্ব দিতেন। ভালবাসতেন তাকে। এবার জেলারের সঙ্গে পরামর্শ করে, সি. এম. ও. একে পাঠালেন, ফরটিফোর সেলস্‌সে, মানিকতলা বোমার মামলার আসামীদের দেখা শোনা করতে।

নতুন কন্‌ভিক্ট ওভারসিয়ারের জেল জীবনের কুষ্টি-বৃহৎকলেবরের হিষ্ট্রীটিকিকটা দেখে সকলের চক্ষুস্থির, কি করেছেরে বাবা! মাছ, মাংস, দুধ, পাউরুটি, মাখন, দামীদামী পেটেণ্ট ওষুধ-কিছুই তো বাদ নেই এর টিকিটে। দিব্বি তেলচুকচুকে চেহারার লোকটা। সাধারণ

মেয়াদী হলে কি হয়? করিতকর্ম্মা তো বটেই, তোফা আছে দেখছি। বুদ্ধি সুদ্ধি এর কাছেই নিতে হবে।

একেই, সকলে মিলে ডিগ্রীর 'লিগ্যাল য়্যাডভাইসার' ঠিক করে ফেললেন।

ইতিমধ্যে ডিগ্রী এলাকায় কড়া পাহারায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দিয়েছে, পাহারাওয়ালাদের টিপ্ স্এ সন্তুষ্ট করা ছাড়াও নতুন এই আগন্তুকদের ব্যবহারের গুণে। মেট-পাহারার কথায় এঁরা ওঠেন বসেন, ওয়ার্ডার তার ডিউটির সময়টা দিব্বি কাটিয়ে যায় এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে। কর্তৃপক্ষ যা চান, বোমারুদল তার সব কিছুই মেনে চলবার চেষ্টা করেন, জেলের শিরা-উপশিরাগুলোর রক্তের প্রবাহ ঠিক কোন খাতে বইছে বুঝে নেয়ার জন্যে।

এখন প্রায়ই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের দেখা হয়। চার পাঁচজন মাঝে মধ্যে এক জায়গায় জুটে গুলতানিও করেন। বড় কাউকে ডিগ্রী এলাকায় প্রবেশ করতে দেখলে এন্. ডবলিউরা সময় মত এসে এঁদের হুঁসিয়ার ক'রে দিয়ে যায়।

এরই মধ্যে একদিন, যখন কয়েকজনে একটা সেলের ভেতর ব'সে গল্প গুজব করছেন, ঐ নতুন মেট এসে হাজির হ'ল তাঁদের মধ্যে।

সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, এই যে, 'লিগ্যাল য়্যাডভাইসার' এসে গেছে।

একজন সামান্য স'রে ব'সে কম্বলের এক খোঁটে একটু জায়গা ক'রে দিয়ে, হাত ধরে টেনে নিয়ে তাকে সেখানে বসালেন।

সে একটু গর্ব্বিত ভাবে হেসে, সেখানে ব'সে প'ড়ে বল্লে—"আমার কথা মেনে যদি বাবুরা চলতে পার, দেখবে অনেক বিষয়ে সুবিধে হয়ে গেছে। চালাকি না খাটালে জেলখানায় পচে মরা ছাড়া উপায় নেই। জেলে আমায়, সুরুতে অনেক ভুগতে হয়েছে। ঠেকে-ঠেকে আমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।"

কানাইলাল বললে, "ভায়া দেখছি তা হ'লে জেল কোডের বি. এ

পাশ ক'রে ফেলেছ? জেল-ইউনিভারসিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নিশ্চয় পেয়ে গেছ? জলহস্তীর মত দিব্বিতো তেল চুকচুকে চেহারাটাও বাগিয়েছ। বেড়ে রেখেছ তোমার দিনপঞ্জীখানা! বাপস্, হাতে ধরে তোলাই যায় না। তা হলে বেশ আছ…?"

কানাইয়ের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উল্লাসকর বললেন—"কানাই চুপচাপ থাকলে হবে কি! সময় বুঝে মাঝে মধ্যে দিব্বিয খুচখাচ ছেড়ে দেয় দেখেছ?"

কানাইলালের কথাগুলোতে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাসি তামাসার আলোড়ন চলল। চার দেওয়ালের মধ্যে এইটুকুতেই তাদের মন কত চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

নিরাপদ বললে,—"লালমুখ' ইমার্সন সাহেব লোকটা খাস বিলেতী-কটা চামড়ার হলেও, শয়তান টাইপের নয়। আমার মনে হয়, মনটা, লোকটার বেশ নরম তাই না? এতেই বুঝুন না! আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হলেই কি তাদের পেয়ারের এই মেট সাহেবকে আমাদের তদারকীতে পাঠিয়েছেন?"

'মেটসাহেব' আখ্যাতে ভূষিত হয়ে সি. ও বিস্ফারিত নেত্রে বলে উঠল "ভুল বলছ! ভুল বলছ! ভুল বলছ! বড় সাহেব মোটেই না। সি. এম. ও. সাহেব নিজেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। লোকটা আইরিশ—খাস নিবেদিতার দেশের লোক। দরাজ বুকের পাটা!"

মেটের মুখে নিবেদিতার কথায় সকলেই অবাক।

উল্লাসকর জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি নিবেদিতার কথা কি করে জানলে?"

—"জানি স্যার! জানি! খুন করে জেলে এসেছি বলে একেবারে মুখ্যু মনে কোর না। বাইরে থাকতে দেশের অনেক খবরই রাখতাম। যাক গে সে কথা, এখন শোন যা বলছিলাম। তোমরা এসেছ স্বদেশী ক'রে, তাই লোকটা তোমাদের শ্রদ্ধা করেন। সেইজন্যেই তো আজ আমি এখানে। আর আমি যা বুদ্ধি দেব, সেগুলো যদি অক্ষরে

ওক্ষরে মেনে চলতে পার তা হলে দেখবে কেল্লা ফতে করে ফেলেছ।"

—ঝাড়না বাবা তু একটা স্যাম্পল !

—খুব বুদ্ধি ক'রে একে-একে এই তীরগুলো কাজে লাগাতে হবে, লক্ষ্য ভেদ হয়েছে কি ব্যাস্ ! হ্যাঁ, আরও একটা কথা, যা ঘটাবে, সব রাত্রিতে কিন্তু ! দেখবে, হৈ, চৈ, পড়ে গেছে। কম্পাউণ্ডার ডাক্তার সব ছোটাছুটি লাগিয়ে দেবে। ডুব দিয়ে জল খেলে দেখতে পাবে একাদশীর চোদ্দপুরুষও টের পাবে না। খুব সাবধানে কাজ হাসিল করতে হবে। একটা একটা ক'রে শোন। কি করতে হবে—

ক। এই ধর, গভীর রাত্রিতে একজনের বুক ধড়ফড়ানি সুরু হয়ে গেল। বুকের বাঁ দিকটা চেপে ধরে ক্রমাগত বিছানার এদিক্ আর ওদিক্, মুখখানাকে বিকৃত ক'রে। ঘরের বাকি লোকগুলো, ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু! ক'রে চেঁচাতে লাগবে। মাঝে মাঝে, গেল-গেল করবে, যতক্ষণ ডিগ্রী খোলা না হয়।

খ। কান কট্‌কটানি। করতে হবে একই ঢংয়ে।

গ। পেটের যন্ত্রণা।

ঘ। হরদম মাথা ঘোরা। শুয়ে কাত ফিরলেও সোয়াস্তি নেই। পৃথিবীটা যেন উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। চোখ খুললেই চক্কর খেতে থাকবে। বিছানা থেকে মাথা উঠতে পারবে না।

ঙ। অসহ্য মাথার যন্ত্রনা।

চ। সারা অঙ্গে অসহ্য ব্যথা। চলতে গেলেই পা কাঁপতে থাকবে। ভিরমী খেয়ে পড়ে যাবে।

ছ। রাত্রিতে ঘুম নেই। চোখের পাতা এক হতে চায় না। বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য মনে হয়। খাঁ-খাঁ করে। ভয় ভয় করে।

এই সাত দফাই যথেষ্ট। প্রয়োগ করে দেখ না, কেমন মজা লেগে যায়। সিওর সাকসেস। দেখবে, ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার দৌড়ে পথ পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রী খুলিয়ে একেবারে হাসপাতালের বিছানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে। ওষুধ, বিষুধ দিব্বি মুখ'রোচক

হসপিট্যাল ডায়েটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এক আধ দিন অসুবিধে হলেও। সি. এম. ও সাহেব রোগীর বাবা-মা। ও বিষয় ডাক্তারদের সব রকম ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। রোগীর পরিচর্য্যার সামান্য এদিক-ওদিক হলে ডাক্তারের আর রক্ষে নেই; লোকজনের সামনে এয়সা অপমান করবে না!

শচীন বললে—'অভিনয় করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাই?'

এ এমনই রোগ, এসব রোগে কেউ ধরা পড়ে না। ভুল ক্রমে যদি বা কেউ ধরা পড়ে যায়, সুবিধে তো কিছুই হবে না! খামখা মাঝ থেকে সলিটারি কনফাইনমেণ্ট ভোগ করতে হবে নয়তো খেতে হবে পেনাল ডায়েট। এই হবে তার সাজা—বলেই সি. ও হো হো করে হেসে উঠল।

—সলিটারি কনফাইনমেণ্ট? পেনাল ডায়েট? এদুটি আবার কি বস্তু!

—জেলে এই সাজা দুটো ভোগ করতে হলেই কয়েদী বাবুরা একদম সিধে হয়ে যায়।

সে আবার কিরে বাবা? সকলে মিলে বলে উঠল।

—ইংরিজী বই তো সকলেই দু'পাতা উল্টেছ। এই সামান্য কথার মানে জান না? প্রথমটি হল নির্জন কারাবাস,—এই ডিগ্রীতে দিবারাত্র লোকজনের মুখ দেখা যায় না। দিনের পর দিন একা একা চার দেওয়ালের মাঝে পড়ে থেকে কড়িকাঠ গোন। আর পেনাল ডায়েট!—খেতে দেবে শুধু ফেনের সঙ্গে নাম মাত্র খুদের ভাত, দিনে রাতে দুবার, তাতে থাকবে না লবনের ছিটেফোঁটা। ঐ ডিগ্রীটাতে একা একা পড়ে থাকতে হলে, যত বড় বীর পুরুষই হোক না কেন, এক দিনেই তার হৃদকম্প উপস্থিত হবে।

কানাই বললে, ওসব বাজে কথা এখন ছাড়ান দাও তো। বোকামি করলে সাজা তো খাটতেই হবে, সে জানা কথা। যাক ভাই! এখন দু'একটা ঐ রকম কাজের কথা ছাড়তো শুনি, যা

শুনলে আখেরে কাজ দেবে।

—ডাক্তার সাহেবের দিলটা খুব উঁচু বুঝলে। কেবল ম্যানেজ করে নিতে হবে লোকটাকে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে যেন দেবতা এসেছেন গো! জানতো জেলখানার নিয়ম, সাতদিন পর পর প্রতিটি কয়েদীর ওজন নেওয়া হয়। যেই দেখা যাবে কারুর ওজন কমেছে, ডাক্তার ওমনি 'লুজিং ওয়েট' ডায়েট তাকে দিয়ে দেবেন। ডাক্তার সাহেব কিন্তু রোগীর স্বাস্থ্যের জন্য আইন কানুনের কোন ধার ধারেন না! সুযোগ মত তাঁর কাছে গলার স্বরটাকে খুব খাটো করে একবার আবেদন করতে পারলেই হল! তিনি যখন রোঁদে আসেন, কয়েদীর হাত থেকে টিকিটখানা নিয়ে, মোটা ফাউনটেন পেনটা দিয়ে খচ্‌খচ্‌ করে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম যা তাঁর মন চায়, তাই তিনি লিখে দেবেন। যা ভাল বুঝবেন, তাই তিনি করবেন। যাকে খুসী যতদিন ইচ্ছে তিনি তাকে হাসপাতালে রেখে দেবেন। এঁর কলমের ওপর, বড় সাহেব বল, জেলার সাহেব বল কারুর ট্যাঁ-ফু করা চলবে না।

সকলে বলে উঠলে তাই নাকি? বড় মজার লোকতো ডাক্তার সাহেব! বদমাইসগুলো না করে প্রথমটা নরম হয়েই দেখা যাক না। কিছু আদায় করতে পারা যায় কি না। না হলে তো ও দাওয়াই আছেই!

—তবে তাই কর। কিন্তু হুসিয়ার উনি যেন বুঝতে না পারেন, আমি তোমাদের এ বুদ্ধি দিয়েছি। হাসপাতালে একবার নাক গলাতে পারলে দেখবে, দিব্বি ফুর-ফুরে সরু চালের ভাত, দুধ, চা, পাউরুটি, মাখন, ফল-ফুলারি, ডাব কিছু আর বাদ নেই। একটা মাস যদি কোন গতিকে সেখানে কাটাবার সুযোগ করে নিতে পার, দেখবে ফুলে-ফেঁপে দিব্বি খোদার খাসি বেনে গেছ। স্যাম্পেল খানাতো দেখে বুঝতেই পরছ! এখন ও কতকাল এ বান্দাকে জেলখানায় কাটাতে হবে, ফন্দি ফান্দা, খোসামদ না করলে এই চার

দেওয়ালের মাঝখানেই হয়তো দেহটাকে রাখতে হবে, বাইরে আর যেতে হবে না। কাজ কি বাবা 'লাথখোরি' করে! তাইতো নিজের কাজ গোছাচ্ছি! শুনেছি, তোমাদের ব্যবহারে ডাক্তার সাহেব খুব

উল্লাস কর বলে উঠলেন, যাঃ, তা হতেই পারেনা! নিছক বানিয়ে বলছ!

—আরে আমি সত্যিই বলছি। একশ' ভাগের এক ভাগ ও মিথ্যে নয়। আমার নিজে কানে শোনা, সে দিন ডাক্তারদের ঐ কথাই বলছিলেন, ডাক্তার সাহেব। আমি কান খাড়া ক'রে শুনেছি। খুনী বলে-ভেবনা আমি ইংরিজী কিছু বুঝি না!

কানাই বললে-আপনার পেটে যে ডুকলম আছে মশাই তা আমাদের বুঝতে বাকি নেই এতক্ষণ। বলে যান শুনি।

— তবে যা বলছি চুপ ক'রে শোন। রসভঙ্গ করলে চলবে না! লেখা পড়া অনেক দূর করে ছিলাম। এক আধটা ছাপ যে নেই তাও নয়! কিন্তু বুঝলে-জেলের অফিসে কেরানীগিরি করার ভয়ে মূর্খ সেজে থাকি। কি ভাগ্যি যে প্রথম দিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েনি। বুঝতেই পার এই ভাবে যতদিন কাটান যায়। অম্বথা অফিসের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ভাগাটা আমার কি খুলতো বল? মাঝে মধ্যে বাবুদের গুঁতনি খাওয়া ছাড়াতো আর কিছু জুটতো না! তার চেয়ে এ বরং এক রকম ভালই আছি। যাক গে, আমার নিজের কথা শুনে তোমাদের আর কি লাভ হবে বল! থাকগে ওসব কথা। ওঠার আগে একটা কথা বলে যাই শোন! তোমাদের যাতে ৪৭ ডিগ্রীতে কোন অসুবিধে না হয়, তদারক করতে, জেলার বাবুকে ব'লে, সি. এম. ও নিজে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। দেশ স্বাধীন করতে নেবে ছিলে ব'লে, লোকটা, তোমাদের খুব বড় চোখে দেখেন। দেখই না একটু খোসামদ ক'রে, দেখবে, অনেক কিছুই তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিতে পেরেছ।

'মেট' যেই কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছোকরার দল এক সঙ্গে হৈ-হৈ ক'রে উঠল-থ্রীচীয়ার্স ফর মেট সাহেব। হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে।

এই রাত্রি থেকেই কেউ-কেউ কাজে নেবে পড়লেন।

ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের ছোটা ছুটি সুরু হ'ল। রাত্রিতে লকআপ খুলিয়ে, একজন-একজন করে হাসপাতালে ভর্তি করা আরম্ভ করলেন ডাক্তার বাবুরা।

দিন কয়েক এই ভাবে কেটে গেল।

ডাক্তার সাহেব, একদিন একান্তে হৃষিকেশকে ডেকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাদের মতলব কি হে বাপু স্পষ্ট ক'রে আমায় বলতে পার? সবই আমি বুঝে ফেলেছি। তোমাদের সব চালাকি ধরে ফেলেছি"।

হৃষিকেশও তেমনি হেসে হেসে উত্তর দিল, "তা যদি বুঝেই থাকেন স্যার, দয়া ক'রে এইবার আমাদের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন। সরকার আপনার হাতে তো অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। আপনি আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান্"!

খোসামদে, ডাক্তার সাহেব গ'লে যেতেন—হৃষিকেশের কথায় হো-হো ক'রে হেসে উঠে বলেই বসলেন,—"কি করলে তোমরা উৎপাত বন্ধ করবে বলতো হে বাপু"!

"জেলে যখন এসেছি, তেমন বিশেষ কোন সুবিধে আমরা চাই না। আইন ভঙ্গতো আমরা কিছু করিনি! আপনাদের যাঁর যতখানি সম্মান তাও আমরা দিয়ে চলেছি। বুঝতেই তো পারছেন, সবাই আমরা ভদ্রঘরের সন্তান। কতদিন যে এখানে পচে মরতে হবে তাও জানিনা। আপনি সামান্য একটু করুণা করলে সবই ঠিক হয়ে যায়। আমরা এমন বেশী কিছু চাইনা! কেবল দয়াটুকু করুন, ৪৪ডিগ্রী থেকে সরিয়ে আমাদের সকলকে অন্য কোন একটা ওয়ার্ডে রাখুন, যেখানে আলো বাতাস পাওয়া যায়। আর খাবার দাবার সামান্য

একটু ভাল যাতে হয়। ও গরুর খাবার আমাদের শরীরে আর সহ্য হচ্ছে না স্যার। একটু-আধটু পুষ্টিকর আহার্য্য আমাদের টিকিট গুলোতে লিখে দিলেই চলবে"—বললে-হৃষিকেশ।

তার উত্তরে সি. এম. ও বললেন—"এটা কি বুদ্ধিমান্, বিবেচক লোকের কথা হ'ল? বুঝে দেখ, একসঙ্গে আমি যদি তোমাদের সকলের ওপর এত উদারতা দেখাতে যাই তা অনেকেরই নজরে পড়বে। বিশেষ ক'রে সরকারের নজর এড়াবে না। আর আমার চাকরীটা একদিনেই নট হয়ে যাবে। কিছুতো করব বটেই তবে খুব ধীরে-সুস্থে। জানই তো ইংরেজ বাহাদুর তোমাদের ওপর কত সন্তুষ্ট। ভদ্রলোকের ছেলেরা কোর্ট থেকে বেটার ক্লাসিফিকেসন পেলে না কেন? কার নির্দ্দেশে তা জান? স্বয়ং ফুলার সাহেবের কড়া হুকুম কোর্টের ওপর; আর আমি কিছু করলেই, তোমাদেরই জাত ভাই পুলিসের লোকেরা ঠিক তাঁর কানে কথাগুলো পৌঁছে দেবে। সবদিক বাঁচিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে, যাতে সাপ ও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। তবে হ্যাঁ! কথা দিচ্ছি সুপারকে ব'লে, তোমাদের সকলকে ফরটিফোর সেল থেকে সরিয়ে একটা বড় ওয়ার্ডে একসঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করব নিশ্চয়! আর ওদিকটা আমি ধীরে ধীরে ক'রে দেব। কোন চিন্তা কোরনা তোমরা"।

সঙ্গে সঙ্গে হৃষিকেশের হাত থেকে তার হিস্ট্রী টিকিটটা টেনে নিয়ে খস্‌খস্ ক'রে, তিনি সেটির ওপর এক্সট্রা ডায়েট লিখে দিলেন— দুধ, পাউরুটি, চিনি, মাখন আর দুবেলা দু' কাপ চা।

হৃষিকেশ ফিরে এসে জনা কয়েককে তার টিকিট খানা দেখিয়ে সি. এম. ওর অভিপ্রায়টা তাদের কাছে ব্যক্ত করল।

একজোটে সকলে বললে—হাত আসুক। পরে বললে-দেখা যাক দুটো একটা দিন। কি করে—না করে। তখন আবার ঐ পন্থা অবলম্বন করা যাবে।

এই ক'দিনই সি. আই. ডি অফিসারের দল, পুলিসের ইন্স্‌পেক্টর থেকে সুরু ক'রে বড় কর্ত্তারা অনেকেই জেলখানায় এসে এঁদের উত্তম-পুত্তম করছে। একজনকেও বাদ দিচ্ছে না। কাউকে বা তিনচার দিন অনেক কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বিশেষ করে ইন্সপেক্টর সামস্থল আলমের প্রতিদিনের উৎপাত সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। এই সঙ্গে চিনেজোঁকের মত লেগে আছেন ডেপুটি সুপার রামসদয় মুখার্জী।—সদাহাস্যময়। ভদ্রলোকের গা টা যেন গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাকা। শত অশ্রাব্য উক্তি তাঁর গায়ের চামড়া খানার ওপর দিয়ে পিছলে চলে যায়। কটুক্তি গালিগালাজ শুনে, সব কিছু অম্লান বদনে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, হাসিমুখে মিষ্টি কথায়, পেচোয়াধুরন্ধরটিকে পর্য্যন্ত ভিজিয়ে তার কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা করেন। কিছুতেই দমেন না! সরকারের ঘরে এ বিষয় তাঁর নাম আছে। এইভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কয়েক জনের স্বীকারোক্তি তিনি সংগ্রহ করলেন।

সামস্থলকে দেখলেই, ছেলে-ছোকরার দল নানাভাবে ব্যঙ্গ করে। শেষ পর্য্যন্ত তার নামে একটা গানই বেঁধে ফেলল। লোকটাকে আসতে দেখলেই থালা বাজিয়ে কোরাস গান সুরু হয়ে যায়—

—"ওহে, সামস্থল, তুমি সরকারের শ্যাম, আমাদের শূল।
কবে ভিটেয় তোমার চরবে ঘুঘু? তুমি চোখে দেখবে সর্ষে ফুল।"

সি. এম. ওর সঙ্গে হৃষিকেশের কথা হওয়ার পর মাত্র চারটে পাঁচটা দিন কেটেছে, একদিন সকালে আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের, ৪৪ ডিগ্রী থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল ৩ নম্বর ওয়ার্ডে।

মাণিকতলা বোমার মামলার নতুন নাম করণ হল—'আলিপুর বোমার মামলা'। আলিপুর কোর্টে এই মামলা চলেছিল বলে সম্ভবতঃ মামলার নামের এই পরিবর্তন দেখা দেয়।

৩ নম্বর ওয়ার্ডে পাশের একটি ছোট ঘরে আগে থেকেই ঠাঁই পেয়েছেন অরবিন্দ ঘোষ* । সেখানে গিয়ে ঢুকলেন দেবব্রত। অপর পাশের ঘরটিতে বয়ঃপ্রবীণ কয়েক জনকে নিয়ে আসর জমালেন বারীন্দ্র। বাকী সব গিয়ে ঢুকল বড় ঘরখানিতে।

ওয়ার্ডের সামনে প্রাচীর ঘেরা ছোট্ট একটি অঙ্গন। স্নানের ব্যবস্থা সেখানে।

প্রথম দলের সঙ্গেই এসেছিলেন, নগেন আর ধরণী—কবিরাজ। বোমার খবর এঁরা কিছুই রাখেন না। বেচারিদের অপরাধ—উল্লাসকরের একটা তালাবন্ধ বোমা ভরতি বাক্স এঁদের বাড়িতে পাওয়া গেছে।

পরের পর চারদিক থেকে গ্রেপ্তার হয়ে অনেকেই এসে ঢুকতে লাগলেন, জেলখানার এই বড় ঘরখানিতে।

খুলনার হিউমারিষ্ট সুধীর সরকার, শ্রীহট্টের সুশীল সেন, তাঁর দুই ভাই, হেম আর ধীরেন; তিন ভাইই একসঙ্গে এসে হাজির। অরবিন্দের শ্বশুরের জ্ঞাতি বীরেন ঘোষ এলেন যশোহর থেকে। মালদার নরেন বক্সীর সঙ্গে এলেন তাঁর বন্ধু কৃষ্ণজীবন। বারীন্দ্র, শ্রীরামপুর জমিদার বংশের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নাম করাতে, সেও এসে ঢুকল। প্রথম দু একদিন তাকে অন্য ঘরে রাখা হয়েছিল। উপেন্দ্রর বিশিষ্ট বন্ধু রগচটা হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, কোর্টে Bomfield Fuller সম্বন্ধে নানাপ্রকার কটূক্তি করাতে তাঁকে তো ক'দিন আগেই শ্রীঘর দর্শন করতে হয়েছে। আর একদিন ভোর হতে-না হতেই দেবব্রত বসু এসেছিলেন। এলেন চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক কানাইলালের গুরু, চারু রায়। ফরাসী সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, ইংরেজ সরকার, ফরাসী উপনিবেশ থেকে চারুবাবুকে ধরে আনাতে মাণিকতলা বোমার মামলায় জড়িত সকলেই আশ্চর্য-হতবাক।

* অরবিন্দ মাঝে কিছুদিন ওয়ার্ডে ছিলেন। নরেন গোঁসাই খুন হওয়ার পর তিনি নিজে থেকে চেয়ে পূর্ব্বের ছ ডিগ্রীর প্রথমখানিতে ফিরে যান।

। একান্ন ।

১৯শে মে ইংরিজীর ১৯০৮ সাল।

২৪ পরগনা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বার্লি, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ এবং যুগান্তর দলকে অভিযুক্ত করে পাকাপাকিভাবে মামলা সুরু করলেন। এই মামলা তাঁর কোর্টে চলেছিল ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল—

১। রাজা অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

২। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা।

৩। বেআইনী অস্ত্র নির্মাণ ও সংরক্ষণ।

এই থেকে সুরু হয়ে গেল আসামীদের ডাক পড়া তাঁর কোর্টে—কখনও বা সকলের একসঙ্গে আবার কখনও বা এর ওর। এদের জবানবন্দী নথিভুক্ত করা হচ্ছে। অপরাধ? এরা নাকি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারত সরকার তো তাই বলে!

প্রথমেই ডাক এল শত্রুদলের প্রধান সেনাপতি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের।

রটিয়ে দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধে এরা নাকি ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়েছে।

এমনই এদের সম্বন্ধে ভীতি ইংরেজ সরকারের। রাজ্য বুঝি যায় রসাতলে।

বার্লির কোর্ট এখন সরগরম। রোজই তোলপাড় হচ্ছে। কোর্টের বাইরে রাস্তাতেও লোক থই-থই করছে। মাণিকতলা বোমার

মামলার আসামীদের সঙ্গে জড়িয়ে, যুগান্তর দলের বেশ কয়েকজনকে, চারদিক-ঢাকা কাল কয়েদ গাড়িতে বোঝাই করে, আলিপুর জেল থেকে রোজই সকালে দশটায় কোর্টে হাজির করা হচ্ছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি নিজ হাতেই আসামীদের স্বীকারোক্তি কাগজে লিখে, আসামীদের সহি নিচ্ছেন নথীর শেষে।

পুলিসী তৎপরতার আর বিরাম নেই। যেখান থেকে যাকে পারছে, পাকড়ে এনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির করছে। দু'দশটি নয়, এক-এক করে ২০৬ জন সাক্ষী এসে কাঠগড়ায় উঠল। কেবলই কী সাক্ষী? গাড়ি ভরতি হয়ে এলো চারশোর ওপর দলিলপত্র; বন্দুক, রিভলবার, বোমা থেকে সুরু করে প্রায় হাজার পাঁচেক প্রামান্য টুকিটাকি। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মালমশলা হল ছ'শো।

সরকার পক্ষে কৌসুলি নিযুক্ত হলেন, ফৌজদারী মামলায় ধুরন্ধর এবং বিচক্ষণ ইংরেজ ব্যারিষ্টার মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন, আর আছে সরকারের খয়েরখাঁ কজন নামী ভারতীয় উকিল-ব্যারিষ্টার নর্টনের সাহায্যে।

—আসামী পক্ষ যদি নর্টন সাহেবের সঙ্গে যুঝবার মত ছঁদে-ছঁদে ব্যারিষ্টার, উকিল দিতে না পারেন, তাহলে তো সর্ব্বনাশ!

তাই অরবিন্দের দলের পক্ষে নিযুক্ত হলেন, তেমনই নামকরা বাঙালী ব্যারিষ্টার বয়ঃ প্রবীন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী আর কে. এন. চৌধুরী। এঁদের সাহায্যের জন্যে উকিল দেওয়া হল, নীরোদ চন্দ্র ব্যানার্জীকে।

এঁরা তো আর বিনা পারিশ্রমিকে কোর্টে উঠবেন না।

কোথায় টাকা? মোটা অঙ্কের ফিজ আসবে কোথা থেকে? কে দেবে এই টাকা?...

গোপনে অর্থ সংগ্রহ সুরু হয়ে গেল। প্রথমটায় তেমন কোন ফল দেখা গেল না।

নিরুপায় হয়ে অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেশবাসীর কাছে অর্থ সাহায্য চেয়ে এক আবেদন পত্র প্রচার করলেন।

এমনিতে নিজের দলের কাছে যাই বলুন, ধরা পড়ার পর বারীন্দ্রের মনোবল কেমন যেন ভেঙ্গে গেল।

পুলিসের চাপে পড়ে সমিতির অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক'রে ফেললেন তিনি, বালির কোর্টে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বারীন্দ্র যদি খোলাখুলি ভাবে নিজের কথা সম্পূর্ণ না ব্যক্ত করতেন, নরেনের পক্ষে রাজসাক্ষী হওয়া হয়তো সম্ভব হত না। তাঁরই এই উক্তির ওপর রঙ চড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধনে সুযোগ পেয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে আবার কেউ কেউ বলেন,—বিপ্লব যজ্ঞের পুরোহিত নিজ মুখ থেকে মুক্তি সাধনার এই অলৌকিক কাহিনীর অগ্নিবন্যা বহিয়ে ছিলেন বলেই, স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুণদের জীবনে অপূর্ব্ব বল সঞ্চারিত হয়ে ভবিষ্যতকে রক্ষা করেছিল।

বারীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, অরবিন্দকে বাদ দিয়ে গুপ্তসমিতির কার্য্যকলাপ স্বীকার করলেন কোর্টের কাছে।

বারীন ঘোষের পর উল্লাসকর দত্তের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হ'ল।

—আপনি কোন বিবৃতি দিতে চান?

—হ্যাঁ।

—আপনার নাম?

—উল্লাসকর দত্ত।

—আপনি জানেন, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট, যে কোন বিবৃতিই দেন না কেন, তা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

—হ্যাঁ, জানি।

—তবুও আপনি বিবৃতি দিতে চান?

—হ্যাঁ।

—আপনার বয়স? বাবার নাম?

—বয়স আমার তেইশ। বাবার নাম দ্বিজদাস দত্ত। জাতে আমরা বৈদ্য।

—পেশা?

—আমার পশুপালনের খামার আছে। একথা বললে গোয়ালার চাইতে একটু ভাল শোনায় তাই না?

—নিবাস?

—কালীকচ্ছ গ্রাম, থানা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, জেলা ত্রিপুরা।

—এখানে কোথায় থাকা হয়?

—আমি শিবপুরে থাকি, হাওড়া জেলায়।

—এই বিবৃতি কি কোন চাপে প'ড়ে দিচ্ছেন?

—না।

—এবার আমায় প্রথম থেকে বলুন আপনি কি ছিলেন?

—আমি ছিলাম গুপ্তস মিতিতে।

—কবে থেকে গুপ্তসমিতির কাজে অংশ নিচ্ছেন?

গত বছর থেকে। জি, বারোনি, গত আট দশ মাস আমাকে দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন। জি, বারোনিব সঙ্গে আমার পরিচয় চার পাঁচ বছরের "যুগান্তর"এ ঘোষণা করা হয়েছিল, একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। একে যোগ দেবার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল আমার। বারোনি বাবু নিজেই আমার সঙ্গে গুপ্ত সমিতির পরিচয় করে দেন। আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত করতাম।

—কবে শিখলেন বিস্ফোরক তৈরী করতে?

—এই সমিতিতে যোগ দেবার আগেই আমি কিছু শিখেছিলাম, অল্প স্বল্প পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি পূর্বেই।

—আপনাকে কে শিখিয়েছেন?

—না, কেউ শেখায়নি।

—কোন্ বিশেষ ঘটনা আপনার মনে আছে? প্রথম ঘটনাটা কি?

—চন্দননগরে ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা। আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি সেখানে নিজে গিয়েছিলাম। ডিনামাইটসহ একটা লোহার সিলিণ্ডারের সঙ্গে আমি একটি মাইন নিযে যাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিকমত বসাতে পারিনি।

—মাইন পাতবার কি উদ্দেশ্য ছিল?

—স্যার এণ্ডরু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করা।

—কে মাইনটা তৈরী করেছিল?

—আমিই করেছিলাম।

—খড়গপুরের ঘটনা কিছু জানেন?

—জানি। খড়গপুরে আমি নিজে যাইনি।

—কে গিয়েছিলেন?

—বারোনিবাবু, বিভূতি আর প্রফুল্ল। গোয়াবাগানের একটা বাড়িতে আমি যে মাইনটা তৈরী করেছিলাম, তাঁরা তাই নিয়ে যান। গোয়াবাগানের বাড়িটা আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। এটা গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ি নয়। মাইনটা ছিল, ঢালাই লোহার সিলিণ্ডারে এবং তাতে ছিল পাঁচ পাউণ্ড ডিনামাইট। ফিউজ তৈরী হয়েছিল, পিকরিক আর ক্লোরাইড অব পটাশ দিয়ে।

—আর কোন ঘটনায় আপনি অংশ নিয়েছিলেন? অন্য কোন উপলক্ষে আপনি আর কোন জিনিষ তৈরী করেছিলেন?

—না?

—আপনি কোথায় ধরা পড়েছেন?

—৩২ নং মুরালী (মুরারী) পুকুর-এ; আমি মাঝে মাঝে দু'তিন দিনের জন্যে সেখানে যেতাম। আমি সর্বক্ষণ সেখানে থাকতাম না। গত আট দশ মাসে আমি দু তিন দিন করে মাঝে মাঝে গেছি।

—সেখানে কি হত?

—নবাগতদের জন্যে একটা ধর্ম্ম শিক্ষার ক্লাস হত। আমি এক বছর হল ভারতবর্ষে এসেছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। আমার ভাইয়ের নাম মনমোহন। আমি ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা অবধি পড়াশোনা করি। এরপর পড়া ছেড়ে দিই, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার রাসেল, বাঙালী ছেলেদের গালি গালাজ করাতে তার পিঠে এক চটীর বাড়ি ক'সে দিয়ে কলেজ থেকে সরে পড়ি। বাহিরে একবছর থাকার পর আমি বাঙলায় ফিরে আসি। এক জেলা থেকে আর এক জেলা ঘুরে বেড়াই এবং ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করি। দু বছর এমনি ঘুরি ফিরি। হ্যাঁ, আর একটা ঘটনার কথা বলতে চাই, মজঃফরপুরের কথা। সেখানে যে বোমাটা ব্যবহার করা হয়েছে তা একটা হাতলওয়ালা টিনের পাত্রে ডিনামাইট।

আমি উপনিষদ পড়তাম।

—আর কিছু ঘটেছিল?

—কখনো-কখনো আমরা বিস্ফোরক তৈরী করতাম ও তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম। আপনি যদি পুলিসের কাছে আমার বিবৃতি পড়তে দেন তো ভাল হয়।

—আপনার মস্তিষ্কে এখন যা ঘুরছে তা এখানেই আমার কাছে বলা ভাল।

—যা বলছি তাও মাথা থেকে বলেছি।

—শুনে খুশী হলাম। কিন্তু আমি যে চাই, আপনার মুখ থেকেই আপনার কাহিনী শুনব। আর কেউ বিস্ফোরক তৈরী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করত বা তৈরী করত?

—এখানে নয়।

—তবে কোথায়?

—হেমচন্দ্র দাস সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে এসেছেন। তিনি তাঁর ওখানে ও গোপীমোহন দত্ত লেনে করতেন।

—মজঃফরপুরের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

—জানি। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল ঐ উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিল। তারা যখন রওনা দেয়, তখন আমি গোপীমোহন দত্ত লেনে ছিলাম। তখন সন্ধ্যেবেলা। তারা একটা বোমা সঙ্গে নিয়ে যায়। আমাদেরই, —বিশেষভাবে কারো নয়, একটি ক্যানভাস ব্যাগে ওটা ছিল।

—কে ঐ বোমা তৈরী করেছিল?

—আমি শুনেছি হেম ওটা করেছেন। যখন ওটা করেছেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম না।

—যাঁরা ধরা পড়েছেন এঁদের নেতা কে কে?

—কেউ নেতা নেই। তবে বুনেনবাবু নেতা হিসেবে কাজ করেন।

—সদস্য কারা?

—বুনেন, আমি, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, প্রফুল্লচাকী, বিভূতিভূষণ সরকার। এঁরাই আসল কর্ম্মী। আরোসব নবাগত ছিল, তারাও ধরা পড়েছে। কিন্তু তাদের গণা করা হয় না।

—খড়গপুরের জন্যে আপনি বোমা তৈরী করেছিলেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি কাউকে দিইনি। ওটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে কে যেন নিয়ে গিয়েছিল। ওটা ছিল গোয়াবাগানের বাড়িতে।

—এখন আপনি যেতে পারেন।

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আসামীর কাঠ গড়ায়। বার্লির কোর্টে।

নরেন্দ্র তার প্রথম বিপ্লবী জীবনের বিবৃতি দিল। সে যেন প্রথম থেকেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিল ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে এটি তুলে ধরার জন্যে। তার ধারণা বারীন্দ্র কুমার, উল্লাসকর যখন সবই ফাঁস করে দিয়েছে তখন সেই বা কেন ছাড়বে।

বার্লি খুসী হয়ে তার বিবৃতি নথীভুক্ত করলেন।

—আপনি আমার কাছে কিছু বলতে চান?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি স্বেচ্ছায় এ বিবৃতি দিচ্ছেন, না, আপনাকে এই বিবৃতি দিতে কেউ চাপ দিয়েছে ?

—না, আমি স্বেচ্ছায় বিবৃতি দিচ্ছি।

—আপনি কি বলতে চান ?

—বঙ্গভঙ্গের সময়ে গভর্মেণ্ট আমাদের মিনতিতে কর্ণপাত করলেন না। তখন আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলাম। দু'বছর আগে আমি বীরেনের সঙ্গে পরিচিত হই। "যুগান্তর" প'ড়ে মন আমার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছিল. ভূপেন দত্তের কারাদণ্ডের পর আমি কাগজটি প্রকাশের জন্যে চাঁদা তুলতে লাগলাম, চার মাস আগে। আমার সঙ্গে হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও উল্লাসকর দত্ত ছিল।

—তাঁদের সঙ্গে আপনি কি করছিলেন ?

—আমি তাঁদের সঙ্গে থাকতাম না; স্বরাজ প্রসঙ্গে আলাপ করতাম।

—এ পার্টির উৎপত্তি হয় কিভাবে ?

—আমি জানিনা। বীরেন (বারীন) ই ছিলেন নেতা। তিনি সব জানেন।

—আপনি বিশেষ ভাবে কিছু জানেন ?

—জানি। চন্দননগরে মেয়রের ঘরে বোমা ফেলবার একদিন আগে বীরেন আমার কাছে আসেন এবং পরদিন আমাকে তাঁর সঙ্গে মাণিকতলা বাগানে দেখা করতে বলেন। তারপর বীরেন চলে যান। আমি পরদিনই যাই। সেখান থেকে, দুটো কি তিনটের সময়ে, বীরেন, আমি ও আরও একটি ছেলে হেমদাসের বাড়ি যাই। আমি ঐ ছেলেটির নাম জানিনা। সেখান থেকে আবার আমরা তিনজনেই বেরিয়ে যাই। আমাদের সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল, তার হাতে একটা ব্যাগ এবং ব্যাগে তিনটি রিভলবার, একটি বোমা ছিল। আমরা

ট্রামে হাওড়া আসি। ট্রেনে চাপি ও মানকুণ্ডু ষ্টেশনে নামি। সেখান থেকে আমরা চন্দননগরে যাই। সেখানে আমরা গঙ্গাতীরে বসি। চন্দননগর থেকে আরও তিনজন আসেন এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। আমি তাঁদের চিনিনে। বীরেন তাঁদের একজনকে বললেন, 'দেখে এসো মেয়র কি করছেন।' তিনি ফিরে এলেন, কিন্তু কোন খবর দিতে পারলেন না। সেদিন আর কিছু হ'ল না। আমরা চন্দননগরে একজনের বাড়িতে থাকলাম। এর আগে আমি সেখানে যাইনি। ভাল ক'রে সেখানকার ব্যাপার জানতামও না। আমরা যে বাড়িতে গিয়েছিলাম, সে বাড়িতে মাত্র একটি লোক ছিল। সেখানেই রাত কাটালাম। ভোর চারটেয় আমরা সব কিছু রেখে চন্দননগর রেলষ্টেশনে এলাম। ছেলেটি এবং আমি একটা গাড়িতে উঠলাম ও শ্রীরামপুর গেলাম, বীরেন ক'লকাতায় চলে গেলেন। ছেলেটির সঙ্গে আমি আমাদের বাড়ি এলাম। এরপর পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটের ট্রেনে আমরা মানকুণ্ডু গেলাম, সেখান থেকে চন্দননগর। চন্দননগর ঘাটে পৌঁছে দেখি বীরেন আরও তিনজনকে নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ব্যাগটা তাঁদের সঙ্গে ছিল। বীরেন, ছেলেটিকে, মেয়র কি করছেন দেখে আসবার জন্যে আদেশ করলেন। ফিরে এসে ছেলেটি আমাদের জানাল যে, মেয়র টিফিন খাচ্ছেন। এ কথার পর, যে ছেলেটি ক'লকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে আসে সে, আমি এবং আর একটি ছেলে, মেয়র ম'সিয়ে তাদিভেলের বাড়ির দিকে চললাম। আমাদের সঙ্গে তিনটি রিভলবার ছিল এবং যে ছেলেটি ক'লকাতা থেকে এসেছিল, তার হাতের ব্যাগে একটা বোমা ছিল। বীরেন ও আর তু'জন আমাদের অনেকটা পেছনে ছিলেন। আমি যখন মেয়রের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, ছেলেটি বাড়িটির সামনে, জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে মেয়রের ঘরে বোমাটা ছুঁড়ল।' তারিখটাও আমার মনে আছে ১১ই এপ্রিল ১৯০৮। একটা পটকার মত শব্দ শোনা গেল। আমরা তিনজন দৌড়ে পালালাম। তারপর

গঙ্গার ধারে এলাম। ফেরীবোটে ক'রে আমরা শ্যামনগরে গেলাম। বীরেনের সঙ্গে দেখা হ'ল গঙ্গার ধারে। শ্যামনগর থেকে আমরা শেয়ালদার শেষ ট্রেন ধরলাম। তারপর মাণিকতলা মুরারীপুকুর বাগান বাড়িতে এলাম। পরদিন সকালবেলায় আমি শ্রীরামপুরে ফিরে গেলাম।

—এমন কাজ কেন করলেন ?

—"যুগান্তর" সংবাদ পত্র প'ড়ে আমি বিচলিত হয়েছি। তার্দিভেল মরেননি। এরপর আমার মনের পরিবর্ত্তনও হয়েছে অনেক। আজকে আর বলতে পারছি না।

—আচ্ছা, এখন আপনি নেবে যেতে পারেন।

: বাহান্ন :

মাণিকতলা বোমার মামলা নিয়ে ইংরেজ সরকার পাগল হয়ে উঠেছে। শুধুই কি বাঙালা! কোন ভারতীয়কেই যেন তারা বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না এখন। কোন্ প্রদেশে যে কখন অভ্যুত্থান ঘটে কে জানে। বোম্বাই, গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তর ভারতেয় বেশ কয়েকটি জায়গা সবই যেন তপ্তকটাহ। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টাকে সামলায়! এ অবস্থায় ওদিকটাতে নজর না দিলেও চলে না।

লোকমান্য তিলক গ্রেপ্তার হলেন : ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে পাঠিয়ে দিল মান্দালয় জেলে, লালা লালপৎ রায় আর অজিত সিং, এই দুই দেশ প্রেমিককে নির্ব্বাসিত করলে পাঞ্জাব থেকে।

বন্দেমাতরম্ মামলায় জেল খেটে বিপিন পাল কেবলমাত্র বেরিয়ে এসেছেন। সরকার তালে আছে, কি ক'রে একটা অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে আবার জেলে পোরা যায়। টের পেলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস; প্রবীন ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে তখনকার মত বিপিন পালকে ক'লকাতার বাইরে সরিয়ে দিলেন; কিন্তু এই মামলা চলা কালিন তাঁকে আর ভারতবর্ষে রাখাই যুক্তি যুক্ত মনে করলেন না উভয়ে। গ্রেপ্তার এড়ানর জন্যে এই বছর সেপ্টেম্বরেই বিপিন পালকে চার বছরের জন্যে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি ওখানে বসেই বাঙলার বিপ্লবকে জিইয়ে রাখতে পারেন।

গুপ্ত সমিতির কর্ম্মীদের ধরাপড়া প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার নিজমুখে

স্বীকার করেছেন, প্রায় দেড় বছর "যুগান্তর" চালিয়ে হঠাৎ যখন সেটিকে তাঁরা অন্য দলের হাতে দিয়ে সরে পড়েন, তখন যুগান্তরে একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে দেশবাসীকে বারীন্দ্রকুমার জানিয়ে দিলেন, "একদিন যাহা কাগজে লিখিয়াছি, এইবার তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইব বলিয়াই আমরা একদল কাগজ হইতে বিদায় লইয়া চলিলাম।"

এর পরেই পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে এই দলের ওপর অকৃষ্ট হ'ল।

কাগজে স্বীকারোক্তিই হ'ল এই সমিতির প্রথম ভুল।

দ্বিতীয় ভুল হ'ল—৩২নং মুরারীপুকুর গার্ডেন রোডের বাড়িতে তাঁরা যখন আড্ডা গাড়েন, তখন একদিন একটি, কাল-বেঁটে-কুৎসিত চেহারার মিষ্টভাষী লোকের সঙ্গে এই বাগান বাড়ির কাছে অবিনাশের পরিচয় হয়। নাম তার রজনীকান্ত, বর্দ্ধমানের একগ্রামে লোকটার বাড়ি। অবিনাশের কাছে গুপ্ত সমিতির কিছুটা গন্ধ পেয়ে, তাকে সে ধরে বসল, গুপ্ত আড্ডায় রজনীকে নেওয়া হোক। সে, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে সব সময়ের জন্যে প্রস্তুত। অবিনাশ বারীন্দ্রের সঙ্গে রজনীকান্তের পরিচয় করিয়ে দেয়। বারীন্দ্র কুমার মিনিট পনের তার সঙ্গে কথা ব'লে বুঝে ফেললেন, সে কি চিজ। তারপর তাকে বললেন, "আমাদের কোন তো আড্ডা নেই! তবে ভবিষ্যতে হ'লেও হ'তে পারে; তখন দেখা যাবে।" লোকটি ছিল গোয়েন্দা। গাঁজাড়ী বলেই এঁরা লোকটিকে ভুল করে ছিলেন।

মুরারীপুকুরে, বড়-ছোট বাগানের নেই কমতি। তারই সুযোগ নিল গোয়েন্দা পুলিস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে ৩২ নম্বর বাগানটির ওপর।

গুপ্ত সমিতির কর্ম্মীরা ধরা পড়ার মাস কয়েক আগে ঠিক এই বাগানের পাশের বাগানটিতে, এঁরা লক্ষ্য করলেন, একদল লোক রোজ ব'সে আড্ডাদেয়-হল্লা করে। এঁরা মনে-মনে ভাবলেন,

লোকগুলো জুয়াড়ী নিশ্চয়! পুলিসের তাড়া খেয়ে সহর থেকে পালিয়ে এসে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গেড়েছে। গাঁজা-মদ খেয়ে নিরিবিলিতে আমোদ স্ফূর্তি করছে। আসলে যে ওটি গোয়েন্দা পুলিশের আড্ডা তা এঁরা বুঝতে পারেননি কেউ। তখন সজাগ হ'লে ধরা পড়তে হ'ত না কাউকেই।

যে রাত্রি শেষে এঁরা গ্রেপ্তার হন, সেই রাত্রিতেই, তখন আন্দাজ দশটা হবে, বিটের একজন ভোজপুরী হেড কন্‌ষ্টেবল রোঁদে বেরিয়ে, বাগানে এসে ঢুকে পরেশকে সামনে পেয়ে কড়া ভাষায় প্রশ্ন করল—"তোমরা এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানের ভেতর কি করছ? তোমরা এখানে দিন রাত্তির করই বা কি?"

পরেশ প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে না পেরে, প্রশ্নটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক'রে বললে, "কি আর করব! আমরা সাধু-ফকির, যোগ-যাগ করি।"

ভোজপুরী ব্যঙ্গ ক'রে বললে,—"তাই নাকি; সবাই সাধু-ফকির বনে গেছ? আবার যোগ-যাগও কর? বড় ভাল কথা। তোমাদের এখানে এলে দীক্ষা টিক্ষা মিলবে তো? গুরুজীকে ব'লে রেখো কালই আমরা আসছি!" তবে যাওয়ার সময়ে শাসিয়ে গেল এই এই ব'লে—"যোগ কর কি বিয়োগ কর, তা 'বোঝা যাবে' খন। টের পাবে শীগ্‌গির বেশী দেরী নেই।"

ভোজপুরীর, এক মুখে দু'রকম কথা শুনে পরেশের বেশ খটকা বাধল। পুলিসের আগমনের কথা দলের সকলের কানে তুলল।' কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পালাবার ব্যবস্থা কিছুই হ'ল না।

এই ব্যাপার ঘ'টে যাওয়ার পর কালবিলম্ব করা বিন্দুমাত্র উচিত হয়নি গুপ্ত সমিতির সদস্যদের পক্ষে! এর ওপর অরবিন্দের হুঁসীয়ারী তো ছিলই।

পুলিস এসে যখন শাসিয়ে গেল, তখন যত অসুবিধেই থাকুক না কেন, সেই রাত্রিতেই অন্ততঃ খানিক মাল পত্র দিয়ে কিছু লোককে

সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

ভগবান্ সম্ভবতঃ সেই ভোজপুরীকে তাঁর দূত হিসেবে পাঠিয়ে সুযোগ করে দিয়েছিলেন এদের কম না! কিন্তু সুযোগ নিল কৈ! গাফিলতির জন্যে শেষ পর্য্যন্ত বাগানের সব ক'জনকেই ধরা পড়তে হ'ল পুলিসের হাতে।

তৃতীয় সংকেতের সুযোগ পর্য্যন্তও এঁরা নিজেদের ভুলে একে একে হেলায় হারিয়ে জেলে গেলেন।

বুদ্ধিমান শ্রীশ ঘোষ কিন্তু অশনী সংকেত কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কারো কথায় কর্ণপাত না ক'রে এক রকম জোর ক'রেই কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে, সেই রাত্রিতেই সেখান থেকে চন্দননগর রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবান্ বরাবরই এই ভাবে শ্রীশকে বুদ্ধি যুগিয়েছেন, তিনি ও নিয়েছেন তার পূর্ণ সুযোগ স্থির মস্তিষ্কে।

শোনা যায় নরেনের পরম আত্মীয়, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী ইংরেজ সরকারের 'একজিকিউটিভ-কাউনসিলার,' গোপনে সরকারী মহলে কথা বার্ত্তা চালিয়ে, তাদের সঙ্গে একটা বোঝা পড়ায় এসেছিলেন, নরেন গোঁসাই এই মামলায় রাজ সাক্ষী হ'লে, মামলা শেষে সরকার নরেনের জীবনের নিরাপত্তার সমস্ত ভার নিয়ে তাকে ভারতের বাহিরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, যেখানে বিপ্লবীরা তার নাগাল পাবে না ; এসংবাদ নাকি নরেনের পিতা জেলখানায় নরেনের কানে পৌঁছে দিয়ে তাকে রাজসাক্ষী হ'তে পীড়া পীড়ি করে ছিলেন।

নরেনকে একথায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা ক'রেও যখন পিতা দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, এতে তেমন বিশেষ কোন ফল হ'লনা, তখন তিনি অন্য পথ ধ'রে এগোতে সুরু করলেন। যে কোন উপায়ে পুত্রের অব্যাহতি পেতেই হবে। এই হ'ল তাঁর সঙ্কল্প।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সুরু হ'ল।

নরেন্দ্রনাথ বাড়িতে, তিনটি-নাবালক শিশু সন্তানও রেখে এসেছে। এছাড়া সব থেকে বড় আকর্ষণ—সুন্দরী স্ত্রী।

দেবেন্দ্রনাথ জেলখানাতে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসে, পৌত্রদের কথা এবং বধূমাতার মানসিক বিকারের কথা জানিয়ে, বারংবার পুত্রের মনের মণিকোঠায় আঘাত হেনে, রাজসাক্ষী হওয়ার জন্যে পরামর্শ দিয়ে চললেন। তাতেও যখন কৃতকার্য্য হতে পারলেন না, শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন ; একদিন বধূমাতা এবং এক নাবালক পৌত্রকে এনে পুত্রের সমুখে উপস্থিত করলেন। বধূমাতা নরেনের মুখ থেকে কথা আদায় করল।

নরেনের পদস্খালন ঘটল। অকস্মাৎ তার স্কন্ধে যেন পিশাচের তাণ্ডব সুরু হল। কোন্ এক অকল্যাণকর হস্ত যেন তাকে হাতছানি দিতে লাগল। সে তখন নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। নিজেই বুঝল না সে কি করতে চলেছে আর এর বিষময় ফলই বা কি হতে পারে!

চুপি চুপি নরেন রাজসাক্ষী হতে রাজি হয়ে গেল ২৩শে জুন।

দলের মধ্যে থেকে সে ইংরেজ পক্ষে গুপ্তচরের কাজ সুরু ক'রে দিল ২৪শে জুন থেকে। সে যে বুদ্ধিমান ধীর স্থির তাতে নিঃসন্দেহ। তলে-তলে দলের গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে একটা বড় কিছু সর্ব্বনাশ ও হয়তো ঘটাতে পারত। চেষ্টা ও ছিল তাই। কিন্তু কাঁচা চাল দিতে গিয়ে সকলের সন্দেহ ভাজন হয়ে পড়ল। পুলিসের শেখান প্রশ্নগুলো বড় অদ্ভুত ধরণের, সহজেই বোঝা যায় এ তার নিজের প্রশ্ন নয় ; যেমন—'মহারাষ্ট্রের বর্ত্তমান বিপ্লবী নেতা কে'? 'মাদ্রাজের নেতা কে'? ইত্যাদি। হৃষিকেশ নরেনের এ চালাকী ধরে ফেলেছেন।

নরেন যখন স্নানে গিয়েছে, তখন বারীন্দ্র, হৃষিকেশ প্রভৃতি এক বৈঠকে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন, সে এমন কোন প্রশ্ন রাখলেই, কিছুটা চিন্তা ক'রে, তাকে গম্ভীর ভাবে ভুল ভাল নাম ব'লে দিতে হবে। স্থির হ'ল বলা হবে, মাদ্রাজের সভাপতি বিশ্বম্ভর পিলে আর

বোম্বাইয়ের—পুরুষোত্তম নটেকার।

নরেন ফিরে এসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হৃষিকেশকে পুনরায় সেই প্রশ্ন করল।

হৃষিকেশ তখন গামছা কাঁধে ফেলে স্নানে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত। বললেন,—'এইতো মনে পড়েছিল! আচ্ছা দাঁড়াও আবার চিন্তা ক'রে দেখি! বারীনদাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো ঝট ক'রে বলে দিতে পারেন!'

বারীন্দ্র সেই সময়ে সেই ঘরেই ছিলেন। কথাটা তাঁর কানে যেতেই বললেন, 'হৃষিকেশ তোমার অবশ্যই জানা উচিত ছিল। পুনায় আছেন পুরুষোত্তম নটেকার আর মাদ্রাজে বিশ্বম্ভর পিলে।' নরেনকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, 'নরেন! ভবিষ্যতে এমন কোন প্রয়োজন হ'লে আমাকে জিজ্ঞেস কোর, সঠিক জবাব পেয়ে যাবে। হঠাৎ এঁদের নামে তোমার এখন কি প্রয়োজন হ'ল?'

নরেন বললে—'না তেমন কিছু না। নেতা কিনা তাই নাম দুটো জানার আমার খুব ইচ্ছে হ'ল?'

—'এই কথা? তা বেশ—তা বেশ'।

॥ তিপান্ন ॥

পুরোদস্তুর ধর পাকড় চলেছে।

চন্দননগর বিপ্লব সমিতির বৈঠক বসল, চুঁচুড়া ষ্টেশনের কাছে আমবাগানে। গুপ্তসভায় এসেছেন, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ আর সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাগ্নে বাবুরাম পরারকর। সকলে একবাক্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, বিপ্লবাত্মক কাজ এক পাও পেছুতে দেওয়া হবে না।

কাজ তাঁরা এগিয়ে নিয়ে চললেন।

কানাইলালের মা খবরের কাগজে দেখলেন, ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদসাধনে ব্রতধারী আরও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কানাই গ্রেপ্তার হয়েছে।

তিনি বাড়ির সকলকে বললেন,—"কানাই তো চাকরী করতে গিয়েছে! সে নিশ্চয় নিরপরাধ। তার মুক্তির জন্যে আমি একটুও চিন্তা করি না!"

বোমার মামলায় কানাইলালের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। সাধারণের চোখে সে যেন কত ভাল মানুষ।

এই মামলার আসামীদের সঙ্গে যথারীতি আদালতে এসে হাজির হত। কোর্ট শেষে জেলে ফিরে গিয়ে চুপচাপ 'বিশ্রাম করত'। বেশ কটা দিন তার এই ভাবেই কেটেছিল।

আদালত এই মামলার সব রকম জামীন মঞ্জুরী স্তব্ধ করে দিয়েছিল। অবৈধ ব'লে ঘোষণাই ক'রে দিল।

শেষে এ পক্ষের বহু চেষ্টার পর, আদালত ঘোষণা করল ঐ মঞ্জুরী (শাসন) বৈধ।

ঠিক এর পরেই অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণজীবন, নরেন্দ্র বক্সী আর কানাইলাল দত্তের তরফে নতুন করে জামীনের আবেদন পেশ করা হ'ল।

বোমার মামলা থেকে এখনও তো এরা বাদ পড়েনি—এই যুক্তিতেই সকলের পক্ষের আবেদন একজোটে নামঞ্জুর হ'ল।

। চুয়ান্ন ।

ফিস্ ফিস্ কাণাঘুসা স্থুরু হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে। দলের সকলেই একে একে নরেনকে সন্দেহের চোখে দেখতে স্থুরু করেছে।

উপেন্দ্রনাথ একদিন কানাইকে বললেন, "তোমার তো অনেক জাপানী যুযুৎস্থর পেঁচ-পুঁচ জানা আছে, তা'ছাড়া ঠোঁসা-ঠুঁসি দিতে তো ভালই জান! ফিরিঙ্গী পেটান অভ্যেস তো আছেই তোমার। দাও না হারামজাদাকে বুঝিয়ে যাতে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারে। দেহের ওপর কিছু প্রকাশ না পেলেই চলবে!"

উপেন্দ্রের কথায় কানাই বিনয়ের ভাব দেখিয়ে তখনকার মত একটু মুচকি হাসল। মাথার ভেতর সঙ্গে সঙ্গে খেলে গেল নরেনকে কেমন দাওয়াই দিতে হবে। তবে চুপ চাপ রইল সে।

প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল, কবে কখন কি উপায়ে অপ্রকাশ্যে।

একদিন বড় ঘরখানিতে সকলে মিলে একত্রে উল্লাস, হট্টগোল, হুড়োহুড়ি, মারামারি, ধস্তাধস্তি স্থুরু ক'রে দিল। আসর যখন বেশ জমে উঠেছে, ভীড়ের মধ্যে পেয়ে কানাই, নরেনকে বেশ কটা 'আণ্ডার হ্যাণ্ড' ঝাড়ল। এই সময়ে উপেনও ওপর থেকে দু'চার ঘা দিয়ে দিলেন।

'বাপরে-মারে, মরে-গেছিরে মরে-গেছিরে' ক'রে নরেন কাতরাতে কাতরাতে মেঝের ওপর পড়ে ছট্ফট্ করতে লাগল।

কি হ'ল? কি হ'ল? ক'রে সকলেই যেন কত ব্যস্ত। কেউ লোহার থালি দিয়ে বাতাস দিতে লেগে পড়েছে। কেউ দিচ্ছে তার মুখে জলের ঝাপটা। কেউ বলছে, 'জমিদারের ছেলে ননীর শরীর নিয়ে এ হুড়োহুড়ির মধ্যে না এলেই ভাল করতে'!

ধরা ধরি করে সকলে তাকে কম্বলের বিছানায় শুইয়ে দিল।

জেলে সাধারণ কয়েদীর জন্যে এই তো শয্যা ব্যবস্থা। বিছানা বলতে কম্বলই, সম্বল।

একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই নরেন, সোজাসুজি জেলারের কাছে গিয়ে নালিশ-ফরিদ রুজু ক'রে দিল—দলের কারো কারো নামে। ঘটনাটা সব ব্যক্ত করাতে জেলার পরিষ্কার তাকে বললেন, "ঐ হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে আপনি না গেলেই ভাল করতেন। এই ইস্যু নিয়ে এদের নামে আমার কোন রিপোর্ট করাও সম্ভব নয়। আপনি বরং এক কাজ করুন! ওদের মধ্যে থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও থাকুন। তা যদি চান, আপনাকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি"।

নরেন বললে, "দয়া করে তাই করুন দেরী না করে, তা না হলে এরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

সেইদিনই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

এইবার নরেনের ভেতর প্রতিহিংসার ভাবটা বেশ দানা বেঁধে উঠল। পুরোদস্তুর সে রাজসাক্ষী হয়ে দাঁড়াল। কোর্টে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রকাশ্যে অনেক এলেমেলো জবানবন্দী দিয়ে চলল। বারীন ঘোষ, পুলিসের কাছে তার নাম করে দেওয়ায় দলের ওপর আগে থেকেই তার রাগ।

ম্যাজিস্ট্রের তার কথাগুলো সবই নথীভুক্ত করেন।

নরেনের এই সত্যি মিথ্যে মেশান জবানবন্দীতে দলের সকলে আশ্চর্য্য, অবাক হয়ে যান। ক্রোধে কেউ কেউ কটূক্তি করতে থাকেন।

হট্টগোল থামাতে গোমড়া মুখ বার্লি মাঝে মধ্যে কটা চোখ দুটো বড়-বড় করে চেয়ে ধমক দিয়ে ওঠেন।

তবুও এরা হৈ চৈ করতে থাকে, লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘরটার মধ্যে ব'সে। ম্যাজিস্ট্রেটের ধমকে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই!

অতিষ্ঠ হয়ে শেষে বসে থাকা কোর্ট অবজ্ঞাকারীদের সাস্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন বার্লি সাহেব।

জুতো পায়ে কোর্টে ঢোকা এদের প্রথম থেকেই বন্ধ। বিশ্বাস করতে পারে না শাসককুল এই বিদ্রোহী দলকে—কখন বা তাদের পাদুকা এসে বার্লির মাথায় পড়ে এই আশঙ্কায়।

মামলার তদন্ত চলেইছে।

মাণিকতলা বোমা মামলায় দ্বিতীয় তালিকায় ধরা পড়ে প্রধান প্রধান আরও কজন এসে খোঁয়াড়ে ঢুকেছেন। এসেছেন—দেবব্রত বসু। নাগপুরের বালকৃষ্ণ হরিকাণে, ইন্দ্রনাথ নন্দী, প্রভাস দেব, বিজয় ভট্টাচার্য্য, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী),* নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক আগেই এসেছেন চন্দননগরের অধ্যাপক চারুরায়।

তখনও গ্রেপ্তারের বিরাম নেই। বার্লির কোর্টে মামলা চলছে। পুলিসি তৎপরতা বেড়ে গেছে, যাকে যেখানে পাচ্ছে ধরে এনে এই মামলায় আসামী করে জেলে ভরছে। এলেন কৃষ্ণজীবন সান্ন্যাল, তাঁর সঙ্গে আরও কিছু। মেদিনীপুর জেল থেকে চালান হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এলেন এই মামলায় জড়িয়ে।

দেখতে-দেখতে জেলের তিন নম্বর ওয়ার্ড উপচে গেল।

এক ফাঁকে গ্রেপ্তার হয়ে এলেন পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। সঙ্গে এল এক দঙ্গল ছেলে ছোকরা। প্রভাস দে ও এলেন।

ভীড়ের ঠেলায় এখানে থাকা অসম্ভব হল। এখান থেকে তল্পী তল্পা গুটিয়ে সকলকে যেতে হল এক নম্বর ওয়ার্ডে, দু'একজন বাদে।

* বারীন ঘোষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে এঁকে এবং সত্যেনকে দল থেকে, অরবিন্দ বিতাড়িত করেছিলেন।

॥ পঞ্চান্ন ॥

এক নম্বর ওয়ার্ড। মস্ত একখানা হল ঘর দু ভাগে ভাগ করা। ঘরখানার সামনে-পেছনে দু সারিতে অনেকগুলো দরজা প্রমাণ জানালা, বলাই বাহুল্য—মোটা-মোটা লোহার গরাদ লাগান। এক পাশে ঘরে ঢোকার মাত্র একটি দরজা, তাতেও ঐ লোহার শিকের আচ্ছাদন। তার ওপর দেওয়ালের ভেতর থেকে হুড়কা, দেওয়ালের ভেতরেই তালা পড়ে। জানালাতে দু খানা করে কাঠের পাল্লা ঝোলান, তাও আবার মাথার দিকটাতে এড়োএড়িভাবে ফুট দুয়েক নেই। রাত্রিতে জানালা, ভেতর থেকে বন্ধ থাকলে লকআপ করা কয়েদীদের ওপর বাইরে থেকে, ডিউটি ওয়ার্ডারের ঘরের ভেতর নজর রাখার জন্যে জানালার ঐ মস্তকহীন অবস্থা। জানালা খুলে রাখলে ঘরখানিতে আলো বাতাস প্রচুর। ঘরটির মাঝে লম্বালম্বি আর্চকরা ইটের পার্টিসান। জানালার সামনাসামনি পথ এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার। পার্টিসানের এপাশে-ওপাশে, দুই জানালার ফাঁকে ফাঁকে ইট-সিমেন্টে গাঁথা চারটে করে প্রমাণ মাপের—আড়াই ফিট উঁচু আড়াই ফিট চওড়া এবং ছ ফিট লম্বা শোয়ার জায়গা (Masonry bed) প্রতিটি কয়েদীর জন্যে আলাদা আলাদা। পেছনকার ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণের শেষ জানালাটিতে কেজ-ল্যাটরিন।

ঘরের সম্মুখে অদূরে এক নম্বর কিচেন। সাধারণ কয়েদীদের জন্যে রান্নাবান্না হয় এখানে। ওয়ার্ডের পেছনে একটু দূরে বেশ বড় একটি পুষ্করিনী। ঘরের কোল ঘেসে লম্বা বাঁধান রাস্তা। তারই গায়ে পনের গজ লম্বা সরু-নীচু-বাঁধান, একটা স্নানের চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চা ঠিক বলা যায় না। যেন, জল নিকাশের বড় একটা নালী। নালীটির দুটি পাশেই আড়াই ফিট চওড়া করে সিমেন্ট বাঁধান প্লাটফর্ম। এরই

ওপর দু সারিতে বসে কয়েদীরা খাওয়ার জলের বাটি করে জল তুলে মাথায় ঢালে; তাও দিনে একবার। জলের ট্যাপ লাগান আছে চৌবাচ্চাটার এক মুড়'য়। প্লাটফর্মের গা বরাবর নীচুতে সরু নালী, নোংরা জল বেরুনোর।

এই এক নম্বর ঘর থেকেই পরিষ্কার দেখা যায় রন্ধন যজ্ঞশালা। বিরাট একখানা লোহার কড়াইয়ে দু'হাজার কয়েদীর জন্যে তরকারী রান্না হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কয়েদী—পাচকরা দুদিক থেকে বৃহদাকার খুন্তী প্রহার করছে মাঝে মাঝে তরকারীগুলোর দেহে। পাশেই লম্বা টেবিলের মত লোহার বড় বড় খুটোওয়ালা চেম্বারে বৃহদাকার তিনটি লোহার ডেগে ভাত-ডাল রান্না হচ্ছে। সেটির খাঁজের মধ্যে ডেগ তিনটি টাইট করে বসান। চেম্বারের একপাশের ছাদটায় কোয়াটার ইঞ্চি পুরু কাছিম পীঠে লোহার প্লেট মারা—পাঁচ ফিট লম্বা, চার ফিট চওড়া। তারই ওপর একবারে পনের বিশখানা রুটি সেঁকা হয়, প্রয়োজনে আরও বেশি। চেম্বারের গা ভেদ করে বেরিয়েছে এয়া মোটা এক লম্বা পাইপ—সোজা দোতলা উঁচুতে উঠে গেছে—কাঁচা কয়লার ধোঁয়া নিকাশের লোহার চিম্নী। গবগবিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটার মুখ দিয়ে। বলিষ্ঠ পায়া লাগান দু'খানা লম্বা-চওড়া টেবিল পাশেই পড়ে আছে। তার একখানির ওপরে দু কিনারায় ছ'খানা করে, বারোখানা বড় ফলকের ইসপাতের বঁটি বসান সমান ব্যবধানে; চেন দিয়ে সব কখানি টেবিলের সঙ্গে শৃঙ্খলিত। তরকারী কোটা হয়েছে সেগুলোতে। দ্বিতীয় টেবিলটার ওপর অ্যালিউমিনিয়ামের পাত মোড়া। নিডিং মেসিনের চল হয়নি তখন জেলখানায়। তাল-তাল আটা ছেনে রুটি বেলছে এটার ওপর চৌকার কয়েদীরা। কাছেই একটা বৃহদাকার জালের ঘর; ফ্লাই প্রুফ নেট দিয়ে মোড়া। রান্না হয়ে গেলে খাবার জিনিষগুলো এনে রাখা হচ্ছে এখানে। এক কোণাতে বসান মস্ত কাঁধা উঁচু লম্বাচওড়া গ্যালভানাইজড্ ট্রের ভেতর ভাতগুলো ঢেলে বিছিয়ে

দিয়ে ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। রন্ধন পর্ব্বের সব কিছুই হচ্ছে, রন্ধনশালার চারদিক খোলা উচু পাকা ছাদটার নীচে। বড় বড় রুই-কাতলা মাছগুলোর আঁশ ছাড়ান হচ্ছে কাঠের কুঁদো দিয়ে। আবার চার দিনের দিন একটা বাঁশের খ্ঁটির গায়ে ছাল ছাড়ান পাঁঠার কয়েকটা মস্তকহীন দেহ টাঙ্গিয়ে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে চৌকার (বলা বাহুল্য হিন্দু-মুসলমানের, ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় রন্ধন ব্যবস্থা)। ভারপ্রাপ্ত কয়েদীরা অনেকে, এগুলোকে টুকরো টুকরো করবে। এ এক অভিনব ব্যবস্থা। এর কোনটিই নজর এড়ায় না ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। জেলে এসে এই সব নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা জন্মাচ্ছে এদের।

॥ ছাপান্ন ॥

কানাইলালের মায়ের কাণে এসে পৌছাল, নরেন গোঁসাই রাজ-সাক্ষী হয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি ক্রুদ্ধ মনোভাব নিয়ে বলেই ফেললেন, "ছি, ছি, এমন কি একজনও দেশে নেই যে, এই নরাধমকে ইহ জগৎ থেকে সরিয়ে দেয়।"

কে জান্‌ত, মায়ের এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি কানাইলালের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌছে দিয়েছিল—সকলের, এমন কি কানাইয়ের বাহ্যিক জ্ঞানের অজ্ঞাতসারে।

সি. এম. ও ডাক্তার ডয়েলীর কৃপায় জেল কর্ত্তৃপক্ষের কড়া নজর ক্রমে ক্রমে মাণিকতলা বোমার মামলার আসামীদের উপর বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমার্সন এঁদের অনেক বিষয়ে অনেক কিছু সুবিধে করে দিয়েছেন। প্রধান হ'ল একত্র সকলে বসবাস। হৈ হুল্লোড় গল্প গুজবে দিব্বি দিন কাটাতে লাগলেন এঁরা। তারপর যখন এঁদের জানান হ'ল, অফিস ঘরের টেবিলে ব'সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা ক'রে কথা কইতে পারবেন, তখন তো সকলে হাতে স্বর্গ পেলেন। এইভাবে দেখা হওয়ার সুযোগ মেলায়, বাহিরের অনেক খবর আসা যাওয়া করতে লাগল।

ফল-পাকড়, মাছ-মাংস দিনের দিন এত প্রচুর পরিমানে আসতে লাগল, যা এঁরা খেয়েই ফু'রতে পারেন না, এতেও কোন মানা নেই। জেলের অফিসের বাবু থেকে সুরু করে বন্দীদের ভেতরও সেগুলো বিলি করা হ'তে লাগল। দেখা করার সময় কেউ কাঁচা মাছ, মাংস এনে দিলে রন্ধনপটু হেমচন্দ্র সেখানিকে নিয়ে, এক নম্বর কিচেনে ছুটে

গিয়ে দিবিব মুখরোচক ক'রে পাকিয়ে আনেন। টিপ্‌সের সাহায্যে সব কিছু জটিলতাই দূর হয়ে যায়।

কোর্টে গিয়ে টাকা পয়সা সংগ্রহ ক'রে আনতেও তেমন কিছু অসুবিধে হয় না। পুলিস জানে, সেও দু'চার আনা ভাগ পাবে, কাজেই লেনদেনের সময়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কোর্টের শেষে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলবার সময়ে তার হাতে কিছু গুঁজে দিলেই সেও সন্তুষ্ট।

জেল গেটে ফেরার পর এখানেও সার্চ্চের নেই কোন বালাই।

আবার চৌকার মেটকে কিছু দক্ষিণা দিলেই, পাহারাওয়ালার হাতে ভালটা-মন্দটা মাঝে মধ্যে জুটে যেত ঘরে বসেই।

পঞ্চানন তর্করত্ন যেমন-তেমন পণ্ডিত নন! চারদিকে নাম ডাক। বড্ডই গোঁড়া। স্বপাক খান; এর ওপর আবার গঙ্গা জল ছাড়া তাঁর রান্নাই চলে না। নিরুপায় হয়ে জেলারবাবু পুকুর পাড়ে গাছতলায় খান কয়েক ইট দিয়ে উনুন তৈরী করিয়ে, তাঁর সেখানে রান্নার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। হলে কি হয়, গঙ্গাজল ছাড়া যে তাঁর কোন কাজই চলে না। গঙ্গা জলে-রান্না, গঙ্গাজল-খাওয়া, এতো তিনি আজীবন ক'রে আসছেন; এটি না হলে তিনি আহারাদি কিছু করবেন না, স্পষ্ট করেই কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন।

ক'লকাতার গঙ্গাজলকে দূষিত ভেবে ইমার্সন সাহেব প্রথমটায় কিছুতেই রাজি হ'তে পারলেন না, শেষে পণ্ডিত মশায়ের এক-গুঁয়েমিতে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে জেলারের পরামর্শে তাঁকে গঙ্গাজলের ব্যবস্থা করতে রাজি হতেই হ'ল। এক কলসী গঙ্গাজল তর্করত্ন মশায় প্রত্যহ পেতে লাগলেন। এ উৎপাত অবিশ্যি জেলখানাকে বেশিদিন সহ্য করতে হ'ল না, প্রমাণাভাবে বার্লিসাহেব তাঁকে অব্যাহতি দেওয়াতে সকলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নেহাৎ এদের বরাত জোর বলতে হবে, না হ'লে ভাটপাড়ার বামুন কি যে অনর্থ ঘটিয়ে বসতেন কে জানে!

॥ সাতান্ন ॥

মজঃফরপুব সেসানস্ কোর্টে ক্ষুদিরামের বিচার চলছে। এজলাসে লোকে লোকারণ্য। ভারতবাসীদের মধ্যে জনাকয়েক বিদেশীও মামলা শুনতে এসেছেন। নীলকুঠীর সাহেব এঁরা।

বিচার শেষ হয়ে গেছে।

জজ রায় দেবেন।

ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসীর হুকুম হ'ল।

একজন সাহেব তাঁব পাশে দাঁড়ান, এক যুবক দর্শককে প্রশ্ন করলেন—"Are you a Bengali youth ?"

যুবকটি উত্তব দিল—"Yes".

সাহেব বললেন—"Then, try to follow the footsteps of your brother."

কথা কটি সেবেই অশ্রু সজল চোখে সাহেব এজলাস ছেড়ে চলে গেলেন।

অনেক দিন আগেই বাঙলায় তথা ভারতে বিভিন্ন নামে কয়েকটি বিপ্লবীদল গ'ড়ে উঠেছে।—'যুগান্তর,' 'আত্মোন্নতি,' 'অনুশীলন' কোনটিই কম যায় না।

জেলের ভেতর বিপ্লবীদের সুযোগ সুবিধের অন্ত নেই। জেল কর্ম্মচারীদের সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধন বেশ দানা বেধে উঠেছে। এখন আর এদের পায় কে !

বারীন ঘোষের মাথায় এক নতুন পরিকল্পনা আশ্রয় নিল।

কি ভাবে জেল ভেঙ্গে পালান যায়, ঐ চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছেন। জেলে বসেই গোপনে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সুরু করে দিলেন। কোর্টে গিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির ক'রে ফেললেন, দশ বারটি রিভলবার বাহির থেকে সংগ্রহ করে একে একে জেলের মধ্যে আনান হবে, তারপর জেলের বিশেষ কোন কর্ম্মচারীকে কৌশলে বা উৎকোচে বশীভূত করে জানালার গরাদ কেটে অথবা ওয়ার্ডের তালার ডুপলিকেট চাবির সাহায্যে বাইরে এসে সমুখের কিচেনের অদূরে পায়খানার ছাদের সঙ্গে বাইরের শেষ উঁচু প্রাচীরটাতে তক্তা লাগিয়ে জেল টপকে রাস্তায় পড়ে, সেখানে মোটর গাড়ির যে ব্যবস্থা থাকবে তাতে ক'রে টানা মধ্যপ্রদেশ পাড়ী কিম্বা সোজা গিয়ে কোন পাহাড়ের গুহায় ঘাঁটি তৈরী করা হবে। জেল ভেঙ্গে কোনক্রমে বের হতে পারলেই হ'ল। ব্যাস্, আর চিন্তা থাকবে না। প্রয়োজন হলে পাহাড়ের আড়াল থেকে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে ইংরেজ রাজশক্তিকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলা হবে।

জেলখানার এক ডাক্তারের সহায়তায় দরজার তালাচাবির মোম ছাপও নেওয়া হয়ে গেল।

জেল থেকে পালান প্রসঙ্গে বারীন নিজেই লিখেছেন...."সকালের বন্দোবস্তে আলিপুর জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না।... জেলের মানুষটিকে রাজী করান হইল। শুভকার্য্যের রাত্রে সে যোগাড় যন্ত্র করিয়া আপন মনের মানুষ দু'চার জনকে পাহারায় রাখাইবে। আমরা মোম আনাইয়া ব্যারাকের চাবির ছাঁচ লইবার চেষ্টা করিলাম।..."

এই পালানর ব্যাপার নিয়ে দলের লোকেদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা সুরু হয়ে গেল।

শেষ পর্য্যন্ত দু'চারজন ছাড়া সকলেই মুক্তিযজ্ঞের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন; রাজী হয়ে গেলেন বারীন্দ্রের প্রস্তাবে।

সত্যেন, কানাই, হেমচন্দ্র এবং আরও দুটিতে আলাদা ভাবে জোট

বাঁধলেন। এঁরা যা করেন বারীন্দ্রকে তা জানতে দেন না। কারণ এঁদের ধারণা হ'ল বারীন্দ্রের আর মতি স্থির নেই, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাঁদেরও বুদ্ধিভ্রম ঘটেছে, অতএব নিজেদের কথা তাঁদের জানালেই সব পণ্ড হবে। এঁরা বেশ লক্ষ্যও করছিলেন, একের পর এক বারীন্দ্রের মত পরিবর্ত্তন। পুলিসের কাছে তাঁর প্রথম স্বীকারোক্তিতে বিপ্লবকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা; এইসব কাণ্ড করার পর আবার তাঁরই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে বিপ্লবী দল গঠনের যুক্তি। তারপর সব শেষের যুক্তিটাই এদের আরও অদ্ভুত মনে হ'ল—জেল ভেঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ নিধনের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা এঁদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ঠেকল আর অসম্ভব বলেও বোধ হ'ল।

নরেন গোঁসাই এখন পুরোদস্তুর রাজসাক্ষী। নানারকম সত্যি-মিথ্যে এজাহার দিয়ে বহু নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করতে লাগল। এর কথার উপর নির্ভর করে পুলিশ ছুটছে দিকে দিকে—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মু. পাড়াও আরও কয়েক জায়গাকার বেশ কিছু লোককে পাকড়াও ক'রে এনে এই খোঁয়াড়েই পুরতে লাগল: রাজা-জমিদাররাও বাদ পড়ল না।

কোর্টে যারা বিচার দেখতে আসে নরেনের কীর্ত্তি দেখে তারাও অবাক্ হয়—লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে? বাইরে এসে নিজেদের মধ্যে ঐ প্রশ্ন ঐ একই আলোচনা। ঘৃণায় বিশ্বাসঘাতকের উদ্দেশ্যে যার মুখে যা আসে সে তাই বলে কটূক্তি করতে থাকে।

দিনের পর দিন ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে অভিযোগ যুগিয়ে নরেন গোঁসাই সরকারী নথীপত্র ভরে দিয়েছে। বিপ্লব সমিতির কার্য্যকলাপের সত্য মিথ্যা সংবাদ তো সে আগেই লিখিয়ে দিয়েছে।

২৫শে জুন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গতেই সে স্থির করল আজ বার্লি সাহেবকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে, বিপ্লবীরা কে কিভাবে সমিতির

সঙ্গে জড়িত। এছাড়া আজকেই সে তার সব থেকে ভ্যালুয়েবল ডিপোজিসন রেকর্ড করাবে এই মঞ্চে অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা কি ছিল। সে দেখবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ঠেঁকে। তাকে, বারীন ঘোষের ধরিয়ে দেওয়ার ফল সকলে বুঝতে পারবে।

কোর্ট সুরু হয়েছে। বার্লি সাহেব বিচারকের আসন জাঁকিয়ে বসেছেন। বিপ্লবীরা খাঁচার মধ্যে জটলা করছেন। দু'পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টার, সরকারী বে-সরকারী অনেকেই উপস্থিত।

নরেন গোঁসাইকে এনে কাঠগড়ায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশ হেফাজতে। প্রত্যূষে সে যা চিন্তা করেছিল, ঠিক সেই ভাবে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে চলেছে।

বার্লি নিজ হাতের কলমে তা রেকর্ড করছেন।

অরবিন্দ ঘোষের নামটা যেই ও জড়িয়েছে, তখনই কানাই, সত্যেন আর তাদের ঐ তিনজন সতীর্থের মুখ রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে উঠল, দাঁতের ঘর্ষণে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে ফেলল তারা। জ্র কুঁচকে বজ্র কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করল। যে কোন উপায়ে জেলের মধ্যেই শয়তানকে যত শীগ্‌গির পারা যায় শেষ করে ফেলবে। বেশী দিন বাঁচতে দিলে সে অনেক ক্ষতি করবে। সেসনসে কেস ওঠার আগেই হতভাগাকে শেষ করতে হবে!

২৬শে জুন দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের দিন মতিলাল এসেছেন জেল-খানায়, কানাইলালের সঙ্গে দেখা করতে।

গোপনে কানাইলাল মতিলালকে অনুরোধ করলে অন্ততঃ দুটি রিভলবার জেলখানার ভেতর যে কোন উপায়ে তার হাতে পৌঁছে দিতেই হবে। শ্রীশচন্দ্রকে বলা আছে, তার সাহায্য নেবে প্রয়োজন হলে। শ্রীশ কথা দিয়েছে, এরা সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছে; নরেনকে বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দেবে যে কেউ হোক।

মতিলাল রাজী হলেন কিন্তু দুটি রিভলবার তাঁর সন্ধানে ছিল না।

তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

শ্রীশ ঘোষ, নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়টিও সংগ্রহ করে ফেলল।

শ্রীশ, কানাইয়ের ভাই পরিচয় দিয়ে জেলে এর আগেই তার সঙ্গে একবার দেখা সেরে এসেছে। দেখা শেষে মতিলাল উঠব উঠব করছেন। কানাই বললে, "দেখ মতিদা! একটা কথা! বিশেষ করে চিন্তারও বিষয়! ব্যারিষ্টার দাসেরও তাই মত। নরেনের ক্রশ এগজামিনেসন হয়ে গেলেই সর্ব্বনাশ হবে, তখন আর কোন চারা থাকবে না। একমাত্র নরেনের এভিডেন্স ছাড়া গুরুজার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। জজ কোর্টে হিয়ারিংয়ের আগেই নরেনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমরাই জেলের ভেতর সে কাজটা সারব। সম্ভবতঃ আমিই আর কেউ একজন কাজটা শেষ করব।

মতিলাল চমকে উঠলেন।

—চমকাবার কিছু নেই। দিতে পারবে কিনা? করে দেবে? আজ—এখন—এইখানেই কথা দিয়ে যেতে হবে। দেরী করবার সময় নেই।

—আমার সন্ধানে যেটা আছে, সেটা দু এক দিনের মধ্যেই পাবে কথা দিচ্ছি।

—তা হলে যাও। দেখো, দেরী না হয়! শ্রীশকে মনে করিয়ে দিও বুঝলে! যাও।

॥ আঠাশ ॥

সরকারের সঙ্গে মামলায় যুঝতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

ওদিকে সরোজিনী দেবী অর্থসাহায্য চেয়ে দেশের লোকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

এই আবেদন বহু ভারতবাসীর মর্ম্মস্পর্শ করল। যে যা পারলেন তিনি তাই পাঠালেন। এমন কি বিদেশ থেকে, থোকে থোকে টাকা আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ যোগ সাধনায় বসেছেন।

আধ্যাত্ম শক্তি সাধক অরবিন্দের অন্তরাত্মা থেকে কোন্ এক মহাশক্তি যেন আদেশ করল—"তরুণ উদীয়মান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসকে তোদের পক্ষে কৌসুলি নিযুক্ত কর। দেখবি জয়লাভে চিন্তা থাকবে না। তার কাছে লোক পাঠিয়ে দে।"

বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার মামলা চালাচ্ছেন, টাকাও নিচ্ছেন। লোয়ার কোর্টে মামলা প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন মকর্দ্দমা যাবে সেসন্‌সে। কে ছাড়া পাবে, কে দায়রা সোপর্দ্দ হবে, কেউ তা বুঝতে পারছেন না খামখেয়ালী বার্লি যে কি করবেন?

মতিলালের সন্ধানে যে রিভলবারটি ছিল সেটিকে সংগ্রহ করে তিনি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে চন্দননগর থেকে নিয়ে এলেন ক'লকাতায় জর্জ হেণ্ডারসন কোম্পানার অফিসে। এইখানেই তিনি চাকরী করেন। অতি গোপনে সেটিকে গুলী সমেত দেরাজের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে চাবি বন্ধ করলেন।

খবর দেওয়া ছিল। এসে হাজির হলেন, চন্দননগর গোঁদল পাড়ার বসন্ত বাঁড়ুয্যে।

বসন্তকে অফিস ঘরে ঢুকতে দেখেই, মতিলাল চেয়ার ছেড়ে উঠে হন হন করে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। বন্ধুর পিঠে একখানা হাত রেখে বললেন "চল বাইরে যাই"।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে উভয়ের অনেকক্ষণ ধরে ফিস্ ফিস্ করে কথা হ'ল।

কিছু পরে বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে এলেন মতিলাল। পাশের একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, দেরাজ ঘেঁসে তাকে বসালেন। পকেট থেকে চাবি বার করে দেরাজটা খুলে দিলেন।

কাল থেকেই টেবিলে কিছু কাজ জমে আছে। তাড়াতাড়ি করে সারতে লাগলেন।

ফাঁক মত বসন্ত সেটিকে বার করে নিয়ে গায়ের চাদর খানার নীচে লুকিয়ে ফেললেন।

অফিসের ঘর থেকে মতিলাল সরে এলে, বসন্ত নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

ঠিক হয়েছে নতুন একটা উপায় বার করে পরদিনই সেটিকে কানাই বাঁড়ুয্যের হাতে জেলে পৌঁছে দেওয়া হবে, তাহলেই কানাই সেটিকে নিজের হেফাজতে পেয়ে যাবে। বসন্তকেই কাজটা করতে হবে।

কাজের আগে কোথায় সেটিকে লুকিয়ে রাখা হবে সে ব্যবস্থা কানাইলাল আগে থেকে স্থির করে রেখেছে।

এমন কি উপায় থাকতে পারে যার দ্বারা সহজে বিনা সন্দেহে আগ্নেয়াস্ত্রটাকে জেলের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে সেই চিন্তাতে বসন্তের রাতে ঘুম নেই। অনেক মতলবই মাথায় আসছে কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হচ্ছে না। গভীর রাত্রিতে শোয়ার ঘরে

পাইচারি করতে করতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি তার মাথায় এসে গেল— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি! একটা উপায় আছে! সেদিন দেখে এসেছি, খাওয়ার জিনিষগুলো জেল কর্তৃপক্ষ তেমন পরীক্ষা করে দেখে না। একটা পাকা কাঁটালের মধ্যে করে রিভলবারটা দিলে কেমন হয়? উপেন বাঁড়ুয্যে, সোজা সেটিকে তাদের ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। সামান্য ইশারা দিলেই সে বুঝে নেবে।'

ভোর হতে না হতেই বাজারে ছুটল বসন্ত। ভাল দেখে একটা পাকা কাঁটাল এনে সোজা সেটিকে নিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিল। খুব সন্তর্পণে কায়দা করে ধারাল একখানা ছোরা দিয়ে ভেতর থেকে বোঁটাটাকে বার করে ফেলল, ছোরা ঢুকিয়ে কুরে কুরে রিভলবারের জায়গা ক'রে ফেলল। কাগজে মুড়ে সেটিকে ভরে দিল ভেতরে। এইবার বোঁটাটাকে এঁটে দিল মুখের ওপর।— 'ব্যাস ঠিক হয়েছে। বাইরে থেকে আর কিছু মনেই হচ্ছে না!— ছু'ট বাজলেই বেরিয়ে পড়তে হবে!'

তৃতীয় দিন মতিলাল এসেছেন কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দলের অনেকের সঙ্গেই কানাইলাল, তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এক ফাঁকে রিভলবারের কথাটা সেরে নিলেন মতিলাল।

অরবিন্দ ঘোষ আর চারু রায়ের দর্শন মিলল না। তাঁরা বড় একটা আসেন না কারো সঙ্গে দেখা করতে।

বসন্ত বাঁড়ুয্যে এসে ঢুকলেন, তুহাত দিয়ে একটা কাঁটাল বুকে জড়িয়ে ধরে।

কানাই আর মতিলালের দিকে নজর করে একটু মুচকি হেসে বসন্ত সরাহরি চলে গেলেন উপেন বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা করে কথা কইতে।

কথা শেষে উপেন্দ্র কাঁটালটি তুলে নিয়ে সোজা এক নম্বর ওয়ার্ডের দিকে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে চললেন। কানাইও তাঁর পিছু নিল।

—এখন জেলের আইন-কানুনের কড়াকড়ি যথেষ্ট শিথিল হয়ে গেছে

এদের জন্যে। কেউতো আর পরীক্ষা করে দেখলনা কাঁটালটাকে, তাই দিব্যি এটার ভেতর আত্মগোপন করে রিভলবারটা সরাসরি জেলের অন্দর মহলে গিয়ে কানাইলালের কাছে জাতি-ধর্ম্ম-কুলের সব কিছু পরিচয় দিয়ে আত্ম সমর্পন করল।

প্রথম যৌবনে ফুলশয্যার রাত্রিতে অপরিচিতা একটি কিশোরীর সান্নিধ্যে এলে পুরুষের মনে যে আনন্দোদ্বেল তুফানের সৃষ্টি হয়, বহু ঈপ্সিত ঐ সুন্দরীকে কাছে পেয়ে কানাই তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একাধিক চুম্বনে সেই তৃপ্তি লাভ করল।

বিছানার নীচে সান-বাঁধান খাটের ইট খুলে প্রেয়সীর জন্যে যে হারেম তৈরী হয়েছিল, কত যত্ন করে, সেখানে নিয়ে কানাই তাকে রেখে এল।

এর পরেই বেশী সতর্ক থাকতে হ'ল শ্রীশ কিভাবে দ্বিতীয় রিভলবারটি পৌঁছে দেয়। কানাইলালের মন অত্যন্ত চঞ্চল। চোখে ঘুম নেই। বাইরে শ্রীশ আর মতিলালের সঙ্গে গোপনে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি এসে পৌঁছুতে যা দেরী। কানাই মনের ভেতর সমস্ত ছকটাই এর মধ্যে এঁকে ফেলেছে কিভাবে কি করবে।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সপ্তাহে এদের দুট দিন ধার্য্য ক'রে দিয়েছেন জেল সুপার, রবিবার আর মাঝে একটা দিন। মাঝের দিনটিতে বসন্ত তাঁর কাজ শেষ ক'রে গেছেন।

রবিবার, অফিস ঘরের ভেতর দর্শনার্থীর বেশ ভীড় জমেছে। টেবিলে টেবিলে ব'সে যে যেমন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন, কর্তৃপক্ষের তেমন নজর নেই কারোর ওপর। চন্দননগর ফটক গোড়ার শ্রীশচন্দ্র, কোণের একটা টেবিলে বসে কানাইয়ের সঙ্গে কথা কইছে। কে কার খবর রাখছে। শ্রীশের গায়ে চাদর জড়ান। সব সময় একখানা চাদর গায়ে রাখা তাঁর অভ্যাস।

জেলার একবার এসে সকলের মধ্যে পাক মেরে গিয়ে দূরে

একখানা চেয়ারে বসে অফিসারদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে কাজ কর্ম্মের কথা কইছেন।

সুযোগ বুঝে শ্রীশচন্দ্র রিভলবারটি টেবিলের নীচ দিয়ে কানাইলালের কাছে এগিয়ে দিল। দিয়েই চুপিচুপি বললে, 'গোঁদল পাড়ার নরেন বাঁড়ুয্যের কাছ থেকে জোগাড় করেছি।'

যন্ত্রটি গায়ের চাদরের নীচে ঢুকিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কানাই শ্রীশকে বললে—"আমি মরব—নরেনের রক্ত-তর্পনের কথা তোমরা খবরের কাগজে প'ড়ো। কেবল এইটুকু অনুরোধ করছি, আমার মরদেহটাকে বিপুল শোভাযাত্রা ক'রে যেন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা আমার মহিমার জন্যে নয়। মীর্জাফর, উমিচাঁদের দেশে প্রথম মৃত্যুদণ্ড বিশ্বাসঘাতক আমারই হাতে পেল, এর গৌরব যেন দেশ বুঝতে পারে।"

সেদিনও কানাইলাল, মতিলালকে এই কথাই বলেছিল আর মতিলালকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিল—"মতিদা! তুমি এসে আমার মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবে, এই আমার শেষ ইচ্ছে—শেষ অনুরোধ।"

—দু'দুটি আগ্নেয়াস্ত্র কি ভাবে জেলের ভেতর প্রবেশ করল, আজ ও কি এর জবাব খুঁজে পেয়েছেন কারাগার রক্ষা কর্ত্তারা?

—না।

তাঁরা আপন প্রশ্নে আপনিই সন্দিহান।*

---

* আজ এই ৮০ সালেও এ জিনিষ জেলখানায় বন্ধ হয়নি।

কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

এর প্রধান সহায়ক কী কেবল উৎকোচ, না কর্ম্মকর্ত্তাদের ঔদাসীন্য? এই দুষ্কর্মের সহায়ক কি কারারক্ষীরা না অন্য কোন বৃহৎ হস্ত একাজে জড়িত থাকে। সেদিন ও কাগজে পড়লাম হাওড়া জেলের ঘটনায়—বন্দীরা নাকি বাহির থেকে সংগ্রহ করা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জেলের ভেতর সংগ্রাম করেছিল।

ওয়ার্ডের ভেতর ইটের ওপর সিমেণ্ট পালিস করা বন্দীদের শোয়ার জন্যে যে অচল খাটগুলি তৈরী ছিল তারই দু'একটির ইট খসিয়ে, খোপের ভেতর গোপনে পিস্তল রাখবার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করা হয়ে ছিল।

কানাইলাল, পরপর রিভলবার দুটিকে এনে এরই ভেতর লুকিয়ে রাখল।

এরা দু একজন ছাড়া অন্য কেউ এ খবর জানতে পারল না।

কানাইলালের সঙ্গে জেলের ভেতর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মতিলাল রায় লিখেছেন—"জেলে তিনবার কানাইলালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতে তাহার কথা শুনিয়া বুঝি, আইনের ফাঁক দিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ যে বাহির হইতে পারিবে, সে আশা

এখানে বক্তব্য এই যে, জেলের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম্ম পরিচালনার জন্যে 'জেলকোড' নামে যে আইন পুস্তকখানি নির্দিষ্ট আছে, তা এত সুন্দর সুসম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ, সেখানির নির্দ্দেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে কর্ম্মচারীরা মেনে চলেন তা হলে বহু অপ্রীতিকর কার্য্য এবং দুর্দ্দৈবের হাত থেকে কারাগারগুলি রক্ষা পেতে পারে। সুদৃঢ়, খাড়াই কলমে সুরক্ষিত কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দীদের কোন অপকর্ম্মের সুযোগ হাতে আসে না বা সহসা অভ্যুত্থানের কোন উপায়ও তারা করে উঠতে পারে না। প্রতিটি ডিউটি পোষ্টের নির্দিষ্ট ওয়ার্ডার আপন আপন পাহারার কেন্দ্রস্থল না ছেড়ে আইন অনুযায়ী কাজ করে গেলে জেলখানায় কোন বিপদের আশঙ্কা প্রত্যায়মান হতে পারে বলে মনে হয় না। কারারক্ষায় নিযুক্ত কর্ম্মীদের প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ঠা এবং পবিত্রতার সঙ্গে কার্য্য নির্ব্বাহ করা একান্ত প্রয়োজন যদি এই বিপদগুলো থেকে ভবিষ্যতে কারাগারকে মুক্ত রাখতে হয়। 'জেলকোড' নির্দিষ্ট কারারক্ষীদের সজাগ দৃষ্টি থাকলে, সামান্য কুটটিরও জেলের মধ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। কারণ বাহির থেকে বন্দীর জন্য দেওয়া অতি সামান্য বস্তু হলেও, সে সবই বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বন্দীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার নিয়ম। রন্ধন করা খাদ্যবস্তু হলে জেলে কর্ম্মরত ডাক্তার অবশ্যই তা খেয়ে পরীক্ষা করে দেবেন, কারণ পাছে এই খাদ্যবস্তু, বন্দীর শরীরে কোন বিষক্রিয়া করে।

তাহারা রাখে না। কানাইলালের বিরুদ্ধে তেমন বিশেষ অভিযোগ না থাকিলেও সে সতীর্থদের সহিত সমান দশা ভোগ করিতেই অধিক ব্যগ্র। এমন কি আশুবাবু কানাইলালকে জামিনে খালাস করিবার জন্য উকিল নিযুক্ত করিতে চাহিলে, সে ইহাতে ঘোরতর অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং বলে—'সঙ্গীদের অদৃষ্টের সহিত আমার অদৃষ্ট যখন জড়িত, তখন সকলের যাহা হইবে, আমিও তাহাই ভোগ করিব।···টেরারিষ্টদের একটি মস্ত বড় দোষ যে, তাহারা লক্ষ্য সাধনের অপেক্ষা আত্মরক্ষার দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়া চলে, মনে করিও না জেলে পচিবার জন্য আজ এই বিরাট্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি'।".

নরেন-নিধনের পাশুপাত অস্ত্র এখন কানাইলালের হাতের মুঠোয়। প্রয়োগে যেটুকু বিলম্ব।

প্রস্তুতি চলতে লাগল।

পরামর্শে ব'সে গেল ঐ পাঁচটিতে। কার কি ভূমিকা হবে। আসল যজ্ঞ সমাধান করবে কে বা কারা? দু'টি মাত্র রিভলবার! কানাই নিজেই একটির অধিকারী। কে নেবে অপরটির ভার?

সত্যেন লাফিয়ে উঠে বললে—"এ ভার আমার। আমিই এর সদ্ব্যবহার করব। দেশের জন্যে অনেক ভেবেছি, আর নয়। এ ছাড়া হাঁপানী রোগটা মাঝে মাঝে যা উৎপাত করে, তখন মনে হয় যে কোন উপায়ে জীবনটাকে শেষ ক'রে দিই। সুযোগ যখন হাতের মুঠোর ভেতর এসে গেছে, তখন তোমরা আর আমাকে বাধা দিও না।"

শেষ পর্য্যন্ত সত্যেনকেই সে ভার দেওয়া হ'ল।

যে কানাই জেলখানার ভেতর সব সময়ে চুপচাপ ক'রে সুবোধ বালকের মত দিন কাটাত, তার মনোভাব গেল সম্পূর্ণ বদলে। দলের বিপ্লবাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা সুরু ক'রে দিল। কানাইয়ের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্যকলাপে সকলেই কেমন যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান। মনের আদান প্রদান দিনের পর দিন গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল।

সে নিজেই যায় এগিয়ে। সকলেই যেন তার কত আপন। উদ্দেশ্য হল, এই ভাবে নরেনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। নরেনের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারলে—বধের রাস্তাটা অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে। দৃঢ় মনোবল নিয়ে কানাইলালের এ প্রস্তুতি। নরেন গোঁসাইকে রেহাই সে কিছুতেই দেবে না। সুকৌশলে তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে যজ্ঞ সমাধান করতে হবে।

নরেন গোঁসাইয়ের চরিত্র চিত্র বর্ণনায় অরবিন্দ তাঁর "কারা কাহিনী"তে লিখেছেন—"গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফর্সা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়; কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুপ্রবৃত্তি প্রকাশক ছিল, কথায় বুদ্ধিমত্তার কোন লক্ষণ পাই নাই।…গোঁসাইএর কথা নির্ব্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তিনি খালাস পাইবেন।…এইরূপ লোকই approver হয়।…অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না। তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার সময় নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগলভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের সামান্য কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল।"

গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে উপেন্দ্র লিখছেন, "গ্রেপ্তার করিয়া, সেদিন ভিন্ন ভিন্ন থানায় লইয়া গিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ রাখা হইল।……পরদিন দুপুর বেলায় আমাদের লাল বাজার পুলিস কোর্টে হাজির করা হইল।……পুলিস কোর্টের লীলা সাঙ্গ হইবার পর আমাদের গাড়িতে পুরিয়া আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির কোর্টে হাজির করা হইল।……কোর্ট হইতে গাড়ী বন্ধ হইয়া যখন আলিপুর জেলের দরজার কাছে হাজির হইলাম, তখন সন্ধ্যা।……

॥ উনষাট ॥

লোয়ার কোর্টের বিচার শেষ। ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি ১৯শে মে থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সব কিছু তদন্ত শেষ ক'রে ৩৮ জনকে দায়রা সোপর্দ্দ ক'রে, ঝড়াত-পড়াতি আর যাঁরা এই মামলায় এতদিন জেলখানায় আবদ্ধ ছিলেন তাঁদের মুক্তি দিলেন।

চারুচন্দ্র রায় ফরাসী প্রজা, চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ। সেখানকার বহু ছাত্রকেই তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। কিন্তু সত্য বটে, এই মামলার দুই প্রধান আসামী উপেন্দ্র ও কানাই তাঁর নিবিড় সংস্পর্শে এসেছিলেন ছাত্র জীবনে। এ দুজনের মধ্যে কানাই ছিল তাঁর অধিক প্রিয়। ছেলেটিকে চারুবাবু নিজ হাতে গ'ড়ে তুলেছিলেন। এই ছিল শিক্ষকের অপরাধ। ইংরেজ পুলিসের সঙ্গে যোগসাজসে ফরাসী মেয়র বে-আইনীভাবে চারু রায়কে গ্রেপ্তার করিয়ে আলিপুর মামলায় ঠেলে দেন। কিছুদিন চারুবাবুকে জেলে আবদ্ধ রাখার পর, কৈফিয়তের ভয়ে ইংরেজ সরকার আগে ভাগেই চারুবাবুর মোকদ্দমা তুলে নিয়ে, খালাস ক'রে দিল তাঁকে। তাঁর খালাস পাওয়ার আর একটি কারণ, ফরাসী বারের উকিল বনমালী পাল প্যারিসের পার্ল্যামেণ্টে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে তোলপাড় করেছিলেন। তাই ফরাসী পার্ল্যামেন্ট বেগতিক দেখে ইংরেজকে বাধ্য করে তাদের প্রজাকে মুক্তি দিতে।

একথা সত্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক'লকাতা বিপ্লব সমিতির স্রষ্টা ছিলেন। মাণিকতলা বিপ্লব কেন্দ্র গ'ড়ে ওঠার বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে, বারীন্দ্রের সঙ্গে দলের কার্য্য কলাপ নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ ঘটায়, যতীন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে অরবিন্দ ঘোষের রায়দানে, মনের দুঃখে

যতীন্দ্র, ক'লকাতা বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছেদ ক'রে উত্তর ভারতে চলে যান এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে 'নিরালম্বস্বামী' নামে পরিচিত হন। এই কারণে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছাড়া পেলেন।

এখন কে কে, নিম্ন আদালতের বিচারে আলিপুর বোমার মামলায় শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত, তাঁদের নামগুলো ছেঁকে তুলে নিয়ে, নামের একটা তালিকা প্রস্তুত করে বার্লি সাহেব এই বিচারের অন্যান্য নথীপত্রের সঙ্গে, ২৪-পরগণা জেলা এবং দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফ্টের কোর্টে পাঠিয়ে দিলেন ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সালে।

অপরাধীদের তালিকায় প্রথমেই অরবিন্দ ঘোষের নাম, তারপর এক এক ক'রে আরও ৩৭ জন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হরিদাস দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, বিভূতিভূষণ সরকার, সুধীরকুমার সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, বীরেন সেন, দেবব্রত বসু, নিখিলেশ্বর রায়, হেমন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, বালকৃষ্ণ হরিকাণে, পরেশ চন্দ্র মৌলিক, নিরাপদ রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, প্রভাস দে, শচীন্দ্র কুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়কুমার নাগ, ধরনী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কানাইলাল দত্ত, পূর্ণচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দীনদয়াল বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কুমার নাগ, কুঞ্জলাল সাহা, হেমচন্দ্র দাস, ইন্দুভূষণ রায়, সুশীল সেন আর অশোকচন্দ্র নন্দী। এঁরা সকলেই দায়রায় সোপর্দ্দ হলেন।

। ষাট ।

মতিলাল উদগ্রীব হয়ে চন্দননগরে বাড়ির দরজায় পায়চারী করছেন, দারুণ চিন্তাগ্রস্ত।—'কেন শিরে এখনও ফিরল না? রাতওতো অনেকটা গড়িয়ে গেল! কোন আপদ্ বিপদ্ ঘটলনাতো? ওকে ছোঁয়, এমন তো সাধ্য কারো নেই! অত বোকা নয় শিরে। ওর কপাল জোরও খুব। তাও বলা যায় না! কেনই বা এই দুশ্চিন্তাগুলো মাথার ভেতর এসে বাসা বাঁধছে তাও তো বুঝতে পারছি না। তবে কি......?'

মুহূর্ত্তক্ষণে অন্ধকার ভেদ ক'রে শ্রীশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মতিদা! গ্র্যাণ্ড সাক্সেস। মাইডিয়ার মতিদা মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন দাদু?—বলে দৌড়ে এসে মতিলালের কোমরটা জড়িয়ে ধরল শ্রীশ।

—ওঃ! যা চিন্তায় ফেলেছিলে ব্রাদার! হার্ট ফেল করবার উপক্রম হয়েছিল!

—তুমি তো দাদা, দেখ্ না দেখ্ যখন তখন অক্কা পেয়ে যাও। এই নিয়ে এ-কথাটি কতবার শুনলাম বল?

—চটচিস্ কেন?

—আরে ছাই ফিরে আসবার সময়টাও তো দেবে এতটা পথ? একবার চিন্তা ক'রে দেখ দেখি ক'লকাতার কোন মুলুকে আলিপুর জেল। যত সব বাজে চিন্তা। চলতো দেখি কিছু খাওয়াও। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

—কি খাবি তাই বল্? চল্ দোকানে যাই!

—তা হলে আর গিয়ে কাজ নেই। ধুত! ধুত! ওসব

দোকানের খাবারে কি শিরোমণির পেট ভরে, তার থেকে বৌদিকে বলনা ছাই, ঘি দিয়ে দিব্বি গরম গরম ক'খানা পরটা ভেজে দিন, শর্করা সংযোগে বেড়ে টানা যাবে। এমন যে মিরাকে'লটা ঘটালাম, তার একটু রেমুনারেশনওতো দেবে! সুড়ুৎ করে টেবিলের নীচ দিয়ে পাস করে দিয়েছি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে। বুঝলে দাদা!

—সাবাস পল্টন! যা যা ভেতরে যা, ভেতরে যা! এখুনি বৌদিকে ফরমাস করে আয়, নিশ্চয় পেয়ে যাবি। ভাল ঘি আছে।

কথা ফুরবার আগেই শ্রীশ গিয়ে বৌদির কাছে হাজির।

এইবার বাহির ঘরে বসে দুজনে গোপন কথা সুরু হ'ল।

—পরটা তৈরী হতে হতে বলে ফেলতো শিবোমণি মশায়! কি ক'রে কি করলে?

—রবিবারে, জানইতো সাজাওয়ালা কয়েদীদের বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সেপাই, জমাদার, নায়েব জেলার সবাই ওদের দেখা করান নিয়ে থাকে ব্যস্ত। হাজতীর তো ওদিন কাবো দেখা হয় না, সুপার নেহাত ভদ্রতা ক'রে রবিবারে আমাদের জন্যে স্পেশাল পারমিশান দিয়েছেন দেখা কবার তাই। ভীড় ভাট্টার ভেতর আমাদের ওপর নজর কতটা আর দিতে পারে বল? জেলের ভেতর পা দিয়েই নায়েব জেলারকে দিব্বি বোলচাল দিয়ে পটিয়ে ফেললাম। দুটো একটা সেপাই, ঘরটার ভেতর মাঝে মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বটে, খান কতক টেবিল দখল ক'রে আমাদেব দল বসে গেছে। ভেতর থেকে যারা এসেছে সবাই আলিপুর বোমার মামলার। এয়া মোটা জেলার এসে বার দুই আমাদের টেবিলগুলোর ফাঁক-ফুক দিয়ে চক্কর মেরে গেলেন। জেলাবকে আমি আগে দেখিনি। কানাই পরিচয় করিয়ে দিতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁকে খুব বিনীতভাবে একটা নমস্কার ঠুকলাম। বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি বললেন, বস, বস। এরপব ভদ্রলোক আমাদের টেবিলের কাছে আর আসেননি। যেই তিনি স'রে গেছেন, সুড়ুৎ ক'রে, ইনটারভিউ

টেবিলটার নীচ দিয়ে রিভলবারটা সাফাই করে দিলাম কানাইয়ের হাতে। বুঝতেই পারছ আমাদের দুজনের গায়েই চাদর। এক চাদরের নীচ থেকে গিয়ে আর এক চাদরের নীচে ঢুকল। কানাই সাফাই হাতে সেটিকে হজম করে দিল নিমেষের মধ্যে। তারপর তোমাকে যা বলেছিল, সেই এক কথাই সে আমাকেও বললে—"আমি মরব—নরেনের রক্ততর্পণের কথা তোমরা খবরের কাগজে পড়ো। কেবল এইটুকু অনুরোধ করছি, আমার মরদেহটাকে বিপুল শোভাযাত্রা করে যেন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা আমার মহিমার জন্যে নয়, মীর্জাফর, উমিচাঁদের দেশে প্রথম মৃত্যুদণ্ড, বিশ্বাস-ঘাতক, আমারই হাতে পেল, এর গৌরব যেন দেশ বুঝতে পারে।" কথাগুলো যেন মুখস্থ।

—উঃ ছেলেটার কি মনোবল ভাই বল!

—আর শোন! ওর মরদেহ তো তোমাকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে বলেছে। হ্যাঁ, শেষে হঠাৎ দেখি ওর মুখের ভাবটা সম্পূর্ণ বদলে গেল; বলে উঠলে কি জান "A revolutionist is supposed to die unknown, unwept, unlamented." এই তার শেষ কথা। বারীনদা আর উল্লাসকরের ওপর খুব অসন্তুষ্ট।

এরপর উভয়েই কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে রইল। দুজনেরই গণ্ডদেশ গড়িয়ে অশ্রু ঝরছে।

মতিলালের স্ত্রী এসে পড়েছেন।

তাঁকে আড়াল করে এঁরা চোখের জল মুছে ফেললেন।

দুখানা রেকাবিতে গরম পরটার সঙ্গে চিনি, তার পাশে নারক'লের নাড়ু। থালি দুটি টেবিলের ওপর রেখে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এঁদের মুখের ঐ অবস্থা দেখে আর কোন কথাই বলতে পারলেন না। খানিক পরে দু'গ্লাস জল এনে দিলেন।

শ্রীশ বললে—বাঁচালে বৌদি, যা ক্ষিধে পেয়েছিল।

॥ একষট্টি ॥

কে এই শিরে ?

—একটি অনাদৃত প্রাণ।

কানাইলালের সহপাঠি-সমবয়সী, বিপ্লব যজ্ঞের সহকর্ম্মী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। চন্দননগরের বাসিন্দা। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নিকটতম আত্মীয়। কৈশোরে রাসবিহারীর 'পারসোনাল য়্যাসিসটেণ্ট'; দুষ্টুমিতে কেউ কম যায় না। সৎসাহস দুজনেরই জীবনে মূল মন্ত্র।

এরা কটিতে একটি দল—কানাই, শ্রীশ, মতিলাল, রাসবিহারী, তার সঙ্গে আছে আর কয়েকজন খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে। সকলেই চন্দননগরের বাসিন্দা। বড় হয়ে ছেলের দল বেশ একটি কায়েমী বিপ্লব সঙ্ঘ গ'ড়ে তুলেছে। সাংগঠনিক কাজে সকলেই এখন দায়িত্বপূর্ণ।

গুপ্তকাজে কঠিন কঠিন কাজ হাসিলের ভার শ্রীশ ঘোষের। ফরাসী সরকার আর ইংরেজ সরকারের চোখে ধূল' দিতে শ্রীশের মত পটু আর কেউ ছিল না। সে যেন এক 'বর্ণ চোরা আম'। বাহ্যিক ব্যবহার—শত্রু মিত্র সকলের সঙ্গেই মধুর। শত্রু ব্যূহে প্রবেশ ক'রে সংবাদ সংগ্রহ করতে সে আদ্বিতীয়।

সর্ব্বাধিক দুঃসাহসিক কাজের পুরোভাগেই শ্রীশচন্দ্র।

অগ্নিযুগের একটি নিবেদিত প্রাণ।

শুধু কি জেলের ভেতর কানাইলালকে রিভলবার পৌঁছে দেওয়া? ডেনহাম হত্যার ব্যবস্থা। মাণিকতলা বিপ্লব কেন্দ্রের সংগৃহীত অস্ত্র-শস্ত্র কিছুটা, সময় মত চন্দননগরে সরিয়ে ফেলা। "রডা কোম্পানীর" মাউসারপিস্তল লুট, বিতরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। বোমা তৈরীর ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু কাজেই শ্রীশ নিজ কর্ম্মতৎপরতার বিশেষ পরিচয় রেখে গেছে।

কানাইলালের মত শ্রীশচন্দ্রও চন্দননগরের অধ্যাপক চারু রায়ের হাতে গড়া বিপ্লবী। এই শ্রীশচন্দ্রই বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে চারু রায়ের আস্থানায় ডুপ্লে কলেজে এনে হাজির করে কৈশোরে। মতিলাল রায়ের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রই রাসবিহারীর পরিচয় করিয়ে দেয়।

শ্রীশের বহুদিনের পরিচিত কলকাতা শ্রমজীবী সমবায় লিমিটেডের কর্ম্মকর্ত্তা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শ্রীশই রাসবিহারীকে নিয়ে যায়। রাসবিহারী এইখান থেকেই বসন্ত বিশ্বাসকে উত্তর ভারতে বিপ্লবের কাজে নিয়ে যায়। অনুশীলন সমিতির, রাজা বাজার কেন্দ্র, শচীন সান্যাল, এ সব যোগাযোগের মূলেই শ্রীশচন্দ্র। পিস্তল পরীক্ষার সময়ে রাঁসবিহারীর আঙ্গুলে গুলীলাগার পর এই শিরেই রাসুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনে। ডেরাডুন থেকে গ্রীষ্মের সময়ে রাসবিহারী চন্দননগরে আসার পর শ্রীশচন্দ্রই রাসবিহারীর সঙ্গে, ডেরাডুন বিপ্লবী সঙ্ঘের ব্যবহারের জন্যে, বোমা পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এই সঙ্গে চন্দননগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নাবায়ণ চন্দ্রেব কাছ থেকে রাসবিহারীব পথ খরচের জন্যেও কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে দেয়, রাসুর কার্য-কলাপের ঐ সকল তথ্য ভদ্রলোকের কাছে গোপন রেখে। রাসবিহারীকে যখন পুলিসেব খোঁজখুজিতে চন্দননগরে আত্মগোপন করতে হয়, তখন শ্রীশচন্দ্র তার নিরাপত্তার জন্যে সকল রকম ব্যবস্থা করে। গোপনে জাপানে পাড়ি দেওয়াব পূর্ব্বে বিপ্লবী রাসবিহারী যখন শিয়ালদহ পোষ্ট অফিসেব দোতলায় আত্মগোপন কবে থেকে ছিল, গোয়েন্দাপুলিসেব সুতীক্ষ্ণ নজরকে এড়িয়ে, সেখানেও শ্রীশচন্দ্রই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল বন্ধুর নিরাপত্তার জন্যে। এক কথায় শিরেই রাসুকে ছায়ার মত আগলে রেখেছিল তাকে জাপানে সরিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত। রাসবিহারীর জাপানে পাড়ি দেওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনার জন্যে গভীর রাতে যতীন্দ্রনাথকে খবর পৌঁছে দেওয়ার মূলে এই শ্রীশচন্দ্র।

জাপানে পৌঁছে রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে একেবারে ভুলে যায় নি।

মনে রেখেই বা কি লাভ হয়েছিল ?

সেখানেও সেই একই অবস্থায় কাটাতে হয়েছে রাসবিহারীকে কয়েকটা বছর আত্মগোপন ক'রে। তাই প্রথম অবস্থায় জাপান থেকে ভারতের জন্যে কিছু করবার মত তার কোন পথই খোলা ছিল না, তবুও গোপনে শ্রীশকে পত্রাদি দিয়েছে এই যা।

শ্রীশ বরাবরই ভারতীয় গোয়েন্দাপুলিসের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে বাঙালীপোষাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাকপটুতায়।

রাসবিহারী এখানে নিজেকে বাঁচিয়েছে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে।

এই আত্মভোলা অগ্নিহোত্রী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের শেষ জীবন বড়ই দুঃখের।

বোহিমিয়ান জীবন। সঙ্ঘের জন্যে অসাধ্য সাধনে সে সদা তৎপর। যেখানে প্রয়োজন, আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সেইখানেই ছুটেছে শ্রীশ হাসিমুখে, ক্লান্তিহীন শরীরে।

শেষ জীবনে ভেবেছিল বে-থা করে ঘর বাঁধবে। বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

জীবনের চরম মুহূর্ত্তের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না! ঘন মেঘ ধীরে ধীরে তার জীবনটাকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করে ফেলল।

অসীম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে অর্দ্ধাহারে অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে শ্রীশ। কেউ তার দিকে ফিরেও চায়নি, কেউ আর দেয়নি তার অগ্নিদগ্ধ জীবনের কোন মূল্যই।

একে তো ঘর বাঁধতে না পারায় হতাশায় মনটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার ওপর শেষ দিকে যখন সে দেখতে পেল তার নিকটতম সহধর্মীদের বিভিন্ন চরিত্রে, তখনই তার মন গেল বিষিয়ে।

এই আঘাতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল উদ্‌ভ্রান্ত পথিক।

শেষে একদিন হাতে তুলে নিল তীব্র কালকুট 'বিষ', সব যন্ত্রনাকে

জুড়োতে, গলায় ঢেলে দিল মনের আনন্দে।

চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল বর্ণচোরা শ্রীশচন্দ্র ঘোষ কারো হাতে ধরা না দিয়ে।

এই ঘটনা ঘটেছিল মাণিকতলা বোমার মামলা শেষ হওয়ার অনেক পরে।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষের বিষয় চিন্তা করতে গেলেই জটিল একটি প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি দেয়, তবে এই কি বিপ্লবী জীবনের পরিসমাপ্তি? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশবাসীর ভেতর কি এমন একজনও ছিল না, যে, এই গোত্রহীন বিপ্লবীর উৎসর্গীকৃত বিগত নির্ভীক জীবনের স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসতে পারে?

ইংরেজ যুপকাষ্ঠকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা এড়াতে পেরেছিল বলেই কি দেশবাসীর নিকট এই ব্যবহার শ্রীশচন্দ্রের প্রাপ্য ছিল?

তাইতো দেখি কত 'গোত্রহীন' মহাপ্রাণ দেশ সেবকের জীবন তো এমনই অনাদৃত-ভাবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে লীন হয়ে গেছে। কে দিয়েছে তার আত্মত্যাগের মূল্য, কেই বা দিল তার স্বীকৃতি।

॥ বাষট্টি ॥

"কেন্দ্রীয় বিপ্লব সমিতি"র একটি মূল্যবান অধ্যায়—প্রথম, 'বিশেষ বোমা পরীক্ষা'।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯০৮ এর ফেব্রুয়ারীতে উল্লাসকর একটা বিশেষ ধরনের বোমা তৈরী করলেন।

বোমাটির শক্তি পরীক্ষার জন্যে সেটিকে ফাটিয়ে দেখার দায়িত্ব নিয়ে দেওঘর বৈদ্যনাথধামে চলল তরুণ কর্ম্মী প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী দু'জন সহকর্ম্মীকে সঙ্গে নিয়ে। যেখানে বিপ্লব সমিতির একটি ঘাটিও ছিল।

জনমানব শূন্য দিঘিরিয়া পাহাড়ে সেটি ফাটান হবে, জায়গাটিকে দেখে তারা স্থির করে ফেলল। ঠিক হ'ল একটা মস্তবড় পাথরের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বোমাটিকে ছুঁড়বে। প্রস্তুত হল সে। সঙ্গের দুইবন্ধু সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেল।

নির্দেশ ছিল, সেটিকে ছুঁড়ে দিয়েই মুহূর্ত মধ্যেই পরীক্ষককে পাহাড়ের আড়ালে আশ্রয় নিতে হবে।

নির্দেশমতই কাজ হল। কিন্তু কি যেন কোথায় একটু ভুল হয়ে গেছে!

বিস্ফোরনের প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল।

দূরে দাঁড়ান দুই সহকর্ম্মী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এল প্রফুল্লর দিকে।

সর্ব্বনাশ!

দেখে এসে, বোমার আঘাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রফুল্লর মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ। মুখ দেখে চেনা পর্যন্ত যাচ্ছে না।

এখন উপায়? উভয়েই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

দেহটাকে কোথায় সরাবে তারা! লোক জানাজানি হয়ে গেলে আরও বিপদ।

পাথর খুঁড়ে প্রফুল্লর দেহটাকে কবর দেওয়া অসম্ভব। দাহ করা আরও অসম্ভব। দূরে নিয়ে যেতে গেলেই গ্রামবাসীদের নজর এড়াতে পারবে না। বাধ্য হয়ে বাঙলার বিপ্লবী 'প্রথম শহিদের' মৃত দেহটা তারা ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে চুপেচাপে সেখান থেকে সরে পড়ল।

এইভাবে বোমার আঘাতে প্রফুল্লর মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল কেন? গবেষণা সুরু হ'ল।

উল্লাসকর বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেন এবং দলের বিশিষ্ট লোকেদের জানালেন, বোমাটায় দাহ্য পদার্থ এত বেশী ছিল যে, বাতাসের ঘর্ষণ জনিত উত্তাপে, মাটিতে পড়ার দু'এক সেকেণ্ড আগেই সেটির বিস্ফোরণ ঘটেছে; ভুল সে করেনি।

প্রফুল্লের মৃত্যুর পূর্ব্বে, তার পিতা ঈশানচন্দ্র বিপ্লবীদলের কোন খবরই জানতেন না!

দরাজ অন্তঃকরণের পিতা।

এই ঘটনা তাঁর কানে যেতেই দেশ মাতৃকার সেবায়, ছোট ছেলে সুরেশচন্দ্রকেও বিপ্লবী দলে এগিয়ে দিলেন।

বোমা তৈরীতে পারদর্শী হেমচন্দ্র আর উল্লাসকর জেলে যেতেই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন, বিপন কলেজের রসায়ণ বিদ্যার অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত।

তাঁর পার্শীবাগানের বাড়িতে সুরু হ'ল নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

অরবিন্দই সুরেশকে দলে ভিড়িয়েছিলেন।

ওদিকে, চন্দননগরের ছেলে, স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র মণীন্দ্রনাথ নায়েক বোমা তৈরীতে মেতে উঠল। চন্দননগরের ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ওকে বোমা তৈরীর ফর্মুলা বাৎলে ছিলেন। 'কৃতকার্য্য হয়ে

মণীন্দ্র, বোমা এনে প্রফেসার সুরেশচন্দ্রকে, তাঁর পার্শীবাগানের বাড়ীতে দেখিয়ে গেল।

সুরেশচন্দ্র খুশী হয়ে ছাত্রটির পীঠ চাপড়ে তাকে খুব উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর কাছে সুযোগ মত এসে নতুন নতুন পদ্ধতিগুলো আয়ত্ত করতে পরামর্শ দিলেন।

॥ তেষট্টি ॥

নরেন বধ যজ্ঞের অন্যতম সাগ্নিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রক্তের সম্বন্ধ অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রের সঙ্গে—একেবারে ফেলনা ছিল না। অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সহোদব ভ্রাতা অভয় বসুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে সত্যেন তৃতীয়। সত্যেনের আরও পাঁচটি সহোদরা ভগিনী ছিল।

২৮-পরগণার বড়াল গ্রামেব আদি বাসিন্দা এই বসু পরিবার।

অন্ন সংস্থানে ছিটকে পড়ে অভয় বসু এসে ঠেঁক খেলেন হেডমাষ্টার হয়ে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে।

সুপরিচিত ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুও এসে পড়লেন মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করতে।

দুই ভাই-ই এখানে ঘর বেঁধে বসবাস শুরু করলেন।

দুজনেই ছিলেন সুরুচি সম্পন্ন সৎ, সদালাপী এবং সাদা সিধে।

সত্যেন্দ্রের জন্ম ১৮৮২র ৩০শে জুলাই।

বয়স বাড়ছে। বাড়ীতে সর্বদাই লেখাপড়ার চর্চা।

বাল্যকাল থেকে বইয়ের পোকা হয়ে পড়ল এই বালক।

১৮৮৮তে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়ে সতীর্থদের কাছ থেকে প্রতি বছর, একচেটিয়া ভাবে, প্রথম স্থানটি কেড়ে নিচ্ছে ক্লাসের।

জ্যেঠামশায় ছিলেন স্বদেশী ভাবাপন্ন।

সত্যেনের বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রভাব, এর ওপর বেশ কিছুটা অর্পেছে।

জ্ঞানেন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের সুরু থেকে তালিম দিয়ে ভাই-

টিকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলছেন।

এল বালকের কৈশোর। বয়স গড়িয়ে হল পনের।

প্রথম বিভাগে ভাল নম্বর পেয়ে এনট্রান্স পাশ করল সত্যেন, ১৮৯৭ সালে।

ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষা উতরে গেল ১৮৯৯ এ।

বি. এ. পড়তে এসে ঢুকল কলকাতার সিটি কলেজে। কলেজের পড়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রবল। অসুখে ভুগে ভুগে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে।—পরীক্ষা এসে গেল। হাঁপানি রোগের উৎপাতে পরীক্ষায় বসা হল না। এ দুঃখ তার রাখবার জায়গা নেই। এখন থেকে প্রায় সে ভুগে চলেছে। কলেজের পড়া চালিয়ে যেতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ডিগ্রী আদায় করা এই মেধাবী ছাত্রের পক্ষে কিছুই কঠিন হত না।

যতই রোগ ভোগ করুক না কেন, খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া, নিত্য নতুন বইয়ের লেখাগুলোকে চর্ব্বিত চর্ব্বন করা ছিল তার মনের এক সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ।

ডিগ্রী নেওয়া হল না।

অন্তরে নিদারুণ ক্ষোভ নিয়ে মেদিনীপুরে ফিরে আসতে হল তাকে।

এইভাবে লেখাপড়া ছেড়ে কত দিন আর বসে থাকবে!

অকেজো হয়ে বসে থাকার চেয়ে মাষ্টারী করা অনেক ভাল ভেবে, মন স্থির করে লেগে পড়ল সেই কাজে।

বাঙলার চারদিকে স্বদেশীর হাওয়া বইতে বইতে ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিল।

ভারতীয় অশ্বারোহী সেনাদল থেকে টেনে এনে, যতীন ব্যানার্জীকে বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ পাঠালেন কলকাতায় বিপ্লব সমিতি গঠন করতে ১৯০১ সালে।

সারকুলার রোডে যতীন বাঁড়ুয্যে আখড়া খুলেছেন।

পরের বছর বারীন্দ্রকে, যতীন্দ্রের সাহায্য করতে অরবিন্দ এখানে পাঠালেন।

বিপ্লব সমিতিয় কাজের জন্যে বিশ্বাসী ও কর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মীর প্রয়োজন। বারীন্দ্র, মাতুল সত্যেন্দ্রনাথকে টেনে নিয়ে এলেন এখানে। আরও কয়েকজন বিশ্বাসী তরুণকে নিয়ে আসা হল সমিতির কাজের জন্যে।

কিছুদিন পরে সমিতির কর্ত্তৃত্ব ও সংগঠন প্রণালী নিয়ে যতীন এবং বারীনের ভেতর তীব্র কোন্দল দেখা দিল। অরবিন্দ বরোদা থেকে ছুটে এলেন এটিকে থামাতে। ফল ফলল অদ্ভুত। যতীন্দ্রের হাত থেকে কার্যভার কেড়ে নিয়ে বারীন্দ্রকে সেই কাজের ভার দিয়ে, যতীন্দ্রকে সমিতি থেকে বিতাড়িত করলেন অরবিন্দ। সত্যেন যতীনের পক্ষ সমর্থন করায় সেও বিতাড়িত হল।

এরপর কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়ে যতীন্দ্রনাথ চলে গেলেন উত্তর ভারতের দিকে।

সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষোভে ও ঘৃণায় কলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে মেদিনীপুরে ফিরে গিয়ে রাজনারায়ণ বসুর পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং হেমচন্দ্র দাস কানুন গোর নেতৃত্বাধীনে গড়ে ওঠা যুগান্তর দলে যোগ দিলেন।

এঁদের উদ্দেশ্য কর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্লবীদল গড়ে তোলা। ধার্ম্মীক, নিষ্ঠা-বান্ অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠতে যে সব গুণ থাকার প্রয়োজন সঙ্ঘের প্রতিটি সভ্যকে সেই সবের প্রকৃত অনুশীলন করান হত এখানে। গীতা, উপনিষদের মূল সূত্র ধরে এবং বৈদেশীক বিপ্লবীদের ন্যায়-নিষ্ঠা, সুন্দর সুন্দর পুস্তকের মাধ্যমে কর্ম্মীদের শিক্ষা দেওয়া হত। রিভলবার এবং বন্দুকে হাত-পাকান এর একটি অঙ্গ বিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের লেখা গ্রন্থাদি এদের পাঠ্য ছিল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে প্রতিহত করবার সর্ব্ব প্রকার

প্রচেষ্টা সুরু হল, সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপী।

কর্ম্মযোগী সত্যেন দেখল চেঁচামেচি করে ব্রিটিশ শক্তিকে বিধ্বস্ত করা যাবে না। মনে মনে সঙ্কল্পস্থির করে সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রদের নিয়ে, 'ছাত্রভাণ্ডার' নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান খুলল। সেই সঙ্গে একটি তাঁতের কারখানা খুলে ছেলেদের কাজে লাগিয়ে দিল।

দেশের তৈরী আসবাবপত্র দিয়ে সুন্দর একটি ব্যবসা চালু হয়ে গেল। ছাত্ররাই সব দেখা শোনা করে। এমনি একটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় থাকলে কারো সন্দেহভাজন হতে হবে না। এই দেওয়ালের আড়াল থেকে বিপ্লবীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণকারী ক্ষুদিরাম বসু সত্যেনের হাতে গড়া বিপ্লবী। ছেলেটি মেদিনীপুরের কলিজিয়েট স্কুলের ছাত্র। পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে এসে সত্যেনের তাঁতের কারখানায় আশ্রয় নিয়েছিল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

ক্ষুদিরামের মত অনেক ছাত্রকেই সে নিজের মনমত করে গড়ে তুলেছিল।

এবার পুরোদস্তুর সংগঠনের কাজে নেবে পড়েছে সত্যেন। একাই একশ'। যদিও শরীরটা তার বরাবরই খারাপ, ঐ একটি মাত্র পৈতৃক সম্পত্তির সে পূর্ণ অধিকার লাভ করে ছিল—হাঁপানী রোগ। কিন্তু অসম্ভব মনোবলে রোগ তাকে কোন দিনই বিপর্যস্ত করতে পারে নি।

সত্যেনের কর্ম্মনিষ্ঠা সরকারী মহল এমন কি মেদিনীপুরবাসী জনগণকে মুগ্ধ করেছিল।

১৯০৬ সালে সরকারের উদ্যোগে মেদিনীপুরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

এই প্রদর্শনীর কার্য্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্যে দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সহকারী সম্পাদকের কার্য্যভার দেওয়া হয়েছে।

এই কারণে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রদর্শনী কমিটীর বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকর্ত্তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বার সুযোগ পেল সে। এ ছাড়া স্থানীয় কালেক্টরী অফিসে সে একটি কাজও করত।

সত্যেন, ক্ষুদিরাম বসুকে লাগিয়ে দিল মেলার মাঠে 'সোনার বাংলা' নামে সরকারী আইন বিরুদ্ধ একটি ছাপা লিপি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে। এই কার্য্যে ক্ষুদিরাম কতখানি কৃতকার্য্য হতে পেরেছিল, তা ক্ষুদিরাম প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ বুদ্ধি খাটিয়ে সরকারী মহলে পরিচিতির গুণে সত্যেন ক্ষুদিরামকে, কর্ম্মরত পুলিসকে আঘাত করা এবং বে আইনী পত্র বিলির অপরাধ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসে; কিন্তু সন্দেহের বশবর্ত্তী হওয়ায় কলেক্টরী অফিসের সঙ্গে তার সকল সম্বন্ধ চুকে গেল।

ভালই হ'ল তার। সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মন প্রাণ ঢেলে লেগে পড়ল বিপ্লবের কাজে।

ঠিক এই সময়ে হেমচন্দ্র বোমা তৈরী শিক্ষা করতে প্যারিসে চলে গেলেন, তাঁর সকল কার্য্যের ভার সত্যেনের স্কন্ধে চাপিয়ে।

জেলা সংগঠনের কর্ম্মিবৃন্দ বিশেষ বৈঠকে তাকে দলপতির আসনে বসাল।

তাঁতের কারখানা এবং সমবায়ের কাজ একই ভাবে চলেছে সর্বদিকেই তার লক্ষ্য।

ভেতরে ভেতরে সে বিপ্লব যজ্ঞের ঘি, কাঠ সব কিছুই যোগাড় ক'রে চলেছে এতদিন, পূর্ণাহুতির জন্যে।

জেলায় ঘুরে সুবৃহৎ বিপ্লবী দলও গঠন করেছে। প্রকাশ্যে এক্সট্রিমিষ্ট দলের পক্ষ হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিলিতী কাপড় পোড়ান থেকে সুরু ক'রে চিনি, নুন প্রভৃতি বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিষ ধ্বংসের পাণ্ডাগিরিও সে ক'রে যাচ্ছে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে।

একখানি ছোট্ট এঁদো বাড়িতে সমবায়ের অফিস।

দুখানির একটি ঘরে ধূলাপড়া পূজো করা মাকালীর মূর্ত্তি। একপাশে ছেঁড়া মাদুরে রাত্রিতে শোয় ক্ষুদিরাম বসু আব নিরাপদ-রায়। তারা নিজেরাই এ বাড়িতে রান্নাবাড়া করে খায়। অপরটিতে অফিসের কাজ চলে।

সত্যেন থাকে অন্যত্র। বিশেষ কাজ পড়লে এখানেই কোন কোন দিন রাত কাটায়।

১৯০৭ সন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে মেদিনীপুর সহরে ৭ই ডিসেম্বর।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত মডারেটদলের সমর্থক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন সভাপতি হয়ে। অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি এক্সট্রিমিষ্ট নেতারা এসেছেন অধিবেশনে।

সত্যেনের পরিচালনায় এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্রী বাহিনী মডারেটদের, ইংরেজের সঙ্গে আপোষ নীতির বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছেড়ে এবং লাঠির ডগায় নানা প্রকার পোষ্টারে সুসজ্জিত হয়ে সহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা ক'রে সভামণ্ডপে উপস্থিত হ'ল। ক্ষুদিরাম শোভাযাত্রায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল।

অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্ম্মনিষ্ঠায় সত্যেনের সাংগঠনিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে অরবিন্দ পারলেন না। তার নায়কত্বে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় পেয়ে উভয় পক্ষেব সদস্যরা স্তম্ভিত।

দুই পক্ষের তুমুল সংগ্রাম সুরু হয়েছে।

মডারেটরা বলেন, সরকারের সঙ্গে আপোষের কথা।

এক্সট্রিমিষ্টরা বলেন—"সংগ্রাম ছাড়া ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু আদায় কবা যাবে না। আমরা চাই বিপ্লব। পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা আদায় করবই ?"

মেদিনীপুরের সদস্যরা এক জোট। সত্যেন যা বলে তাই।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর প্রাদেশিক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল, সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবী করা হবে।

চরমপন্থীদের পক্ষে জয়ধ্বনি উঠল।

সত্যেনের সাংগঠনিক শক্তি যে কি সুদূর প্রসারী এক্সটি মিষ্ট দল তা হতবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যেন না থাকলে হয়তো এ যুদ্ধে জয়লাভ করা মুস্কিল হত এঁদের পক্ষে।

অরবিন্দের অনুরোধে, সত্যেন ভাগ্নের পূর্ব্বব্যবহার মন থেকে মুছে ফেলে জাতীয় স্বার্থে তার দলবল নিয়ে সুরাটে সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে, বাঙলা দলের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। মেদিনীপুর দলের সকলেই বাল গঙ্গাধর তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদেরই সমর্থন জানাল সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে।

১৯০৮ সালে সত্যেনের আস্তানা তল্লাসী ক'রে, পুলিস তার দাদার লাইসেন্স করা বন্দুকটি তারই হেফাযতে পেয়ে, বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করল। ওটি যে তার দাদার বন্দুক কোর্ট তা গ্রাহ্যই করল না। ম্যাজিষ্ট্রেট 'Arms Act' এর বলে তাকে দু'মাসের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে মেদিনীপুর জেলে পাঠাল।

এর পর আলিপুরে বোমার মামলায় জড়িয়ে সরকার তাকে সেখান থেকে আলিপুর জেলে পাঠাল।

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির কোর্টে তখনও মাণিকতলা বোমার মামলার শুনানী চলেছে। বিপ্লবীরা জেলে ব'সেই শুনতে পেলেন ১১ই আগষ্ট (১৯০৮) মজঃফরপুর জেলে ভোর ছ'টায় ক্ষুদিরাম বোস হাসিমুখে ফাঁসীর রজ্জুতে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজ দণ্ডিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম বাঙালী শহীদের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়েছে গণ্ডক নদের তীরে।

॥ চৌষট্টি ॥

বাঙলা দেশের গণ অভ্যুত্থান কেবল ভারতবর্ষকে নিয়েই জড়িয়ে থাকল না—দানা বেঁধে উঠল বিদেশেও। হিন্দুস্থানের বাইরে হুহু করে এই আগুন ছড়িয়ে পড়ল। আচম্বিতে শুদ্ধমন দেশভক্তদের রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তারের খবর প্রবাসী ভারতবাসীদের হৃদয় তন্ত্রীতে যেন শক্তিশেল হানল।

······কিংসফোর্ডকে খতম করতে গিয়ে কিশোর ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেছে। ইংরেজ তাকে ফাঁসীর দড়িতে লটকে দিচ্ছে। আলিপুর বোমার মামলায় যারা ধরা পড়েছে অনেকেই বেহাই পাবে না। রাজশক্তি চাইছে, এদের কাউকে কাউকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলবে, বাকি কতকগুলোকে পাঠাবে আন্দামানের সেলুলার জেলে। আন্দামানে নির্বাসন মানেই বন্দীর সারা জীবনটা বরবাদ করে দেওয়া। দীপান্তরিত হয়ে তাদের যে তিলে তিলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালড়ে চলতে হবে! ঘটবে মনের অপমৃত্যু। সেখানে তো যাবে না আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব বাঙালী অথবা ভারতবাসী কেউ, কালাপানি পেরিয়ে তাদের সুখ দুঃখের কাহিনী শুনতে!

এই খবর ছড়িয়ে পড়ল—সুদূরে—পাশ্চাত্ত্যে-পৌঁছে গেল জার্ম্মানীতে। এখানেও ছিল ভারতীয় যুবগোষ্ঠী। তাদের কানে গিয়ে খবর গুলো সূঁচের মত বিধল।

এখান থেকে যদি ভারতকে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করতে পারা যায়, এই চিন্তা ক'রে মুক্তিকামী সন্তানেরা একজোট হয়েছে। বার্লিন কমিটীর অনুপ্রেরণায়, কাইজারের সহায়তায় ভারতের অভ্যন্তরে 'সসস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তুলবার জন্যে বদ্ধপরিকর তারা,

সঙ্গে-সঙ্গে এই দল খবর পাঠাল কানাডায় মার্কিন মুলুকে—"প্রস্তুত হও ভারতীয় সন্তানেরা।"

কানাডাতেও বাস করছে হাজার-হাজার প্রবাসী ভারতবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সলীগ, হিন্দী অ্যাসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন অব দ্যা প্যাসিফিক কোষ্ট এবং আরও কতকগুলো এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে।

দু দেশের যুবশক্তি এবার উঠে পড়ে লাগল হিন্দুস্থান থেকে বিদেশী শাসনের মূলোচ্ছেদ করতে।

তিন তিনটি বৃহৎদেশে ভারতীয় যুবশক্তি বদ্ধ পরিকর, যে কোন উপায়ে হোক ভারতের বন্ধন মোচন তারা করবেই করবে। এই প্রচেষ্টার তুফান গিয়ে ঢুকে পড়ল দূর প্রাচ্যে এমন কি মধ্য প্রাচ্যেও।

চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মালয়, মিশর, তুরস্ক সব দেশের প্রবাসীরাই ভারতের দুঃখের কথা চিন্তা করে কোমর বাধল। সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

উদ্দেশ্য ছিল মহান্ পবিত্র, তাই এই যজ্ঞের পূজারীরা নিজনিজ উদ্দেশ্য সফলে যে সামান্য কিছু সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছিল, তার প্রধান কারণ সংগঠকদের পরিকল্পনা ছিল বলিষ্ঠ; ছিল মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিজ্ঞা। প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্য্যশীল। প্রত্যুৎপন্নমতি। অসীম সহিষ্ণুতা এরা বক্ষে ধারণ করত। এর সঙ্গে ছিল সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

অ্যামেরিকার 'গদরপার্টি' আর 'বার্লিন কমিটী' উত্তরকালে বিপ্লবীদের নতুন আদর্শের প্রতিভূস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মার্কিন মুলুকে খুব ছোট্ট খাট্ট রূপ নিয়ে এই চক্রের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েকজন ভারতীয় যুবক এক এক ক'রে এসে যুটল, বার্কলি সহরে ১৯০৭ সালে ভারতের যুবজাগরণকে উদ্দেশ্য করেই এদের প্রস্তুতি সুরু হয়েছিল। এরা সকলেই বিদেশে শিক্ষার্থী। পরদেশে মনের খোরাক যোগাতে এরা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে এক

গোষ্ঠীতে পরিণত হ'ল প্রথমটায়। ভারতীয় বলেই এখানে একজন আর একজনকে আঁকড়ে ধরল।

প্রথম পর্বের শেষ হতেই দেখা গেল এক অদ্ভুত ব্যাপার—এই ছাত্র কটিকে নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংস্থা। লক্ষ্যবস্তু হ'ল এদের, মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জন।

ভারতবর্ষের গুপ্ত সমিতিতে এখন বেশ রং ধরে উঠেছে।

ভারতের বাইরে এই যজ্ঞ কেন্দ্রের নাম দেওয়া হ'ল 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সলীগ', নেতাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলোচনার পর।

১৯০৮এই ক্যালিফর্নিয়ায় লীগের জন্ম হ'ল। তরুণ বাঙালী তারকনাথ দাসকেই সদস্যরা একজোটে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন।

ছোট্ট একটি লাইব্রেরী ক'রে বেশ কিছু বই পত্রের যোগাড় করা হ'ল। একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হ'ল। লীগের সদস্যরাই এতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। নানাবিধ আলোচনার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক দিক্‌টাকে এঁরা বিশেষভাবে সক্রিয় ক'রে তুললেন। প্রত্যেকেই দেশের জন্যে মাথা ঘামাতে সুরু ক'রে ছিলেন। সামরিক শিক্ষা লাভের বিন্দুমাত্র সুযোগ এলে তার পুরদস্তুর সদ্ব্যবহার না ক'রে এঁরা ছাড়তেন না। আপন-আপন মনকে এমনই দৃঢ়ভাবে গ'ড়ে তুললেন যে, জেনে অবাক হতে হয় বিদেশে বসে বোমা অথবা যে কোন বিস্ফোরক তৈরীর পদ্ধতি শিক্ষা করবার জন্যে এঁরা নিজেদের মনোবলের পরিচয় দিতে আগুনের মধ্যে দিয়েও হেঁটে যেতে ভয় পেতেন না।

তারকনাথের পর আপন-আপন কর্ম্মদক্ষতার বিষয় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ খাকোঁজি, কাশীরাম প্রভৃতি ঐ পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব অ্যামেরিকা আর কানাডায় এই সময়েই বর্ণ বৈষম্যের প্রবল হাওয়া বইছে। ভারতীয়দের 'নিগার' অর্থাৎ

কালা আদমী ছাড়া এরা মনে করে না। সর্বগুণসম্পন্ন হলেও এদের এক আসনে বসতে দেয় না। সেখানকার কোন সঙ্ঘের সদস্য হওয়া বা অভিজাত হোটেলে ঢোকার এদের নেই কোন অধিকার। ওরা যেন ভাব দেখায়-দাসীপুত্র এরা। এই কারণে সেখানে ভারতীয়দের বহু প্রকারে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হ'তে হ'ত।

পোর্টল্যাণ্ডে 'শিখ' বড় কম ছিল না। এই লাঞ্ছনার একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে ভেবে শিখেরদল এক জোটে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

খাকোঁজি ও কাশীরাম 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সলীগের' প্রতিষ্ঠা করলেন, পোর্টল্যাণ্ডে। এরই শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায়—অরিগন, সানফ্রানসিস্কো আর ওয়াশিংটনে।

চলতে লাগল লীগের প্রতিটি কেন্দ্র থেকে প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে প্রতিবাদের সোচ্চার নিয়মিত ভাবে, এই পুস্তিকা ভারতবর্ষেও আসতে লাগল।

মুক্তিকামী ভারত সন্তান এই পুস্তিকার বাণী হৃদয়ঙ্গম ক'রে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণীত হয়ে উঠল-আশ্চর্য্য হতে লাগল দেখে দেখে, বিদেশে থেকেও ভারতীয়দের মাতৃভূমির প্রতি কী গভীর অনুরাগ।

জেলখানায় বসে বারীন্দ্রের মত তাঁর দলের সকলেই যে সময়ে মনোনিবেশ সহকারে ভাবতে সুরু করেছেন রাজদণ্ড মাথায় তুলে নেওয়ার আগে জীবনকে আর কি ভাবে সার্থক করে তুলতে পারা যায়—এছাড়া দেশ ও যখন তাদের মুখের পানে চেয়ে আছে আরও বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করছে, তখন তাদের চুপ করে বসে থাকাতো আর চলে না।

কি প্রত্যাশা করছে? সেই বস্তুটিই বা কি?

না জানে দেশবাসী, না জানে এদের দলের কেউ।

শ্রীঅরবিন্দ নির্লিপ্ত। এই গণ্ডীর ভেতর নিজেকে আবদ্ধ না রেখে আধ্যাত্ম শক্তি অর্জ্জন করার পরিকল্পনা নিয়ে নিভৃতে কারাপ্রকোষ্ঠের অন্তরালে যোগ সাধনায় ব্যস্ত তিনি।

রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিশেষ সরকারী ব্যবস্থায় জেল হাসপাতালের কাছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে (গোরা ডিগ্রীতে) দিন কাটাচ্ছে, এই মামলার আর সকলে আছেন অন্য দু একটি ওয়ার্ডে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কয়েদী-মেট, পাহারার (কনভিক্টওভারসিয়ার আর নাইট ওয়াচ ম্যানের) ওপর ভার পড়েছে নরেনের দেখা শোনার। বেশ আছে সেখানে সে-জামাই আদরে।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

নরেন বধের সঙ্কল্প স্থির। তাকে কী ভাবে বাগে পাওয়া যায়।

কানাইলাল সত্যেনকে বললে, হাসপাতাল একমাত্র নিরিবিলি জায়গা, যেখানে সহজেই কাজটা সমাধান হ'তে পারে।

হাঁপানী রোগের জন্যে সত্যেনকে মাঝে মধ্যে তো হাসপাতালের বিছানাতেই থাকতে হয়। এ সময়ে হাসপাতালে গিয়ে অস্তানা গাড়া তার পক্ষে এমন একটা অসুবিধে হবে না।

কানাইকে যেতে হবে বিশেষ একটা রোগের অছিলা ক'রে।

নরেনকে কি উপায়ে গোরা ডিগ্রী থেকে হাসপাতালে আনতে হবে, তা উভয়ের আলোচনায় স্থির হয়ে গেল।

একদিন সত্যেনের শ্বাসকষ্টটা বেশ বেড়েছে; সে গেল হাসপাতালে। যাওয়ার সময়ে কানাইলালকে বলে গেল, প্রস্তুত থাকতে। এক নম্বর ওয়ার্ডের কনভিক্ট ওভারসিয়ার তো রোজই হাসপাতালে যায় সকালের দিকে। ঠিক হ'ল সেখান থেকে ফেরার আগে সে যেন প্রতিদিন সত্যেনের সঙ্গে দেখা ক'রে আসে; কোন খবর থাকলে সে কানাইকে খবরটা পাঠাবে। খবর পেয়ে বিন্দুমাত্র যেন দেরী না করে কানাই।

এবার একটানা কদিন হাসপাতালের বেডেই আছে সত্যেন।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কনভিক্ট ওভারসিয়ারকে সেখানে দেখতে পেয়ে, সত্যেন প্রথম টোপ ফেলে নরেনের মনের ভাবটা বুঝে নিতে চাইল। তারই হাতে গোপনে নরেনের কাছে চিঠি পাঠাল।—"সে এবং কানাই দত্ত রাজসাক্ষী হতে চায়। বারীনের দলকে তারা সহ্য করতে পারছে না। কানাইলালও তাকে কথা দিয়েছে, সুযোগ পেলে সেও রাজসাক্ষী হবে। এ মামলায় অরবিন্দ ঘোষকে কিছুতেই

াটে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। সেই তো নাটের গুরু ত্যানন্দ। নরেন, অরবিন্দ সম্বন্ধে এবং সমিতির বিষয় কোর্টে যা বলে সেছে, রাজসাক্ষী হয়ে তারা ও হুবহু সে কথাগুলোই বলবে। সে পরামর্শ দেবে ঠিক সেই মত কাজ তারা করবে। Coroborating ridence হ'লে অরবিন্দ ঘোষকে বেঁধে দেওয়া কোর্টের পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়বে। একজনের evidence এ ব্যাপারটা দানা ধছে না। অরবিন্দকে ঝুলতে পারলে সে যেন নিঃশ্বাস ফেলে চে। এই অরবিন্দই তাকে একদিন দল থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে-ল। সেই থেকে সে আর ক'লকাতা বিপ্লবী দলের সঙ্গে কোন ম্বন্ধই রাখত না। ঐ শয়তানটার ওপর রাগ তার আজও যায়নি। তিশোধ সে নেবেই, এই তার সঙ্কল্প। নরেন যদি তার প্রস্তাবে জি থাকে জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সে যেন সত্ত্বর জেল সপাতালে এসে তার সঙ্গে দেখা করে। কবে, কখন সে আসছে নতে পারলে কানাইলালকেও খবর পাঠাবে। দিনটা নরেনই স্থির রবে। সেই দিনই তিনজনের কথা হয়ে যাবে। তাদের দুজনের কী বলতে হবে! কী কী করতে হবে রাজসাক্ষী হ'তে হলে কি বা দরকার" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাসবিহারী ক'লকাতা ছাড়ার পর, কানাই অনেক দিন তার বর পায়নি। সে যে কোথায় হারিয়ে গেল?

শ্রীশ যখন শেষ দিন জেলাখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, াৎ রাসুর কথা তার মনে ভেসে উঠল। শিরেকে জিজ্ঞেস করতেই াব সব খবরই সে পেয়ে গেল।

—রাসু দেরাডুন ফরেষ্ট অফিসে চাকরী করছে; সেই সঙ্গে াদের কাজ ও করে যাচ্ছে। উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলটা যেমন মন মনে কোর না। যতীনদা আর রাসু চারদিক থেকে অনেককে দলে ভিড়িয়েছে। দেখো, রাসু কি ক'রে তোলে। অসুবিধে

তার ঐ কাটা আঙ্গুলটার জন্যে। মজা হ'ল সরকারের চোখে, সে, যেন ধোয়া তুলসীপাতা। খুব বিশ্বাস করে ওরা তাকে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কানাই বললে ঠিক কথাই বলেছ—"রাস্থ কি ক'রে তোলে।' সে যে বিরাট কিছু একটা ক'রে তুলতে পারে, সে বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু সেটা দেখে যাওয়ার কি সুযোগ আমার হবে ভাই? ততদিন কি আর বেঁচে থাকব" ?

৩০শে আগষ্ট দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে কেবল মাত্র সান বাঁধান বিছানাটার ওপর শরীরটাকে টান-টান ক'রে মেলে দিয়ে কড়ি কাঠের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কানাই যেন কি একটা চিন্তা করছে।

মেট, সোজাসুজি তার বিছানাটার কাছে এসে, লুকিয়ে সত্যেনের চিরকুটখানা তার হাতে দিয়েই, অন্য দু'একজনের ওষুধ পত্র তাঁদের হাতে পৌঁছে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাগজের টুকরটা হাতে পেয়েই সে বিছানার ওপর উঠে বসল।

গ্রুপের আর যে তিনজন ছিল, তাদের কাছে খবরটা দিয়ে এসে বিছানাটাতে আবার শুয়ে পড়ল।

ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতেই পেট ধ'রে ভীষণ কাতরান সুরু ক'রে দিল। মাঝে মাঝে খুব ছট্‌ফট্‌ করছে প্রাণটা যেন এখুনি বেরিয়ে যায় এমনি ভাব। নিজের তিন বন্ধু এবং দলের অন্যেরা অনেকেই তার বিছানার কাছে ছুটে এল।

ঘরটার মধ্যে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। হাসপাতালে খবর ছুটল।

ডাক্তার এসে তার ঐ অবস্থা দেখে ভেবাচাকা খেয়ে কিছুক্ষণ খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ঐ মুহূর্তে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। কলিকের বেদনা ব'লে সন্দেহ করলেন। তিনি তখনই হাসপাতালে ফিরে গিয়ে, মেট, পাহারাকে দিয়ে ষ্ট্রেচার পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে নিয়ে যেতে।

যেই তারা কানাইকে বিছানা থেকে ষ্ট্রেচারে তুলেছে, অবিনাশ বললে—"উপেনদা, হেমদা চান না সে হাসপাতালে যায়। অরবিন্দ ঘোষ নাকি এঁদের ওপচ ভার দিয়েছেন, ফুস কথায় রোগের ছুতানাতা ক'রে কেউ যেন হাসপাতালে গিয়ে, ভাল খাওয়ার লোভে ভর্ত্তি না হয়"।

অবিনাশকে খেঁচিয়ে উঠে কানাইলাল হাসপাতালে চলে গেল। রিভলবার দুটো সত্যেনের সঙ্গেই সে হাসপাতালে পাচার করেছে আগেভাগেই।

সত্যেন সে দুটোকে খুব সাবধানের সঙ্গেই তার মাথার নীচে তোসকের তলে লুকিয়ে রেখেছে।

সকালের দিকটায় হাসপালের সকলেই বেশ একটু ব্যস্ত। জেল সুপার সকাল ন'টায় সাপ্তাহিক বেঁাদে আসবেন।

সকাল হতেই দুই মহারথ, সত্যেন আর কানাইলাল তৈরী হয়ে নিল। সত্যেন অসুস্থ ব'লে ৩৮০ বোরের ছোট রিভলবারটা নিল। অস্‌বর্ণ কোম্পানীর তৈরী। তাতে ছিল মাত্র একটা গুলী।

সে বললে—ঠিক মত বুকে লাগাতে পারলেই এটাতেই কাজ হবে।

কানাই নিল আর. আই. সি (R. I. C.) ৪৫০ বোরের বড় রিভলবারটি। তাতে ছিল চারটি গুলী।

অধীর আগ্রহে কানাইলাল ছট্‌ফট্‌ করছে।

—সাড়ে সাতটা বেজে গেল, কৈ নরেনের তো দেখাই নেই! আসবে তো? সত্যেনকে যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

কানাইয়ের ভাব গতিক দেখে, নরেনের লেখা কাগজের টুকরাখানা বিছানার নীচ থেকে বার করে তার হাতে দিয়ে সত্যেন বললে এই দেখ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিকই তো! ৩১শে আগষ্ট ১৯০৮ সাল, সকাল সাড়ে

সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই তো নরেনের এখানে আসার কথা। তবে কেন দেরী হচ্ছে ?

সত্যেনকে ঘরে থাকতে বলে কানাই সামনের বারান্দায় গিয়ে অধীর আগ্রহে পাইচারী করতে সুরু করল। এই বুঝি আসে। নজর পড়ে আছে হাসপাতালে ঢুকবার ফটকের ওপর।

হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"মামা! নরেন আসছে। ঐ আসে, ঐ আসে, ঐ আসে হরষে। তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি"।

হাসি হাসি মুখে নরেন এসে হাসপাতালে ঢুকল। সঙ্গে তার ইউরেসিয়ান কনভিক্ট ওয়ার্ডার হিগিন্স পাহারায়।

নরেন বারান্দার ওপর উঠে আসতেই কানাইলাল একটু হেসে, আঙ্গুল দিয়ে সত্যেনের ঘরটার দিকে দেখিয়ে দিল।

এবার তার ছট্‌ফটানি আরও বেড়ে গেছে। সত্যেন কতক্ষণে কাজ শেষ করে। সে দ্রুত পায়চারী সুরু করে দিল। পাহারা দিতে লাগল দরজাটার সামনে।

সত্যেন ওয়ার্ডের দরজাটা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে, নরেনকে স্বাগত জানিয়ে তার একখানা হাত ধরে, বিছানাটার ওপর নিয়ে গিয়ে বসাল।

হিগিন্স নরেনের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ওপরওয়ালার বোধ হয় সেই রকমই আদেশ।

হঠাৎ কম্পাউণ্ডার এসে কানাইলালকে ডাকল ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওষুধ খেয়ে আসতে।

কম্পাউণ্ডারের কথা কানাইয়ের যেন কানেই যাচ্ছে না।

পুনঃপুনঃ ডাকাতে সে কিঞ্চিত উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি মশায় ওষুধ টষুধ খাব না, আপনি যান। অসুখ টসুখ আমার কিছু নেই"।

কম্পাউণ্ডার নাছোড়বান্দা। একটু পরেই বড় সাহেব রাউণ্ডে আসবেন। নালিস হয়ে গেলে তো তার চাকরী নিয়ে টানাটানি

পড়ে যাবে। তার ওপর সি. এম. ও তো আছেনই! একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব তার দোসর!

আবার অনুরোধ ক'রল, বড্ডই কাকুতি মিনতি করে।

কানাই বললে—"কাল আমার কলিকের ব্যথা উঠেছিল, আজ তার কী?"

কম্পাউণ্ডারের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্য্যন্ত তাকে যেতেই হ'ল ডিসপেনসারীতে।

—আমার জন্যে বেচারা কেন বিপদে পড়ে!

বিশেষ অনিচ্ছে সত্ত্বেও সে গেল। মনটা তার প'ড়ে আছে নরেনের ওপর।

সত্যেন আর নরেন পাশাপাশি ব'সে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

পকেটের মধ্যে হাত পুরে রিভলবারটা টেনে বার ক'রে যেই সে নরেনের বুকে মারতে যাবে, হিগিন্স ছুটে এসে বাধা দেওয়ায় হাতখানা তার সরে গেল। গুলী গিয়ে নরেনের উরুতে লাগল। দ্বিতীয় গুলী তো আর নেই যে, সে আবার প্রয়োগ করবে!

নরেন ঐ অবস্থায় রক্তাক্ত উরু নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দৌড়ে পালিয়ে গেল হাসপাতালের বাহিরে।

সত্যেন তার পেছু নিল। হিগিন্সের হাতে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে সে সত্যেনকে বাধা দেয়। আততায়ীকে নিরস্ত করতে বাধ্য হয়ে সে তাকে, সজোরে একটা ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল।

গুলীর আওয়াজ পেয়ে রিভলবারটা হাতে নিয়ে কানাই ডিসপেন-সারী থেকে ছুটে এল।

দেখে সত্যেন মাটিতে পড়ে।

—যাঃ সর্ব্বনাশ! নরেন পালিয়েছে! কোথায় গেল? কোন দিকে গেল সে? নিশ্চয় হাসপাতালের বাইরে?

কাল বিলম্ব না ক'রে সে ছুটে গেল হাসপাতালের ফটকের সামনে।

রিভলবার উঁচিয়ে ধরে দরজায় ওপর বেটন হাতে প্রহরারত ওয়ার্ডারকে প্রশ্ন করল—'নরেন কোন দিকে গেল ?'

প্রাণের ভয়ে সে, কানাইকে নরেনের পালানর পথটা অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দিল। হাতে বন্দুক কিম্বা রিভলবার থাকলে বাধা দিতে পারত হয়তো কারারক্ষী।*

রিভলবারের নলটা সামনে রেখে কানাই ছুটল তার পেছনে।

হিগিন্স ছুটেছে কানাইলালের পেছনে।

যেই-সে বাধা দিতে গেল, কানাই গুলী চালাল।

হিগিন্সের একটা আঙ্গুল গেল উড়ে। কানাইয়ের হাত ধরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা তার ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। সে নিজের হাতখানা, আর একখানা হাত দিয়ে চেপে ধরে সেইখানেই বসে পড়ল।

উন্মত্ত জিঘাংসার লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে নরেনের পেছনে ছুটেছে সে, কোন বাধাকেই বরদাস্ত করতে চায়না শত শার্দ্দুলের শক্তি তার শরীরে যেন ভর করেছে।

কনভিক্ট ওভারসিয়ার লিণ্টন আসছিল হাসপাতালের দিকে। সামনে প'ড়ে সে আটকাতে গেল। কানাইলালের রিভলবারের বাঁট খেয়ে তার মাথাটা গেল ফেটে।

আর কেউ এগোতে সাহস করল না। কে জানে তার রিভলবারে কটা গুলী আছে !

* Swords, bayonets and firearms shall only be taken inside the Jail at "alarms", in which case the armed officers and warders shall march into the Jail in a body.

Any officer or warder carrying his sward, bayonet or muskets inside the Jail, when on ordinary duty, will be liable to punishment. (Jail code: Page 106. Entry into the Jail with arms. Rue 382).

দূরে সে নরেনকে দেখতে পেয়েছে, উর্দ্ধশ্বাসে তার পেছু নিল

ব্যর্থ প্রচেষ্টা।—কি ভীষণ মনঃ ক্ষোভ সত্যেনের !

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে গোলকাকৃতি দেহখানাকে টানতে টানতে শ্লথগতিতে জেলারবাবু, কাঠের বড় ফটকের একটা পাল্লার কিছুটা খুলিয়ে কারাগারের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছেন—সঙ্গে বিশাল রক্ষীবাহিনী। চিফ হেডওয়ার্ডার, ওয়ার্ডার, এসিষ্টেন্ট জেলার প্রভৃতি।

চুয়াল্লিশ ডিগ্রী ছাড়িয়ে হাসপাতালের রাস্তায় তখন।

নরেনকে ঐ অবস্থায় ছুটে আসতে দেখে, থমকে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কি হয়েছে?'

নরেন চলতে চলতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পিছনেব দিকে দেখিয়ে আর্ত্ত-কণ্ঠে বললে—'ঐযে আসছে! ঐ ঐ ঐ দেখ···'!

সামনে তাকাতেই তাঁদের সকলের নজর গিয়ে পড়ল' কানাই-লালের ওপর; রিভলবার উঁচিয়ে তাকে তাড়া ক'রে আসছে।

কানাইয়ের উন্মত্ত অবস্থা দেখে রক্ষাবাহিনী প্রাণ বাঁচাতে যে, যে দিকে পারল ছুটে পালাল। জেলার পড়ি কি মরি ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে ঈশ্বর নাম জপতে জপতে সেঁদিয়ে পড়লেন, বাঁ হাতেই ছটি সেলের একটির গহ্বরে। বিশাল বপু বড় জমাদার দৌড়তে গিয়ে ছিটকে পড়ল ড্রেনের ধারে। গড়িয়ে প'ড়ে আশ্রয় নিল বড় ড্রেনের অন্তরালে; কম্পিতস্বরে অনর্গল ঠোঁট কাঁপিয়ে বিড় বিড় ক'রে বলে চলেছে 'জয় রামজী, জয় রামজী', বাকি সকলে নিমেষেয় মধ্যে শত্রুর সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'।

কে জানে কানাইয়ের হাতের গুলী কার দেহটাকে এইমাত্র এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়!

ঈগলের চোখের দৃষ্টি নরেনের ওপর সীমাবদ্ধ। জেল রক্ষী-

বাহিনী কে কোথায় গেল, সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। সে এখ
লক্ষ্য ভেদের চিন্তায় বিভোর।

গুলী গিয়ে বিধল নরেনের পিঠে। শিরদাঁড়াটা গুঁড়ো ক'রে বু
গিয়ে বসল। একবার মাত্র বাবাগো আর্তনাদ ছাড়া তার গলা দি
আর কোন শব্দই বেরুল না। তবুও সে টলতে টলতে এগিয়ে যায়
দ্বিতীয় গুলীটা গিয়ে তার অন্তঃকরণটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিল
ছিট্‌কে পড়ল শ্বেত-সুঠাম দেহটি মুখ থুবড়ে রাস্তার ওপর গোব
ডিগ্রীর কাছে তাঁত-কামানের (তাঁতের কারখানার) সামনে।

কানাই দৌড়ে গিয়ে তার পিঠের ওপর চেপে বসল, তখনও নড়ছে
দেখে।—'বেইমান' ব'লে শেষ গুলীটা আবার বিধিয়ে দিল বিশ্বাস
ঘাতকের পিঠের ডান দিকটায়।

শিকারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বাঘের মত খানিক চুপ চাপ
দেহটার ওপর ব'সে রইল।

—না, না, না, আর নড়ছে না। সব স্থির হয়ে গেছে। বে
মানের তাজা খুনটাকে ধরিত্রী লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করে চক চক
করে চেটে খাচ্ছে! ধমনী তবে স্পন্দনহীন!

নরেনের বুকের কলুষিত রক্ত ধমকে ধমকে ইতস্ততঃ ছিটি
প'ড়ে ধবাধামের ঝিমিয়ে পড়া মাটিটাকে বড়ই উত্তেজিত ক'
তুলেছে।

কানাইয়ের কী উল্লাস! সে যেন বাসুকীর ফণার ওপর
ব'সে আছে।

দক্ষিণ তর্জ্জনী দিয়ে সেই রক্ত নিয়ে ভালে একটি লম্ব
তিলক আঁকল।

পরক্ষণেই চিৎকার ক'রে উঠল—"কই 'মিষ্টার ক্যাবেজ'—বাঁধা
কপি জেলার। রিভলবার হাতে উন্মত্ত কানাইলালকে ছুটে আসতে
দেখে কোথায় শটকান দিলে তুমি? বপুখানা তো তোমার কম নয়।
তাই বুঝি এখানকার বাসিন্দেরা বাঁধাকপি জেলার নাম দিয়েছে

তোমার? কোথায় গেল তোমার চীফহেড ওয়ার্ডার? সেও ভয় পেয়ে পালিয়েছে? তোমার সঙ্গেকার সেপাই সান্ত্রিরাই বা গেল কোথায়! এই বুঝি তোমাদের কারারক্ষার নমুনা? একটা রিভলবার দেখেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালে মহা মহা রথীরা? আমাকে নরেনের পেছনে ধাওয়া করতে দেখে, সামনে থেকে চোঁচা দৌড় দিলে সকলে?

"আমার রিভলবারে আর একটিও গুলী নেই! বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি? এই দেখ, হাত থেকে ফেলে দিয়েছি ওটাকে।

আমাকে তোমরা পাকড়াবে না? এস পাকড়াও! ধরবে এস! শীগ্‌গির এস! আমি খুন করেছি। নরেনকে আমি খুন করেছি। আমি খুনী! আমি খুনী!"

কী তার উন্মত্ত উল্লাস!

৩১শে আগষ্ট, ১৯০৮ সকাল প্রায় আটটা তখন, নরেন বিদায় হ'ল।

বিপ্লবী নরেন নামের কলঙ্ক ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে ফাঁসীর রজ্জু থেকে বাঁচাল কানাইলাল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান দলকে, নিজে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিয়ে।

অব্যর্থ শিকারের বিদ্রোহী নায়ক ঋত্বিক্ কানাইলাল নতুন পথের সন্ধান দিল বিপ্লবীদের।

আগে ছিল, বিপ্লবী নিজের প্রাণ-বাঁচানর ব্যবস্থা রেখে ইষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করত। কানাই চাইত ঠিক তার উল্টটি—প্রাণটাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে ইষ্ট সিদ্ধি।

এইবার এই পথ ধরে পরের পর এক একটি ঘটনা ঘটতে সুরু হয়ে গেল।

শরতের সকাল। পরিষ্কার তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। প্রকৃতি নতুন

সাজে ঝলমল করছে। বর্ষা বিধৌত ধরণীর লাস্যময়ী মূর্তি! কোথাও মলিনত্বের স্পর্শ মাত্র নেই।

বিপ্লবী দলের অনেকেই তখন স্নানে ব্যস্ত।

হেমচন্দ্র এবং কানাইয়ের নিজস্ব দলের যারা, তারা ওয়ার্ডের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রিভলবারের আওয়াজ তাদের কানে ঠিকই গেছে।

হেমচন্দ্র বললেন—"আওয়াজ তো শুনলাম, কাজ হল কিনা বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ একটা ভীষণ হৈ চৈ হট্টগোল দূর থেকে সকলের কানে ভেসে এল। সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ফুর্‌র্ ফুর্‌র্ হুইসেলের বিপদ সঙ্কেত আর্ত্তনাদ।

কয়েদীদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সবাই এদের জিজ্ঞেস করছে কি হ'ল? এত হৈ চৈ কিসের? কি হয়েছে কি?

—কে যেন মারা পড়েছে!

স্নানে যাঁরা ছিলেন, অনেকে উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে পড়লেন।

স্নানরত অরবিন্দের মনে বা দেহে নেই সে সবের কোন উদ্বেগ উত্তেজনা। মুখে মৃদু হাসি। আপন মনে স্নানই করে যাচ্ছেন। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ নেই।

সেপাইরা ছুটেছে হাসপাতালের দিকে।

কারো স্নান শেষ হয়েছে কারো বা অর্দ্ধ স্নান।

ঐ অবস্থায় বিপ্লবীরা এসে ঢুকে পড়ল নিজেদের খোঁয়াড়ে। না জানে কি হতে আবার কি ঘটে যায়।

পুকুর পাড় দিয়ে একজন দেশওয়ালী মেটকে ছুটতে দেখে জানালার কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বারীন তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—"ব্যাপারটা কি? এত হট্টগোল কিসের? সেপাইরা বাঁশী বাজাচ্ছে কেন?"

উত্তরে সে বললে—"গোঁসাই খতম হো গেয়া।

—কি করে ?

—আওর কেয়া ! আপইকা আদমী উসকো মার দেয়া।

ঢং ঢং ঢং ঢং Alarm Bell বেজে উঠল।

ডিউটি ওয়ার্ডার, সকলকে ঘরের মধ্যে জোড়া জোড়া বসতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে গুনতি নিয়ে ব্যারাকের দরজাটা বাহির থেকে বন্ধ করে দিল।

বারীন হেমচন্দ্রকে শুধালেন—"ব্যাপারটা কি হে ? তুমি কিছু জান ?"

—খুব পরিষ্কার স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ! হাসপাতালে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে জান না ? আর কি নরেনের রেহাই আছে ! নিশ্চয় ওরাই ওকে শেষ করেছে।

জেলের অভ্যন্তরের কয়েদীরা যে যেখানে ছিল ইতিমধ্যে জোড়ায় জোড়ায় নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়েছে।

পাগলাঘণ্টি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, মস্ত একখানা টিনের পাতে লেখা তাঁত কামানের নম্বরটা জেলের প্রধান লোহার ফটকের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে, লাঠির মাথায় বাঁধা লাল রঙের চার কোনা একখানা পতাকা তার পাশেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই একদল কারারক্ষী যে যার পোষাকে হাজির ছিল, লাঠি কাঁধে কাঠের বড় ফটক দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় দ্রুত পদে চলে গেল তাঁত কামানের দিকে।

এর কিছু পরেই জেল রিজার্ভের খাকী পোষাক পরা আর এক দল ওয়ার্ডার রাইফেল কাঁধে বাহির থেকে ভেতরে ঢুকে ছুটে গেল একই লক্ষ্যে। পরিচালনা করছে আরমারীর ভার প্রাপ্ত চীফ হেড ওয়ার্ডার তরবারি স্কন্ধে তাদের পাশে পাশে থেকে।

জেলের কয়েকজন কর্ম্মচারী, জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, চীফ মেডিক্যাল অফিসার সকলকেই ঐ একই পথ ধরে যেতে দেখা গেল হাসপাতালের দিকে।

সি. এম. ও নরেনের স্পন্দনহীন দেহটাকে এক নজরে দেখে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ একনাগাড়ে পাগলাঘন্টির ঢং ঢংয়ানি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

বহিঃপ্রাঙ্গনের কর্ম্মরত মেয়াদী আসামীরা দলে দলে ভেতরে এসে, পুকুরপাড়ে বটবৃক্ষের নীচে জোড়ায় জোড়ায় বসে গেল।

মিনিট পনের পরে কানাইলাল আর সত্যেনকে ঘিরে নিয়ে কয়েকজন ওয়ার্ডার সোজা গিয়ে ঢুকল গেটের ভেতর।

নরেনের মৃত দেহটাকে ঘিরে ক'জন সেপাই দাঁড়িয়ে।

সোরগোল পড়ে গেল এক নম্বর ওয়ার্ডে। পুকুর পাড়ের জানালা দিয়ে বড় গেটের সবই দেখা যাচ্ছে।

খানিকপরে সেপাইয়ের দল ওদিক্ ছেড়ে সোজা এসে হাজির হল বড় চৌকোর উল্টো দিকে ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডের সামনে। দুই সারিতে দাঁড়িয়ে গেল এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। মুখে তাদের উত্তেজনামূলক কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সবই প্রায় বাংলা মুলুকের বাইরের লোক। হাতে পেলে তারা যেন বোমার মামলার আসামী-কটাকে ছিঁড়ে ফেলে এই মন ভাব। হাত তাদের নিস্ পিস্ করছে। হুকুম একবার মিললেই হল, পিটিয়ে লোকগুলোকে ছাতু বানিয়ে দেবে।

জেল সুপার মিঃ ইমারসন এসে গেলেন। সঙ্গে রক্ষীবাহিনী। আরও আছেন—জেলার, তিনজন এসিষ্ট্যাণ্ট জেলার আর সেই স্থূলকায় চীফ হেডওয়ার্ডার।

সুপার এবং জেলারের মুখভাবে বেশ কিছুটা পরিবর্ত্তন ভেসে উঠেছে। পূর্ব্বের সে ভাব আর নাই। আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত আসামীদের অনেকেই তা লক্ষ্য করলেন। তাঁদের মুখে কোন

কথা নেই।

দেশওয়ালী বড় জমাদার নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে, দেহের সঙ্গে গলার স্বর মিলিয়ে অন্তর্নিহিত বিক্ষোভের কিছুটা সেইখানেই প্রকাশ করে ফেলল। এই সুবৃহৎ কারাগারের রক্ষীবাহিনীর নায়কের পক্ষে কানাইলালের মুখের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বড়ই অসহ্য লেগেছে তার কাছে। ইচ্ছে ছিল লোকটাকে বেশ ভালভাবে সমঝে দেয় এটা জেলখানা কিন্তু আফসোসের বিষয় হয়েছে 'বড়সাহেব' ঐ দুটো খুনীকে অক্ষত দেহে তাঁর অফিসে পাঠিয়ে দিলেন, বিশেষ পাহারায়, কড়া হুকুম দিয়ে—'এদের গায়ে যেন কেউ হাত না তোলে।'*

পাগলাঘন্টি বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই, ঘরের ভেতর বিপ্লবী দলের যে সব বে-আইনী জিনিষপত্র ছিল, সবই সেখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

ইংরেজ আমলের পর জেল প্রশাসনে ক্রমে ক্রমে অনেক বৈচিত্র্য দেখা গেছে। প্রশাসনের ধারা যেন অন্য খাতে প্রবাহিত হয়ে মজা নদীতে পরিণত হয়েছে। সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথাটি উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি।

সরকারী মনোভাবকে ধন্যবাদ দেব তাদের উদারতার জন্যে। কিন্তু সে উদারতার মূল্য প্রমোশন প্রাপ্ত সুপারিনটেণ্ডেন্টদের ভেতর সকলেই কি দিতে পেরেছেন? অনেকেই তা পারেন নি। তার নজীর পশ্চিমবাংলার জেলখানার ভেতর একের পর একটি বীভৎস ঘটনা ঘটে যাওয়া।

জেলের অভ্যন্তরে প্রশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করাতেও কানাইলাল এবং সত্যেনের গায়ে, বিচারের আগে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দিলেন না মিঃ ইমার্সন। এমন কি এই ব্যাপারের সূত্র ধরে ঐ দলের কোন আসামীর ওপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার উৎপীড়ন হল না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের বাঙলা জেলে এ ঘটনার বিন্দুমাত্র ঘটলেও, কি অবস্থা দাডাত বলা বাহুল্য।

ইমার্সন হুকুম দিলেন ওয়ার্ডের দরজা খুলতে।

জোড়ায় জোড়ায় সকলকে এনে ঘরের বাইরে বসান হ'ল। অন্য ঘর থেকে অরবিন্দ এবং তাঁর সহবাসীদের এনে সেখানেই বসান হ'ল।

আসবাবপত্র ছত্রাকার ক'রে ব্যাপক তল্লাসী সুরু হয়ে গেল। ওপরের ঘুলঘুলিতে লুকান কয়েকটি টাকা ছাড়া আর কিছুই মিলল না তাদের কাছ থেকে।

ইমার্সন চরিত্রে সহসা আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হ'ল। তাঁরই হুকুমে বোমার মামলার প্রতিটি আসামীকে প্রায় অর্দ্ধনগ্ন করে তল্লাসী করল সেপাইরা। সেখানেও তারা নিরাশ হ'ল।

এ বাদ হ'লে পাগলাঘন্টী বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডারেরা হয়তো বা উত্তেজিত হয়ে কানাইয়ের ঐ অপরাধী দেহটাকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফেলতো। সত্যেনকেও বাদ দিত না।

স্বাধীনতা লাভের পর তারা যে নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে ওয়ার্ডারেরা এমার্সনের সময় জেলের ভেতরে ঢুকে ক্ষেত্র বিশেষে শাসন যন্ত্রটাকে নিজেদের হাতেই তুলে নেয়, লাঠি পেটা ক'রে নিরস্ত্র অবস্থায় বন্দীদের কুকুর বেড়ালের মত মারতে সুরু করে। এর ফলে কেউ বা প্রাণ হারায়। জেল কোডের নিয়ম মাফিক যার জান যাবে না। জেল কোড (Jail Code) যখন সুযোগই দিয়ে রেখেছে, কোন বন্দীকে পালাতে অথবা মার মুখী হ'তে দেখলে অবাধে গুলী চালিয়ে তাদের ধরাশায়ী করা যায়, তবে কেন তাদের ওপর এই নির্মম অত্যাচারে জীবন হানি ঘটান? এ রকম নৃশংসভাবে হত্যা করবার অধিকার কে তাদের দেয়? এরা ওপর ওয়ালাদের কোন বাধাই মানতে চায় না। আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে যা খুসী তাই করে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বা জেলারের বাধা না মেনেই এঁরা তা করে। পরে এই গিঁট ছাড়াতে কর্ত্তাদের ফাঁপড়ে পড়তে হয়। পরপর একই ঘটনা ঘটে গেল কয়েকটা জেলে ঐ একই উপায় অবলম্বনে। এর কারণ কী? দোষীকে শাস্তি কি অন্য উপায়ে দেওয়া যেত না?

তল্লাসী ও গুণতি শেষে পুনরায় সকলকে ওয়ার্ড বন্দী ক'রে রক্ষী-বাহিনী এবং কর্তা ব্যক্তিরা ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খানিক বাদেই কাঠের প্রধান ফটকের পাশে ঝোলান বৃহৎ ঘণ্টাটার ঠংঠংয়ানী আওয়াজ থেমে গিয়ে পুনরায় ঠং ঠং ঠং শব্দে তিন ঘন্টিতে all clear signal দেওয়া হল।

আবার শুরু হয়ে গেল কারাগারের নিত্যনৈমিত্তিকের গতানুগতিক কাজকর্ম্ম।

২৪-পরগণা পুলিস রিজার্ভ ফোর্সের যারা এসে এলার্মের সময় কারা প্রাচীরের বাইরের চতুর্দিক এতক্ষণ ঘিরে রেখেছিল, তাদের একজন অফিসার এসে পুলিস 'কমাণ্ডের' কাগজখানায়, তাদের সময় মত উপস্থিতি জেল থেকে সই করিয়ে নিয়ে সদলবলে ফিরে গেল।

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই কর্ম্মফলের শেষ শুনানী বুকে নিয়ে [illegible]

[illegible] অপরাধের শাস্তি ভোগও এঁদের [illegible]

[illegible] কোন্ সুনজরে [illegible] নিয়ে এবং এই [illegible] কাজ করার সুযোগ না। [illegible]

[illegible] এই সব ঘটনা দেখে ও [illegible] সন্ধ্যায় [illegible] চোখ মুখ কুলুপ এঁটে [illegible] কিন্তু আর আর কেন? পারবো আপন কিছুটা।

ইংরেজ আমলের শেষ দিকেও দেখেছি মিলিটারী জেল সুপারিনটেণ্ডেন্টদের দাপটে প্রশাসন কাঁপত। পাগলা ঘন্টির গুরুত্ব যত বেশীই হোক না কেন, কর্তৃপক্ষের নিকট হুকুম মেলার পূর্বে প্রশাসন দণ্ড নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার সাহস কারারক্ষীদের কোন দিনই হত না।

বাংলার সরকারের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না আশা করি।

নিশ্চয় সুন্দর হয়ে উঠবে জেল প্রশাসন।

নরকের পথে পা বাড়িয়েছে। এ খবর বাতাসের আগে কারাপ্রাচী-রের বাইরে চলে গেল।

নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত ভারতবাসীর কণ্ঠে কানাইলালেয় স্তুতিগান আকাশ বাতাস মুখরিত করল।

মতিলাল রায় উল্লোসিত হয়ে জনসভায় কানাইলালের জয়গান গেয়ে বললেন—"ভারতের জাতীয় মন্দির যদি কখনও গগণচুম্বী চূড়া বিস্তার করে আত্মমহিমা প্রচারে সমর্থ হয়, তবে সে দিন সে মন্দিরে ভারতবাসী কানাইলালের মর্ম্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে…।"

বারীন্দ্রের সংগঠনে পর পর কয়েকটি ব্যর্থতার মধ্যে চূড়ান্ত সার্থকতার এই প্রথম জয়ধ্বজা উড়ল। তাই বুঝি এই পবিত্র দিনটি থেকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হাসি মুখে নতুন করে হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লিখতে সুরু করেছিলেন!

বিধাতার অব্যর্থ নির্দ্দেশ পালন ক'রে কানাই হ'ল চিরবরেণ্য।

কানাইলাল জেলের ভেতর গুলী ক'রে মেরেছে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে, একথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে মুখে। দেশবাসীর সে কী আনন্দ! সর্ব্বত্রই দলে দলে ঐ একই আলোচনা। কারো মুখে এছাড়া কোন কথাই নেই।

পথে পথে নাচন-কোঁদন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কেউবা লজ্জা সরম জলাঞ্জলী দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায়, পরনের ধুতিখানা মাথায় জড়িয়ে নৃত্য সুরু ক'রে দিল।

এই খানেই এর শেষ হয়নি।

খবর পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ "বেঙ্গলী" অফিসে বসে প্রচুর সন্দেশ বিলি করলেন।

কানাইলালের প্রশস্তি ইংরিজী "পাইওনিয়ার" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও বড় বড় হরফে আত্মপ্রকাশ করল, যার বাঙলা ভাষায় সারমর্ম্ম এই—"নরেন্দ্রনাথ আত্মরক্ষার জন্যে, তার দলের সকলের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সেখানে দাঁড়াবার অবসর পেলে

পাছে সে আরও ক্ষতি করে সেই জন্যে, সে সুযোগ আসার আগেই তারা তাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিল। এক্ষেত্রে একের নিধনে বহু লোক উদ্ধার পেয়ে গেল। ওরা সহচরদের মঙ্গলের জন্যেই নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করবে জেনে অকুতোভয়ে জীবন উৎসর্গ করেছে।"

এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে "Pioneer" এর আর একদিনের মন্তব্য—"The shooting of the informer is indeed murder, but it is also self devotion. It is a case of his life against the lives of the others and the two assassins resolved to sacrifice themselves for the sake of the rest. If Bengalis like to enthrone those two young men hereafter in popular remembrance, it is not easily to see how any one can justly object to the action."

স্বদেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে সমগোত্রীয় "পাইওনিয়ারের" এই প্রকার মন্তব্যে "ইংলিশম্যান" এবং "ষ্টেটসম্যান" বিশেষ ক্ষিপ্ত হয়ে বারংবার বিষ উদ্গিরণে, সরকারী মহলে, সংবাদপত্রখানিকে বিশেষ হেয় প্রতিপন্ন করাতে চেয়েছিল, কিন্তু এতে ফল কিছু হয়নি।

কেবলই কি ইংরিজী পাইওনিয়ার? বহু ইংরেজ, কানাইলাল এবং সত্যেনের এই বীরত্বপূর্ণ কাজে ভূয়সী প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারেনি।

জেলের হাতার ভেতর থ্যাকারে রোডের ওপর ২৪-পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো। দুর্ঘটনার খবর কানে যেতেই প্রায় তখনই তিনি এসে গেলেন জেলখানায়।

কারা সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ বুকানন, পুলিস কমিশনার মিঃ হ্যালিডে, হোম সেক্রেটারী সকলেই এসে হাজির হ'লেন।

এ যে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! ইংরেজ মসনদ কেঁপে উঠেছে,

আগ্নেয়াস্ত্র একটি নয়, দু দুটির, কারা প্রাচীরের অন্তরালে প্রবেশ করা মানে এদের অস্তিত্বের আর কি রইল! ওপর মহলের এবার ভাল ক'রেই টনক নড়ল।

কানাইলাল এবং সত্যেনকে নানান ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে মিষ্টি কথায়, চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েও এঁরা এদের মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারলেন না। এরা শেষে পরিষ্কার বলে দিল—"ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ালেও কিছু বলব না, তোমরা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

লালবাজারে খবর গিয়ে পৌঁছাতেই সাদা পোষাকে গোয়েন্দা পুলিশ ছেয়ে ফেলল জেলের বাহিরের কোণা কানচি। কে এদের এনে দিল রিভলবার দুটি? এই তাদের মনে প্রশ্ন! সামান্য গন্ধপেলেই গেঁথে ফেলবে তাকে।

কাকস্য পরিবেদনা! কে এনে দিতে যাচ্ছে ইংরেজ পদলেহী টিকটিকির দলকে সে খবর!

কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্কন্ধে চাপল আর একখানি ক'রে ওয়ারেন্ট, ভারতীয় পেনাল কোডের ৩০২, ১০৯ ইত্যাদি ইত্যাদি ধারা সেই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট জুড়ে দিয়েছেন 'আর্মস আক্ট'। দোষী প্রমাণের ঢঙে এই সব ফৌজদারী আইনের কবলীভূত করা হ'ল তাদের!

চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর এক নম্বর, দু নম্বর কুটরী দুটো খালি করতে লোক ছুটেছে।

সত্যেন আর কানাইকে এনে পোরা হ'ল দু নম্বর আর এক নম্বর সেলে।

স্পেশাল ওয়াচার বসান হ'ল এদের ওপর। সেই সঙ্গে যত রকম আইনের মার পেঁচে তাদের শ্বাস বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হ'ল। দিন রাতে একটিবার মাত্র সকালের দিকে সামনের ছোট্ট উঠোনটিতে বেরুতে

পায় তারা, কেবল মাত্র স্নানের সময়ে লোহার দরজা খোলা হ'লে। অন্য সব সময় ঐ তিন দিক বন্ধ আলো-বাতাসহীন ঘরটিতে একা একা। এ কষ্টকে এরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যৎ জেনেইতো এরা প্রস্তুত হয়েছে। কি এর পরিণতি তা তো জানেই এরা। এর পর মুখের ওপর দিয়ে সেলের সংলগ্ন ছোট উঠোনের দরজাটাও বন্ধ হ'ল। সলিটারি কনফাইনমেন্ট। সরকারী কোন আদেশের বলে নয়, জেল সুপারের হুকুমে—এদের কার্য্য কলাপে।

কড়া সরকারী কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে জেলের সুপার মিঃ ইমার্সন, সি. এম. ও ডাঃ ডায়েলী এবং জেলার যোগেন ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে, "কেন এই দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহীদের চুয়াল্লিশ ডিগ্রী থেকে অন্যত্র সরান হয়েছিল? কেন তাদের এত সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়েছিল? কিভাবে জেল খানায় আগ্নেয়াস্ত্র প্রবেশ করতে পারে? এই সব অব্যবস্থার জন্য কেন জেলারের চাকরী যাবে না?" ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব কারণ দর্শিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে।

বোমার মামলার আসামীদের ওপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। পাঠান পুলিস দিয়ে তাদের ব্যারাকটিকে ঘিরে রাখা হ'ল বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। বোঝা গেল জেল কর্ত্তৃপক্ষের ওপর গোয়েন্দা বিভাগ ডাণ্ডা ঘুরচ্ছে।

তড়িৎ ঘড়িৎ জেলখানায় লাল মুখ কারারক্ষী আমদানি হ'ল।

একজন চিফ ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, চারজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার নতুন চাকরী নিয়ে এসে ঢুকল জেল খানায়। এদের সম্পূর্ণ পাহারার ভার পড়ল বোমার মামলার আসমীদের ওপর। এরা সকলেই মিলিটারী ফেরৎ।

স্নানের সময় ছাড়া দিবারাত্র ব্যারাকবন্দী সকলে।

নরেন মারা পড়বার পর এই ভাবেই পাঁচ দিন কাটল এই দলের।

এরপর দিন ভোর হ'তে না হতেই এক এক জন করে টেনে এনে চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর এক একটি খোপে এক এক জনকে ভরা হ'ল।

অরবিন্দ সব সময়ে চুপচাপ যোগ সাধনায় থাকেন দেখে, এঁকে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হ'ল চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর হাতার কাছাকাছি বাইরেকার ছ'টি সেলের প্রথমটিতেই।

কয়েক দিনের ভেতর ওই সুবৃহৎ সেল প্রাঙ্গণে ঘাঘরা পরা মাথায় হেলমেট ধারী জনা কতক ফিরিঙ্গী হাই ল্যাণ্ডারের পাহারা পড়ল। সরকারী বিশেষ হুকুমে রাইফেলের ডগায় সঙ্গীন চড়িয়ে সেটিকে কাঁধে ফেলে ছুটি ছুটি ক'রে সব সময়ের জন্যে এক থেকে চুয়াল্লিশ আর চুয়াল্লিশ থেকে এক, অবিরাম পদ চালনা করে চলে এরা।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আর চীফ মেডিক্যাল অফিসারের চাকরী নিয়ে টানাটানি চলেছে।

জেলার যোগেনবাবু বেচারা বৃদ্ধ বয়সে চাকুরী এবং পেনসন দুই খুইয়ে, তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীর হাত ধরে জেল থেকে বিদায় হলেন।

তাঁর জায়গায় আন্দামান থেকে এসে বসল ইংরেজ জেলার।

এই থেকেই প্রেসিডেন্সী জেল (তখনকার আলিপুর জেল) আর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ইউরোপীয়ান জেলার, আর হল গুটি কতক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের আমদানি।

জেল কোডের এক পেশে আইন কানুনের কোপে প'ড়ে যোগেনবাবু শত অপরাধেব বোঝা মাথায় নিয়ে হাপুস নয়নে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিতাড়িত হলেন।

জেল কোডের এমনই আইন—সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সবার মাথার ওপর বসে ডাণ্ডা ঘুরবেন, কিন্তু প্রশাসনীয় অপরাধের আঁচ তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করবে না

লিখিত পড়িতের দিকে তিনি বড় একটা যান না। মিনিট করতে বললেই জেলারের সঙ্গে লাগল খচাখচি। জলে বাস করে

কুমিরের সঙ্গে বিবাদ ? তাতে আবার লাল মুখ! হুকুম দেবার পুর অধিকার তাঁর ; ভুল থাকলে মাসুল দেবে আর একজন। এএক অদ্ভুত ব্যাপার।

মাস খানেকের মধ্যেই বাইরের প্রাচীরের চুড়ায় চুড়ায় কুটরী বানিয়ে মিলিটারী পাহারা বসান হ'ল।

ডিগ্রীতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। প্রাণ ওষ্ঠাগত মানিকতলা বোমার মামলার আসামীদের। কানাই-সত্যেনকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছে, বোমার মামলায় আসামীরা এখানে ঢুকে ঐ একই অবস্থায় থাকল, কণামাত্র কম বেশী নয়। এর ওপর, সামসুল এবং তার দলের পুলিসের লোকেরা মাঝে মধ্যে এর ওর ডিগ্রীতে গিয়ে উৎপাত সুরু করলেন।

অসুখ বিসুখে এই খানেই পড়ে থেকে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, হাসপাতালে যাওয়ার নামটি কেউ মুখে আনতে পারে না।

দ্বিতীয় বার ডিগ্রীজাত হওয়ার পর দু' একদিন ছেলে ছোকরারা আপন মনে একা একা হল্লা চিৎকার, জীব জন্তুর ডাক সুরু করে ছিল কুটরীর মধ্যে কিন্তু চিফ ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার উইল্‌স্‌য়ের ধমকানী ও ভয় দেখানোতে সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

হেমচন্দ্র নাকি দেয়ালে টোকা দিয়ে ইংরিজী অক্ষরের মাধ্যমে ঘরে ঘরে নিজেদের মধ্যে কথা বলার একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন নির্ব্বাসন যন্ত্রণাকে কিছুটা প্রশমিত করবার জন্যে।

এইভাবে বিপ্লবীদের দুঃখের দিন অতিবাহিত হ'তে লাগল। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর বিভীষিকা তিলে-তিলে মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করতে লাগল সকলে। কোথায় গেল ইমার্সনের সহানুভূতি, কোথায় গেল ডায়েলীর সে মিষ্ট ব্যবহার-দরাজ হাতে extra diet লেখা History Ticket এ।

অন্য দিকে ২৪-পরগণা জেলা দেওয়ানী আদালতে সাজ-সাজ রব

উঠেছে। দেওয়ানী ফৌজদারী দুই-মামলাই চলে এখানে জজের কাছে।

কাছারি বাড়ির একটি সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠকে ঢেলে সাজান হচ্ছে। এই খানেই ২৪-পরগণা জেলা এবং দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফ্‌ট আলিপুর বোমার মামলার বিচার করবেন।

জজের আসনের ডান পাশেই মস্ত একটা জায়গাকে ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত আষ্টে-পৃষ্ঠে জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। খান চার পাঁচ লম্বা বেঞ্চ, যাতে এর ভেতরে পড়তে পারে তার ভাল মত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বেঞ্চতেই আসামীরা এসে বসবে বিচারের সময়। দু পক্ষের উকিল-ব্যারিষ্টার, জুরীদের বসবার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সাক্ষীর কাঠগড়াটাও ঐ জালের খাঁচার উল্টদিকে জজের আসনের বাঁপাশে দেখা যাচ্ছে।

নতুন লাল সালু দিয়ে জজের উঁচু আসনের সামনেকার তিন পাশের কাঠের রেলিং বেশ ভাল ভাবে, ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত মুড়ে দেওয়া হয়েছে।

রেলিংয়ের ভেতর এক পাশে পেশকার আর এক পাশে দুজন জুরী বসবেন জজের আসনের সামান্য নীচে।

এজলাসের ব্যবস্থা মোটামুটি শেষ ক'রে এনেছে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

জেলে, পূর্ব্বের সুখ সুবিধে সব লোপ পেয়েছে এদের কাছ থেকে। এই দুর্বিবসহ অবস্থায় আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখে, কটা কথা ব'লে যে মনটাকে খানিক হালকা করবে, তাও শিকেয় উঠেছে বিপ্লবীদের। এরই মধ্যে সামান্য একটু সুবিধে দেওয়া হয়েছে; চিঠি পত্র আদান প্রদান না করলে, পনের দিনে আপন জনের সঙ্গে একবার মিনিট কয়েকের জন্যে দেখা হওয়ার। সেও আবার তেমনি কড়াকড়ির ভেতর—তেমনি জায়গায়।

একটা ঘরের মাঝখানে দু'দিকে কড়িকাঠ থেকে নীচ'দিকে মেঝে

পর্য্যন্ত জাল আঁটা, মাছি পর্য্যন্ত যে ফুটোর মধ্যে দিয়ে যেতে পারেনা। তার ফাঁকে এমুড় থেকে ওমুড় অব্দি চার ফিট চওড়া লম্বা খালি জায়গা। সেই ফাঁকটিতে জেলার, টেবিল নিয়ে ব'সে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করবেন। জেলের ভেতর থেকে বন্দী এসে দাঁড়াবে জালের ভেতর পাশে, বাইরে দিকে মুখ ক'রে। সাক্ষাৎকারী বহিপ্রাঙ্গনের দরজা দিয়ে ঐ ঘরে প্রবেশ ক'রে জালের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে বন্দী আত্মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা করবে। একত্রে চার পাঁচজন বন্দীর আপন জনের সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা কওয়া; এমনই চেঁচিয়ে দূর থেকে কথা ছোড়া ছুড়ে হয়, ঠিক যেন মেছো হাটা। অর্দ্ধেক কথা কানে আসে, অর্দ্ধেক যায় না কানে। আবেদন নিবেদনে কোন ফল হয় না।--ইচ্ছে হয় দেখা কর না হয় ক'র না!

॥ ছেষট্টি ॥

দুর্ধর্ষ যুবক দুটিকে বিচারের জন্যে প্রত্যহ আলিপুর কোর্টে নিয়ে যাওয়া যুক্তি যুক্ত হবে কিনা, এই নিয়ে সরকারী মহল বিশেষ চিন্তায় পড়ল। 'জেলের বাইরে বেরুতে পারলে আবার যদি এরা কিছু ঘটিয়ে বসে! এদের অসাধ্য তো কিছুই নয়? কাজ কি বাবা যেচে বিপদ ডেকে আনা! তার চেয়ে জেলের ভিতরেই কোর্ট বসিয়ে এ দুটোর বিচার শেষ ক'রে দেওয়া যাক! রায় যে কি হবে ওরাও জানে —অপরাধীরাও জানে। কোর্ট একটা না বসালেই নয় তাই!'

নরেন গোঁসাই হত্যার মামলা সুরু হ'ল আলিপুর জেলের ভেতরেই।

জেলের প্রধান ফটকের সংলগ্ন অফিস বাড়ির পেছনকার একখানা লম্বা কামরায় কোর্ট বসল।

দুপক্ষের উকিল, ব্যারিষ্টার, সাক্ষী, দলবল নিয়ে বিচারক সকলেই এই ঘরটির ভেতর ভীড় জমান। প্রহরীবেষ্টিত আসামী কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সেল থেকে বার ক'রে এনে হাজির করা হয় ভেতর দিকে ঐ ঘরের সামনেকার বারান্দায় লোহার মোটা মোটা গরাদওয়ালা তালা মারা দরজার সামনে। সেইখান থেকেই তারা বিচার সভা দেখে এবং বিচারের প্রহশন শোনে। তারাতো আগে থেকেই নিজেদের ভাগ্যের ফলাফল জেনে বসে আছে।

সামান্য দু'চার দিন বিচার চালিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী মামলার আসামী দুটিকে দায়রা সোপর্দ্দ করলেন।

নরেন হত্যার আসামীদের বিচারের জন্যে বিশেষ নিযুক্ত দায়রা

জজ খুনী আসামী কানাইলাল আর সত্যেন্দ্রনাথের নথীপত্র ঘেঁটে জেলের ভেতর ঐ সাজান এজলাসেই তাদের বিচার সুরু করলেন।

কে শত্রু, কে মিত্র কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। আলিপুর বোমার মামলার দায়রায় বিচার সুরু হতে আর মাত্র কটা দিন বাকি। কোথায় যে শত্রু ভাল মানুষটি সেজে বসে আছে কে জানে! কোর্টের মধ্যে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিলেই তো হ'ল? বাঙালী জাতটাকে বুঝে ওঠা কঠিন!

বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে আলিপুর দেওয়ানী আদালতে দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফ্‌টের এজলাসে মানিকতলা বোমার মামলা সুরু হ'ল।

দু পক্ষের ব্যারিষ্টার, উকিল, পাবলিক প্রসিকিউটার, পুলিস কর্ম্মচারী কোর্টের লোকজন, দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র, প্রমাণের জন্যে যা কিছু মামলায় প্রয়োজন সবই এসে জড়ো হচ্ছে।

ভেনটিলেটার লাগান আপাদ মস্তক ঢাকা কাল রংয়ের কয়েদ গাড়ি বোঝাই ক'রে এই মামলায় জড়িত ৩৬ জন আসামীকে এনে সারিবদ্ধ ভাবে ঘরে ঢুকিয়ে বেঞ্চিপাড়া জালের খাঁচাটার ভেতর পুলিশ এক এক করে গুণে ভরে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করল। একই সূত্রে জড়িত আসামী হলেও কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মুখ এদের ভেতর দেখা গেল না।

জালের সামনে রাইফেল স্কন্ধে পুলিস, পাহারায় নিযুক্ত। রিভলবার হাতে লালমুখ, সার্জেন্ট ঘুরছে। সাদা পোষাকে বাঙালী গোয়েন্দার ছড়াছড়ি। এজলাসের বহিপ্রাঙ্গনে বন্দুকধারী পুলিসের দল ঘোরা ফেরা করছে।

এই ভারত বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলার সুরু হ'ল ১৯শে অক্টোবর ১৯০৮।

বীচক্রফ্‌টের, অনুসন্ধিৎসু চক্ষু দুটি জালের ভেতর লক্ষ্য ক'রে সমানে ঘোরা ফেরা করছে। কাকে যেন খুঁজছে! এই কি সেই বাঙালী অরবিন্দ ঘোষ যে কেমব্রিজে তার সহপাঠী ছিল? যে যুবকটি তারই সঙ্গে সিবিল সার্বিসে প্রথম হয়েও শেষ পরীক্ষায় ইস্তফা দিয়ে ভারতে ফিরে এসেছিল? বেঞ্চের এক কোনে সামান্য গোঁফদাড়ীওয়ালা সাদা সার্ট গায়ে বসে থাকা লোকটির ওপর তাঁর নজর গিয়ে পড়ল। সত্যিই তো তাই? দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হওয়াতে বীচক্রফট চমকে উঠলেন। অরবিন্দ স্মিত হাস্য করলেন।

এই মামলায় জজকে বিচারে সাহায্য করবার জন্যে গভমেণ্ট দু'জন বাঙালী জুরী পাঠিয়েছেন, গুরুদাস বসু আর কেদার নাথ চ্যাটার্জ্জিকে। এঁরাই মামলায় আসেসারের কাজ করবেন।

সরকার পক্ষে কৌসুলী নিযুক্ত হয়েছেন, ফৌজদারী মামলায় বিশেষজ্ঞ সেই ডাক সাইটে ইংরেজ ব্যারিষ্টার ইয়ার্ডলি নর্টন। তাঁর ভাই ব্যারিষ্টার বার্টন তাঁকে সাহায্য করবেন সরকার তরফে। সঙ্গে আছেন উকিল আশুতোষ বিশ্বাস পাবলিক প্রসিকিউটার হিসেবে।

বিপ্লবী পক্ষে মামলা চালাতে এসেছেন প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী আর কে, এন, চৌধুরী। এডভোকেট নীরদ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী এঁদের সাহায্য করছেন।

নর্টনকে এই মামলায় সরকারের দাঁড় করানর উদ্দেশ্য, যে কোন উপায়ে বাক্‌ চাতুরীর দ্বারা অরবিন্দ ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করা।

দেশের কুলাঙ্গার ইংরেজের খয়ের খাঁ ডেপুটি পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্যামসুল আলম সোৎসাহে এগিয়ে এসে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন সরকারের কাছ থেকে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায়।

জেলের ভেতর বিশেষ এক দায়রা আদালতে কানাইলাল আর সত্যেন্দ্রনাথের বিচার চলেছে। সাক্ষীরা, নরেনকে গুলী করে মারার

ব্যাপার নিয়ে যার যা খুসী সে তাই বলে যাচ্ছে। কোন প্রতিবাদ নেই কারো মুখে, সত্যিই বলুক আর মিথ্যেই বলুক এতে এদের কিছু আসে যায় না। বিশেষ ক'রে কানাইয়ের তো সে দিকে কোন কানই নেই। ভাবনা চিন্তা বলে যে বস্তু, কেউ তার ভেতর সে বস্তুটি দেখতে পেল না।

জজ সাহেবের প্রশ্নের জবাব দিতে সে বেশ কৌতুক বোধ করছে।

—নরেন গোঁসাইকে কে খুন করল?

—কেন? আমিইতো তাকে গুলী করে মেরেছি! আপনি কি ভুল কিছু শুনেছেন?

—না। রিভলবার কোথা থেকে পেলে? কে তোমাকে ওটা দিল? জেলের ভেতর ওটা কি করে এল?

—সাক্ষীরা সে খবর দেয়নি বুঝি আপনাকে? ক্ষুদিরামের প্রেতাত্মা ওদের সামনে দিয়েইতো ওটা আমাকে দিয়ে গেল! কারারক্ষীরা কি বোকা দেখুন তো? সে সময়ে কেউ ওরা ওটা দেখতে পেল না!

এই কথা কটা বলেই কানাই অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

জজ ভাবলেন, কানাইলালের মস্তিষ্কের নিশ্চয় বিকার ঘটেছে! তিনি আর তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

পুলিসকে, ম্যাজিষ্ট্রেটকেওতো আগেই বলেছে "ক্ষুদিরামের ভূত আমায় রিভলবারটা দিয়ে গেছে"।

এর পরেও জজ সাহেব কি ক'রে অনুমান করলেন, সে পাগল হয়ে গেছে।

দিন কয়েক বিচার সভা বসিয়ে 'স্পেশাল জাজ' টেনে দিলেন এই বিচারের যবনিকা; কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্র নাথ বসুকে ফাঁসীর দড়িতে তাদের গলাদুটি লটকে দিয়ে ঝুলিয়ে মারার জন্যে।

এই হল তাঁর বিচারের রায়। ২১শে অক্টোবর রায় বেরুল। কানাই এবং সত্যেনকে তাঁর আদেশ পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

নিম্ন আদালতের রায় গেল, হাইকোর্টের অনুমোদনে।

এই আদেশের প্রতিবাদে সাতদিনের ভেতর আসামীর পক্ষ থেকে আপীলের নিয়ম।

সত্যেন আপীল করল।

কানাইলাল লিখে জানিয়ে দিল,"There shall be no appeal, আমি যে মরতে চাই! আপীল করলে যদি বেঁচে যাই! সেটি আমি হতে দিচ্ছি না। আমি পশ্চাতে রেখে যেতে চাই এক নতুন আদর্শ। মরতে আমি কখনই ভয় পাই না। বাঁচবার জন্যে অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের কাছে অনুনয় বিনয় কানাইলাল দত্ত কোন দিনই করবে না। ফাঁসার দড়ি আমি হাসিমুখে গলায় পরে নেব। এর চেয়ে সুখের মৃত্যু আর কি হতে পারে? আমার কাছে এর থেকে শান্তি আর কিছুতে নেই। কবে তোমরা আমাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলচ্ছ? সেই দিনটা তাড়াতাড়ি জানতে পারলে আমি খুবই খুসী হব।"

—শ্যামসুন্দর বাবু এসে গেছেন? বেশ ভালই হ'ল! দেখা করবার জন্যে আপনাকে খবর পাঠিয়ে ছিলুম।

—সেই খবর পেয়েই তো এলাম। উঃ জেলখানায় এসে দেখা করা যে কি বিড়ম্বনা তা ভুক্ত ভোগী ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। সাত দোর ঘুরে তবে হুকুম নামা মিলেছে। শেষ পর্যন্ত বড় সাহেবের পাকা হুকুম মিলল তবেই!

—দেখা করার এত কড়াকড়ি হয়েছে?

—মরজি হল তো কর্ত্তারা দেখা করতে দেবেন, না তো নয়। সেই সকাল থেকে হয়রানি সুরু, নেহাত ভাগ্যের জোর তাই দেখা হয়ে গেল।

—দেখা না হ'লে কিছুটা অসুবিধে তো হতই!

—যাক্। কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি হঠাৎ ডেকে পাঠালেন?

—ডাকবার বিশেষ কারণ না থাকলে অরবিন্দ ঘোষ অযথা কাউকে বিরক্ত করতে চায় না। আপনাকে যে জন্যে, ডেকে ছিলুম! ব্যারিষ্টার দাসের কাছে আপনাকে যেতে হবে। কোর্টে তাঁকে দু'একদিন দেখেছি।

কার কথা আপনি বলছেন? চিত্তরঞ্জন দাস?

—হ্যাঁ! আমি স্থির করেছি তাঁকেই আমার কৌসুলী নিযুক্ত করব। আপনাদের কোন আপত্তি আছে?

কেন বলুন তো? বেঘো বেঘো ব্যারিষ্টার থাকতে শেষ কালটায় কিনা চিত্তরঞ্জন? ও কদিনই বা ব্যারিষ্টারি করছে! তবে হ্যাঁ, উঠতির মধ্যে একটু আধটু যে ওর নাম হয়নি তা নয়। এত বড় ভুল আপনি করবেন না, আমার অনুরোধ।

—কি বলছেন আপনি? তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

—যতই আপনার বিশ্বাস থাক না কেন, নর্টনের সঙ্গে সি. আর. দাস লড়াই ক'রে কখন জিততে পারে না, যাঁরা আছেন তাঁরাই তো ভাল। তবে আপনার এইটুকু সুবিধে হ'তে পারে বীচক্রফ্‌ট যদি আপনার প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হন! তিনি আপনার অনেক দিনের সহপাঠী; এত সহজেই যে ভুলে যাবে আপনাকে. তা আমার মনে হয় না।

—ও কথা যদি ভেবে থাকেন, সম্পূর্ণ ভুল করেছেন। ও ইংরেজ বাচ্চা, নিজের সরকারের দিকে ঝোল না টেনে ওকি আমাকে দেখবে? এতবড় নেমকহারামী ও করতে পারে না। ইংরেজ বিদ্রোহী ভারতীয়ের দিকে, ও কখনই নজর দিতে পারে না। যত বড় বন্ধুই আমি তার হইনা কেন!

—সেটা অবিশ্যি ঠিক কথাই বলছেন।

—শুনুন তা হলে। আমি যোগ বলে আদিষ্ট হয়েছি। তাই সি. আর. দাস ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই করতে পারিনা। এ মকর্দ্দমায়

আমার হারও যদি হয়, তবুও আমার দলের আর কারো জন্যে না হ'লেও ব্যারিষ্টার দাস যদি রাজি হন, তিনিই আমার মামলা পরিচালনা করবেন, এই আমার ইচ্ছে। ওদিকে তো বুঝতেই পারছেন—ভাঁড়ে মা ভবানী! সাহায্য পাওয়া সঞ্চিততিরিশ হাজার তো সবই প্রায় নিঃশেস হয়ে এসেছে। দেশবাসীর অনুগ্রহে আর কতদিন চলতে পারে বলুন? ব্যারিষ্টার চক্রবর্ত্তী আর চৌধুরী কোর্টে উঠলেই তো মোটা অঙ্কের দর্শনী! আপনি সি. আর. দাসকে ব'লে দেখুন, তিনি যদি রাজি হন অল্প টাকাতেই হয়ে যাবে।

—আর যাঁরা আছেন তাঁদের কি ব্যবস্থা হবে?

—ব্যারিষ্টার দাসের কথা আমি এদের কয়েক জনকে বলেছি। প্রবীনেরা অনেকেই ওঁর প্রতি আস্থাহীন। চৌধুরী আর চক্রবর্ত্তী ছাড়া তারা অন্য কাউকে চিন্তাই করতে পারে না! কিন্তু ভেবে একবার দেখেওনা মোটা ফিজের এই থোক থোক টাকা ঘর-ছাড়া বাউণ্ডুলেদের জন্যে কে এত যোগাবে! এ কথা বলেওছি তাদের। যাক্ সে কথা। আপনি পারেন তো আজই একবার সি. আর. দাসের সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল হয়। আমাদের সামর্থের কথা চিন্তা করে, ওদের জন্যে অন্য কাকে কাকে এনগেজ করলে ভাল হয় তা ও মিঃ দাসকে জিজ্ঞেস করবেন। তাঁকে একবার জেলখানায় আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। আমি ডেকেছি জানলে তিনি নিশ্চয় আসবেন।

নিজহাতে গড়া ছাত্র কানাইলালের ফাঁসীর হুকুম শুনে চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায় বড্ডই মুসড়ে পড়লেন। প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে এলেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কানাইকে বললেন, "একটা গুলী তো নিজের জন্যে রাখতে পারতে? ফাঁসীর তারিখের জন্যে দিন গুণে মন কষ্ট ভোগ করার থেকে সেটা কি ভাল ছিল না?"

কানাইলাল উত্তরে বললে, "স্যার! আপনি কি আমার ভেতর সে

রকম দুর্ব্বলতা কোন দিন দেখতে পেয়েছেন ? ফাঁসীর হুকুম শুনে বুকটা আমার আনন্দে ভরে উঠেছে। এমন সুখের মরণ যে আমার ভাগ্যে ঘটবে তা কোন দিন চিন্তাই করতে পারিনি। I wanted to do it, Sir, and I did it" ?

—সত্যি কানাই, তোমার জীবন সার্থক! এই বীরোচিত মৃত্যু ভারতের ঘরে ঘরে তোমাকে অমর করে রাখবে, এই আমার আশীর্বাদ!

শিষ্য গুরুর পদধূলি মাথায় নিল।

—স্যার! আপনার একটা কথা মনে পড়ে? ছাত্রাবস্থায় একদিন আপনার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, পলাশী যুদ্ধ শেষে বেঁচে থাকলে শেষ গুলীটা নিয়ে আমি মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতাম এবং বিশ্বাসঘাতকের, তার কৃতকর্ম্মের শেষ বিচার করতাম। অন্য ছাত্রদের সঙ্গে আমার উত্তরের গড়মিল ছিল তাই না স্যার?

অশ্রু সজল নয়নে গুরু, শিষ্যের পিঠ চাপড়ে বললেন—"You are perfectly right, my boy. এখন আমি বুঝতে পারছি কেন তুমি শেষ গুলীটা নিজের জন্যে রাখনি।"

অপরাধী কানাইলালের বি. এ পাশের সুখবরটা ইতিমধ্যে সরকার থেকে নাকচ ক'রে দেওয়া হয়েছে। ভার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটাও যেন কত বড় অপরাধ করেছে! 'ডিগ্রী কেড়ে নেওয়াতে কানাইয়ের বড় বয়েই গেল।' কি এমন বাহাদুরী দেখালে ইংরেজ সরকার, তার ডিগ্রীটা কেড়ে নিয়ে!

সেসনসে আলিপুর বোমার মামলার প্রথম দিনের শুনানিতেই আসামী অরবিন্দ ঘোষের কৌঁসুলী ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস নিখুঁত সাওয়াল ক'রে দায়রা জজকে দিয়ে পূর্বে রাজ সাক্ষী প্রদত্ত জবানবন্দী সম্পূর্ণ নাকোচ করিয়ে দিলেন। এর পরেই মামলার মোড় গেল ঘুরে।

মামলা কিছুদূর এগিয়ে যেতেই বিপ্লবী পক্ষের ব্যারিষ্টার, উকিল সম্পূর্ণ বদলে গেল! ব্যাবিষ্টাব ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী কে. এন. চৌধুরী আব নেই। অরবিন্দ পক্ষে, সি. আর. দাস একাই একশ'।

দলের বাকি পঁইত্রিশ জনের পক্ষে এলেন নতুন একদল উকিল-ব্যাবিষ্টাব। ব্যারিষ্টার-পি. মিত্র. এস. রায়, ই. পি. ঘোষ, আর. সি. ব্যানার্জ্জী, আর. এন. রায় এবং জে. এন. রায়। এঁদের এই মামলায় সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন উকিল আর এডভোকেট শরৎচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ বস্থ, বঙ্কু বিহারী মল্লিক চৌধুরী, নগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, বিনোদ রায়, তিনকড়ি ব্যানার্জী নগেন্দ্রনাথ বস্থ আর দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী।

সি. আর. দাস বিনা পাবিশ্রমিকেই অরবিন্দ পক্ষে কৌস্লীর কাজ চালাবেন, পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন শ্যামসুন্দরকে।

এই মামলায় দেওয়ানী আদালত সবগরম। গাদাগাদা exibits এনে হাজির করছে পুলিসের দল। এত জিনিষেব পেমাণ দিয়ে তারা যেন চায় সব কটিকেই ফাঁসার দড়িতে লটকে দেয়। শামসুলের তৎপরতা দিনেব পর দিন বেড়ে চলেছে। নর্টন আর বার্টন তুই ভাই উঠে প'ড়ে লেগেছেন। যোগাড় দিচ্ছেন আশু বিশ্বাস।

॥ সাতষট্টি ॥

হাইকোর্ট থেকে কানাইলাল দত্তের ফাঁসীর confirmation এসে গেছে তড়িত ঘড়িত।

বাহাদুর ইংরেজ সব সময়ে এই ক্ষুদে লোকটার ভয়ে সশঙ্কিত।

'তবে আর কেন? যত শীগ্‌গির সম্ভব ওকে শেষ ক'রে ফেলাই প্রয়োজন। যতই কেননা চোখে-চোখে রাখা যাক,এই বিচ্ছু কখন যে কি অঘটন ঘটিয়ে বসে কে জানে।'

কানাইলাল দত্তের ফাঁসীর দিন ধার্য্য হয়ে গেল—১০ই নভেম্বর ১৯০৮ সাল, মঙ্গলবার।

আলিপুর জেল থেকে আশুতোষ দত্তের নামে চিঠি গেল চন্দননগরে, 'আত্মীয় স্বজন কারো কানাইলাল দত্তকে শেষ দেখার ইচ্ছে থাকলে এসে দেখা করে যেতে পারেন। সরকার এর জন্যে কোন পাথেয় বহন করবে না'।

কানাইয়ের অগ্রজ আশুতোষ দত্ত এলেন অনুজের সঙ্গে দেখা করতে জেলখানায়। হাতে, এই জেল থেকেই লিখিত চিঠি, ইংরেজ জেলারের সঙ্গে দেখা করতেই, তিনি সটান বলে দিলেন, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তার সাক্ষাৎকারের আবেদন পত্রের ওপর লিখিত হুকুম না দিলে, কোন উপায়েই তাঁরা তাঁকে ভেতরে Condemned cell এ দেখা করার জন্যে নিয়ে যেতে পারবেন না। আহাম্মক একবার চিন্তা করেও দেখল না, যে, জেল থেকেই তাঁকে এ চিঠিটা পাঠান হয়েছে।

আশুবাবু বললেন, "তবে কেন তোমরা চিঠি লিখে আমাকে আসতে বলেছিলে" ?

জেলার বললেন—"It is our duty but can't help, better you seek permission from Superintendent."

অগত্যা আশুবাবুকে তাঁর কাছেই হুকুমের জন্যে ছুটতে হ'ল।

জেলে এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মতিলাল রায়কে একটি চিঠির মাধ্যমে তিনি জানালেন—"কানাইয়ের ফাঁসীর হুকুম হয়ে গিয়েছে জেনে আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। হুকুমের জন্যে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম। জেলার আমাকে জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে বললেন; সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমাকে বিশেষ ভদ্র ভাবেই অভ্যর্থনা জানালেন। আমি আমার মার পক্ষ হয়ে নিরালায় কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করতে, তিনি বললেন—'বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এমন ভাবে দেখা করার হুকুম আপাততঃ দিতে পারছি না'। তিনি আমাকে জেলের দরজার কাছে অপেক্ষা করতে বললেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর, জেলের ওয়ার্ডার গেটের খাতায় আমার নাম লিখে নিল এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে কাপড়-চোপড় পরীক্ষা ক'রে ওরা আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। আমার সঙ্গে দু'জন ডেপুটি জেলার এবং দু'জন ওয়ার্ডার প্রহরায় ছিল। বিস্তৃত প্রাঙ্গনের একধারে প্রহরী বেষ্টিত কনডেম্‌ড ইয়ার্ড। আমার আসাতে ইয়ার্ডের দরজা খোলা হ'ল। সকলে ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে ঢুকেই দেখলাম আমাদের ঠিক ডানদিকের প্রথম কনডেম্‌ড সেলটির ভেতর, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত কানাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চোখে চশমা না থাকার দরুণ আমাদের চিনতে পারল না প্রথমটায়। তবুও নির্ভীক দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখল। প্রথমেই সে আমাকে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল—'ফাঁসীর দিন কি স্থির হয়ে গেছে'? মনে হ'ল, সে যেন, জীবনের কাজ শেষ ক'রে পরপারের প্রতীক্ষা করছে, মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই। আমি স্তম্ভিত হ'লাম। তার এমন মুক্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থা দেখে আমার মুখ দিয়ে আর কথা ফুটল না। আশ্চর্য্য হয়ে তাকে দেখতে

লাগলাম, এই কি ফাঁসীর আসামী! দু'জন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার আমার এই অবস্থা দেখে বলল, 'হি ইজ এ ওয়ানণ্ডারফুল চ্যাপ, হি ইজ অলওয়েজ ব্রাইট।' মাকে সান্ত্বনা দিতে কানাই আমাকে অনুরোধ ক'রল, আর বলেছিল, 'যে ভাবে জেলে পরীক্ষা চলছে, তাতে, মাকে এখানে আনবার দরকার নেই। কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করব নিশ্চয়।' এই সময়টুকুর মধ্যে তাকে যেন কত উৎফুল্ল দেখলাম। 'ফাঁসীদণ্ড' থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে কানাইকে অনুরোধ করলাম। উকিল—ওকালতনামা সঙ্গে করেই জেলখানাতে এসেছিলাম। অবিচলচিত্ত কানাইয়ের দৃঢ়তা ভঙ্গ হ'ল না। সে দৃঢ়তার সঙ্গে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। যদিও জানতাম ফাঁসীর দিন ধার্য্য হয়ে যাওয়ার পর এসব আর কিছুই চলে না, তথাপি কানাইকে একবার ব'লে দেখলাম। কানাই যেন তখন 'মৃত্যুঞ্জয় শিব'। প্রতি মুহূর্ত্তে ফাঁসী কাঠে ঝোলার ডাকের প্রতীক্ষায় পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের ঐ ভাব দেখে আর কিছুই বলতে পারলাম না। তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে সে দিনকার মত বাড়ি ফিরলাম।"

কানাইলালের স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। শরীরে রোগ ভোগ প্রায় লেগেই থাকত। এই স্বাস্থ্য সম্বল ক'রে দৃঢ় মনবল নিয়ে স্বদেশের কাজ করতে সে কোন দিনই কার্পণ্য করেনি। জেলে আসার সময়েও শরীর তার ভাল ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্য, মৃত্যু দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর থেকেই দিনের পর দিন তার শরীর ক্রমশঃ সতেজ হয়ে উঠতে লাগল। দেহের ওজন গেল বেড়ে। ফাঁসীর দিন যতই কাছে আসতে লাগল, স্বর্গীয় লাবণ্যে কানাইলালের সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

নরেন-বধের পরেই জেলখানায় ডেপুটি জেলার আসতে লাগল,

ক্রমে-ক্রমে এসিষ্টান্ট জেলারের পাট গেল উঠে। কারারক্ষী বাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এল ইংরেজ জেলার, ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, ডেপুটি জেলার সরগরম হয়ে উঠল জেলখানার ভেতর। এ এক এলাহি ব্যাপার। নতুন এইসব দিয়ে যদি কারারক্ষা করা যায়! অভিনব সরকারী পরিকল্পনা।

রোজই কোর্ট বসছে। দায়রার আসামীদের কয়েদ গাড়ি বোঝাই ক'রে আনানেয়া চলেছে। বোমার মামলার আসামীরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করেছে, ইংরেজ হত্যার চেষ্টা করেছে, ইংরেজের দখলাকৃত মাটিতে বসে বে আইনী অস্ত্রনির্ম্মান করেছে। এরা করেনি কি? এদের অব্যাহতি দেওয়া মানেই ভারত সরকারের নতি স্বীকার করা। এরা যে কি ভীষণ অপরাধী তা সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতিপন্ন করবার সর্ব্বৈব চেষ্টা চলেছে।

মামলায় সাকুল্যে সাক্ষী ২০৬ জন, এক এক করে এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠছে। দুপক্ষের জেরা চলেছে। এই সঙ্গে দলিল দস্তাবেজ, কাগজপত্র, আর গুলীগোলা প্রমাণের জন্যে মাল পত্রের পাহাড় হয়েছে জজের সামনে। ৮০০ দলিল দেখান হ'ল কোর্টকে, বাকি, মারাত্মক জিনিষ থেকে সুরু ক'রে ছোটখাট সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০০।

সত্যেন আছে কনডেম্ড সেলের দ্বিতীয় খানিতে। প্রথমটিতে আছে কানাইলাল, প্রত্যেকটী সেলের এলাকা সম্পূর্ণ আলাদা। কানাইয়ের এলাকা অতিক্রম ক'রে সত্যেনের এলাকায় যেতে হয়।

সে ছিল ব্রাহ্মসমাজী। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় জেলের ভেতর এসেছেন, তাকে শাস্ত্রীয় বাক্য শোনাতে। সত্যেনকে শাস্ত্রীয় বাক্য শুনিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, কানাইলালের ইয়ার্ডের কাঠের দরজাটা খোলা দেখে সেখানে থমকে

দাঁড়ালেন তিনি। দেখেন সেলের মধ্যে কানাই সিংহের মত পাইচারী ক'রে চলেছে। লোহার গরাদে দেওয়া ঘরের ভেতর তার ঐ আচরণ দেখে তিনি আর সে দিকে পা বাড়াতে সাহস পেলেন না। মাথা নীচু ক'রে সেখান থেকে চলে এলেন। গর্ব্ব অনুভব ক'রলেন, ফাঁসীর আসামীর এইভাব দেখে। বাইরে এসে সকলের কাছে সে কথা ব্যক্ত করলেন।

প্রফুল্লচাকীকে (মৃত অবস্থায়) ধরিয়ে দেওয়াতে নন্দলাল ব্যানার্জী মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। প্রমোশন দিতে দিতে বাঙলা সরকার তাকে টেনে তুলেছে পুলিস ইন্সপেক্টরের পদে। তার এ সুখ আর বেশী দিন ভোগ করতে হ'ল না। ঠিক ছমাস পরে ১৯০৮ এর ৯ই নভেম্বর রাত্রিতে ক'লকাতা সারপেনটাইন লেনে শ্রীশচন্দ্র পাল ওরফে নরেন পাল গুলী ক'রে নন্দলালের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। কানাইলালের ফাঁসার আগের দিনই নন্দলালকে শেষ করল, সম্ভবতঃ সুখবটা তার কানে পৌঁছে দিতে; যাতে সে মনের আনন্দে মৃত্যু বরণ করতে পারে।

॥ আটষট্টি ॥

এসে গেছে ১৯০৮ এর ১০ই নভেম্বর, বাঙলার ১৩১৫ সালের ২৫শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার কানাইলাল দত্তের ইপ্সিত সেই সাধের ফাঁসীর দিন।

আগের দিন ৯ই নভেম্বর, সন্ধ্যে তখন গড়িয়ে গেছে, কানাইলাল সবে মাত্র রাত্রির আহার শেষ করে উঠেছে। জেলার এক নম্বর কনডেম্‌ড সেলে এসে, সরকার পক্ষ থেকে তার কানে খবরটা পৌঁছে দিলেন। অনেক বিনয় করে বললেন—"My dear friend। perhaps you do not know that the date and time of your execution have been fixed by the authority, tomomrrow on 10th November 1908 at 5 Hours in the morning sharp. I have been ordered to communicate the information to you for your knowledge I may, please be excused for carrying you the sad news which is no fault of mine."

জেলারের মুখে খবরটা শুনে কানাইলালের সমগ্র মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে যেন এক জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তি, এমনই ভাব, কত বড় এক সুখবর যেন সে পেয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে কম্বল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে এসে দরজার গরাদের ভেতর থেকে ডান হাতখানা বাইরে এগিয়ে দিয়ে, জেলারের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে গর্ব্বিত কণ্ঠস্বরে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—"Thank you Mr. Jailor for your trouble. You are so kind to me to come here for conveying me the happiest and best news of my life. I was so long

anxiously waiting for the brightest day of my life."

এত বড় দুঃসংবাদ এই মৃত্যুপথযাত্রীর কানে পৌঁছে দেওয়ার পরও যে সে কি ক'রে এইভাবে অকম্পিত দৃঢ় হস্তে করমর্দ্দন করতে পারে, আন্দামান ফেরত ইংরেজ জেলার তা ভেবেই পেলেন না। ফাঁসীর আসামীর এই দৃঢ় মনবল দেখে, মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, মাথা হেঁট করে সেখান থেকে চলে এলেন।

অফিস ঘরে ফিরে এসে সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে বললেন—"Kanai does not care for his life. Really he is very strong, a brave and bright young chap."

খানিক পরে চীফ ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার উইলশ, ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ফুকারিয়াকে সঙ্গে করে এসে কানাইলালের সেলের দরজা খুললেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ১৯নং ডিগ্রীতে; সেইখানেই তার শেষ রাত্রি বাস। ২১ নং ফাঁসী ডিগ্রীর সামনে-পেছনে দরজা। সামনেরটিতে গরাদ লাগান সম্পূর্ণ লোহার ফ্রেমে গাঁথা। পেছনেরটি, মোটা কাঠের এক পাল্লার দরজা। মাপ হ'ল ৬'-৬"×৩'—৬"। দরজাটি খুললেই চোখে পড়বে ঠিক পায়ের কাছ থেকে একটা সরু রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে ফাঁসীর মঞ্চে গিয়ে সোজা উঠেছে।

এই ২১ নম্বরের ভেতর দিয়ে এনে, কাঠের ঐ দরজা খুলে, পায়ের সামনেই এই সরু পথ টুকু দিয়ে নিয়ে গিয়ে কানাইলালকে ফাঁসীর মঞ্চে তোলা হবে।

২০ নং ডিগ্রীতে লোক নেই, একেবারে ফাঁকা। সেটিকে ডিঙিয়ে যেতে হবে ২১ নম্বরে।

কানাইয়ের শেষ ইচ্ছে, সে তাদের দলের সকলের সঙ্গে দেখা করে যেতে চায়। এই ৪৪টি সেলের প্রাঙ্গন পার্শ্বে ৩৫টিতে তাঁরা একজন একজন করে আটকান আছেন। অরবিন্দ আছেন, এই বৃহৎ প্রাঙ্গনের বাইরে ছটি সেলের প্রথমটিতে।

মিলিটারী ফেরৎ লালমুখ ওয়ার্ডার হ'লেও এরা তার ইচ্ছেতে

বাধ সাধল না, বরং দেখা হওয়ার জন্যে ওই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের সংলগ্ন প্রতিটি সেলের নিজস্ব উঠানের সামনেকার কাঠের দরজাগুলো একে একে হাট করে খুলে দিলে। প্রাঙ্গণ থেকে পর পর প্রতিটি বিপ্লবীর সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কানাই এক-এক করে প্রত্যেককে কর-জোড়ে নমস্কার জানিয়ে হাসি মুখে শেষ বিদায় নিল। সত্যেনের সঙ্গে প্রথম দেখা, নিজের কেসের। দেখা হ'ল না কেবল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে! কারণ তাঁকেযে রাখা হয়নি ৪৪ ডিগ্রীর খাঁচার অবগুণ্ঠনে তাই। কানাই তা জানতো। সে বারীনকে বললে "গুরুজীর সঙ্গে শেষ দেখাটা হ'ল না এই যা দুঃখ রয়ে গেল"। বিদায়। বলে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে গেল।

বারীনের চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান'—মৃত্যুকে কানাই এই ভাবেই গ্রহণ করেছিল।

মরণের আশা পথ চাওয়া দিনগুলো কানাইলাল পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় সেলের গণ্ডী টুকুতে পাইচারী ক'রে, বিবেকানন্দের বাণীগুলি পড়ে পড়ে, গীতার ভাষ্য কটি বারবার শেষ ক'রে আনন্দের সঙ্গে গভীর নিদ্রা দিয়ে কাটিয়ে দিল।

৯ই নভেম্বর রাত্রিতে ১৯ নং সেলে কানাইলালের শোয়ার ব্যবস্থা ক'রে, তাকে সেখানে দিয়ে, দেওয়ালের ভেতর থেকে লোহার দরজাটায় তালা বন্ধ ক'রে উইল্‌স তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন।

কানাইও সামান্য হেসে বললে—"Chief! my last good night to you. Good-night"!

ফুকারিয়া ডিউটিতে থাকল রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

এই লোকটির বরাবরের আচার ব্যবহার কানাইকে মুগ্ধ করেছিল: অন্য ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের মত নয়! সে ইউরোপীয় হলেও যেন অন্য ধাতুতে গড়া।

নটা বাজতে যে সময়টুকু বাকি ছিল, ফুকারিয়ার সঙ্গে মন খুলে

গল্প গুজব হাসি ঠাট্টা করল।

ফাঁসীতে ঝোলার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মনের অবস্থা যে কি দাঁড়ায়, হঠাৎ আইরিশ-ফুকারিয়া তাকে সে কথাটা মনে পড়িয়ে দিল।

কানাই হেসে তার কথার কোন গুরুত্বই দিল না।

কানাইয়ের হাসির তালে, তাল মিলিয়ে ফুকারিয়া পুনরায় বললে —"তখন বুঝতেই পারবে; ফাঁসীর দড়িটা গলায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মোটা ঠোঁট দুখানা ভয়ে শুকিয়ে কাল হয়ে যাবে। দেখবে, তোমার এখন যে মনোবল আছে তখন তার কিছুই থাকবে না। ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, তাতেই বুঝতে পারবে,—আমাদের রেজিমেণ্টের একজন খুব সাহসী সৈনিকের কথা বলছি—সে বহু শত্রু সেনাকে নিজ হাতে হত্যা করেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু মৃত্যু সে হাসি মুখে দেখেছে। সেখানে গোলার আঘাতে মারা পড়লে, হয়তো সে ভয় পেত না। হঠাৎ একটা গুরুতর অপরাধে কোর্টমার্শালে তার মৃত্যু দণ্ড হ'ল। কিন্তু ঐরকম বুকের পাটাওয়ালা লোকটিকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল, দেখলাম, এতবড় সাহসী হয়েও তার মনের কি বিরাট পরিবর্ত্তন। মৃত্যু যখন নিশ্চিৎ হয়ে তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে তার কি ভীষণ ভয়! তাকে মৃত্যুদণ্ডের জন্যে যখন তারই দলের লোকেরা বধ্য ভূমিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, পথে সে চার পাঁচ বার ব'সে পড়ল। সোজা পা ফেলে হাঁটতে পারছে না। টেনে হেচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল বধ্য ভূমির নির্দ্দিষ্ট স্থানে। দেখলাম, তার আগের মনের মৃত্যু ঘটেছে। দেখ, সৈনিক হয়েও তার এই অবস্থা, আর সেই তুলনায় তুমি তো একজন অতি সাধারণ লোক।"

কান পেতে তার সব কথাগুলো শুনল কানাই।

পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলে— "ভুল! ভুল! সবটাই তোমার ভুল! এতদিনের সখ্যতায় তুমি বুঝি আমার এইটুকুই জেনেছ? দেখবে কানাইলাল দত্ত সে উপাদানে গঠিত নয়। তুমি মস্ত বড় ভুল করছ আমার সম্বন্ধে! ভুলে যেও না

কানাই ব্রিটিসার নয়—'বাঙালী'। সুযোগ পেলে ফাঁসীর দড়িটা গলায় নিয়ে তোমাকে কাছে ডাকব। তুমি পরীক্ষা ক'রে নিও। ডাঃ ডায়েলীকে বোল ফাঁসীর আগে ষ্টেথেসকোপটা বসিয়ে আমার বুকের অবস্থাটা ভাল করে পরীক্ষা ক'রে দেখতে। তাতেই তো ধরা পড়বে আমি কতটা ভয় পেয়েছি। তাঁকে জিজ্ঞেস ক'র তিনি কি দেখলেন, দেখো ভাই! তুমি যেন ভয় পেয় না।"

ফুকারিয়া বললে—"হুঁ! আমি ভয় পাব? তুমিও ভুলে যেও না আমি মিলিটারী ম্যান। কত লোককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছি। সেখানেই উৎপীড়িতের আর্ত্তক্রন্দনে দমে যাই নি, আর এটা তো সামান্য একটা লোকের ফাঁসী। এ তুমি কি বলছ?"

কানাই লক্ষ্য করলে ফুকারিয়ার কণ্ঠস্বর ভার, চোখের খেদ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

মুগুরের বাড়ি খেয়ে গেটের ঘণ্টাটা ন'ন'বার শিউরে-শিউরে, কাতরে কাতরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল।

এই কাৎরানি শুনে ফুকারিয়া কেমন যেন হয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বর সহসা রুদ্ধ হয়ে গেছে। লাল চামড়ার ভেতর সাদা বড় বড় চোখের কটামণি দুটোর অবস্থার পরিবর্ত্তন, সেই মুহূর্তে মনের আলোড়ন কিছুই কানাইয়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ওর ঐ বিদগ্ধ মনটাকে সতেজ করে তুলতে কানাই তাই কত কিছু আবোল তাবোল বকতে লাগল।

তথাপি আইরিশ যুবক নীরব।

দ্বিতীয় পাহারায় লোক এসে গেল।

চলে যাওয়ার আগে ফুকারিয়া তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুখানি কানাইয়ের দিকে প্রসারিত করে দিল। মুখে কথা নেই।

দরজার সুদৃঢ় লৌহশলাকার ভেতর হতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেই সে তার হাতখানা দুহাতে চেপে ধরেছে, চোখের বাঁধ ভেঙ্গে অজস্র অশ্রুধারা ফুকারিয়ার গণ্ডদেশ অতিক্রম করে অঝরে ঝরতে লাগল।

কানাই তার হাত খানা চুম্বন ক'রে বললে—"Don't you feel sorry my Brother ! for a criminal. Although he is an enimy of the Britishers but lover of Mother-land. This much you can keep in yout heart. I love you and you love me too. This is all. Before you leave me may I request you one thing ? Please try to present yourself at the time of my execution. If so, you will see, Kanai is embracing death like a brave soldier. Good-night my dear Brother. Don't fail to come tomorrow morning. By-By, Cheer you ! Don't you feel sorry. Good-night for the last time."

ফুকারিয়া আর তার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারল না। ধীরে ধীরে ডিগ্রী প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে গেল, প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে রুমাল খানা বার করতে করতে।

কানাই হাত নেড়ে তাকে বিদায় দিল।

ফুকারিয়া চলে গেছে। তার জায়গায় পাহারায় এসেছে আর এক লালমুখ'। কিন্তু তার সঙ্গে নেই কিছু সৌহার্দ্য বন্ধন। তাই নেই কোন বাক্যালাপ।

কেন ফুকারিয়া এমন করে কাঁদল ! পাষাণও তবে গলে ? সেও তো সৈনিক ছিল ? এত মায়া ! এত মমতা !—মনের ভেতর বিদেশীর ছোয়াটাকে কাটিয়ে উঠিতে বেশ একটু সময় লাগল কানাইয়ের। পরে কিছুটা স্থির হয়ে, দরজার সমুখ ছেড়ে এগিয়ে গেল ধীর পদক্ষেপে। ঘরের কোন্ থেকে গীতাখানা হাতে তুলে নিয়ে, এসে বসল যোগাসনে কম্বলের বিছনা টুকুর ওপর। শোয়ার জন্যে তাকে তিনখানা কম্বল ছাড়া আর, কিছুই দেওয়া হয়নি। এটি তারই একখানি। ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর, পেয়েছে সে দুটি জাঙ্গিয়া, দুটি কুর্তা, এই কাপড়েরই একটি গামছা, একটা টুপি, একটি থালা আর একটা বাটি।

পরনের জাঙ্গীয়া-কুর্ত্তা-টুপি আর কম্বল ছাড়া, প্রয়োজনীয় বাকি সব কিছু থাকে ফাঁসীর আসামীর নাগালের বাহিরে, সামনের উঠানে প্রহরার জিম্বায়। সেখানে আরও থাকে, একটি মাটির কলসীতে এক কলসী জল এবং তার পাশেই একটি বালতিতে জল। সারা দিনরাতে স্নানের সময় ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের লোহ কপাট খুলে, দুপুরে তাকে এক বারটি মাত্র কক্ষ সংলগ্ন সামনের ছোট্ট উঠানটিতে বার করা হয়। কানাইয়ের বেলায়ও সরকারী আইনের বিন্দুমাত্র নড়চড় হয়নি একটি দিনও। সব সময় জেলের একটি ওয়ার্ডার ওত পেতে চোখ ডেবা ডেবা ক'রে, সরকারের ওই ভয়ঙ্কর আসামীটির দিকে চেয়ে বসে আছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

সুললিত কণ্ঠে চলল গীতার আবৃত্তি। প্রথম থেকে ঝড়ের বেগে অধ্যায় ক'টি শেষ ক'রে গীত-মাহাত্ম্য টুকু ও সেরে নিয়ে, শ্যামসুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে, মাথার নীচে দেওয়ার জন্যে জড়ান কম্বল খানির তলে গ্রন্থটিকে রেখে, লম্বা দু'ভাঁজ করা কম্বলের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল কানাইলাল। ক্ষণকাল অতিক্রান্ত হ'তে না হতেই নাসিকা গর্জ্জন সুরু হয়ে গেল। কত শান্তিতে সে যেন সুখ নিদ্রায় অভিভূত।

১৯নং ঘরের দেওয়ালের পেছনেই, ফাঁসীর মঞ্চে আলো জ্বেলে খুট-খাট, খট্-খট্ শব্দে প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। ফাঁসী কাষ্ঠের লোহদণ্ড গুলিতে প্রয়োজন মত নাট-বল্টু আঁটা হচ্ছে। তেল ঢেলে সেগুলোকে সচল করা হচ্ছে। নতুন ফাঁসীর দড়িটা, সদ্য খোলস ছাড়া কেউটে সাপের মত লম্বা দেহটা নিয়ে, ফণা গুটিয়ে মঞ্চের নীচে এক পাশে ঝিমিয়ে আছে। খানিক পরে সড়-সড়িয়ে মঞ্চের মাথায় গিয়ে উঠবে এই তার মতলব।

ভোর চারটের আগেই দু'বালতি জল এনে রাখা হয়েছে উনিশ নম্বরের ছোট্ট উঠোনটিতে। একস্যুট নতুন কোরা কাপড়ের জাঙ্গিয়া-

কুর্‌তা হাতে নিয়ে ডিগ্রীর মেট সেখানে দাঁড়িয়ে।

বড় ফটকের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ঢং চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে চীফ ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, বড় জমাদার, এডমিসন ব্রাঞ্চের ডেপুটি জেলার, জনা দুই দেশওয়ালী ওয়ার্ডার এসে হাজির হ'ল সেখানে।

আশ্চর্য্য! এখনও ঘুমচ্ছে? অবাক হ'ল এরা কানাইকে এই অবস্থায় দেখে। তখনও তার নাক ডাকছে, দিব্বি ঘুমচ্ছে।

কর্ত্তব্য রত ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, দেওয়ালের ভেতর দিয়ে ঝোলান দেড় সেরি ওজনের তালাটিকে লম্বা এক চাবিদিয়ে খুলে, ঘরের লৌহ কপাটের কোমরে আঁটা মোটা লোহার বন্ধনীটাকে, তালার মুখ থেকে সজোরে টেনে খড়াস করে সরিয়ে দিল। ভারি ওজনের দরজাটিও সঙ্গে সঙ্গে আলগা হয়ে গেল।

এ শব্দেও তার ঘুম ভাঙ্গল না।

—ভালা মুস্কিলে পড়া গেল তো! এ আবার কি আপদ! ঘুমই ভাঙ্গে না? পাঁচটার সময়ে যে দড়িতে ঝুলবে তার এ কী ঘুমরে বাবা! দেরী হয়ে গেলে যে জবাবদিহি করতে হবে! সবাই সবার মুখপানে চায়, কে তাকে জাগায়।

নিরুপায় হয়ে অবশেষে মুঞ্জিল্‌শাই তাকে ধাক্কা ধাক্কি ক'রে ঘুম ভাঙ্গতে বাধ্য হ'ল।

চকিতে বিছানার ওপর উঠে বসে কানাই বললে—"তোমরা এসে গেছ? সময় হয়ে গেছে বুঝি? দেখতো কি সাংঘাতিক ঘুমে পেয়েছিল আমাকে! শেষ ঘুমটা বড্ড নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিলাম। এমন শান্তিতে ঘুম আমার কোন দিন হয়নি। বল এখন কি করতে হবে?

বড় জমাদার বললে—"নিয়ম মত বালতি ক'রে জল রাখা হয়েছে। ইচ্ছে করলে স্নান সেরে নিতে পারেন। মাজন ও রাখা আছে। স্নানের পর পুরনো জাঙ্গিয়া-ছেড়ে নতুন জাঙ্গিয়া কুর্তা পরতে হবে। তাও এনে রাখা হয়েছে এখানে। পণ্ডিতজী আসবেন এখুনি। গীতা

শোনাবেন"।

বড় জমাদারের কথায় সে হেসে বললে "বাঃ, বেড়ে ব্যবস্থা তো আপনাদের! নতুন কাপড় জামা পরে বিয়ে করতে যাব বুঝি? সঙ্গে আবার পুরুত মশায়।

চলুন, স্নানটা সেরে নিই। চিরুণী-টিরুণী দেবেন তো? চুলটা বড্ড বড়-বড় হয়ে গেছে, জায়গায়-জায়গায় জট পাকিয়ে গেছে; কতদিন আঁচড়াইনি।

কানাইলাল, আপন মনে বেশখানিকক্ষণ ধরে স্নান সারল। ভাল ক'রে গা মুছে নিয়ে নতুন জাঙ্গিয়া-কুরতা প'রে নিল। চুলটা বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়াল।

গীতা হাতে হিন্দু রিলিজিয়াস ইন্সট্রাক্টর এসে সেখানে হাজির হয়েছেন।

কানাইকে জিজ্ঞেস করলেন—"কোন অধ্যায়টা পড়ব"?

—আপনার যেটা খুসী। ওসব আমাব মুখস্ত!

তিনি বিশ্বরূপ দর্শনটা সেরে মোক্ষ যোগ সুরু করলেন। পড়া তাঁর শেষ হ'ল না।

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, জেলায় এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে একজন ভার প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মৃত্যুদণ্ড বহালের সাক্ষী থাকবার জন্যে।

জেলারের হাত থেকে কানাইলাল দত্তের ডেথ ওয়ারেণ্টটা আর জজের জাজমেণ্টের কপিখানা হাতে নিলেন সুপার। জায়গায়-জায়গায় পড়ে শোনালেন তাকে। ডেথ ওয়াবেণ্টটা সম্পূর্ণ পড়লেন।

কাজ সেরে তাঁরা চলে গেলেন ফাঁসী-মঞ্চের দিকে।

ডাক্তার সাহেব বাইরে-বাইরে গিয়ে মঞ্চের সামনে হাজির হয়েছেন, চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর প্রাঙ্গন দিয়ে না গিয়ে।

পাঁচটা বাজতে কৈ আর দেরী? বড় জমাদার তাড়াতাড়ি তার হাত দুটিকে শরীরের পেছন দিয়ে টেনে নিয়ে একত্র করে, এক জোড়া হাতকড়ি হাতে লাগাতে গেল।

পেটে তার সামান্য বিদ্যে হ'লে কি হয়, নিয়ম মাফিক কাজে সে খুব তৎপর।

কানাই বললে—"ও আবার কি করছ? তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি কিছু করব না"।

সদলবলে চল্‌ল সকলে তাকে নিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে।

ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে সে বিছানার নীচ থেকে গীতাখানাকে নিয়ে, চোখ থেকে চশমা জোড়াকে খুলে উইলশের হাতে দিয়ে বললে—"এই দুটি জিনিস আমার দাদাকে দিয়ে দিও"।

দেশী ওয়ার্ডার দু'জন দুপাশ থেকে তার হাত দু'খানা ধরে রাখতে চাইল।

কানাই বললে—"ভাবছ বুঝি আমি মাটিতে পড়ে যাব? তোমাদের কোন ভয় নেই, আমার মনে যথেষ্ট জোর আছে। দমে যাওয়ার আমার কি কারণ থাকতে পারে বল? এই পুরনো দেহটা ছেড়ে প্রাণটা আমার বেরিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে বইতো নয়! আবার সময় হলে নতুন একটা দেহে এই প্রাণটা আশ্রয় নেবে। পুরনো দেহটার ওপর এত মায়া কিসের! সময় হলেই তো চলে যেতে হবে! তার জন্য এত হাঁক-পাকানি কিসের! যে টুকু কাজ ভগবান্ আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিলেন, তা করিয়ে নিয়েছেন। এরপর আবার যা করাবেন, তাই করব। দেখ, তোমরা যেমন আমাকে পুরনো বস্ত্র ছাড়িয়ে নতুন বস্ত্র পরালে, এই আত্মটাও ঠিক তাই! পুরনোটা ছেড়ে আবার একটা নতুনে আশ্রয় নেবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই কথাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥'

এই দেহের অবস্থান, এই দেহের নাশ চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে এটা কিছুই নয়। অতি তুচ্ছ। কত সহজ সরল ব্যাখ্যা এই শ্লোক দুটির,—মানুষ যেমন পুরনো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, সেই ভাবে আত্মাও পুরনো দেহ ছেড়ে নতুন দেহ ধারণ করে।

এই আত্মাকে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, একে আগুন পোড়াতে পারেনা, জল একে ভিজতে পারেনা, এমন কি বাতাসও একে শুকতে পারেনা।

"তাহলে দেখ, যাকে তোমরা দুর্ধর্ষ ইংরেজ শক্তি বলে মনে কর, যে শক্তি এই নশ্বর দেহটার ভয়ে থর থরিয়ে কাঁপছে, সেই শক্তি, কানাইলালের আত্মার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না; শুধু পারবে, তার এই দেহটাকে রুবাই দিতে। তাই আমিও ভয় পাইনা এটাকে ছেড়ে যেতে। আত্মাটা তো বেশ কিছুকাল এই দেহটার মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ক'রে দিব্বি আনন্দে কাটাল, আবার গিয়ে আর একটার ভেতর প্রবেশ ক'রে আনন্দ করবে এইতো"!

তার দেহটাকে হাত দিয়ে ধরে রাখবার প্রয়োজন হ'ল না।

দৃঢ় পদক্ষেপে একুশ নম্বর ডিগ্রীর ভেতর দিয়ে এসে কাঠের খোলা দরজাটার ওপর থমকে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে কানাই পরিষ্কার ক'রে দেখে নিল ফাঁসীর মঞ্চের প্রকৃত রূপটা কি।

—উঁচু মঞ্চের দু'পাশে সমব্যবধানে লোহার কড়িকাঠের আকারের দু'খানি বলিষ্ঠ লৌহদণ্ড খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওপরের ঐ রূপ একটি দণ্ডকে দু'পাশ থেকে ধরে আছে। সেই দণ্ডে মধ্যব্যবধানে, দড়ি গলাবার জন্যে দু'টি লোহার ক্ল্যাম্প লাগান, তারই একটিতে ঝুলছে, একটা ফাঁস লাগান মোটা শনের দড়ি। রাস্তা বরাবর, তারই নীচে মঞ্চের গর্তটির বুকের ওপর বড় বড় দুখানি লোহার প্লেটের মাঝে, মাঝারি ধরণের লম্বা একটি গিয়ার লাগান। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জহ্লাদ, একটি নতুন কাপড়ের মুখস হাতে নিয়ে। তার হাতে আছে আর একটি মোটা কাপড়ের ফালি।

দড়িটা বুঝি তার গলায় দেওয়ার আগে জহ্লাদ হাতের ঐ মুখসটি পরিয়ে তার মুখটি ঢেকে দেবে। কাপড়ের ফালিটা দিয়ে পা দুটি জোড়া ক'রে একসঙ্গে দেবে বেঁধে।

ফাঁসীর মঞ্চটাকে ঘিরে গুচ্ছের পুলিশ, জনাকয়েক ওয়ার্ডার ইউনিফর্ম পরে রাইফেলে বেয়নেট চড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একগাদা অফিসার, বাইরের দুএকজন বিশিষ্ঠ নাগরীক চারদিকে গিজ্ গিজ করছে।

কানাইলাল উঁচু রাস্তাটা বেয়ে সোজা মঞ্চের ওপর উঠে এসে, লোহার প্লেট দু'টির একটির ওপর দড়ির নীচ বরাবর দাঁড়াল। হাত দুটি জোড় ক'রে, সকলকে শেষ নমস্কার জানাল স্মিত-হাস্যে।

মনে হ'ল তার চোখ দুটো চার পাশে কাকে যেন খুঁজছে।

—ঐ, ঐতো মিঃ ফুকারিয়া!

"ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে আছ বুঝি? কাছে এস। আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ দেখি আমার কথা সত্যি কিনা! কাল রাত্রিতে তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল, দেখেছিলে তো, আমার মনটা তখন আনন্দে কি রকম মসগুল ছিল, সকালের সামনে একবার নয়! এমন শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা আমার যেন সহ্য হচ্ছিল না; তাইতো তোমার সঙ্গে অত হাসি তামাশা করছিলাম। তুমি আমার কথাগুলো শুনে বিশ্বাস করনি তাই ভয় দেখিয়েছিলে, বলেছিলে, 'মরার ভয়ে তোমার ঠোঁট দুটো কাল হয়ে যাবে'। কিন্তু তা হ'ল কি মিঃ ফুকারিয়া"?

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ঘন ঘন পকেট ঘড়িটা দেখে চলেছেন। ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে একখানা সাদা রুমাল ঝুলছে।

সামনে থেকে তাঁর ইঙ্গিত পেতেই, কানাইয়ের মুখের কথা কটি শেষ হওয়ার আগেই, জহ্লাদ তার মুখের ওপর মুখসটা গলিয়ে দিল। গলায় দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিতে গেলে, সে বললে—"জল্লাদ! তুমি কেন কষ্ট করবে! দড়িটা আমার হাতে দাও আমিই ওটা পরে নিচ্ছি!"

গলায় দড়িটা গলিয়ে নিল কানাই নিজেই।

ঘাতক তাড়াতাড়ি কাপড়ের ফালিটা দিয়ে, তার পা দু'খানি একত্রে বেঁধে দিল।

বড় জমাদার পেছন থেকে তার হাত দু'খানা টেনে নিয়ে কব্জি দুটো এক ক'রে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল।

এরা যে তাকে নিয়ে কি করছে, সে দিকে তার গ্রাহ্যই নেই। একটানা ফুকারিয়াকে বলে চলেছে "আমি সে ধাতুতেই গড়া নই। বিশ্বাস না হয় আমার মুখের ঢাকাটা উঠিয়ে দেখ না ছাই কেমন তুমি আমাকে দেখছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা কথা! কাল রাত্রিতে তোফা ঘুম দিয়েছি। আমি যখন ঘুমচ্ছিলাম তুমি এসেছিলে কিনা জানি না। এসে থাকলে নিশ্চয় দেখেছ! সকালে ডাকাডাকি করে ওরা আমার ঘুম ভাঙ্গাতেই পারে না। কী হাসির কথা বলতো"?

মঞ্চে উঠে কানাইয়ের কী ভীষণ কৌতূহল। ফাঁসীর কায়দা কানুনগুলো সবই একসঙ্গে জেনে নিতে চায়। দড়িটা হাতে ধরেই বা সরকারকে কত বিদ্রূপ!

ভোর হয়ে আসছে।

বড় ফটকে ঘণ্টা বাজল ঢং-ঢ-ঢং-ঢ-ঢং।

সুপারিনটেণ্ডের উঁচু করা হাতখানা, রুমালটা নিয়ে নীচের দিকে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাতক গিয়ারটা দিল টেনে। তড়িৎ প্রবাহে লোহার প্লেটখানি কানাইলালের পায়ের নীচ থেকে ভেতরে নেবে গেল। মুহূর্তে তার দেহটা ছিটকে মঞ্চের গভীরে অদৃশ্য হয়ে, চৌবাচ্চার আকারে সিমেন্ট বাঁধান ঘরটির মধ্যে দড়িতে ঝুলতে লাগল। লোহার ফ্রেমে টাঙ্গান দেহটা দড়িতে খানিক দুলে ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল।

মঞ্চের পায়ের নীচেকার গর্তের বুকে বসান ছোট্ট কাঠের দরজাটি (মাপ ২´–৭´´ × ২´–৭´´ ইঞ্চি) খুলে দেওয়া হ'ল, গর্তের ভেতর দড়িতে ঝোলা কানাইলালের দেহটি পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে

জীবিত না মৃত ?

চীফ মেডিক্যাল অফিসার তার বুকের ওপর ষ্টেথেস্‌কোপ বসালেন।

মাথা নেড়ে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে জানালেন সব স্থির হয়ে গেছে।

শেষের দিকে মতের মিল না থাকলেও কানাইলালের ফাঁসী হয়ে যাওয়ার পর বারীনঘোষ আবেগ ভরে তাঁর লেখনীতেই ব্যক্ত করেছেন —"এই নিষ্কাম অনাবিল শান্ত সমর্পণের জীবনে কানাইয়ের চুলগুলি হইয়াছিল বড় বড়, মুখশ্রী হইয়াছিল দীপ্তও ঢলঢলে, ওজনে সে অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল মৃত্যুর পূর্বে। মরিবার প্রাতে চারটার সময়ে তাহাকে বধ্য মঞ্চে লইতে আসিয়া সকলে দেখিল, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি ঘুম হইতে তাহার জাগরণ, আর একটি দীর্ঘতর নিবিড়তম ঘুমের জন্য। ফাঁসীর আগের দিন উঠান বাহিয়া সে, আমারও অনেকের কুটরির সামনে দাঁড়াইয়া স্মিত-হাস্যে বিদায় নমস্কার করিয়াছিল। সে সময় প্রহরী বাধা দেয় নাই, পরন্তু আমাদের উঠানের দরজা মুক্ত রাখিয়াছিল। সে সহাস্য প্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময় রূপ আমি কখনও ভুলিব না, কানাই তখন মহাতাপস, প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। পথ ভুল হউক, আর সত্য হউক, তাহার সে মরণের মহত্ত্ব যাইবার নয়, তাহার ক্ষাত্রগুণের গুণ মুগ্ধ মানুষ ইংরাজের মধ্যেও আছে। আমাদের দেশে বোধনের আত্মদানে শেষ ঋত্বিক্‌ কানাই। তাহার পর অন্য দলে অনেক মরণই হয়তো মরিবে, কিন্তু কানাইয়ের পুণ্যস্মৃতি অম্লানই রাখিয়া গিয়াছে। যে কোন দেশে কানাইয়ের তুলনা নাই, কারণ-এ বীরপূজার জাতি নাই, গোত্র নাই দেশ নাই; যেখানে যখন মানুষ প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইয়া আর্ত্তত্রাণ ব্রত ধরে, সেইখানে তখনি সে নমস্য।"

॥ উনসত্তর ॥

৯ই নভেম্বর সোমবার (১৯০৮) মতিলাল রায়, কানাইলালের সম্পর্কে ভাগিনেয় আশুতোষ দাস, হরিচরণ ভড় এবং মনীন্দ্রনাথ নায়েককে সঙ্গে নিয়ে শব যাত্রার প্রয়োজনীয় সব কিছু একে একে সংগ্রহ ক'রে উৎকণ্ঠিত চিত্তে কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীটের একটি বাসা বাড়িতে রাত্রি যাপন করলেন। সেই বিভীষিকাময়ী রাত্রিতে কারোরই চোখে নেই ঘুম। কানাইলাল প্রসঙ্গে নানান আলোচনা, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এইসব নিয়েই রাত্রিটা তাদের কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল !

ভোরের আলো দেখা দিতেই কোনক্রমে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে তাঁরা আলিপুর জেলের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

হকারের মুখে অপ্রত্যাশিত সংবাদে হলেন সকলেই স্তম্ভিত। '৯ই রাত্রিতে সারপেনটাইন লেনে আততায়ীর গুলীতে নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় মারা পড়েছে।'

তাড়াতাড়ি একখানি সংবাদপত্র কিনে, প্রথমেই বড় বড় হরফে লেখা খবরটিতে চোখ বুলাতে লাগলেন মতিলাল। সঙ্গীরা কাগজ খানির ওপর হুমড়ী খেয়ে পড়েছে।

—বাঃ ! বাঃ ! কৃতকর্ম্মের ফল তবে ফলেছে ? প্রফুল্লচাকীর প্রেত আত্মা বুঝি সেই কুকর্ম্মের ফল তাকে দিয়ে গেল ! কে তাকে মারল ? প্রফুল্ল কাকে দিয়ে একাজ করাল ?

কানাইলালের প্রতি শ্রদ্ধায় ও গর্ব্বে বুক তাদের ফুলে উঠল। 'Action সুরু হয়ে গেছে। আরও কত হবে'।

মতিলাল, আশুতোষ আর মনীন্দ্রকে বললেন—"কি দেখছ? ডাইরেক্ট একস্থান যে সুরু হয়ে গেল!

"দ্রোণাচার্য্যের, কর্ণের মত শিষ্য কত যে জন্মেছে এরমধ্যে কে জানে! দেখলে তো সামান্য কটা দিন আগে কার্জ্জনের সৃষ্টি পশ্চিমের অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর স্যার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রাণ নেবার কি চেষ্টা ছেলেদের, ওভারটুন হলে। বেটার খুব কপালজোর, ভাগ্যিস রিভলবারের গুলীটা ছুটল না তাই কোন গতিকে রক্ষে পেয়ে গেল"।

মনীন্দ্র বললেন—"কত বারই তো ওর ওপর চেষ্টা হ'ল, একবারও পড়ল না। 'রাখে কেষ্ট, মারে কে'? কথাটা তা হ'লে সত্যিই বল"?

মনীন্দ্র বলেই চলেছেন—দেখছিও তো তাই:

"কিন্তু তোমরা এটা লক্ষ্য করেছ নরেন গোঁসাইকে ধরাশায়ী করার পর থেকেই ছেলেগুলোর বুকের পাটা কত বেড়ে গেছে, শত্রুকে মেরে নিজের প্রাণ বাঁচানব জন্যে আর—দে দৌড় নেই! সামনা সামনি দাঁড়িয়ে একেবারে—'চার্য্য অব দি লাইট ব্রিগেড'। একেই তো বলে অকুতোভয় তরুণ বঙ্গসন্তান। এরপর দেখবে পরপর কতগুলো পড়ে গেছে। শামসুল বেটা খুব বেড়েছে। এইবার দেখো ওর অদৃষ্টে কি আছে। আশু বিশ্বাসকেও বোধহয় এরা ছাড়বে না"!

আশুতোষ বললেন—"তোমার বুকের পাটার খুব জোর দেখছি। এটা যে প্রকাশ্য রাজপথ তা বুঝি ভুলে গেছ? ওসব কথা এখন থাক। চল, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক"।

মনীন্দ্র, আশুর মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে আবার বললে—"কানাই যদি বেঁচে গিয়ে থাকে, কি আনন্দটাই না হবে"!

আশুতোষ বললেন—"তুমি আস্ত একটা গাধা। তাই কখনও হয়?"

হরিচরণের মুখে কোন কথা নেই। এদের মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে কথাগুলো কঁত কঁত করে গিলে যাচ্ছে।

মতিলাল, আশুতোষের উদ্দেশ্যে বললেন—"মনীন যদি মনের

আবেগে অসম্ভবকে সম্ভব করাতে চেয়ে থাকে, তাতে হয়েছেটা কি? ওকে শুধু শুধু তুমি কটু কথা বলছ। আশার পথ চেয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে। চলনা গিয়ে দেখাই যাক, কি ঘটেছে"।

দ্রুত পা চালিয়ে তাঁরা চললেন আলিপুরের দিকে।

শ্রান্ত অবস্থায় জেল গেটে পৌঁছে, কানাইয়ের অগ্রজ আশুতোষ দত্ত এবং তাঁর কজন আত্মীয়কে দেখতে পেলেন তাঁরা, আশুবাবুর কাছে জানতে পারলেন, অনেক আগে থেকেই এঁদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ইংরেজ সরকার কি তাকে বাঁচতে দিতে পারে? কখনই না। ধ্রুব সত্য হয়ে এই দুঃসংবাদ তাঁদের কানে এসে আঘাত করল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আশুবাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"ভোর পাঁচটায় সব শেষ হয়ে গেছে। এই কচি বয়সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা সব ফুরিয়ে যাবে, এইটাই তো ভাবতে পারছি না।

মুখে কথা নেই। সকলেই হতবাক।

ক্ষণেকের বাধা না মেনেই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু মতিলালের গণ্ডদেশ অতিক্রম ক'রে চিবুকের ওপর ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল। পরক্ষণেই তাঁর ভাবাক্রান্ত কণ্ঠ দিয়ে কম্পিতস্বরে নির্গত হ'ল, "সত্যি কথা। লীলা খেলাই সে ক'রে গেল"!

আর দেরী নয়।

লৌহকপাটের ভেতর দণ্ডায়মান রিলিজ ব্রাঞ্চের ডেপুটি জেলারকে আশুবাবু বললেন, তাঁরা কানাইলালের মৃতদেহ সৎকারের জন্যে, গ্রহণে এখন প্রস্তুত।

খবর পেয়ে তিনি অফিস ঘরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ইউনিফর্ম পরিহিত একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার একখানি হুকুমনামা হাতে নিয়ে কপাটের সামনে এসে তাঁদের জানাল মৃতদেহ নিতে, সাকুল্যে পাঁচ-ছ জন তার সঙ্গে জেলের ভেতর যেতে পারেন।

অগত্যা আশুবাবু, মতিলাল এবং তাঁর আর তিনজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে তার পেছু পেছু ভেতরে গেলেন। বেশ কিছুদূর কম্পিত পদক্ষেপে এই শ্বেতাঙ্গটির অনুসরণ করার পর, সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অদূরে খোলা জায়গায়, জাল দিয়ে ঘেরা একটি ছোট্ট ঘর দেখিয়ে দিল।

দেখতে পেলেন তাঁরা, জেল মর্গের একপাশে আপাদ মস্তক কালো কম্বলে আচ্ছাদিত দেহটি অত্যন্ত হীন অবস্থায় ভূমি শয্যায় পতিত।

মতিলাল কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে জালের ঘরের কোণা থেকে ঐ অবস্থায় মৃত দেহটিকে বুকে জাপটে তুলে নিয়ে বাহিরে এনে মাটির ওপর শুইয়ে দিলেন।

মৃতের ওপরও ঐরূপ সরকারী ব্যবহার দেখে আশুবাবু নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অপর কজনেরও এ অবস্থায় অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এঁদের সকলকে ঐভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে দেখে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীটি বললে—"কাঁদছেন কেন আপনারা? এই বীর পূজারীর আত্মার এতে অকল্যান হবে! এতখানি আত্মচেতনাসম্পন্ন বীর যুবক যে দেশে জন্মেছে, সে দেশ ধন্য। জন্মালে, মরতে একদিন হবেই একথা যখন সর্ব্বৈব সত্য তবে কেন কাঁদছেন? এ মহামরণ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে বলুন? ম'রে ক'জন এমন অমর হ'তে পারে বলুন তো"?

যে শান্ত্বনা দিচ্ছে সেও তখন কাঁদছে। সে যে কানাইলালকে ভুলতে পারছে না কিছুতেই। কতদিনের অচ্ছেদ্য অন্তরের সেই কারা প্রহরী শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ফুকারিয়া।

বিদেশী কারাপ্রহরীর চোখে জল দেখে সকলেই অবাক বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

একদিকে ফুকারিয়ার চক্ষু দুটি বিদীর্ণ ক'রে অঝোরে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে, অন্যদিকে সে ব'লে যাচ্ছে "আমি একজন কারারক্ষী, তোমরা বিশ্বাস করবে না হয়তো, কানাইয়ের সঙ্গে আমার, এ কদিনে

অন্তরের কত কথা হয়েছে। কেউ তা জানে না। ও আমাকে বড্ড ভাল বাসত, ডিউটিতে আসতে সামান্য দেরী হয়ে গেলে, সে কত অনুযোগ করত। ওকে আমি ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। মৃত্যু-দণ্ডের খবর শুনে থেকে ওর মনের প্রফুল্লতা সহস্র গুণে বেড়ে গিয়েছিল। কাল সন্ধ্যার পর ওর মুখে এমন মিষ্টি হাসি দেখেছি, যা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। আমি ওকে বরং ভয় দেখিয়ে ছিলাম, বলেছিলাম—কানাই! আজ হাসছ, কাল কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকায় তোমার ঐ হাসি মুখখানা ফেকাসে হয়ে ঠোঁট দুটিকে আতঙ্কে কালো করে দেবে। এমনই দুর্ভাগ্য আমার, ফাঁসীর সময়ে মঞ্চের কাছে আমারই ডিউটি পড়ল। নিয়ম মোতাবিক সেল থেকে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে বস্ত্রাবরণ দিয়ে তার মুখটি ঢেকে দেওয়া হয়নি। হাতে হাতকড়ি লাগান হয়নি। সুপার এর বেলায় নিয়মের কিছুটা তারতম্য করে ছিলেন। সম্ভবতঃ কানাইয়ের নির্ভিকতা দেখে, তাছাড়া ঐ ভদ্রলোক যে খুব একটা কড়া প্রকৃতির তাও নন। তাই হয়তো এর শেষ অনুরোধটুকু রক্ষে করেছিলেন। দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম। বীর সেনাপতির মত দৃঢ় পদসঞ্চালনে মদগর্ব্বে গর্বিত হয়ে সোজা মঞ্চের ওপর উঠে গিয়ে ফাঁসীর দড়িটা হাতে নিয়ে হ্যাঙ্গম্যানের সঙ্গে কি ঠাট্টা তামাসা সুরু করে দিল! সেই সঙ্গে সরকারী কার্যকলাপেও কটাক্ষপাত। আশ্চর্য্য ব্যাপার কি জানেন! মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত্তেও এর বড় বড় চোখ দুটো আমাকে খুঁজছে। আমি দূরে সরে ছিলাম। কিন্তু এর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ঠিক আমাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করে, বিগত রাত্রির সেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছে, আমি তাকে যে কথা বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। যখন 'হ্যাঙ্গম্যান' এর মুখের ওপর কাপড়ের মুখসটা পরিয়ে দিয়ে, গলায় দড়িটা গলিয়ে দিতে যাবে, এ নিজ হাতেই সেটি গলার ভেতর গলিয়ে নিয়েছে, ততক্ষণ জল্লাদ এর পা দুটো এক ক'রে একফালি দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে, তখনও আমাকে

ডেকে বলেছে, "মিঃ ফুকারিয়া এখানে এস। এখনও সময় আছে পরীক্ষা ক'রে দেখ মরার ভয়ে আমার ঠোঁট দুটো কালো হয়ে গেছে কিনা? যে ভয় তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে!' শেষ কথা কটি তার মুখ থেকে ফুরবার আগেই ফাঁসীর দড়িতে টান পড়ল। এর পায়ের নীচ থেকে ৩´×৩ ফিটের লোহার প্লেটখানা সরে যাওয়ার শব্দে আমার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যেন দু ফাঁক হয়ে গেল। আমি আইরিশ বাচ্ছা, তবুও যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। তোমারা তো এর আপনজন। আমি মিলিটারী ফেৎ, তবুও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, যে বীরত্ব কানাইয়ের মধ্যে দেখলাম, তা রক্ত মাংসে গড়া অন্য মানুষে সম্ভব নয়"।

যে কাজের জন্যে এঁরা এখানে এসেছেন সে কথা ভুলে গিয়ে সকলে হতবাক্ হয়ে শ্বেতাঙ্গের মুখে কানাইলালের কাহিনী শুনে চলেছেন, এমন সময়ে পুলিসকমিসনার হ্যালিডেকে সঙ্গে নিয়ে আই. জি, প্রিজনস্ এবং জেলখানার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সেখানে এসে হাজির হ'লেন। ইংরেজ জেলারও এদের সঙ্গে। সেপাই সান্ত্রীতো আছেই এই দলের সামনে পেছনে।

মৃতদেহ সত্ত্বর বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের জোর তাগিদ সুরু হ'ল। অগত্যা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মতিলাল অপরের সাহায্যে কম্বল খানি অতিসন্তর্পণে কানাইলালের দেহ থেকে সরিয়ে নিলেন।

তখন সেই চেহারা কি অবস্থায় দেখে ছিলেন তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে মতিলাল লিখেছেন—"অতিসন্তর্পণে কম্বলখানি অপসারিতকরা মাত্র কি দেখিলাম,—সেই তপস্বী কানাইয়ের দিব্য রূপের পরিচয় দিবার ভাষা নাই—দীর্ঘকেশ প্রশস্ত ললাটে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র যেন এখনও অমৃত আস্বাদে ঢুলু-ঢুলু, দৃঢ় বদ্ধ ওষ্ঠ পুটে সঙ্কল্পের জাগ্রৎ রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে, আজানু লম্বিত বাহুযুগল মুষ্টি বদ্ধ। আশ্চর্য্য। মৃত্যু যন্ত্রণার একটু কুণ্ঠিত বীভৎস চিহ্নও

কানাইয়ের কোন অঙ্গে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল উভয় স্কন্ধ রজ্জুর পীড়নে নমিত হইয়া পড়িয়াছে, মৃত্যুর ছায়া সে পবিত্র মুখশ্রী একটুও বিকৃত করিতে পারে নাই।"

হাপুস নয়নে আশুতোষ এবং তাঁর সঙ্গীরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর একটি একটি ক'রে বন্দীর পোষাক ছাড়িয়ে মহাযোগীকে নতুন সাজে সজ্জিত করছেন। লাল পাড়ের রেশম বস্ত্র পরিয়ে, কোঁচান রেশমী চাদর গলার দুপাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কানাইলালকে সজ্জিত খাটের ওপর সুন্দর ভাবে শুইয়ে দিয়ে ললাটে তাঁরা, এঁকে দিলেন চন্দন তিলক। গলায় পরিয়ে দিলেন রজনী গন্ধার মোটা মালা। সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিলেন পুষ্প স্তবকে। এ যেন অভিনব বরবেশে সজ্জিত কানাইলাল। মুখের মৃদু হাসি আর অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু দুটি দেখে অনুমান হচ্ছে, সে যেন বাসর শয্যায় সুখ নিদ্রায় অভিভূত।

শব যাত্রীরা ধীরে ধীরে খাট খানি ধরাধরি ক'রে জমি থেকে উঠিয়ে নিয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হ'লেন।

অনাবৃত অবস্থায় দেহটি নিয়ে যেতে দেখে, দূর থেকে হ্যালিডে ছুটে এসে ওটিকে ঢেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আস্ফালন সুরু করলেন।

মতিলাল তাঁর এই আদেশে কোন রূপ কর্ণপাত করলেন না, অপরকেও সেকথায় কান না দিতে ইশারা করলেন।

হ্যালিডের রাগ এতে গেল আরও বেড়ে। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন।

এই গভীর দুঃখেও মতিলাল হ্যালিডের এই অশালিন ব্যবহারে, ক্রোধে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন, মনে ভাবলেন, এই কচি বয়সে ওর জীবনটা শেষ ক'রে দিয়ে ও দেখছি শয়তানদের আক্রোশ মেটেনি।

"ঢাকব না দেহটাকে, দেখি বেটারা কি করতে পারে!" এখুনি ওদের সঙ্গে একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে যায় মতিলাল সেইটিই চাইছিলেন।

আশুবাবু দেখলেন ব্যাপারটা বড্ডই ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মতিলালকে বললেন, "কাজ কি ঝঞ্ঝাটে, জেলের ভেতর দেহটা ঢেকেই নিয়ে চল"।

অগত্যা মতিলালকে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হ'ল।

ঢেকে দেওয়া হ'ল পুষ্পচ্ছাদিত দেহটিকে এক খণ্ড নতুন বস্ত্রাচ্ছাদনে।

মৃতদেহ বাইরে আনার পর ওটি বহন ক'রে কেওড়া তোলা শ্মশানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রহরী, বড় ফটকের উল্টাদিকে সারিবদ্ধ পায়খানার পাশ দিয়ে একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়ে দিল।

নীচ দিয়ে আদিগঙ্গা প্রবাহিত।

বাঁ দিকের রাজপথ ধরে তাঁদের যেতে দেওয়া হ'ল না।

উপায় নেই। অগত্যা ঐ পথ ধরেই তাঁদের এগোতে হ'ল।

কোন ক্রমে মন্থর গতিতে শবদেহ বহন ক'রে আশুতোষের দল এগিয়ে চলেছেন।

সম্মুখে রাজপথ, লোকে লোকারণ্য। নর মুণ্ডের গভীর সমাবেশ: রাশি রাশি লীলায়িত কৃষ্ণকুন্তলে যেন এক মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। মুহুর্মুহুঃ সেই প্রবল ঢেউকে মথিত ক'রে, গর্জ্জন সুরু হয়েছে-বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্। পর মুহূর্ত্তেই তার পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউ এসে গভীর নিনাদে বেলা ভূমিতে আঘাত হানছে—'কানাইলাল অমর রহে'। 'বিপ্লবীবীর যুগযুগ জিয়।'

একি? কানাইকে শ্রদ্ধা জানাতে ভারতবাসীর অন্তরের কি গভীর ব্যাকুলতা। শবানুগমনকারীর দল অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে আছেন সেই দিকে। ভাবে বিহ্বল হয়ে তাঁরা এই দৃশ্য দেখছেন।

কোন এক ফাঁকে তাঁদের স্কন্ধ থেকে কানাইলালের শবাধারটি যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। খানিক পরে নজর পড়ে, দূরে সেই স্রোতের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শবাধারটি। গাত্রাচ্ছাদন নিমেষে কোথায় উড়ে গেল। চতুর্দ্দিক থেকে গীতা, পুষ্পমাল্য রাশি রাশি বিল্বপত্র

নানা ধরনের পুষ্প, পুষ্প স্তবক আর চন্দনের প্রবল বৃষ্টি শবাধারটিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। অনেক শ্বেতাঙ্গের মুখকেও এই স্রোতে ফুলের মালা হাতে নিয়ে হাবু ডুবু খেতে দেখা গেল।

কানাইলালের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে এই শুভক্ষণে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রটি চোখের ওপর ভাসতে লাগল। এই মহা বিপ্লবীকে বিদায় দিতে হিমালয় থেকে সুরু ক'রে কন্যা কুমারিকাও এসময়ে এখানে ছুটে এসেছে। বহু ইংরেজ নরনারীও কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে ছুটে চলেছে। এদের মধ্যে যারা আসতে পারেনি তারা অনেকেই পুষ্প স্তবক পাঠিয়েছে এই বলে, 'বাঙলার হে বীর পূজারী তোমাকে আমরা ভালবাসি-শ্রদ্ধাকরি, আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ কর।'

বীরপুরুষ পুলিসপ্রবরের দল নরসমুদ্রের ঐ উন্মত্ততা দেখে ভয়ে ভীত হয়ে দূরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

কেওড়াতলা মহাশ্মশানের একটি বিশেষ স্থানে কানাইলালের শবদেহটি সুরক্ষিত হ'ল। স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে পথ ক'রে দিল দর্শনার্থীদের। অসংখ্য শোকচ্ছমান নারী-পুরুষ সেই আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সারিবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হয়ে কানাইলালের দেহটি প্রদক্ষিণ ক'রে তার চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ করতে লাগল। অজস্র গীতা, ফুল, বিল্বপত্র আর চন্দনের পাহাড় ক্রমাগত কানাইলালের দেহটি নিমেষে আচ্ছাদিত ক'রে ফেলছে, সেগুলি সরাবার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

ললাটে ও কপোলে মায়েরা নতুন ক'রে এঁকে দিলেন থাকে থাকে চন্দন বিন্দু, ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে সিন্দুর তিলক শবদেহের স্নানান্তে।

অগুরু চন্দন চর্চিত সুসজ্জিত চন্দন চিতা পালঙ্কে শায়িত হ'ল বীর কেশরী মহাযোগীর স্পন্দনহীন দেহখানি।

পুষ্পস্তবকে সজ্জিত হ'ল চিতাপালঙ্ক। সুসজ্জিত বাসর শয্যায়

কানাই চিরনিদ্রায় অভিভূত।

কত যেন শান্তিতে, কত আনন্দে ফুলশয্যায় ঘুমচ্ছে সে।

দিব্যকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি, অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন ছুটি, ওষ্ঠপুটে মৃদু হাসি। বদ্ধ ঠোঁট দুখানিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—প্রতিহিংসার ক্রুদ্ধতা, আজানুলম্বিত অকম্পিত বাহুযুগল মুষ্টিবদ্ধ।

চিতায় অগ্নি সংযোগ করে কার সাধ্য! ক্রমাগত দর্শনার্থীর ভীড় বেড়েই চলেছে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তখনও অজস্র গীতা, পুষ্প-চন্দন, ধূপ-গুগ্গুলের বর্ষণ চলেছে সেই ফুলশয্যায়, মরদেহের পথ পরিক্রমায় যেমন চলেছিল গীতা আর পুষ্পেরবর্ষণ। এখন যেন আরও বেশী। মুহূর্তের জন্যেও নিবৃত্তি নাই। সেই সঙ্গে কলসী-কলসী গব্যঘৃত চিতা কাষ্ঠকে স্নান করিয়ে দিতে লাগল।

প্রত্যুষ থেকে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হ'তে চলল। এখনও জনসমুদ্র কানাইলালের চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। ভারত-তীর্থে 'চক্রধারী' দর্শনে কত ইংরেজ নর-নারী ভারতবাসীর সঙ্গে অশ্রুসিক্ত নয়নে জমায়েত হচ্ছে। একদল সরে গেলে আবার আর একদল আসছে। দলের পর দল। এর যে শেষ নেই!

রবিরশ্মির পূর্ণপরশনে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সর্বাঙ্গ এখন এক জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

—আরতো বিলম্ব করা যায় না! অধীর হয়ে পড়লেন আশুতোষ দত্ত।

চিতানল ধীরে ধীরে বীরের অঙ্গস্পর্শ ক'রে নবানুরাগে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল।

মিনিটে-মিনিটে, কলসী-কলসী ঘৃত, মনে মনে চন্দন কাষ্ঠ, সেরে সেরে সুগন্ধির গুড়া, ধূপ-গুগ্গুল যজ্ঞকুণ্ডে অর্পিত হ'তে লাগল। এরও যেন শেষ নেই, কে আনছে! কোথা থেকে আসছে! কে জানে।

পরম বিস্ময়ে চেয়ে আছেন শ্মশান বন্ধুরা। এমন তো কখনই দেখা যায় না!

অশ্রুজলে মহাশ্মশান প্লাবিত।

গগণ চুম্বী হোমানল বীর শহীদের জীবনালেখ্য এই ভাবেই লিখে দিল আকাশের গায়ে, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত।

কবি বিনয় ভূষণ দাসগুপ্ত তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন এই কাব্যছন্দে—

"ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে
হে বিপ্লবী শহীদ কানাই,
যে কীর্তি রাখিয়া গেছ
প্রাণ-বীর্য্যে আত্মাহুতি দিয়া,
সেই পুণ্য অমর স্মৃতি
জন্ম ক্ষেত্রে থাক উদ্ভাসিয়া
অনন্ত কালের বুকে—
হে যাজ্ঞিক, তব মৃত্যুনাই" *

রাত্রি দ্বিপ্রহর। শুক্লারজনার চন্দ্র তখন কানাইলালের গৃহ-প্রাঙ্গণ জ্যোৎস্নাধারায় উদ্ভাসিত ক'রে যেন ঋত্বিক কানাইলালের জয়গান গাইছে। শ্মশানবন্ধুরা ধীরপদক্ষেপে উঠানে পা দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ডাকে বীর প্রসবিনী কানাইজননীকে তাদের আগমন বার্ত্তা জানাল।

জননীর হৃদয় ভেদী ক্রন্দন সকলের বুকে শেলের মত এসে বিদ্ধ হ'ল। তারা নতজানু হয়ে মায়ের চরণধুলি মস্তকে ধারণ করল। মায়ের ক্রন্দনে চিত্ত স্থির রাখা কারোরই সম্ভব হ'ল না। আশুতোষ মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ক্ষণপরে শোকে মুহ্যমানা আলুথালু বেশা জননী অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন "হ্যাঁগোবাবারা, কানাইয়ের কী ক'লকাতার চাকরীর ছুটি হয়ে গেল? তাকে তো তোমাদের সঙ্গে দেখছি না।"

* অবশেষে ক্ষোদিত হ'ল কবির এই শ্রদ্ধার্ঘ্য চন্দননগর ষ্ট্যাণ্ডে মহাবিপ্লবী বীর শহীদ কানাইলাল দত্তের আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদদেশে।

কোথায় রেখে এলে তাকে ; তার পথ চেয়ে যে আমি বসে আছি।···তোমরা আমার কথার জবাব দিচ্ছনা কেন ? তবে বুঝি সাগরপারে পাকা চাকরী নিয়ে চলে গেছে সে ? আর ফিরবে না বুঝি ? ও যে কোন দিনই মিথ্যে কথা বলতে জানে না। তা হলে সত্যিই খোকা চাকরী করছিল ? হ্যাঁরে আমাকে যে সে, তাই বলে গিয়েছিল !"

। সত্তর ।

আলিপুর বোমার মামলা একনাগাড়ে চলেছে তো চলেইছে। কবে যে শেষ হবে ঠিক ঠিকানা নেই। নর্টন নেচে-কুঁদে আসামীদের নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করবার চেষ্টায় আছেন। মাঝে মধ্যে জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে নোট নিতে অনুরোধ করছেন। বার্টন তাঁকে সহায়তা করছেন পাশ থেকে খেই যুগিয়ে দিয়ে। আশু বিশ্বাস আর আর সামসুল কাগজ পত্র এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছেন, কৌঁসুলীর হাতের কাছে। প্রয়োজন বোধে নথীপত্র, বিপ্লবীদের তৈরী জিনিস পত্র, সংগৃহত আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি জজের চোখের সামনে একটি একটি করে তুলে ধরা হচ্ছে।

এঁদের শেষ হ'লে পাল্টা প্রশ্ন করছেন, বিবাদী পক্ষের ব্যারিস্টাররা।

সাক্ষীর দল একের পর এক উঠছে কাঠগড়ায়। সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছুই বলে যাচ্ছে দু'পক্ষের প্রশ্নের জবাবে। কৌঁসুলীর প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে মাঝে-মধ্যে এমনই সব বানিয়ে শিখিয়ে দেওয়া মিথ্যে এজাহার দিচ্ছে, যে, একটার সঙ্গে একটার মিল থাকছে না; শেষ কালটায় তাল কেটে এলো-মেলো জবাব দিচ্ছে।

দর্শকরা হেসে খুন।

এইভাবে দিনের পর দিন মামলার শুনানী চলতে লাগল।

সন্তোনের ফাঁসীর হুকুম শুনে তার মা এসেছেন জেলখানায় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে।

ছেলেকে ঐ অবস্থায় সেলের মধ্যে কয়েদী পোষাকে কম্বলের ওপর ব'সে থাকতে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

জেলখানার কর্মচারীদের সামনে মাকে ঐভাবে কান্নাকাটি করতে

দেখে, সত্যেন মাকে সান্ত্বনা দিতে বললে,—এভাবে কান্নাকাটি করলে সে তাঁর সঙ্গে কথাই কইবে না।

বাধ্য হয়েই মাকে কান্না থামাতে হ'ল।

মা ছেলের হাত দুটো ধরে বার বার অনুরোধ করলেন, হাইকোর্টে আপীল করতে। এ আপীলের ফলাফল সত্যেনের জানাই আছে। কানাই তাই এক কথায় না করে দিয়েছে। সে কিছুতেই রাজি হ'ল না। শেষে মার মনে সাময়িক শান্তি দিতে হেমচন্দ্রের অনুরোধে তাকে আপীল করতে হ'ল।

•

হিন্দুস্থানের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল ভাষায়, সমস্ত সংবাদ পত্রের শিরোনামায় বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে "দশই নভেম্বর (১৯০৮) ভোর পাঁচটার সময় আলিপুর ইংরেজ কারাগারে বিপ্লবী মহানায়ক বীর শহীদ কানাইলাল দত্তের ফাসীর রজ্জুতে জীবন দান।" বিভিন্ন সংবাদপত্র আপন আপন বৈষম্য নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে কত রকম ভাবে তার জয়গান করেছে। রাজদণ্ড তাদের লেখনী রোধ করতে সক্ষম হয়নি।

রাসবিহারী তিন-চারখানি সংবাদ পত্র কিনে এনে খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে চলেছেন অশ্রুসজল চোখে। কৈশোরের কত কথাই না তার মনের অলিন্দে উঁকি দিচ্ছে। মহাযোগী কানাইলালের কীর্ত্তিতে বুকটা তাঁর ফুলে উঠছে। চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ ক'রে জল ঝ'রে কাগজখানা ভিজিয়ে দিচ্ছে। চোখ দু'টি মুছে নিয়ে আবার পড়ছেন। কানাইয়ের মায়ের কথা মনে পড়তেই মনটা তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এসময় তাকে চন্দন নগর যেতেই হবে।

ছদ্ম বেশে রওনা হলেন চন্দন নগরের উদ্দেশ্যে। পুলিস পেছনে আছে, তবুও তাকে যেতেই হবে, বীর প্রসবিনী জননীকে সান্ত্বনা দিতে, যত বড় বিপদই তাকে তাড়া করে আসুক না কেন!

। একাত্তর ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আপীল ক'লকাতা হাই কোর্ট সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। নিম্ন আদালতের রায় বহাল রয়েছে -"You Satyendra nath Basu son of Abhay Basu is condemned to death·· and will be hanged, hanged, hanged by the neck until you are dead·· "

ফাঁসীর দিন ধার্য্য হয়ে গেল ; কানাইলাল দত্তের ফাঁসর মাত্র এগার দিন পর।

আলিপুর জেলের ঐ ফাঁসীর মঞ্চেই ২১শে নভেম্বর (১৯০৮) ভোর পাঁচটায় অনুরূপ ব্যবস্থাপনায় ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল তাকেও।

কানাই আর সত্যেনকে ফাঁসী কাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে ইংরেজ ভাবল- 'যাক্ বিপদের হাত থেকে বুঝি রেহাই পাওয়া গেল' !

ধীর স্থির ভাবে বিপ্লবীর আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সত্যেনও চলে গেছে।

সৎকারের জন্যে কানাইলালের মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যেতে দিয়ে ভারত সরকার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

এখনও সে ক্ষত সারেনি। সত্যেনের মৃতদেহ বাইরে নিতে দিয়ে দ্বিতীয় বার আবার ফাঁসাদে কে পড়তে চায়! আর এতবড় ভুল তারা করছে না। আত্মীয় স্বজনের হাতে সত্যেনের মৃত দেহ কিছুতেই ছাড়া হবে না ! সৎকারের ব্যবস্থা যা কিছু করা হবে সবই কারা প্রাচীরের অন্তরালে !

জানিয়ে দেওয়া হ'ল আত্মীয়দের, দেহটিকে পুড়িয়ে দেওয়ার সময়ে

কেউ যদি উপস্থিত থাকতে চায়, আসতে পারে। জেলখানার ভেতরেই দাহ কার্য্য শেষ করা হবে।

সরকার পক্ষের এই হীন আচরণকে আত্মীয়েরা সুষ্ঠ ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না।

পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম্মের জন্যে যে টুকু প্রয়োজন সেই টুকু সমাধানের জন্যে, কেবল মাত্র সত্যেনের একজন আত্মীয় অবিনাশ চন্দ্র রায়, এলেন ব্রাহ্মনেতা এবং ধর্ম্মযাজক আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়কে সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই সকালে জেলখানায়, সত্যেনের ফাঁসী হয়ে য্যাওয়ার পর।

জেল কর্ত্তৃপক্ষ, সরকারী আদেশে কারাগারের অন্তরালের শেষ সীমানায় হাসপাতালের পেছন দিকে মৃত দেহ সৎকারের জন্যে চিতা প্রস্তুত ক'রল।

আচার্য্যদেবের বেদপাঠান্তে প্রেতযোনীর মঙ্গল কল্পে সামান্য অনুষ্ঠান শেষে সত্যেন বসুর মৃতদেহ চিতায় তুলে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল।

মৃত্যুর পরও অর্ব্বাচীন সরকারের জঘন্য ব্যবহারে বন্দী অবস্থাতেই কর্ম্মযোগী সত্যেনের পবিত্র দেহটিকে পঞ্চভূতে লীন হ'তে হ'ল।

কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন বসুর ফাঁসীর ব্যাপার নিয়ে ইংরিজী পত্রিকা "Pioneer" আবার লিখল—'The shooting of informer is indeed murder, but it is also self devotion. It is a case of his life against the livies of the others and the two assassins resolved to sacrifice them selves for the sake of the rest. If the Bengalies like to enthrone those two young men here after in popular remembrance, it is not easy to see how any one can justly object to the action."

আলিপুর বোমার মামলার সওয়াল তখনও নিয়ম মাফিক সুরু হয়নি। মামলার স্রোত বিভিন্ন গতিতে বহে চলেছে। তখনও সাক্ষীর ঝুড়ি এনে উপুড় ক'রে দিচ্ছেন শামসুল।

শীতের সকাল। অল্প বয়সের একটি কিশোর-চারুচন্দ্র বসু, চাদর জড়িয়ে কোর্টের সামনে ঘোরাফেরা করছে। তার ডান হাতখানা আবার পঙ্গু। ঐ পঙ্গু হাতের সঙ্গেই একটা পিস্তলকে বেশ ক'রে দড়ি দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে। লক্ষ্য ভেদ করবে সেই মতলবে ঘুরছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাস বারলাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে, গাউনটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

জজসাহেব এজলাসে বসে গেছেন।

আশু বিশ্বাস সামনা সামনি হতেই পঙ্গু হাতের ছেলেটি, চাদরের নীচ থেকে হাত ছুটি বার ক'রে, সোজাসুজি তার বুকের সামনে ধরে, ডান হাতখানা সোজা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে পিস্তলের ট্রিগারটা দিল টিপে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে আশু বিশ্বাস লুটিয়ে পড়লেন মাটির ওপর। ১৯০৯ এর ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর ভবের খেলা শেষ হয়ে গেল।

কোর্টের ভেতর ভীষণ উত্তেজনা। বাইরে লোকজন ছুটছে। জজসাহেব চেয়ার ছেড়ে ছুটে গিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে আত্মগোপন ক'রলেন।

আদালতের ভেতরে-বাইরে এক গাদা পুলিস থেকেও তো আশু বিশ্বাসকে রক্ষে করতে পারল না।

সরকার প্রমাদ গনল।—কি করা যায়? সাহাজ্যকারী ছু'জন বাঙালী তো একে একে খতম হ'ল। কানাই-সত্যেনের কত যে শিষ্য আছে অনুমান করাই তো যাচ্ছে না। রক্তবীজের ঝাড় একের পর এক তৈরী হয়ে উঠছে। এখন উপায়? এদের তো প্রাণের মায়া নেই। কত জনাকে আর ফাঁসীর দড়িতে লটকান যাবে? বুকের পাটারও

বলিহারী যাই! শিকারকে শেষ ক'রে গর্ব্বিত ভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

দু পক্ষের কৌঁসুলীর সওয়াল চলল চল্লিশ দিন ধরে। মানিকতলা বোমার মামলায় অন্য সব অপরাধীদের যে কোন শাস্তি হয় হোক্‌গে, তাতে নর্টনের কিছু এসে যায় না। অরবিন্দকে দণ্ডিত করতেই হবে এই হল তাঁর 'ধনুর্ভাঙ্গা পণ'।

সওয়াল সুরু করলেন নর্টন। আশু বিশ্বাসের জায়গাটাও নিয়েছেন সামসুল।

সাক্ষী সাবুদ, মামলা সংক্রান্ত জিনিষ পত্র কোর্টে যথাসময়ে হাজির করা সবই এখন শেষ হয়েছে। আদালতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আদালত প্রাঙ্গনে আজে বাজে লোক আসা যাওয়া একদম বন্ধ। আরও পুলিস মোতায়েন হয়েছে। পুলিসের নজর এড়িয়ে কারো ঢোকা এখন মুস্কিল।

দু.পক্ষের সওয়াল শেষ হলেই জজ মামলার রায় দেবেন।

কথায় কথায় জজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে নানা প্রকার বাচনিক ভঙ্গিতে ফরিয়াদ পক্ষের কৌঁসুলী সওয়াল শেষ করলেন।

সরকার পক্ষের উপস্থিত সকলেই মনে ভাবল অপরাধী বলে যাদের গণ্য করা হচ্ছে তাদের মধ্যে কয়েকটা তো ফাঁসীতে ঝুলবেই, অরবিন্দেরও রেহাই নেই।

মামলায় নর্টন আসামীদের 'Notorious' বলে অভিহিত করলে পি. মিত্র তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং নর্টনকে উক্তিটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন।

বিবাদীপক্ষের ব্যারিষ্টাররা অপরাধীদের বাঁচানর জন্যে সওয়াল জবাবে কিছু আর বাকি রাখলেন না।

সব শেষে অরবিন্দ পক্ষে জবাব দিতে উঠলেন কৌঁসুলী-ব্যারিষ্টার

সি, আর, দাস, ২৩শে মার্চ (১৯০৯) থেকে সুরু হ'ল তাঁর সওয়াল জবাব।*

গুরু গম্ভীর বাচনিক ভঙ্গিতে একটানা ন'দিন তরুণ ব্যারিষ্টার সওয়াল জবাব করলেন।

May it please your honour, and gentlemen assessors,—it is a matter of congratulation for us all, that at last this trial has come to a close. It is especially a matter of congratulation for the prisoners at the bar because they have been in jail for the best part of a year and the time has now come, gentlemen, for you to consider the evidence which has been placed before you to find out whether the charges brought against them by the prosecution are true or not. I shall have to deal with the evidence in this case at some length but before I do that I must draw your attention to certain features of this case which are very unusual. I believe Mr. Birely said in his evidence that he took special, or rather unusual interest in this case because it was an unusual case and you will find throughout the evidence in this case that it has been conducted on very unusual lines. I am not referring to what has taken place here so much as to what took place before the committing Magistrate, before the case came here. The seeds were sown there, you will find that Mr. Birley made up his mind to try this case on the 3rd May, the accused persons being arrested on suspicion. The evidence is that the police connected some of the accused at any rate with bombs and with conspiracy; whether that evidence is true or false is another matter. It is their version that on the 2nd May these accused persons were

* এই সম্পূর্ণ সওয়ালটি ইতিপূর্বে কোন বইতে প্রকাশিত হয়নি এটি একটি পৃথিবী বিখ্যাত সওয়াল।

arrested on suspicion and taken to the thana and kept in the lock-up. They were not produced before the Magistrate at all unless of course they say the Commissioner of Police is a Magistrate. We find on the 3rd May Mr. Birley made up his mind to try the case. They were produced before him on the 4th May. We find that Mr. Birley went to the house of a Police officer, a very high official, no doubt and there he read some of the confessions alleged to have been made by the accused persons to the Police. I say this is an unusual feature, a feature we have not come across in any case in any Court before now. Having done that what does he do? On the 4th May some of the accused persons were produced before him. He forthwith proceeded to examine them. The case for the prosecution is that he recorded the confessions of these accused under a particular section of the Code, with regard to that I shall deal later and you will find from those questions put by Mr. Birley that his object of enquiring was as to what other persons were implicated in certain things. That is done on the 4th May. On the 3rd May he makes up his mind to try this case, on the 4th May the accused brought before him and before a scrap of evidence is placed before him—he proceeded to take the statement of the accused personally putting questions and recording their answers. After that you will find that he dealt with the applications for bail; a great many were put in—almost all the accused one by one made an application. They were all rejected. Later on May 18th evidence began before Mr. Birley with the examination of Mr. Frizoni. On that day you find objections were taken to his jurisdiction. You find the next day Mr. Birley in the order-sheet is referring to his order of the 3rd May to show how he came to take up the case himself. There is another unusual thing which I have to mention.

After Frizoni was examined in part on the 18th May, on the 19th he made an order, I shall read it. There is no

record of that evidence here at all. But Mr. Birley thought that some objections may be put forward before him to the effect that he had taken cognizance of the case without the proper sanction of the Court ; so he proceeds to re examination to make the proceeding regular according to his opinion. Is that the manner in which a Magistrate is to record evidence ? My submission is that the object of that entry here in the evidence of Frizoni is to get over what he thought he could not get over, namely, the legal objection to his jurisdiction.

It is perfectly clear that before the 18th May there was no sanction put up before him on any authority and it is perfectly clear that even when he got sanction he did not examine the complainant as he was bound to do under the law. I submit all these proceedings are of a very unusual character. These proceedings are not warranted by anything in the Code of Criminal Procedure or under any law. I can quite understand my friend's contempt for the Code, but I venture to submit that the Code applied even to a State trial and more so in a trial where persons are accused of the most serious offences known to the law. I shall show you, when I survey the evidence and put it before you that ninety per cent of that is inadmissible here and ninety per cent, of it throws no light upon the charges which these persons are brought here to meet. Not only is public time and money wasted but that all that mass of evidence tends, and must necessarily tend to prejudice the accused.

In a case like this, the first thing to do is to prove that a conspiracy did exist and the next thing is to connect the particular person with the conspiracy. What has been the method followed by my friend ? Whether he discussed oral evidence or documentary evidence he started with the assumption that these persons are guilty. He assumed them guilty and then tried to connect them with the evidence. He reads a letter and finds a reference to A. G. What is

his arugument ? Does he refer to any proof to show that A. G. stands for Aurobindo Ghosh ? No. His argument is "I tell you that is Aurobindo Ghosh". In order to try the accused persons you must start with the assumption that they are guilty and after to look into the evidence connecting them.

Take the Chattra Bhandar. Aurobindo Ghose is a conspirator because he is connected with the Chattra Bhandar. I submit that is entirely a wrong procedure to adopt a procedre which has never been adopted before in any Court of Justice. He ought to have told you that you must proceed on the assumption that these persons are innocent of all the charges brought against them and if by pursuing the evidence you come to the conclusion that the evidence is unmistakable proof of their guilt, then and then only can you convict them.

There is another point, that is with regard to Aurobindo's domestic letters. Read these letters and you will find that they throw no light on the charges against these accused. The sanctity of his private correspondence has been wantonly and improperly violated. Was it for the purpose of proving to you that these men are guilty ? I submit not. There is nothing in those letters from beginning to end which throws a light on the charges for which these men are being tried. There again my friend's argument was "don't" read the letters as they stand but read between the lines". That is to say although the letter don't support the conspiracy and don't suggest any offence, yet you must not be deceived by them. Don't you know Aurobindo is guilty ? Don't you know he is connected with bombs ? Don't you know he has waged war against the king ? Take that for granted and you find him guilty. His movement-in Baroda is stated to be in connection with bombs. His articles in the Bande Matarm are referred to. There is no evidence at all reliable which is put forward to show that he is responsible for

all means and take the consequences. He never asked you to apply force in the single utterance of his either in the press or on the platform. If the Government thought fit to bring in a law which hinders you from attaining that salvation, Aurobindo's advice is to break that law if necessary in the sense of not obeying it. You owe it to your conscience; you owe it your God. It the law says you must go to jail, go to jail. That was the cardinal feature ot the doctrine of passive resistance which Aurobindo preached. Is not the doctrine of passive resistance preached throughout the world on the same footing? It is peculiar to this country, this movement which has met with such abusive language from Mr. Norton? Have not the people of England done it over and over again? I say that this is the same dottrine that Aurobiodo was preaching almost upto the very day when those handcuffs were put on his hand. He was oppressed with a feeling of disappointment, because his country was losing everything having lost their faith. Therefore find whenever he preached freedom he brought out that feature clearly. He says, believe in yourself; no one can attain salvation who does not believe in himself. Similarly, he says in the case of the nation. If the nation does not feel that it has got something within it to be free to attain that salvation then there is no hope for that nation. Accordingly we find Aurobindo preaching "you are not cowards, you are not a set of incapable men, because you have divinity. Have faith in you, and in that faith go towards that goal, and become a self-developed nation".

I now deal with the evidence referred to by my learned friend to show the inner work of Aurobindo from 1902 down to the day of his arrest. You will find, gentlemen, that upto 1902 or 1903 there was no connection between Barin and Aurobindo.

You will find it is proved by the evidence in this case

that Aurobindo went away to England. After his return he was posted at Baroda. Barin at that time was being educated at Deoghar. From there he went to Dacca to study for F.A. After that he went to Patna and thence he went to Boroda. We find him in Baroda in 1902 and 1903. My learned friend's argument is that it was during his stay in Baroda in 1902 and 1903 that the seeds of revolution were sown in the hearts of Barindra by Aurobindo. Barin says in his statement that he came away from Baroda sometime in 1903 and began to tour round the different parts of the country and preached the cause ot indeoendence. My learned friend thinks this to be an ideal with which nobody will quarrel and then with regard to this ideal he says that the seeds of this concent was sown at Baroda.

First of all you will find, gentlemen, from the evidence of Sukumar Mitter and Padoo Tewari that there was no connection between Barin and Aurobindo before their meeting at Baroda in 1902 and 1903. Therefore as long as Barin was at Deoghar you find from the evidence of Sukumar and Padoo that the two brothers did not meet. Barin passed his Entrance Examination from Deoghar, he read F.A. at Dacca and then went to Bankipore and then eventually went to Baroda. The two brothers first met at Baroda. After a time Barin left Baroda and engaged himself in preaching the cause of independence of the country. From that, my learned friend argued that the poison must have been infused into Barin by Aurobindo. The best way to test that would be from what Aurobindo himself says at that time when they were together at Baroda in 1902 and 1903. There are only three Exhibits 292-1, 292-3 and 292-5. I am not aware of any other letters of that period. Exhfbits 292-1 is a letter dated the 2nd of July 1902.

How do you find sedition or waging of war against the Government in this letter ?

With regard to the reference to Jyotindra I shall deal

later on. Aurobindo wanted the horoscope of his wife to show to Jyotindra who was an astrologer in the Baroda service. I want to deal later on with Jyotindra and see if he was the accused who has since been discharged. It was in 1902. That does not help the case for the prosecution at all. Amongst these letters I have just mentioned there is another letter dated the 20th of August 1902. This letter refers to his promotion and so on. There is nothing important in that letter except that soon before that time Aurobindo considers himself a strict member of the Hindoo Society. These are all the letters which we get and which we preserved to give us an idea as to what the trend of his mind was in 1902. After that, as I have told you, Barin came away from Baroda and was engaged in preaching the cause of independence. He goes back sometimes in 1904 or 1905. It is difficult to find out exactly when. It is at that time that Aurobindo complains about Barindra. You will find that from Exhibit 286-4.

If you see coupled Exhibit 286-4 with the evidence of Sukumar you will find that Aurobindo complained that Barindra would not take service. It is clear that Barin at that time went back. Aurobindo asked him to accept service but Barindra refused to work. This letter was written on 22nd Octber, 1905. This is not in order of time. This is the last letter of that period, before Barin goes to Baroda. Aurobindo compalins, "Barin is never quiet, he will not accept any service". Therefore we see, gentlemen, that Barin goes bad. It must have been that Barin's people took him to ask for doing nothing and asked him to take some post to earn his livelihood. Aurobindo complains "he is not quiet, he wants to go out for the service of the country". That also we find in Sukumar's evidence. That shows clearly the relation between Aurobindo and Barindra. Then, gentlemen, vou have got to consider Aurobindo's own views during that period. The career which Aurobindo

sketched out in that letter is that to which he stuck up to the day of his arrest. I refer you to the letter of Aurobindo to his wife, dated 13th August, 1905. At that time Barin was living at Baroda. I have shown from the letter of 20th October, 1905 that Aurobindo was complaining about Barin. So Barin was at that time at Baroda. The seeds of revolution were again sown. It is better to find out what Aurobindo's own views were about the time. These letters are Exhibits 286-1 and 286-2. I would prefer to read Bengali letter. You must remember, gentlemen, that at that time Aurobindo did not acquire a sufficient knowledge in Bengali. It is written after Sanskrit. You remember, gentlemen, that Andha Rajar Mahishi. This allusion refers to queen Gandhari who used to blindfold her eyes as her husband Dhritarastra was blind. Gentlnmen, you see that Aurobindo describes himself as Pagal (a mad man) and tells his wife to settle as to what path she would follow. He makes the reference to Gandhari and expresses his hope that inasmuch as there is Hindoo blood in her veins she will follow the course which he has taken up. The life he sketched out he followed literally. The man has spent all his income for the good of the country, for charity keeping only that which is necessary for his bare subsistence. The first great ideal which he sets out in this letter is that he must regard himself as trustee of all money that belongs to him. It is his duty to spend as little as possible for himself for the purpose that he may continue to live and give the rest to God. How? By doing God's work, namely by feeding those who are hungry and by assisting those who are in need. It is then and then only that you can give back what you owe to God. If a man does not do it he is then a thief. It is not for his own selfish end. He is determined to lead that life. He will keep for himself only what is absolutely necessary for bare subsistence and the rest he will give back to God. The only way you can do that is by way of charity, by feeding

the hungry and by rendering assistance to those who are in need of it.

The second great ideal to which he refers is he has got the conviction in his mind, that it is possible to see God, not to see God in the objective sense but according to Hindoo religion to see God in his own mind. One can discover the God-head that is within him. It is easy to scoff at this. But here is a man giving expression to his earnest longing to realise the God-head himself. This is his second great ideal There is another point and that is this. There is also in this letter a covered reference to Guru (Spiritual guide).

Because you know gentlemen that when a Hindoo brings himself under a spiritual guide he never discloses the manner of his Guru nor the fact that he has done it, That is part of the religion. Unless you get the permission of the Guru you can not give it out even to your wife "Jaibar Niyam dekhayche" that is somebody has pointed out rules of conduct which will help him to enter that path following which he can realise the God. That is within him. Then he began to practise. That is to say he began to shape his life according to those rules.

Then he says "after practising them for one month, and realising the signs which the Hindoo religion has said to be the signs of that stage", everybody is entitled to that path. Unless you desire to enter that line you can not get it. But it is within the power of every individual to attain that". In this letter he asks his wife to write to him whether she desires to enter this line or not, so that he may further correspond with her on that point. I ask you to remember this because you will find it is fully explained in his subsequent letters to which my learned friend also has referred.

Then he comes to his third ideal. Here he lays down the basis of his patriotism. There again the 'ideal is drawn

from Vedantism. You know the doctrine according to the Vedantism is that the whole world is a manifestation of God. Unless you realise that the whole is a manifestation of Divinity, as long as you do not realise within yourself that the world you see around you, the country in which you live are manifestations of Divinity then all these are unreal as you do not realise the association, the connection between them and the Absolute. But when you realise they are not seperated from but are parts and manifestation of Divinity that very moment they cease to be unreal and become real. "What do you think of your country? It is not merely forest, river, etc". To Aurobindo it is the manifestation of Motherhood. That is another aspect of Divinity according to Hindoo religion. His basis of patriotism is that you must show regard to your country that you can discover and realise the Motherhood of the country. You must so love your country that you can realise within yourself that it is another aspect of God. A man who believes in Vedanta can see clearly and finds no difficulty at all That is the basis of his patriotism. You must realise Divinity in the country in which you live. Aurobindo feels that nationalism has no place unless it leads to universal humanity Unless nations develop in that way, the ideal of humanity can never be reached. I shall point out from article after article in the Bande Mataram that as the individual must live in the light of the society. So the nation must live in the light of humanity without which the whole philosophy is meaningless absolutely He looks upon the country as the Mother. As I have explained that is another manifestation of God.

Then he says that his ideal is independence and the last line of this paragraph makes it clear. Some day or other, it may not be in the life-time that this ideal will be accomplished. "When the mother is oppressed what will her sons do, etc"? A very curious argument has been based upon that. He says how can you do that. You have got

no guns, no swords. "It is my ideal", he says "that the country should realise freedom some day or other". He explains it by his answer. How can you do it? "I am not referring to Kshatratej but I am referring to Brahmatej". My learned friend's argument is that so far as Aurobindo himself is concerned he will do the advising but others will be left to bombs. Where do you find this in these letters? My learned friend's argument is on the whole of this sort that you must assume that Aurobindo is guilty. Then you are to read the letters between the lines. According to my friend's contention, so far as Aurobindo is concerned, he will apply the Brahmatej, and makes others to use the Kshatratej. If you read these letters you must come to the conclusion that he deprecates other forces. The only force upon which he relies and to which he appeals is the intellectual force. It is upon this force, he says, the future welfare of the country rests. He is going to rely upon guns and swords. With all respect I submit that the suggestion of my learned friend is absurd. Anyone who reads the letters must come to the conclusion that the means which Aurobindo suggests is not physical force but the force of character, the force of intellect, upon those forces the future of the country will be based. He says "don't you think that physical force is the only force in the world, there is a higher force and that is intellectual force, the force of character. Rely upon that force That is the means which should be employed for the deliverance of the country" It is not possible to put the construction upon the letter as my learned friend has done.

Referring to that part of the letter which says "If a demon sits on the breast of the mother what would the sons do" Counsel said--what is the meaning of that? It is only an analogy. He says that he regards his country, not as merely a collection of fields, hills, rivers, and so forth but he regards her as his Mother; then he says that he is

only referring to the fact that the country is under subjection. He has used only a metaphor to show that his countrymen are not to sit idle, but to act so as to realise his ideal. The letter was not intended for publication, it was not an open letter to his countrymen; it was to his wife. ([illegible]). Does not it mean that regarding the facts that their country is in a wretched condition, it is far away from freedom, it is in bondage? So it is the duty of every man in India to stir himself to realise the ideal of freedom. His basis of pariotism is that he regards his country as Mother. It is to him not a physical nonentity but is a concrete manifestation of Divinity. His central idea is that the country is a concrete manifestation of Divinity.

The regeneration of the country has to be brought about by force of character and intellect and not by physical force. Then the next paragraph makes it clear

You understand, gentlemen, what he means by saying "wife is the strength of husband" That attribute in Aurobindo by which he realises the Divinity is Sakti and he brings that into relationship between a husband and wife and says wife is the Sakti It is through her that he realises the higher relation of man and wife

Referring to the sentence "will you utter the mantra of worshipping the Saheb like, Usha?" Counsel said he thereby means to say "will you worship Western ideals?" He is disparaging those who follow Western ideals.

"Ei chila sei goponia kotha". He explains the secret in the letter and asks for the co-operation of his wife. He asks his wife to worship God, then she will be able to realise these things. There is nothing into the letter except that, it refers to his wife's vices which he says, are vices of the present time. Then he says that every high fdeal is now-a-days laughed at. I refer your Honour to the letter, dated the 30th August, 1905, I submit that the letter shows no disposition on the part of Aurobindo to use physical

force of any description at all. On the contrary what the writer does rely upon is what he calls (Brahmatej). You will find later on that all throughout his activities he merely advocates the application of the force to which the phrase Brahmatej refers. Here is a man who regards it as a part of his ideal of religion to bring about the salvation of his country and that by applying Brahmaej; it is for you to consider what the man had in contemplation. It is a truth of political philosophy. You remember in this connection that no government, however, absolute or representative, it may be, can exist except without the consent of the people. It is a maxim which is well recognised by political philospher from Hobbes to Spencer downwards. When a government exists it shows conclusively that it exists with the consent of the people. He preaches that the salvation of the country must be attained by people who possess Brahmatej. First of all, I submit that he preaches the ideal of freedom because he thinks that until a transformation in the thought of the people is brought about he cannot accomplish his ideal. He says and says candidly that it cannot be brought about in life-time of an individual. But before that point is reached he holds that the people must be educated at any rate. And it is when the consent of the people is lost that the Gnvernment ceses to exist. What are the means he adopts when he comes to Calcutta ? He takes up the cause of National Education. All throughout his activities and until the day of his arrest he was always in favour of National Education. He sacrificed his wordly prospects in order that he might improve the national education of his country. He joins the National Council of Education and fill an important post there. He engages himself in the Swadeshi and Boycott movements. In this connection his ideal is that when the people have learnt to love the country they must encourage the industries of their country. Aurobindo's view with regard

to Swadeshi is that it is not purely industrial. I do not desire to justify Aurobindo's connection with Swadeshi and boycott movement purely on industrial lines. This way of thinking is inconsistent. What I do say is that he has got one all-absorbing ideal for the regeneration of his country, and the basis of that ideal is religion. His advocacy of the Swadeshi, boycott and national education is not only for the industrial development of the country, not only the development of the education of his country but he thinks that these are means which are conducive to the awakening of the national spirit of this country. This is the line of activity. Before I deal with the various documentary evidence upon this point, you will allow me to place before you two letters which will throw some light. One letter is dated 30th August, 1905 which will show the thing in its two aspects, and the other letter is dated the 17th February, 1908. I shall also refer to another letter to which my learned friend has not referred. It is of the 20th February, 1908. The first letter is marked as 292-4 and the second 292-10. The first letter is set out in the first volume of Exhibits page 401. With your permission I will deal with the letter in Bengali.

The letter stated 'I have not written to you for a long time. I was to return on the 8th but I could not do so. Whereever Providence took me to I went. I was not engaged in my work but His'

My learned friend seemed to have thought that Aurobindo in his statement dissociated himself from political work. But in his statement 'in all my activities, political, religious, or otherwise, I followed the principles which are enunciating himself from it,' he admits that he was engaged in a political work. My learned friend has a marvellous faculty of misunderstanding Aurobindo. There is an interesting point in my learned friend's address. With reference to the transformation of Aurobindo's

thought as refered to in the letter my learned friend was going to suggest something, but all on a sudden he turned away in another direction and suggested that on account of the 'Sweets letter' there was a transformation in his thought. My learned friend branched it off as it were and said his case was that Aurobindo was engaged throughout in the conspiracy. That point he gave up, namely, the suggestion that 'Sweets' letter' had anything to do with this wonderful transformation in Aurobindo's activities.

Counsel here read the letter further on, which says 'the condition of mind is different now and I am no longer subject to my own will. I shall have to do whatever He bids me', Your honour will see how Aurobindo's conviction were getting deeper and deeper every day. You are familiar with the Hindu thought on the point. In this connection I may point out to your honour the utterances of Ramkrishna Paramhansa and other saints. The man considering himself as the actor is inconsistent with the principles of Hindu religion, the very essence of which is—You are the player of the instrument and I am instrument itself. This thought is referred to in the letter of the 30th August in which Aurobindo says to his wife "you may think that I am doing all this of my own accord but these are not my own actions. I am merely an instrument of the Divinity within".

Continuing Counsel said: You are also aware of the line in the 'Gita'—'Thou dwellest inside, I do whatever Thou dost engage me in'.

Mr. Das read the line in the letters which showed that God had shown a specimen of His boundless mercy. Does this—asked Counsel—suggest bombs? It marks the beginning of his religious convictions. Aurobindo says further on the letter that God will show His mercy

to her also. He will show her also the way. Does it suggest that his wife is to join the conspiracy and engage her in the preparation of bombs to kill the English? It is for the wife to help the husband in the exercise of the religious rites. Aurobindo used the word in the letter referred to above. He calls his wife according to Hindu ideal. I suggest that this transformation marks the beginning of Aurobindo's religious conviction. The wife is to assist the husband in the exercise of his religious rites. Aurobindo writes to his wife "Pray to God half-an-hour every day and He will give you strength. You will be in a position to assist me in my religious practices".

Counsel read the portion of the letter which says i.e., what he write is not allowed to be divulged. Counsel commenting on this said, if a man takes any vow then he is not to divulge it to any one, even to his wife unless he gets premission from his Guru Aurobindo says that the matter is secret I submit that even if the language of this letter is strained no other construction could be put upon this He says i.e, I havenot said it to anybody else except you and I am not allowed to divulge it". Why? If it is a matter of conspiracy the conspirators know it Aurobindo says. The Government translations of this is "I have been specially forbidden to disclose it". I submit that this is not a proper translation The correct translation would be "it is not allowable". The letter of the 30th August is on a purely religious topic, because he for a business matter refers his wife to Sorojini. After his return from the Congress he must have taken the mantra and he was anxious to take his wife along with him.

Barin went to Baroda in the year 1905. My learned friend suggests that it was at this time that the seeds of anarchism were sown. The letter Ex. 286-3 was written before Aurobindo came to Calcutta. First of all it shows that at that time he was not interesting himself in Calcutta

politics. He did not know anything about Bengal politics at that time excepting Swadeshi movement which was all over India at that time. The letter states further on "I have had to spend a lot of money on account of the Swadeshi movement. I have another movement in view which requires unlimited money".

But what is this movement ? My learned friend suggests, that is the movement that you have got here. But was it started at that time ? Was it started as far back as 1905 ? Aurobindo writes "I have had to spend a lot of money on account of the Swadeshi movement. I wish to carry out another movement which requires unlimited money". I submit, observed Counsel, this movement is not the movement of the bomb. Aurobindo's idea was to start an extensive movement of Vedantism. He desired to spread it not only all over India but all over the world. He is a Vedantist and he bases whole of his activities on Vedantism. He was thinking of starting the movement on the basis of his truest principles. You must not forget that it is not a matter of conjecture that Vedantism may be carried outside India. It has already been carried into Ameria and also into England though not to the same extent into the latter. The movement of bombs according to my learned friend was inaugurated in Calcutta sometime after the time mentioned in the letter. Whenever my learned friend comes accross the word "movement" he at once comes to the conclusion that it must be a movement of bombs. I need not trouble your honour with anything further about this letter.

The next question is when Aurobindo came to Calcutta ? He came sometime in May, 1906, and then he went to Baroda back again. It is very important to fix the date, Here is a letter from Aurobindo to his father-in-law. It is marked 292-6 and dated 8th June. You will find the letter on page 5, Book I. It is written from Calcutta. The letter states "If you are anxious to send Mrinalini down to Calcutta I have no

objection. Barin has fallen ill. I suggest that he may go to Shillong for a change. If he goes I am sure, you will take care of him. Barin is somewhat erratic. He is specially fond of knocking about in a spasmodic fashion when he should stay at home and nurse his health. I have learnt not to interfere with him in this respect. If I interfere and try to check him, he is likely to go off at a tangent and become worse".

Commenting on this Counsel observed, my learned friend has made use of this letter and observed that Aurobindo is a very affectionate brother.

On the 7th July, observed Counsel, Aurobindo was at Baroda. Between the 6th July and August, there is no letter to throw any light. If you turn to page 254 of the Book I, you will find at the bottom of the page, that Aurobindo is described as a service-holder. This document is dated the 1st of August, 1906. So far as documentary evidence is concerned, you find that Aurobindo was in Calcutta on that date.

It is clear—observed Mr. Das—that Aurobindo had come to Calcutta, shortly before the 1st of August. Witness Sukumar Mitter also spoke about this, but his evidence is rather hazy with regard to dates. It happens that he never went to Baroda after that He must have sent his resignation. The National College was well established in the meantime and my learned friend calls the period between August 1906 and October of the same year the "period of great activities". Aurobindo became the Principal of the National College within this period. Within this period of time the "Bande Mataram" was started. He was certainly one of the promoters of the "Bande Mataram" company and the venture, the "Chattra Bhandar" was called into being. These are the three lines of his activities. I will prove here that so far as the "Chattra Bhandar" is concerned, he had no connection with it except that he signed his name as a witness. This was a mere formal matter. He was connected with both the institutions, the National Council of Education and the

"Bande Matatam" if I am allowed to call the latter an institution. I do not admit for a moment that he was Editor of the "Bande Mataram". But I do not for a moment deny that he was connected with it and certainly he was connected with it as a contributor.

My learned friend speaking about the "Chattra Bhandar" observed that it is a limb of the conspiracy. Because, Aurobindo was connected with it, or Aurobindo is a conspirator, so the "Chattra Bhandar" is a limb of conspiracy. The question is "Is Aurobindo a conspirator" ? The charge that he is a conspirator is laid at his door, because of his alleged connection with the "Chattra Bhandar". First of all, if you look at the Memorandum of Association of the "Chattra Bhandar", you find that Aurobindo signs his name as witness.

My learned friend says that the organisation is a limited liability company, its Articles of Association and so forth are mere devices. He observes that they do not represent the real state of affairs. The argument is that the "Chattra Bhandar" became a limited liability company with a view to conceal its real object.

Mr. Norton : I never said that.

Mr. Das : Perhaps it is owing to my weak intellect that I could not understand what my learned friend said. He said as a matter of fact that it is a cloak to conceal the design. Let us look at the document itself, I am referring to Clause III of it. It says that the Company is started to carry on business as merchants, traders, importers, exporters, and general business merchants, both wholesale and retail. It shows that "Chattra Bhandar" is not purely Swadeshi. It proposes to import. As for exporting opinion varies. I am not, however going to enter upon an economic discussion. If you look at "D" you find that it has no connection with any political design. It does not look like a conspiracy. Mr. Norton remarks that this Company was stated as a cloak to conceal

the nefarious design. But what do we find here: shareholders are restricted. It depends upon the directors to take shareholders in. Rule X declares that if a shareholder is indebted he can not buy or sell his share to get rid of the debt. But if you read Rules VI and X together you find that there is no difficulty in selling or buying shares. There is also no difficulty for outsider to come in. Still my learned friend holds that the "Chattra Bhandar" was a device to conceal its nefarious design.

My friend suggests that the "Chattra Bhandar" was intended to help the conspiracy. 40 per cent. of its profit is to be divided amongst shareholders. My learned friend commenting on the clause which provides that 30 per cent. of its profit is to be devoted to philanthropic work, observes that it was to effectuate the nefarious design.

It is a custom in this country amongst people who start business as limited liability companies, or those who start business by themselves to distribute a portion of the profit to the welfare of the community. I submit that is a perfectly good thing. You find this, even amongst common shopkeepers who set apart something which they call "britti".

Mr. Norton: Is that evidence?

Mr. Das: It is a common custom in this country, Can I not refer to that? Your Honour may have come across this in many civil cases. It is very usual amongst shopkeepers to keep portions of their profit. They do it in this way: For each article sold they keep one pice and this they devote to charitable purposes. We have the great institution at Sodepur which the Marwaris keep up in that way-the institution where your Honour sends your horse to be broken.

My submission is that if they really intended to start the "Chattra Bhandar" as a cover for their dark design, why did they start a limited liability Company at all? Could they not start a partnership business for that purpose?

If you start a Company, you bring yourself directly under the inspection and supervision of the Director. The accounts are rendered liable to be inspected and checked ; whereas if you start a shop, you have to avoid all that. However there is nothing to prove that the limited liability Company was formed to devote the profits to the nefarious purposes. If they had that design, they could start a shop, there is absolutely no evidence to show that profits were appropriated for any dark design.

Mr. Norton : There was no profit at all.

Mr. Das : If there was no profit, it cannot be said that they had any nefarious design. The whole thing is based upon suspicion. Assuming Aurobindo had such design, what proof is there that Aurobindo was connected with it ? He simply signed his name as a witness. I desired to show that no suggestion of suspicion can be based upon the evidence adduced on this point, Witness No. 84, Pobitra Chandra Datta said, "I went to Subodh Mullick and got him and Aurobindo Ghose to sign as witnesses because they were big men". Mr. Norton tried to get out from this witness Aurobindo's connection with the "Chattra Bhandar". He says "we decided to go there, as we thought that they were big men. Subodh Mullick had made a donation of a lakh of rupees towards the Bengal National College. He was looked upon as a great man in Calcutta". Pobitra said "Aurobindo used to live at that time at 12, Wellington Square I went to Subodh Mullick and he told me looking towards Aurobindo Ghosh 'you had better take his signature'. Speaking about Aurobindo Ghose's connection with the Bande Mataram, my learned friend observed "I do not care whether he was Editor or not. I say he is the paper itself". Mr. Das here read the deposition of Sukumar Sen. The witness said (he was at that time professor of the National College)—"Aurobindo never advocated violence, or I would *have remembered it. The Company was regarded merely*

as a National organisation than a commercial venture. The object was more political than commercial".

Continuing Counsel said, I find that Aurobindo was connected with the old Bande Mataram. He was present at some of the meetings of the company. He was not the Manager of the paper. He was sometime the Managing Director of the "Bande Mataram" Company.

Counsel referring to exhibit 950 D said that Aurobindo was not connected with the Bande Mataram as Editor or Sub-Editor. He had nothing to do with the dealing with telegrams, reprints etc. The prosecution of the Bande Mataram I may tell your Honour was for having published an English translation of an article which had appeared in the Yugantor.

Judge : Does not the witness Sukumar Sen say who was the Editor ?

Mr. Das : The witness stated that Bepin Chandra Pal refused to act as joint-editor along with Aurobindo Ghosh. He wanted to have the entire control of the paper as the Editor-in-Chief. But there was difference of opinion. Aurobindo Ghose was offered the Editorship but he refused to take the sole responsibility. For he could not do that. He was at that time the Principal of the National College. In only one issue his name was published as Editor. But in the next issue it was taken off.

Judge : Some addresses were presented to him as Editor.

Mr. Das : That was through the impression that he was Editor, Aurobindo was not responsible for anything that appeared in the Bande Mataram. There is no magic in the name "Editor". My learned friend says he does not care if Aurobindo is Editor. He says that he is the paper and that this paper was born in conspiracy. Let us look into it and see if we can find anything dangerous or anything that suggests bombs or conspiracy or waging war against the Government. Far from any such suggestion your Honour

will find suggestions which, I have said, are the ideals of independence, and the means suggested are those of passive resistance. The point on which the greatest stress is laid in the articles is National education, swadeshi and boycott. These points are typical of this paper. The fourth point was the general idea of freedom. To reach the ideal of freedom they advocated the same policy I have mentioned up to the last day. You will find that they not only did not advocate the formation ot secret societies but whenever anything happened which drew their attention they deprecated the secret societies in an emphatic language. I do not for a moment suggest that the ideal of the Bande Mataram was not "absolute independence" It was that and nothing but that, and they always deprecated the ideal of improvement of the Government in this country by putting in one member in the Executive Council, or additional members in the Viceroy's Council. It was repeated over and over again that they were not in favour of reforms, but what they desired was a "forming". It would not serve the national ideal by legislation of tinkering kind, that is to say giving some advantages here and some advantages there. All the articles read out by the prosecution in condemnation of Lord Morley's scheme were in reference to that. Those are the honest views of the paper. If those views constitute in any way the waging of war against Government, I will have to say that Aurobindo is guilty. My contention is that it is open to them to preach the ideal of freedom and lay down the methods in the way the Bande Mataram has done—the methods of passive resistance, boycott, national education and Swaraj. Wherever any suggestion of any violence is made your Honour will invariably find that it is necessary for the purpose of repelling an attack. I shall read a few articles to show that it is not true that the Bandé Mataram, was born in conspiracy. I shall refer to an issue of the 18th September.

1906 under the heading "That Sinful Desire" * * * It refers to these constitutional troubles within the Congress itself. I submit that there is nothing felonious in that article unless my friend means to say that you must read between the lines.

Mr. Das then read an article entitled "The idea of National Council" to show the attitude of the Bande Mataram towards secret societies. Counsel read a paragraph dated 3rd October, 1908, which he put to Purno Chandra Lahiri in cross-examination. The article was entitled "Golden Bengal Scare". Now with regard to National College I have one word to say. There again I do not quite understand my friend's argument. He does not suggest as I thought at first he did that the Council of National Education was limb of the conspiracy against the Government. What I understood him to stggest was—I say this subject to correction by your Honour that Aurobindo made use of the National Council to give effect to his nefarious views. If that was so then no interence can be drawn against him from the fact that he was connected with it. I ask your Honour not to draw any interence from the fact that he was connected with the National College. If interence is to be drawn it must go further; not only must the National Council be not harmless but it must also be proved that the National Council is a part and limb of the conspiracy. Unless that is established, mere connection with the National council will not give rise to any inference adverse to Aurobindo Ghose. You will find in the evidence that Aurobindo was connected with it not only after it was started but he came to Bengal expressly for the purpose of carrying on the National Council of Education. He took part in it before it was started as we find in the evidence of Satish Chandra Mukherjee, and the best part of the argument, show that he did not intend to use the National Council of Education as a party organ in this conspiracy.

At the time the National Council was formed who were the men we find in it? Dr. Rash Behari Ghose, Sir Gooroo Das Banerjee and Mr. Nagendra Nath Ghose with whose name no one will ever try to associate politics. That conclusively proves that Aurobindo had no control over it, or if he had. it was not his intention to make it a sort of organ for his political activities. The people in Bengal wanted to keep the National Council of Education, free prom political activities. This inference clearly arises from the names I have mentioned. It was intended, as the prospectus shows, to be an institution to further the education of the country and it was intended to be free from all political bias of either party. Aurobindo was selected as the Principal of this College because he was under the circumstances the fittest person. When he came to Calcutta in August, 1906, he was still in the service of Baroda. He does not give it up until after he is appointed Principal of the National College. With reference to this I desire to read just a few lines of the evidence of Satish Chandra Mukherjee * * *. There is no evidence even that Aurobindo exercised any active control so far as the selection of the course of studies was concerned. I submit that this fact is of no importance at all in arriving at the question whether Aurobindo Ghose is guilty or not of the charges brought against him. I submit that although it does not help you in coming to any conclusion as to his guilt it shows—as I have submitted to you before that the course of the activity of Aurobindo Ghose was in accordance with the principles which were enunciated in that letter of 13th August, 1905. That is all that I have got to submit up to this period of 1906.

The next period I take is the period from October, 1906 to April, 1907. This is a period of very little activity on Aurobindo's part as you will find during that period he was mostly ill. You will find I will state the facts before prove

them-that he was at Deoghar from 11th December, 1906 to the 24th December, 1905, and again from 27th January, 1907, to the middle of April, 1907, and you have heard from the evidence of Sukumar Sen that on the night he left for Deoghar permission was asked-after his name appeared as Editor of the Bande Mataram-if he would agree to be the Editor and upon his refusal his name was removed the next day. With regard to three different dates which I have given there is very little documentary evidence in the case, and from Aurobindo's written statement I shall have to refer to it. In this connection we see that he was ill. He had to take leave from the National College on several occasions; in fact he was practically ill during the whole of this period * * *. Satish Chandra Mukherjee was asked about it and he said that the statement about Aurobindo taking leave was true.

Another thing which I should like to point out in this connection is that there is no suggestion that as that time there was any activity in Seal's lodge. That was from a few days before February 1903, to sometime in April, 1908.

With reference to this period my learned friend read out some articles in the Bande Mataram dealing with autonomy, Swaraj, etc., and he further said that they contained a show of racial antipathy, that there was no love for humanity and that they advocated a direct violation of the law. Well, I have read those articles over and over again and I say that they are absolutely, everyone of them, free from any one of those charges, except the charge and I did not understand my friend to bring that in as a charge, that they wanted to bring in absolute Swaraj. What I did understand him to say if I have understood my friend aright, was that the means suggested for attaining Swaraj, was not legal and it was that made the Ideal of Swaraj improper. He took care to say that and I must say that it was very fair on the part of my learned friend to point it out.

So far as these articles are concerned I submit that the charge of racial antipathy can not be brought against the Bande Mataram. The particular note in the Bande Mataram was "love for its own people" and if that in itself involved some antipathy it may be expected, but what I want to lay stress on it, that the dominant note was not antipathy but love for its own people, but in dealing with it, may be, that the articles have referred to other nations not in very complimentary language. If you read the whole thing you will find that the object is not an attack on any nation at all. but to point out that we must fall back upon our own resources, and stand on our own legs, or in other words, as I have pointed out before, that you cannot attain your ideal except through your own salvation. The Bande Mataram had to attack other nations because it pointed out that the people of this country were under the spell of foreign civilisation. under alien civilisation and wanted to dispel by these articles that peculiar hypnotism that was cast on the people of this country by European nationa. Not that European civilisation is bad but that European civilisation is for "Europeans'. European nations must develop in their own way ; they must rise to the noblest and best in their own traditions. So also with the Indians : they must also take their own stand. Not that European civilisation is bad I want you to particularly notice that, you won't find that in the articles, but that European civilisation applied to us. European traditions brought into this country, are not the materials upon which this nation can grow. That is the philosophy underlying all articles. The European civilisation is as a tree which grows in the soil of England : if you bring that tree here, it will not attain the same growth because the soil is not congenial. In the same way the development of a nation must be based on its own traditions. If you base it on any other traditions the soil will not be congenial. As for antipathy and dislike for humanity

they are not to be found in those articles. I submit they breathe all that my friend denies. I say according to these people nationalism has no rational basis to grow upon unless it be for humanity. I ask your permission here to read an article which comes into this period. It is written in very figurative language, but the thing it brings out is the inner philosophy of this school.

Counsel next referred to the period from April, 1907, to September, 1907, i. e. up to the acquittal of Aurobindo Ghose in the sedition case. In this period, counsel said, Aurobindo's, activities were confined to the National College and Bande Mataram. In this connection counsel read a letter written to Aurobindo from Tokio sympathising with him in his trouble with the Bande Mataram trial, There are some articles of the Bande Mataram of the period. Counsel then read the articles of the 17th September headed "The secret of prudence and moderation". The articles also deals with passive resistance. "Every country fought its battle of freedom in its own peculiar way. We can use our passive resistance in such a way, etc" * * * I need not trouble your Honour with other articles because the idea is the same. They are articles on the Congress, Swaraj and so forth.

It is a curious feature that the whole evidence against Aurobindo is doubtful. When your Honour finds, so far as Aarobindo's case is concerned, that there is something unusual, something difficult to understand, I submit that your Honour may come to the conclusion that there is something behind the series of difficulties. When your Honour finds that some act is repeated a number of times your Honour may draw that inference * * * I suggested to him why he did not put any mark. He says he put some mark in blue pencil which was obliterated. * * * I submit there is nothing in it which goes against Aurodindo

The next period I take up now is from September, 1907 to December, 1907. Your Honour will find that from the

middle of October, 1907 to about end of December, 1907, Aurobindo was ill and he was at Deoghar. I ask your Honour's attention to the letters and other evidence on this point because this matter is of some importance in connection not only with this topic but also with different topics.

Counsel next read a letter from Mr. Palka which related the entire activities of Aurobindo with regard to the Congress. The writer invited a number of extremist delegates. Aurobindo wanted to put the Congress on a representative basis. He said that what is alleged to be a national gathering must be national in the true sense of the word,

Judge. The Congress has ceased? According to the Extremists the Congress has ceased to be. But according to the moderate it is still going. It is like "The Duma is dead. Long live the Duma". Counsel next referred to the slip which was sent to the Bande Mataram for discussion.

Your Honour will find, continued counsel, from the evidence of Mr. K. B. Dutt that Mr. Surendranath Banerjee did not like the idea of giving up boycott at the conference. A few days after they issued a circular that Swadeshi covered everything. The extremists say that it was mearly a trick to mislead the people who feel very thoroughly on the question of boycott.

Mr. Das referred to a letter from Mr. Tilak to Aurobindo Ghose. It asked Aurobindo Ghose to invite a large number of extremist-delegates to the Congress. Mr. Tilak wanted to have a separate Conference for the nationalists. His idea was to have a separate Conference as soon as the deliberations of the Congress were over. Their attitude was not to break up the Congress. They want to have the question of electing Dr. Rash Behari Ghose decided by voting. The extremists' wanted to have a separate sort of party organisation for them. In England

the parties have their own organisations—the Liberals, the Conservatives down to the Socialists. They wanted to see that the views of the delegates were represented by the Congress. I submit the Nationalist Conference was held and passed resolutions. These resolutions were published in news-papers. They assembled not to break up the Congress. They did not say "if you don't accept our views, we shall break your head". They had no bombs in their contemplation. I do not say as my friend suggested that they had bombs in their contemplation.

Judge : It is rather forcing their views on the Congress.

Mr. Norton :—Surely.

Mr. Das :—The position of affairs was this. The nationalist delegates did not want Dr. Rash Behari Ghose as the President. They wanted Lala Lajpat Rai. If he declined, then they would have Mr. Surendranath Banerjee.

Mr. Das :—There is no difference between exteremists and moderates. The moderates have the ideal of Swaraj on the colonial lines while the extremists have the ideal of of Swaraj in the independent form.

Mr. Norton :—The moderates have the ideal of Government as obtained in the colonies.

Mr. Das : —What is the difference ? Where is the control of England over the Colonies.

Judge :—It is a matter of policy.

Mr. Das : - It is not a question of ideals. The Parliament cannot force its views. The extremists liked to put their ideals in a more logical form. The Bande Mataram made this point clear The moderates and extremists mean the same thing but the moderates have not the courage to sing as the extremists.

The same letter contained a phrase which was printed as "Government Expression", saying that if Dr. Ghose was rejected, there would be "Government Expression".

Judge .—It it probably repression.

Mr. Das next made reference to a letter, from Mr. Tilak to Babu Moti Lal Ghose asking him not to accept Dr. Ghose as the leader. Counsel referred to the manifesto issued by Aurobindo Ghose inviting extremist delegates to the nationalist conference here.

Your Honour heard the discussion about the scheme for the constitution of the Congress. That was another point on which there was a good deal of dispute between the extremists and the moderates. Mr. Norton suggested that he got it at Surat, nobody would dispute this. To my mind it was a scheme drawn up for the purpose of drawing constitution for the Congress. The subjects mentioned were National Fund, Arbitration Court, Primary Education, Swaraj and Boycott. They were to be discussed either in the Congress or it suggests a scheme that is to be proposed before the country or the Congress. The worst point in that is the establishment of Arbitration system, of course from our point of view. There is nothing sinister ; nothing suggestive of Bombs, conspiracy or anything of the kind.

Then some other letters appear during that period. I will not read them. They prove Aurobindo's connection with the Bande Mataram. It is admitted. That is the letter I have referred to in connection with Aurobindo's residing at Deoghur. In this letter the writer made suggestions for the improvement of the Bande Mataram. It was from a man of Bombay. He thought that Aurobindo has some influence over the Bande Mataram, that is why he wrote it to him. It is clear, that Aurobindo had some sort of control and I have all along admitted that both here and elsewhere in connection with the other case.

Aurobindo's work was a work of love to the "Bande Mataram". He would not be put to such a position so as to be responsible for anything appearing in the Bande Mataram. He had not the time nor his health would allow him to look after or supervise that paper. That is why he

refused to be the editor. He was not the editor at any time. It is the case with English newspapers that the reporters send their reports and they are printed and the editor is responsible for what appears. He associates himself with the views but he does not hold himself responsible for anything that appears in the editorial columns. I can't ask Your Honour to read the whole but there was nothing to show that he was responsible. Continuing counsel said—I have got a few articles of the Bande Mataram placed before Your Honour. I placed articles published in December 1906. I have got 3 or 4 articles representative of different views of the different parties. Aurobindo was arrested on the 2nd May, 1908. I have taken up all the articles from December 1906 to April 1908. They conclusively support the contention that I have made from beginning to end.

Mr. Das then dealt with several articles from the paper during this period and assailed the argument of Mr. Norton about the alleged connection between the National papers.

He continued :—I have dealt with the evidence with regard to the socalled conspiracy and I now desire to draw Your Honour's attention to certain points in common between the moderate papers, the Bengalee and the Indu Prokash for instance and the Anglo-Indian papers like the Statesman, the Indian Daily News, the Pioneer and the Englishman. Still these papers have their peculiarities, I can not forget the fact that there must be a great deal in common between them. It is, by no means, a violent assumption to say that. But inspite of the points in common, each paper must stand on its own legs. Your Honour will find certain peculiarities in each paper. Your Honour knows the Bengalee and the Indu Prokash of Bombay are perfectly moderate-papers. I do not know why my friend will extend his triangle so far.

So far as the Bande Mataram and the Jugantar are concerned, I shall show by reference to one article that

according to the Bande Mataram, the ideal of freedom must be attained by passive resistance, Swadeshi Boycott, national education, Courts of Arbitration etc. To quote from the famous speech of Gladstone, "you must educate yourself for self government. You must take up as much work of Government as you can do". National education, Swadeshi, all these are methods laid down by the Bande Mataram. The paper says that it is only by pursuing these methods that you can attain self-government Make your-self fit for self-government. This is the doctrine of political philosophers in Europe upon which the view is based. This view has again been analyse by the Bande Mataram and adapted to Vedantism pure and simple. Every philosophy in England deals with the growth of democracy. From the time of Hobbs down to the time of Spencer,—passing from the period of English History known as the period of French revolution it has been held that the Government can only exist with the tacit consent on the part of the people. In point of time, if the character of the Government be most despotic that you can imagine or representative, the mere fact that the Government does exist shows conclusively that the people has consent to it There was a time, according to Hobbs, when the people and the king used to meet together They met why? To determine the consent of the people.

Locke borrowed his views from Rousseau on this point Spencer's "Man vs State" embodies this view. As a matter of fact, the relation between the Government and the governed based upon actual contract. It may not be so historically speaking but it must be true logically speaking. You cannot govern people against their wishes. At every point of time that the Government exists, it shows that it exists, because the people lent their support.

Continuing counsel said Aurobindo also exposes the same theory. He gives a new expression and makes it a new point of his philosophy. This doctrine of the tacit consent

of the people and another doctrine which is misapplied, namely "vox populi vox dei", are applicable in this connection. Aurobindo hold the same principles whether with regard to the nation or the individual. He sees in the development of the society or the individual, the manifestation of God. He takes the same principle of development according to the law ot Nature or law ot God, in the light of Vedantism. "Vox populi vox dei", i.e. to voice of the people is the voice of God, because the people are the manifestation of God. No man can attain salvation except by severe self-restraint. Unless he restrains himself, he has no hope of salvation.

If you apply this doctrine, as Aurobindo Ghose applied it, to the situation of this country, what is the result? The result is that the people want swaraj or self-government. I do not desire to repeat my argument here. Aurobindo has taken care naver to define the form of Swaraj. Aurobindo has advocated national education, swadeshi, boycott and court of arbitration whereas the Jugantar in its articles headed the Suchena holds that no progress of the country is possible without independence. Talk of Swadeshi. the Jugantar laughs at it. Talk of National Education, arbitration court, the Juganrar says all that is a pastime. No progress of the country can ever take place unless you have absolute independence. This is the essential difference between the principles ot the Eande Mataram and the Jugantar. Mr' Das here read articles from the Sandhya, Nabasakti and other papers to shew the difference in the time of their writings.

Mr. Das then went on to discuss some unpublished writings of Aurobindo Ghose. My learned friend, observed counsel, argues that the writing No. 2998 furnishes an index of the man's thoughts. This writing is in Bengali, my friend does not show that it is the hand writing of Aurobindo Ghose,

Mr. Nortion ;—I suggest that is the hand writing of Sarojini.

Mr. Das ;—It certainly looks like a lady's hand writing. I fail to understand how it furnished an index of Sarojini's thoughts. Sarojini is not before Your Honour as a conspirator. Referring to the article "morality of bycott", Mr. Das said "since the man did not publish this, I venture, to submit that he did not publish as he thought the article might be misunderstood. How can you convict a man for unpublised writings ? It is for your Honour to say whether these writings can furnish an index of the man's thoughts. I submit they cannot. Because the words and phrases employed do not clearly and completely bring out his ideal. Aurobindo thought the writings might be misunderstood so he did not publish them. Unless you can show that they were secret documents, intended to be circulated amongst the people secretly, you can not draw the inference that the writings supply an index of man's thoughts. I ask your Honour to interpret the point charitably. These writings were not published anywhere. Aurobindo could publish them easily. They are open to this charitable construction that since Aurobindo feared they might be misunderstood, he did not publish them. I ask your Honour to accept the charitable construction. The writings do not bear the meaning which my learned friend sought to put into it".

Mr. Das read a long unpublished article by Aurobindo Ghose entitled. "What is extremism". Referring to a sentence "the law was made for man and not man for the law", the Judge asked if each person was entitled to pass his own judgement on the law.

Mr. Das, emphatically replied "yes". After all he continued, the principle of man's life must be guided by his own conscience.

Mr. Norton, interrupting, asked how the societies were to exist ?

Mr. Das continuing with his argument Put the question "is it not the same view which obtains in other countries with regard to passive resistance? Have not the people often disobeyed the provisions of the law and taken the penalty"?

Mr. Norton:—Not on the ground that the law is wrong.

Mr. Das:—That is Aurobindo's view. Proceeding Mr. Das said that Aurobindo put it on the ground of organic unity between the goverment and the people. They were not judging the man on account of his ideals. So far as the infringement of the law was concerned it was the same in other countries. The goverment does a certain thing and the wrong and unjust. If they are fined, they are prepared to people say it is pay the fine.

In language of Aurobindo you have got here an anthority which has not sprung from the nation as a part ot its organism. The government has not sprung here from within the people as the government of the other countries.

No one can gainsay the truth of that: Aurobindo never hesitated to put that forward over and over again. I object to the government of this country not because it is an autocratic government, not because it is not a democratic government or of its particular actions which are criticised by others. My objection is based on philosophy, that this government has not sprung from the people as a part of an organism.

Aurobindo's argument was based on the ground of "utility" And after all, counsel declared, the basis of all legislation in England was utility; something which helped the growth and development of the nation. That was the claim of the Government. We pass this law because it is in the interests of the people, and the interests of the people, counsel said, could not be considered apart from the development of the Nation

Counsel read out some further passages from the article where Aurobindo discussed the methods by which they were

to attain the ideal of freedom. Commenting on this counsel said if a bomb was brought to Aurobindo and he was asked "shall I throw this at the first Englishman I come across ? Aurobindo would say "will this accomplish the great ideal" ? The answer, counsel said, would necessarily be "no" it would not produce the desired effect.

His Honour :—If effective, use it ?

Mr. Das :—If the oppression increases to such an extent and people are so united together, and have got such resource at their back that they think they can fight the Government in battle as it were they may do it, not now

His Honour :—He goes back to the utilitarian method if yon are strong enough to fight.

Mr, Das :—Yes, that is the whole trend of his argument. Proceeding Mr. Das repeated his former argument the methods advocated by Aurobindo, insisting on the point that according to Aurobindo violent methods were bad and peaceful methods were good In the paragraph discussing the methods, which counsel read. Aurobindo was taking each particular ideal and probing it in order to test its truth or otherwise. He was discussing the best ideal. Counsel read a sentence regarding one of the means discussed by Aurobindo which ran "whether it is worthy of a great people who is struggling to be" counsel called His Honour's attention to this question put by Aurobindo.

Counsel continued :—If there was section in the Penal Code—which fortunately there was not—that the preaching of National freedom meant sedition, Aurobindo's answer would be, "nevertheless I must do it. I cannot help it. It is within me and that is what I woe to myself and my God."

Referring to another passage where after discussing certain questions Aurobindo said "that result will be anarchy." Counsel said he was surprised at Mr. Norton who was an English scholar saying that he meant anarchist's outrages.

He challenged Mr. Norton to point out from the writings of any English writer that the term "anarchy" has been used to mean "anarchist's outrages,"

"Anarchy" counsel said meant "disorder" and Aurobindo was referring to a sort of social chaos.

Counsel read some further passages with the object of showing that metaphors used by Aurobindo were taken by Mr. Norton literally. When he spoke of sacrificing their lives for the country, Aurobindo meant that they should suffer. Referring to the expression "Manuring the soil with their blood" counsel asked if such a thing was possible, it was a mere metaphor. He exhorted the people to suffer to the last extremity. What would happen, counsel asked, if passive resistance could be so well organised that all the people refused to pay taxes. It was not a very pleasurable subject to deal with, but counsel said one could well imagine that there would be firing of guns and the result of that would be that the people would be weltering in blood.

Proceeding Mr. Das said he was outlining a passive resistance which would be impossible to reach, but the man who was writing was pushing a wrong point to its logical conclusion. The point he had fixed his attention on was the method and the ideal. The point he was pursuing was whether it was effective and consistant with the traditions of the country. No taxation could grow out of subjection unless it was prepared to suffer. The reference to blood and darkness and death, counsel averred, was figurative. If it led to disorder even then it was welcome because it helped to attain the development they were seeking. It did not help Mr. Norton in thinking that it referred to bombs, ammunition or any other thing.

Referring to the word revolution which appeared in a passage in the article, counsel said, that this did not have the same meaning as the French Revolution. The word was

used in the sense of peaceful revolution.

Proceeding with his argument counsel said "If Your Honour looks at the dominant notes in the unpublished writings it is perfectly in accord with the real nature of Aurobindo's writings. If you take hold of a word here and a paragraph there you will not get the real intention. Your Honour must read that article with all the other article. Counsel referred to another article from which Mr, Norton quoted the lines of wordsworth incorporated in the article "who would free themselves must themselves strike the blow."

Commenting on this Mr. Das Said :—My friend seems to think that it is indicative of bombs. If Your Honour reads the whole article you will find that it is written in appreciation of Rash Behary Ghose's speech delivered at the Congress. The author quotes this particular line of poetry to support the contention that Mr. Ghose put forward that nations by themselves are made

Counsel next dealt with the "sweets' letter". He said, "Your Honour will find that having regard to the circumstances as disclosed in the evidence of this case. Your Honour cannot accept the document as being in the hand-writing of Barindra Kumar Ghose, or that it was sent to Aurobindo Ghose. What does it show ? The letter is supposed to have been written by one brother to another at Surat. Therefore it this letter is genuine both the brothers were at Surat at that time. I submit that it is utterly improbable, assuming that both the brothers are conspiraters, that one brother should write to another brother in this way. There they could have talked to each other, explained their thoughts—each to the other—without writing at all. The letter states "We must have sweets all over India ready made for emergency. I wait here for your answer." The case for the prosecution is that Barin used to address Aurobindo as "sejda". Did Barin

forget this when writing this letter? He writes "Dear Brother." In this country no younger brother would write to any elder brother, as "Dear brother" except to the eldest brother.

Judge :—What do they write?

Mr. Das :—Mejda, Shejda, etc. only the eldest brother is addressed as a brother. The fact that both the brothers being at Surat, Barin wrote to Aurobindo is extremely improbable.

I draw Your Honour's attention to the fact that Barin signs "Barindra Kumar Ghose." My learned friend says that Aurobindo and Barindra are Europeanised. But Barin came to England at the very early age of one year. I left England 15 years ago. I do not know whether the custom has changed there. But when I was in England I noticed that a brother never set out his full name when writing to another brother.

Judge : I would not put my full name, I would omit my surname.

Mr. Das : Nobody would sign like that considering the probabilities, I submit that when a brother desires to communicate something to another brother, the proper form of signing his name is not to give the full name like Barindra Kumar Ghose

Mr. Das continuing said, "this sweets Letter is taken with Aurobindo and treasured down. It is brought to calcutta back again. It is kept at 23, Scotts Lane for a couple of months and Police are lucky enough to find the letter at 48, Grey Street. It is grossly improbable. I submit that under the circumstances, Your Honour will hesitate to accept this as evidence and proof against Aurobindo Ghose."

Mr. Das here read from the evidence of Mr. Greagan. Counsel Commenting on the evidence said, on the 2nd May, not only the 48, Grey Street, was searched but the other houses were searched as well. All the articles found at the

search were sent to the Park Street Thana. There is no reason why an exception should be made with regard to 48. Grey Street. The documents of 15, Gopi Mohon Dutta's Lane, and the garden were both sent to the Park Street Thana.

Mr. Das then referred to the great confusion in the evidence of the police witnesses with regard to the finding and examination of the letter at the thana.

Mr. Das : There is just another point about the "sweets" which is this,--Your Honour will find that the number of the bundle was subsequently added to Mr. Greagan in his cross-examination says "The letters might have come out of the envelopes." I submit that the "Sweets' letter" could not have been in the bundle The number of the letters in the documents must at least be 64 There were 64 letters and 20 envelopes.

Mr. Das referred to the evidence of several other witnesses and commented on them, after which he summed up He said, "I must thank your honour and gentlemen assessors for the very kind and patient hearing you have given me throughout this case My only wish was that the task might have fallen on other hands to place this case betoe the Court, but as it fell on my hands I did all I pssibly could to place the evidence in this case before the Court in a connected form. There is one point which struck me at the outset of this case but I did not refer to it so long, as I thought it could be dealt with mere conveniently and appropriately after I had finished dealing with evidence oral and documentary on the record. Your Honour will find that my learned friend's case is that Aurobindo is the head of this conspiracy. He has credited Aurobindo with vast intellectual attainments and with vast powers of organisation and his case was that he was directing this conspiracy and working from behind. Now it is with reference to this that

I make my submission before Your Honour, that having regard to the nature of the conspiracy which has been established by the evidence if, it has been established at all, it is impossible that Aurbindo could ever have believed that canspiracy was likely to succceed. If you say that Aurobindo is not gifted with the intellectual powers with which you have credited him that is another matter. But if you say that he is all that you have been kind enough to say he is and concomittant with that he is the head of the conspiracy and is directing the conspiracy my answer to that is, the conspiracy of such a nature that it is impossible to believe that Aurobindo could ever have thought in his mind that it could succeed. My learned friend has referred to the thousand and one ramifications of that conspiracy and he has argued that there was a conspiracy from calcutta to Tuticorin and other places and in order, to substantiate this vast conspiracy as it were, he has not hesitated to bring a charge of conspiracy against persons of whom there is not the slightest evidence on record to show that they were in any way connected with it. I ask you to disregard all that, the conspiracy is in my learned friend s imagination, I do not for a moment suggest that he does not believe it to be true ; I don't suggest that he does not believe every word of what he has said and that he has no misgivings on the point. I wholly concede that he fully believed in the conspiracy whice he has put forward before the Court and the only way I can explain that and the only suggestion that I can make is that he has been under the tutelage of the police for a long time and the police have poisoned his mind during the last ten months and no doubt he sincerely believed in it and put it forward before the Court,

But the evidence is entirely different. From the evidence as is furnished by the confessions in this Court-confessions

upon which the prosecution relies—you will find that it is a childish conspiracy—a toy-revolution. It is impossible that Aurobindo could ever have believed in his heart of hearts that by bombing one or two Englishmen, or some Englishmen at different places, they would have been able to subvert the British Government. If you credit him with intellectual powers and say that he has a brilliant mind, it is not open he was the leader of a childish conspiracy and a toy-revolution. That is the difficulty which comes at the very threshold of this case. Either drop the suggestion that it is because of his intellectual powers because of his eminent qualities with which he is credited that you want the Court to believe that he was the leader of the conspiracy ; or the other theory that he was in fact the leader of the conspiracy, and of this alleged revolutionary project. Apart from that suggestion if you turn to the evidence against Aurobindo, my answer is that the confessions exonerate him. If it is argued that the watch witnesses and the other witnesses have proved conclusively that there has been association between Aurobindo and the conspirators, I submit that, that evidence is such that you can't place the slightest reliance upon it ; not only that, but that under the circumstances one could only expect the evidence to be of such character. If the Government takes into its head to believe that there is a vast conspiracy which is threatening the stability of the government, it is common knowledge, that you do come across spies who give false evidence. I shall just read a passage from a book written by an eminent Judge. "The government under those circumstances have spies who wriggle into the case, causes drop into families, abstract correspondence and forge letters." Therefore the evidence given before you is evidence that you can expect in a case like this. It seems to me if you consider the evidence carefully and apply the different tests I have suggested and

submitted for consideration "I have hardly any doubt that you will reject that evidence as untrustworthy. Is it argued that in the different letters that have been put forward there is a case against Aurobindo, that these letters show that Aurobindo is implicated in any conspiracy whatsoever ? My answer is that the letters themselves don't show anything of the kind. It is my learned friend's interpretation on those letters ; and in some case in regard to Aurobindo's connection with certain boys that interpretation has been of such a character that one can hardly resist the temptation of calling it ridiculous, reminding one of the case of Mrs. Bardell against pickwick. He reads a document and imports into that document, but which have evolved out of friend's inner coscience If you read the documents as they are, having regard to the circumstances under which they were written, I venture to submit before you, that there hardly any doubt, whatever may be the view, that those documents do not bring the guilt home to Aurobindo Ghose with reference to any of the charges brought against him.

My further submission is that my learned friend to a certain extent realised that and he said out of despair as it were, never mind the letters, never mind the evidence but look at the probability, look at the man's thought. It was in that view that he put before you the differant newspapers and the charge of conspiracy and wholesale conspiracy against many men of light and leading in this country. Read the Bande Mataram, read the different speeches, and read the other newspapers —my friend says that you must read the other papers because they are all linked together and you discover what his thoughts were. If you analyse those speeches and writings and if you find an indication that the man was putting forward before the country, the ideal of freedom, you must take it for granted that he was also in

favour of applying bombs, of secret societies and such other means as some of the evidence in this case discloses'. My sbmission to you is—I made it before and I do so again, that these papers and the writings and speeches are not legal evidence in the case at all, but if you do take them you find unmistakable indication that whatever may be Aurobindo's views, he is not guilty of the charges brought against him. I have placed before Your Honour the letter of the 13th August 1905. I read to you the whole of that letter and commented on it and I explained to you what the different thoughts in that letter are 'I say, as I have said in my statement, that ever since I came to Calcutta from Baroda, I never for one single moment deviated from the principles laid down, in that latter. I have said I never took any part in politics. I have said in my written statement, whatever the nature of my activities, be they political, social or religious, that throughout the whole course of my activities, I never for one single moment deviated from the principle laid down in that letter of 13th August. The whole of my case before you is this. If it is suggested that I preached the ideal of freedom, to my country which is against the law, I plead guilty to the charge. If that is the law here I say I have done that and I request you to convict me. But do not impute to me crimes that I am not guilty of, deeds againist which my whole nature revolts, and which having regard to my mental capacity are something which could never have been perpetrated by me. If it is an offence to preach the ideal of freedom. I admit having done it—I have never disputed it. It is for that, that I have given up all the prospects of my life. It is for that, that I came to calcutta to live for it and to labour for it, It has beet the one thought of my waking hours, the dream of my sleep, If that is my offence, there is no necessity to bring witness into the box to depose to different

things in connection with that. Here am I and I admit it. My whole submission before the Court in this. Let not the scence enacted in connection with the sedition trial of the Bande Mataram beenacted over again, and let the whole trial go into side-issue. If that is my offence let it be so stated and I am cheerful to bear any punishment. It pains me to think that crimes I could never have thought of or deeds repellent to me, and against which my whole nature revolts, should be attributed to me and that on the strength, not only of evidence on which the slightest reliance cannot be placed, but on my writings which breathe and breathe only of that high ideal which I felt I was called upon to preach, I have done that and there is no question that I have ever denied it. I have adopted the principles of the political philosophy of the west and I have assimilated that to the immortal teachings of Vedantism. I felt I was called upon to preach to my country to make them realise that India had a mission to perform in the committee of nations. If that is my fault you can chain me. imprison me, but you will never get out of me a denial of that charge. I venture to submit under no section of the law do I come for preaching that ideal of freedom and with regard to the deeds with which I have been charged, I submit there is no evidence on record and it is absolutely inconsistent with everything that I taught, that I wrote and with every tendency of my mind discovered in the evidence,"

My appeal to you therefore is that a man like this who is being charged with the offences imputed to him stands not only before the bar in this Court but stands before the bar of the High Court of History and my appeal to you is this: That long after this controversy is hushed in silence, long after this turmoil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long

after he is dead and gone his words will be echoed and reechoed not only in India, but across distant seas and lands. Therefore I say that the man in his position is not only standing before the bar of this Court but before the bar of the High Court of History. The time has come for yon, sir, to consider your judgement and for you, gentlemen, to consider your verdict. I appeal to you, sir in the name of all the traditions of the English Bench that forms the most glorious chapter of English History. I appeal to you in the name of all that is noble, of all the thousand principles of law which have emanated from the English Bench, and I appeal to you in the name of the distinguished Judges who have administered the law in such a manner as to compel not only obedience, but the respect of all those in whose cases they had administered the law. I appeal to you in the name ot the glorious chapter of English History and let it not be said that an English Judge forgets to vindicate justice. To you, gentlemen, I appeal in the name of the very ideal that Aurobindo preaced and in the name of all the traditions of our country, and let it not be said that two of his own countrymen were overcome by passions and prejudices and yeilded to the clamour of the moment.

আজ ৩১শে মার্চ্চ, জবাবের শেষ দিন।

জজ সাহেব বীচক্রফটকেও আসামী পক্ষের জবাব শোনানর শেষ দিন।

উপস্থিত সকলেরই নজর আসামীপক্ষের কৌঁসুলী সি. আর. দাসের ওপর। এই মামলায় তাঁর শেষ ভাষণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সবকিছু নির্ভর করছে আজকের জবাবের ওপর; মামালায় প্রত্যেকটি আসামীর আর সেই সঙ্গে অরবিন্দের শাস্তি কিম্বা মুক্তি।

কোর্টে উঠেই কৌঁসুলী জলদ গম্ভীর কণ্ঠে সুরু করলেন বক্তৃতা।

আদালত কক্ষ নিস্তব্ধ। পিনটি পর্য্যন্ত পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কেবল ব্যারিষ্টার দাসের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ছাড়া।

জনারণ্য উৎকর্ণ হয়ে তাঁর প্রতিটি কথার বাঁধুনি গুলো শুনছেন আর উপলব্ধি করছেন।

বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার স্ফুলিঙ্গ ছুটে চলেছে।

কৌঁস্যুলী থামলেন।

এই সময়ে বিচাবপতির আদেশ নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে আসামী অরবিন্দ জবাব দিলেন—"মহামান্য আদালত! আমি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করেছি। এটি যদি আইন বিরুদ্ধ হয় তা হ'লে আমি স্বীকাব করছি আমি দোষী…স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা যদি অপরাধ হয় আমি তা করেছি, আর আমি যা কবেছি তা আমি কেন অস্বীকার করব? এরই জন্যে আমি আমার জীবনের সকল আশায় জলাঞ্জলী দিয়েছি, এরই জন্যে আমি ক'লকাতায় এসেছিলাম, এরই জন্যে জীবন ধারণ করেছি, শ্রম স্বীকার করেছি। এই বস্তুটিই হয়েছে আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। এইটিই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় তা হলে আর সাক্ষী-সাবুদের প্রয়োজন কি? আমি এখানে বর্ত্তমান, আমি এ অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।…পাশ্চাত্য রাজনীতির তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করেছি এবং এইগুলির সঙ্গে বেদান্তের অমর শিক্ষার সমন্বয় করেছি। আমার সব লেখাতেই আমি এই আদর্শই প্রচার করেছি, এইটিই আমার জীবনের ব্রত বলেই আমি মনে করেছি। আমি অনুভব করেছি, আমার কাজ হচ্ছে আমার দেশবাসীকে বলা, তাদের উপলব্ধি করান যে, জগতের জাতি সকলের মধ্যে ভারতের একটি বিশিষ্ট অবদান আছে, ভারতের একটা মিশন আছে, সমগ্র মানব জাতির জন্যে ভারতবর্ষকে তা করতে হবে। এইটিই যদি আমার অপরাধ হয়, আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে আমাকে দিন, আপনারা আমাকে কারারুদ্ধ

করতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারেন, কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করব না। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে চাই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারা মতেই অপরাধ নয়।" এই কথা কয়টি বলে অরবিন্দ নিজের বক্তব্য শেষ করলেন।

মানিকতলা বোমার মামলায় প্রধান আসামীর এই বীরোচিত স্বীকারোক্তি বড়ই তাৎপর্য্য পূর্ণ হ'ল এইদিন।

সর্ব্বশেষে কৌঁসুলী চিত্তরঞ্জন দাস পুনরায় তাঁর শেষ বক্তব্য রাখলেন আসামীর হয়ে—

"My Lord! my appeal to you is this, that long after this turnoil and the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India but across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court but before the bar of the High-Court of History. The time has come for you, Sir, to consider your judgement and for you, gentlemen, to consider your verdict."

—সাধু! সাধু!

অরবিন্দ ঘোষের ওপর ১২১ ধারা প্রয়োগ করা প্রমাণাভাবে যে একেবারেই অসিদ্ধ, কৌঁসুলী চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর বাচনিক শক্তিতে কোর্টের সামনে তা প্রমাণ করে দিলেন।

বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন—'অপূর্ব্ব-অপূর্ব্ব, এই সওয়াল জবাব অদ্বিতীয়। এর পূর্ব্বে আসামী পক্ষের এমন সুগঠিত চমৎকার সওয়াল আর কোন দিনই শোনা যায় নি।'

॥ বাহাত্তর ॥

২৩১ দিন ধরে সেসনস কোর্টে 'আলিপুর বোম কেসের' মামলা চ'লে, শেষ হ'ল ১৩ই এপ্রিল ১৯০৯ সাল।

অভিযুক্তদের মধ্যে কার কিরূপ শাস্তি হওয়া দরকার এবং কে কে খালাস পাওয়ার যোগ্য জুরীরা তা লিপিবদ্ধ করে নিজেদের মতামত সহ লিখিত ভাবে ১৪ই এপ্রিল জজ সাহেবের হাতে দিলেন।

প্রথম জুরী গুরুদাস বসু বিচার করে সাব্যস্ত ক'রেছেন, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ সরকার, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, পরেশচন্দ্র মৌলিক আর হেমচন্দ্রদাস দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি, বাকি সকলেই নির্দোষ।

দ্বিতীয় জুরী ও অ্যাসেসার, কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মতামতে বললেন, পরেশচন্দ্র মৌলিক ছাড়া অপর কয়জনের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে তিনি গুরুদাস বসুর সঙ্গে একমত।

এইবার বিচারপতি বীচক্রফট শুনানীর সব নথীপত্র গুছিয়ে নিয়ে রায় লিখতে বসলেন। এখন সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর কি করবেন না করবেন, কাকে শাস্তি দেবেন, কাকে খালাস দেবেন। বিশেষ চিন্তার বিষয় ইংরেজ সরকারের মর্য্যাদা, এই মামলার সঙ্গে বহুলাংশে জড়িত। পৃথিবী-বিখ্যাত এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় তাই তাঁকে অনেক চিন্তা করে, অনেক বুঝেসুঝেই দিতে হবে। জনা কয়েককে তো ফাঁসীর দড়িতে লটকাতেই হবে! ওদিকে আবার সরকার চাইছে অরবিন্দ যেন বাদ না পড়ে। তাকে শাস্তি দিতেই হবে। কিন্তু পথ কোথায়? সি. আর. দাস যে সওয়াল জবাবে সে রাস্তা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। অবরুদ্ধ পথ থেকে তিনি বেরুবার অনেক চেষ্টা

করলেন কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব হ'ল না। বেশ ক'টা দিন কেটেও গেল তাঁর, মামলার রায় দিতে।

৬ই মে ১৯০৯ সাল।

আদালত কক্ষ আজ দু'পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টার, আসামী পক্ষের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আর পুলিস কর্ম্মচারীতে ঠাঁসা। গাড়ি বোঝাই ক'রে মানিকতলা বোমার মামলার আসামীদের আলিপুর কোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে।

সকাল সাড়ে দশটায় কোর্ট বসেছে।

জজ সাহেব বীচক্রফ্‌ট বিচার পতির উচ্চ আসনে উপবিষ্ট।

বিচারের সুদীর্ঘ রায় প'ড়ে বীচক্রফ্‌ট আসামীদের শোনালেন-কাকে-কাকে খালাস দিলেন আর কাকে কিরূপ দণ্ড দিলেন :—

১।	অরবিন্দ ঘোষ	খালাস।
২।	বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	ফাঁসীতে মৃত্যু।
৩।	উল্লাসকর দত্ত	ফাঁসীতে মৃত্যু।
৪।	হরিদাস দত্ত	খালাস।
৫।	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।
৬।	হৃষীকেশ কাঞ্জীলাল	ঐ
৭।	বিভূতিভূষণ সরকার	ঐ
৮।	সুধীরকুমার সরকার	ঐ
৯।	ইন্দ্রনাথ নন্দী	ঐ
১০।	অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ঐ
১১।	শৈলেন্দ্রনাথ বসু	ঐ
১২।	বীরেন সেন	ঐ
১৩।	নিখিলেশ্বর রায়	খালাস

১৪। দেবব্রত বসু	খালাস
১৫। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ
১৬। কৃষ্ণজীবন সান্যাল	এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড
১৭। বালকৃষ্ণ হরি কানে	সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, আন্দামান জেলে।
১৮। শিশির সেন	ঐ
১৯। পরেশচন্দ্র মৌলিক	দশ বৎসর কারাদণ্ড, দেশান্তরে এবং সরকার কর্তৃক যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।
২০। নিরাপদ রায়	ঐ
২১। শিশির কুমার ঘোষ	ঐ
২২। শচীন্দ্র কুমার সেন	খালাস
২৩। নরেন্দ্রনাথ বক্সী	ঐ
২৪। নলিনী কান্ত গুপ্ত	ঐ
২৫। বিজয় কুমার নাগ	ঐ
২৬। ধরণী গুপ্ত	ঐ
২৭। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ঐ
২৮। পূর্ণচন্দ্র সেন	ঐ
২৯। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ
৩০। প্রভাস দে	ঐ
৩১। দীনদয়াল বসু	ঐ
৩২। কুঞ্জলাল সাহা	ঐ
৩৩। হেমচন্দ্র দাস	যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।
৩৪ ইন্দুভূষণ রায়	ঐ

৩৫। সুশীলচন্দ্র সেন — সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আন্দামান জেলে।

৩৬। অশোকচন্দ্র নন্দী — ঐ

আসামীদের সামনে রায় প'ড়ে শুনিয়ে দিয়ে বীচক্রফ্‌ট পাশের চেম্বারে চলে গেলেন।

॥ তিয়াত্তর ॥

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে জেলের ভেতর গুলী ক'রে মারার অপরাধে এই মামলার বাকি হু'জন আসামীর, অনেক পূর্ব্বেই ফাঁসী হয়ে গেছে অপর একজন দায়রা জজের বিচারে।

৩৭। কানাইলাল দত্ত……ফাঁসীতে মৃত্যু—১০ই নভেম্বর, ১৯০৮ সন।

৩৮। সত্যেন্দ্রনাথ বসু……ফাঁসীতে মৃত্যু—২১শে নভেম্বর ১৯০৮ সন।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাস কর দত্ত মৃত্যুদণ্ড রহিত করার জন্যে হাইকোর্টে আপীল করলেন।

হাইকোর্টের বিচারে উভয়েই যাবজ্জীবন কারা দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। দীপান্তরে এঁদের ও যেতে হবে। মৃত্যু দণ্ড থেকে বেঁচে গেলেন।

ইন্দুভূষণ রায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল আর বিভূতিভূষণ সরকারের, আপীলে দশ বৎসর ক'রে সশ্রম কারা দণ্ডের আদেশ হ'ল। সুধীরকুমার সরকার এবং অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের হ'ল, সাত বৎসরের সশ্রম কারা দণ্ড। পরেশচন্দ্র মৌলিকেরও হ'ল ঐ সাত বৎসর সশ্রম কারা বাস। নিরাপদ রায় আর শিশিরকুমার ঘোষের হ'ল চার বৎসর ক'রে সশ্রম কারা দণ্ড। অন্যের শাস্তি যা, তাই বহাল থাকল।

আলিপুর বোমার মামলা শেষ হয়েছে—দীর্ঘদিন পর। যাঁদের ভাগ্যে জুটেছে দীপান্তর তাঁরা জাহাজের খোলে ভরতি হয়ে সশস্ত্র পুলিস প্রহরায় কালাপাণি পেরিয়ে গেলেন আন্দামান সেলুলার জেলে। যাঁদের স্থানীয় কারাগারে রাখার কথা তাঁদের এখানেই

সশ্রম কারাবাস সুরু হয়ে গেছে। যাঁরা বেকসুর খালাস পেয়েছেন, তাঁরা কেউ কেউ বাড়ি ফিরেছেন আবার কেউবা ছিটকে পড়েছেন এখানে-সেখানে। শ্রীঅরবিন্দ আছেন ক'লকাতাতেই।

কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই উত্তরপাড়া থেকে এল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নামে আমন্ত্রনলিপি। সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে জানাতে চায় সম্বর্দ্ধনা—অভিনন্দনে। তাই তাঁরা তাঁকে সাদর আমন্ত্রন জানিয়েছেন ৩০শে মে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে ; তাঁরা ঋষি অরবিন্দের মুখ থেকে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, আরও জানতে চান জরাগ্রস্ত দেশ এখন কি করবে? তিনিই তাঁদের বলে দেবেন।

দেশবাসী জেনেছে তিনি মহাযোগী। কারাগারের ছোট্ট সেলটিতে বসে শ্রীঅরবিন্দ ভগবৎ দর্শন লাভ করেছেন।*

ঋষি অরবিন্দ ঠেলে ফেলতে পারলেন না উত্তরপাড়াবাসীর সাদর আমন্ত্রন। আসতে হল তাঁকে এই সভায়। সুদীর্ঘ বক্তৃতাও দিতে হ'ল।

তিনি আর এখন পূর্ব্বের বিপ্লবী অরবিন্দ নেই, তিনি এখন মহাযোগী ঋষি অরবিন্দ। যে চেতনা তিনি বন্দী অবস্থায় লাভ করেছেন, সেই সম্বন্ধেই তিনি বললেন বেশী ক'রে।+

শ্রীঅরবিন্দের ভাষণ :

"……..বছর খানেকের বেশী হ'ল শেষবার এখানে এসেছিলাম। যখন আসি, আমি একা ছিলাম না ; তখন জাতীয়তার পরম শক্তিমান্ গুরু একজন আমার পাশে ছিলেন।…এখন তিনি বহু দূরে, তাঁর সঙ্গে আজ আমাদের সহস্র-সহস্র মাইলের ব্যবধান। অন্যান্য যাঁদের আমি আমার পাশে কর্ম্মরত দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তাঁরাও অনুপস্থিত। দেশের উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেছে তা তাঁদের

---

*প্রেসিডেন্সী জেল (পূর্ব্বের আলিপুর জেল) শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পীঠস্থান : চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর হাতার বাইরে, পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে একত্রে

ইতস্ততঃ বহুদূরে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলেছে। এবার আমিই একবছর নির্জ্জন বাসে কাটিয়ে এলাম; আর আজ বেরিয়ে এসে দেখি, সবই বদলে গেছে।

পরপর ছ'টি সেল। পুকুব পাড়ে অদূরে প্রবীন এক বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান। প্রত্যহ এখানকার অনেক কিছুই সে প্রত্যক্ষ করছে।

এই সেলকটির মধ্যে প্রথমটি এখন তীর্থ ক্ষেত্র।

এই কক্ষটিতেই ঋষি অববিন্দ সিদ্ধি লাভ কবেছিলেন।

মানিকতলা বোমার মামলায় জড়িত আসামী কানাইলাল এই জেলেব ভেতর এই সেল ক'টির অদূবে, বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীকে গুলী ক'রে হত্যা করার পব, এই মামলায় জড়িত সমস্ত বন্দীকে, এক এক ক'রে এনে পোবা হ'ল, চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর এক একটি নির্জ্জন কক্ষে, কিন্তু অরবিন্দকে বাখা হ'ল, বাইবেব এই ছ'টি সেলেব প্রথমটিতে। প্রথমেও ছিলেন এখানেই।

এব পূর্ব্বেই ভগবৎ সাধনায় আত্মানুভূতি লাভে তিনি অনেক দূব অগ্রসর হয়ে গেছেন। ভালই হ'ল তাঁর, দলের সকলেব কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারায় তাঁব দ্রুত আত্ম চেতনা লাভের পথ প্রসস্থ হ'ল। এই সেলটিতে বন্দী অবস্থায় থেকে বাইবের সব কিছু ভুলে, তিনি একান্তে ভগবৎ চেতনা লাভে মনঃ সংযোগ কবলেন। জেল জীবনেব শেষেব দিনগুলো এক বিশেষ অনুভূতির মধ্যে, বিশেষ চেতনাব মধ্যে, বিশেষ উপলব্ধিব মধ্যে বিশেষ আনন্দেব মধ্যে কেটে গেল তাঁব। এব মধ্যেই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন কবলেন।

এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে আমি একটি বিশেষ সমাচার, আলিপুরের জেলার মিঃ আফসনের মুখ থেকে শুনেছি। ১৯৩৫ সালে।

আফসান বললেন—"আমি তখন সবে এসেছি মিলিটারী থেকে আলিপুর জেলে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডাবেব পদ নিয়ে। সে দিন আমার জেল গেটে নাইট ডিউটি পড়েছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম, খট্, খট্, খট্, খট্, কবে, ভেতরে যাওয়ার ছোট দরজাটাব ওপর দ্রুত আঘাত চলেছে। আমি দরজাব কাছে যেতেই নাইট রাউণ্ডেব হেড ওয়ার্ডাব ভেতর থেকে বললে, 'এক থেকে ছ' ডিগ্রীব—এক নম্বর ডিগ্রীর স্বদেশী আসামী গাছেব নীচে, কাব সঙ্গে কথা বলছে, সে লোকটাকে আমি দেখতে পেলাম না। বুঝলাম কথা কইছে' আসামীকে ডাকলাম, সে কোন জবাব দিল না। ডিগ্রীর দরজা খোলা, ডিউটি সেপাই

……বেরিয়ে এসে আমি চারদিকে চাইলাম, উপদেশের জন্যে, প্রেরণার জন্যে যাদের দিকে চাইতে অভ্যস্ত ছিলাম তাদের সন্ধানে চারদিকে চাইলাম। তাদের দেখা আর পেলাম না। শুধু তাই নয়, যখন আমি জেলে যাই সমগ্র দেশ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে পূর্ণ ছিল,



ডিগ্রীর সামনে বসে ঘুমচ্ছে'। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, সেখান থেকে চলে এলে কেন? সেখান থেকে হুইসেল বাজালে না কেন? সে বললে—'ভুল হয়ে গেছে, আমি ওখানে যাচ্ছি, আপনি শীগ্‌গির আসুন!' আমি, এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে সেখানে ছুটলাম। দেখলাম, গাছের নীচে কেউ নেই। গেলাম ডিগ্রীতে। দেখি, অরবিন্দ ডিগ্রীর ভেতর কম্বলের' ওপর চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। তখন রাত্তির প্রায় তিনটে হবে। আমি অরবিন্দকে বার বার ডাকলাম। সে কোন উত্তর দিল না। সেলের দরজা ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রলাম। সব ঠিক আছে। তালা যেমন আটকান তেমনই আছে। সেপাইকে, ডিউটির সময় ঘুমনর জন্যে বকলাম, ওখান থেকে সরে এসে, হেড ওয়ার্ডারের মিথ্যে খবর দেওয়ার জন্যে, তাকেও দুটো কথা শুনলাম। তবুও সাহস হ'ল না, হেড ওয়ার্ডারকে সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত জেলটার ভেতর লোকটার সন্ধান করতে লাগলাম। সব জায়গাকার ডিউটি পোষ্টের সেপাইদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা বললে, কাউকে দেখেনি। কোথাও কোন লোকের সন্ধান পেলাম না। সকালে জেলারকে রিপোর্ট দিলাম। সেপাইকে ডিউটির সময় ঘুমনোর জন্যে রিপোর্ট ক'রে, বড় সাহেবের কাছে হাজির করা হ'ল। বড় সাহেব তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে, রিপোর্টের পাশে ওয়ার্ণ লিখে তাকে ছেড়ে দিলেন। এর পর থেকে অরবিন্দের রাত্রিতে সেলের বাইরে আসার কথা প্রায় শোনা যেত। সেলের মধ্যে যখন তখন শোনা যেত সে কার সঙ্গে কথা কইছে। কেউ কেউ বললে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার ঐ ভাব, ঐ ব্যাপার স্যাপার দেখে, কেউ বললে, সাজা হওয়ার ভয়ে ওর ওই অবস্থা। রিলিজিয়াস মাইন্‌ডেড চিফ, মেডিক্যাল অফিসার তাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা ক'রে বললেন—'মোটেই তার মাথা খারাপ হয়নি। সে ভগবৎ চিন্তায় বিভোর। বট গাছ তলায় আলাদা একজন পাহারা বসান হ'ল, তাতেও তার বাইরে আসা বন্ধ হ'ল না। সেলের ভেতর সন্ধান করলেই, দেখা

একটা জাতির আশায়, অধঃপতিত অবস্থা থেকে নূতন উত্থিত লক্ষ লক্ষ মানব হৃদয়ের আশায় পূর্ণ ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সেই ধ্বনি শোনবার জন্যে কান পাতলাম, কিন্তু তখন সব নীরব, দেশের উপরে একটা স্তব্ধতা এসে পড়েছে, সবাই যেন বিভ্রান্ত; কারণ আমাদের সামনে ভবিষ্যতের স্বপ্নে পূর্ণ ভগবানের যে উজ্জ্বল স্বর্গ ছিল, তার পরিবর্ত্তে মাথার উপর যেন এক মেঘাবৃত আকাশ, সেখান থেকে বজ্র ও বিদ্যুৎ বর্ষিত হচ্ছে। কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে কেউ জানেনা, সকল দিক থেকেই এল প্রশ্ন, 'এরপর কি করব? কি করতে পারি আমরা?' আমিও জানতাম না, এরপর কি কর্ত্তব্য। কিন্তু এই একটা জিনিষ আমি জানতাম, ভগবানের সর্ব্বজয়ী শক্তি যেমন সে ধ্বনি তুলেছিল, সে আশা জাগিয়েছিল, তেমনি সেই একই শক্তি এই নীরবতাও প্রেরণ করেছে। কোলাহল ও আন্দোলনে ছিলেন যিনি, বিরতি ও নীরবতার মধ্যেও রয়েছেন তিনি।

······আমি সেই নীরবতায় নিরুৎসাহ হইনি, কারণ কারাগারের মধ্যে নীরবতার সহিত আমার পরিচয় হয়েছিল, আমি জানতাম, আমার দীর্ঘ বর্ষব্যাপী হাজত বাসে বিরতি ও নীরবতার মধ্যেই আমি নিজে এই শিক্ষা লাভ করেছি। বিপিন পাল জেল থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, জেলে তাঁর অনুভূতি লাভের কথা; আমাদের সকলের মধ্যে ভগবান রয়েছেন, জাতির মধ্যেও ভগবান রয়েছেন। তাঁর বক্তৃতাগুলিতেও তিনি বলেছিলেন, এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তা সাধারণ শক্তি অপেক্ষা মহত্তর, এবং এর সামনে যে লক্ষ্য তা সাধারণ লক্ষ্য অপেক্ষা মহত্তর।

যেত সে সেখানে। কিন্তু কববার কিছু ছিল না। অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেও কোন জবাব পাওয়া যেত না। পরে বুঝতে পারলাম সে সাধারণ লোক নয়। এখন জানতে পারছি তিনি কত বড় মহাপুরুষ।"

* উত্তরপাড়ার অভিভাষণ এখানে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাই তার কিছুটা বঙ্গানুবাদ তুলে দেওয়া হ'ল এখানে। ভাষণ ছিল ইংরিজীতে।

…যে বাণী বিপিনচন্দ্র পেয়েছিলেন বক্সার জেলে, ভগবান সেইটিই আমাকে দিয়েছেন আলিপুর জেলে। দ্বাদশ মাস যে আমি জেলের মধ্যে ছিলাম সেই সময় দিনের পর দিন তিনি আমাকে সেই জ্ঞানই দিয়েছেন, এখন সেই জ্ঞানই আপনাদের নিকট প্রকাশের জন্যে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন।

আমি জানতাম, আমি মুক্তি পাব। আমাকে যে এক বৎসরব্যাপী অবরোধ তার উদ্দেশ্য ছিল এক বছরের নির্জ্জন বাস ও সাধনা। ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যত দিন আমার জেলে থাকা আবশ্যক তার বেশী আমাকে জেলে ধরে রাখতে পারবে কে? তিনি আমাকে একটি বাণী দিয়েছিলেন, একটি কর্ম্ম দিয়েছিলেন, আমি জানতাম যতদিন না সেই বাণী উচ্চারিত হচ্ছে ততদিন কোন মানবীয় শক্তিই আমাকে নিস্তব্ধ করতে পারে না, যতদিন না সেই কর্ম্ম সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন কোন মানবীয় শক্তিই ভগবানের যন্ত্রকে নিবৃত্ত করতে পারে না,—সে যন্ত্র যতই দুর্ব্বল, যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন। আর এখন যে আমি বেরিয়ে এসেছি, এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মধ্যে এমন একটা কথা এসেছে যেটি বলবার কোন ইচ্ছা ইতিপূর্ব্বে আমার ছিলনা। আমার মনের মধ্যে যেটি ছিল ভগবান সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর এখন আমি যা বলছি তা একটা প্রেরণা ও বাধ্যতার বশে।

যখন আমি ধৃত হই, তাড়াতাড়ি আমাকে লালবাজার হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিছুক্ষণের জন্যে আমার বিশ্বাস টলেছিল, কারণ ভগবানের ইচ্ছার প্রকৃত মর্ম্ম কি তা আমি তখন বুঝতে পারিনি। আমি নিমিষের তরে বিচলিতও হয়েছিলাম, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে ডেকে বলেছিলাম,—'আমার এ কি হল? আমি ভেবেছিলাম আমার দেশবাসীর জন্যে আমার একটা কাজ করবার আছে, যতদিন না সে কাজ সিদ্ধ হয় ততদিন তুমিই আমাকে রক্ষা করবে। তা হ'লে আমি এখানে কেন? আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন?' তিন দিন

এইভাবে কেটে গেল, তখন ভেতর থেকে একটা স্বর শুনতে পেলাম। 'অপেক্ষা কর, কি হয় দেখ।' তখন আমি শান্ত হ'লাম, অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে লালবাজার থেকে আলিপুর নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং এক মাসের জন্যে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে একটা নির্জ্জন সেলে আবদ্ধ রাখা হল। এই নির্জ্জন বাসেই এল আমার সর্ব্বপ্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা। তখন আমার স্মরণ হ'ল, আমার গ্রেপ্তার হবার একমাস বা আরও কিছু পূর্ব্বে আমার প্রতি একটা আহ্বান এসেছিল সকল কর্ম্ম ছেড়ে দিতে, নির্জ্জন বাসে যেতে এবং নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করতে, যেন আমি ভগবানের সহিত ঘনিষ্ঠতর ভাবে যোগযুক্ত হতে পারি। আমি ছিলাম দুর্ব্বল, সে আহ্বানে সাড়া দিতে সমর্থ হইনি। আমার কাজ ছিল আমার নিকট অতিপ্রিয়, আর আমার হৃদয়ের অহঙ্কারে আমি মনে করেছিলাম যে আমি যদি সেখানে না থাকি সে কাজের ক্ষতি হবে, এমন কি তা বিফলও বন্ধ হয়ে যাবে, সেজন্যে আমি তা ছাড়তে চাইনি। তিনি যেন আমাকে পুনরায় বললেন, 'যে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিলনা, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন ক'রে দিয়েছি, কারণ এটা আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি এই কাজ নিয়ে থাকবে। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি, তুমি নিজে যা শিখতে পারনি, তাই তোমাকে শিখতে দিতে এবং তোমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরী ক'রে তুলতে।' তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হ'লাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগ—দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে

নির্ব্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ-নীচ, শত্রু-মিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি সমভাবাপন্ন হ'তে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না।

আমি অনুভব করলাম, হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি।

আমরা অনেক সময়েই হিন্দুধর্ম্মের কথা, সনাতন ধর্ম্মের কথা বলি কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কি বস্তু তা আমাদের মধ্যে ক'জন জানে? অন্যান্য ধর্ম্মের প্রধান কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ, কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম হচ্ছে জীবনই; এটি এমন জিনিষ যা শুধুই বিশ্বাস করবার নয়, পরন্তু জীবন ফুটিয়ে তোলবার, মানব জাতির মুক্তির জন্য এই ধর্ম্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে। এই ধর্ম্ম দেবার জন্যেই ভারত উঠছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্যে উঠছে না অথবা যখন সে শক্তিমান্ হবে তখন দুর্ব্বলকে পদদলিত করবার জন্যেও সে উঠছে না। যে সনাতন জ্যোতি তাঁকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকীরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানব জাতির জন্যে জীবন ধারণ করেছে, নিজের জন্যে নয়, আর তাকে যে বড় হতে হবে, তাও তার নিজের জন্যে নয়, মানব জাতির জন্যে।

হিন্দু ধর্ম্মের যা মূল সত্য তা তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি জেলারদের হৃদয় আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারা জেলের কর্ত্তা ইংরেজ অফিসারকে বললে, 'উনি বন্দী অবস্থায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, অন্ততঃ তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা করে তাঁর সেলের বাইরে বেড়াতে দেওয়া হোক।' সেই ব্যবস্থাই হ'ল এবং আমার বেড়ানর সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে জেল আমাকে মানব জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি তার জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই; আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার সেলের সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ার তলে আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা

দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা 'বাসুদেব', দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধ'রে রয়েছেন। আমার সেলের দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। দাঁড়িয়ে থেকে আমার ওপর পাহারা দিচ্ছিলেন। আমার পালঙ্ক—স্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন; সেই বাহু আমার বন্ধুর, আমার —প্রেমাস্পদের। তিনি আমার যে গভীরতর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন, এইটিই হয়েছিল তার প্রথম ফল। জেলের কয়েদিদের দিকে আমি চাইলাম—চোর, খুনী, জুয়াচোর এদের দিকে যেমন চাইলাম, আমি বাসুদেবকেই দেখতে পেলাম, সেই সব তমাসাচ্ছন্ন আত্মা ও অপ-ব্যবহৃত দেহের মধ্যে আমি নারায়ণকেই দেখতে পেলাম। এই সব চোর ও ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিল যারা তাদের সহানুভূতি তাদের স্নেহের দ্বারা আমাকে লজ্জায় ফেলেছিল, এই সব প্রতিকূল অবস্থার উপর তাদের মানবতা জয়ী হয়েছিল। বিশেষ ক'রে তাদের মধ্যে একজনকে দেখলাম, আমার মনে হল সে একজন সাধুপুরুষ, সে অক্ষর-জ্ঞান বিহীন চাষা, ডাকাতির অভিযোগে তার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, আমাদের মিথ্যাশ্রেণীর গর্ব্বে যাদের যাদের আমরা 'ছোটলোক' বলে ঘৃণা করি সে ছিল তাদেরই একজন। পুনরায় ভগবান্ আমাকে বললেন, 'দেখ, কি সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্যে। যে-জাতকে আমি তুলতে চাই, এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।'

নিম্ন আদালতে যখন মোকদ্দমা ধরা হল, ম্যাজিষ্ট্রেটের সুমুখে আমাদের আনা হ'ল তখনও আমার সঙ্গে গেল সেই নিগূঢ় দৃষ্টি। ভগবান্ আমাকে বললেন, 'যখন তোমাকে জেলে বদ্ধ করা হয়, তোমার হৃদয় কি হতাশ হয়ে পড়েনি? তুমি কি আমায় ডেকে বলনি

কোথায় আমার অভয় ছায়া? এখন দেখ ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চেয়ে সরকার পক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে।' আমি দেখলাম, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম সেখানে বাসুদেবকে, দেখলাম বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন নারায়ণ। সরকার পক্ষের উকিলের দিকে তাকালাম, সেখানে আমি সরকারী উকিলকে দেখতে পেলাম না, সেখানে বসে রয়েছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আমার প্রিয়, আমার বন্ধু সেখানে বসে হাসছেন। তিনি বললেন, 'কেমন, এখন আর তোমার ভয় আছে? আমি রয়েছি সকল মানুষের মধ্যে, আমিই তাদের সকল কর্ম্ম, সকল কথাকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করি। আমি এখনও তোমাকে রক্ষা করছি, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার বিরুদ্ধে এই যে মোকদ্দমা আনা হয়েছে, এটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। এ তোমার জন্যে নয়! এই বিচারের জন্য আমি তোমাকে এখানে আনিনি, অন্য কিছুর জন্যে এনেছি। মোকদ্দমাটিও আমার কাজের একটা উপায় মাত্র, তার বেশী আর কিছুই নয়'!

পরে সেশন কোর্টে যখন মামলা আরম্ভ হ'ল, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণের মধ্যে কোথায় কি মিথ্যে ছিল এবং সাক্ষীদের কি কি বিষয় জেরা করতে হবে সে সম্বন্ধে আমার উকিলকে নির্দ্দেশ লিখে দিতে লাগলাম। তারপর এমন একটা জিনিষ ঘটল, যা আমি আশা করি নি। আর একজন কাউন্সেল আমার পক্ষ সমর্থন করতে দণ্ডায়মান হ'লেন। —তিনি আমার একজন বন্ধু। তিনি তাঁর অন্য সকল ভাবনা সরিয়ে ফেলে, সমস্ত প্র্যাক্টিস পরিত্যাগ করে, আমাকে রক্ষা করবার জন্যে মাসের পর মাস ধরে অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র কাটালেন, তিনি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস।

যখন তাঁকে দেখলাম আমি নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্তু তবুও আমার মনে হ'ল তাঁকে নির্দেশ লিখে দেওয়া দরকার। তারপর সে-সব আমার বন্ধ হ'ল। আমি ভেতর থেকে বাণী শুনলাম, তোমার পায়ে যে জাল জড়ান রয়েছে তা থেকে এই মানুষটি তোমাকে উদ্ধার করবে।

ঐ সব কাগজ ফেলে দাও। তোমার তাকে উপদেশ দিতে হবে না, তাকে উপদেশ দেব আমি।' আমি তাঁর উপরেই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি সকল সময়েই জানতাম আমাকে নিয়ে ভগবানের কি উদ্দেশ্য ছিল, কারণ আমি বার বার তা শুনতে পেয়েছিলাম। সর্ব্বদা আমি ভেতরে বাণী শুনতাম—'আমি পরিচালনা করছি, সুতরাং তুমি ভয় ক'রো না। তোমাকে যে কাজের জন্যে আমি জেলে এনেছি সেই দিকে তুমি মনোযোগ দাও, আর যখন তুমি জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, কখনও আর যেন ভয় ক'রো না, কখনও দ্বিধা ক'রো না। মনে রেখো আমিই এই সব করেছি, তুমিও নয় আর অন্য কেউই নয়। অতএব যতই মেঘ ঘনিয়ে আসুক, যত দুঃখ, বিপদ ও দুরূহতা আসুক, যত কিছু অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন, বস্তুতঃ কিছুই অসম্ভব নয়, কিছুই দুরূহ নয়। জাতির মধ্যে, জাতির উত্থানের মধ্যে, আমি রয়েছি, আমি বাসুদেব, আমি নারায়ণ, আমি যা ইচ্ছা করি তাই হবে। আমি যা ঘটাতে চাই, কোন মানবীয় শক্তিই তা আটকাতে পারবে না।'

তিনি আমাকে নির্জন বাস থেকে বের করে আমার সঙ্গে অভিযুক্ত অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে রাখলেন।

জেল থেকে বের হবার পর আমার স্বার্থত্যাগ ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাকে শুনতে হয়েছে, কিন্তু তা শুনে আমার লজ্জা হয়। কারণ আমি আমার দুর্ব্বলতা জানি, আমার ত্রুটি বিচ্যুতির অতীত আমি নই। সে সব সম্বন্ধে পূর্বে আমি অন্ধ ছিলাম না। আমার নির্জন বাসের মধ্যে তারা যখন আমার বিরুদ্ধে জেগে উঠল, আমি তীব্র ভাবে তাদের অনুভব করলাম। জানলাম, মানুষ হিসেবে আমি একটি দুর্ব্বলতার স্তূপ। দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ যন্ত্র, আমি শক্তিমান হয়ে উঠি কেবল যখন একটা ঊর্দ্ধের শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করে।

যখন আমি এই সব যুবকদের মধ্যে এলাম তাদের অনেকেরই মধ্যে দেখতে পেলাম এমন মহতী সাহস, নিজেকে মুছে দেবার এমন

শক্তি যার তুলনায় আমি অতি তুচ্ছ। দু'এক জনকে দেখলাম, তারা যে কেবল শক্তি ও চরিত্র বলেই আমার চেয়ে বড় শুধু তায় নয়, সে রকম তো অনেকেই ছিল—পরন্তু যে বুদ্ধির উৎকর্ষতার জন্যে আমি গর্ব অনুভব করতাম তার সম্ভবনাতেও তারা আমার চেয়ে বড়।

ভগবান আমাকে বললেন, 'এই তরুণের দল, এই নূতন মহা-শক্তিশালী জাতিই আমার আদেশে উঠছে। তারা তোমার চেয়ে বড়। তোমার ভয় কি? যদি তুমি সরে দাঁড়াও অথবা নিদ্রিত হয়ে পড়, তথাপি কাজটি আটকে থাকবে না। কালযদি তোমাকে সরিয়ে ফেলা হয়, এখানে যে তরুণেরা রয়েছে এরাই তোমার কর্ম্মভার গ্রহণ করবে, আর তা এমন শক্তির সহিত করবে, যা তুমি কখনও পারনি। তুমি কেবল এই জাতিকে একটা বাণী দেবার জন্যে আমার কাছ থেকে শক্তি লাভ করেছ, সে বাণী তাকে উঠতে সাহায্য করবে।' তারপর তিনি আমাকে তা বললেন।

সহসা একটা ঘটনা ঘটল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে শশব্যস্তভাবে নির্জন সেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, সেই সময়ে আমার মধ্যে কি সব ঘটেছিল তা' বলবার প্রেরণা আমি পাচ্ছি না। কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, দিনের পর দিন ভগবান্ আমাকে তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দেখালেন এবং হিন্দুধর্ম্ম যে সম্পূর্ণভাবে সত্য তা' উপলব্ধি করালেন।

...যখন আমি প্রথমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, তখন সম্পূর্ণরূপে ভক্তের ভাব নিয়ে যাইনি, জ্ঞানীর ভাব নিয়েও না। বহুদিন পূর্বে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার কয়েক বছর আগে বরোদায় থাকার সময়ে আমি ভগবান্‌কে চেয়েছিলাম এবং আমি দেশের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

সে সময় আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী সংশয়বাদী, নাস্তিক; ভগবান্ আদৌ আছেন কিনা, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম না। আমি তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতাম না,

তত্রাপি কি যেন আমাকে বেদ, গীতা এবং হিন্দুধর্মের সত্যের দিকে আকর্ষণ করত। আমি অনুভব করতাম যে, এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের মধ্যে মহাশক্তিশালী সত্য নিশ্চয় আছে। স্থির করলাম জেলে বসেই যোগ সাধনা করব। দেখব আমার ধারণা সত্য কিনা, ভগবান্‌কে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, —যদি তুমি থাক তুমি আমার মর্ম্মের কথা জান। তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায়, এমন কোন জিনিষই আমি চাই না। আমি শুধু চাই, এই জাতিটাকে তোলবার শক্তি, আমি শুধু চাই, এই যে ভারতের লোক-সকলকে আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্যে জীবন ধারণ করতে পারি, কাজ করতে পাই, যেন এদের জন্যে আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি। যোগের সিদ্ধিলাভ কতকটা করেছিলাম, কিন্তু আমি যেটি সবচেয়ে বেশী চাইতাম তাতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। জেলের নিঃসহতার মধ্যে আবার আমি সেটি চাইলাম। আমি বললাম, 'দাও আমাকে তোমার আদেশ। আমি জানিনা কি কাজ আমাকে করতে হবে। কেমন ক'রে করতে হবে, আমাকে একটা বাণী দাও।'

যোগ সাধনার ভেতর দিয়ে দুটি বাণী এল। প্রথম বাণীটি হল, 'আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই জাতিটাকে তুলতে সাহায্য করা। শীঘ্রই এমন সময় আসবে, যখন তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে; কারণ আমার ইচ্ছে নয় যে, এবার তুমি দোষী সাব্যস্ত হও, অথবা অন্যান্যকে যেরূপ তাদের দেশের জন্যে কষ্টভোগ করে সময় অতিবাহিত করতে হবে তুমিও সেরূপ কর। আমি তোমাকে কাজের জন্যে ডেকেছি, আর তুমি যে আদেশ চেয়েছ তা এই-ই। আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, যাও, আমার কাজ কর।'

দ্বিতীয় বাণীটি এল এইরূপ—'এই একবছর নির্জন বাসে তোমাকে কিছু দেখানো হয়েছে, যার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা' হচ্ছে হিন্দুধর্মের সত্যতা,......আমার বাণী প্রচারের জন্যেই আমি এই

জাতিটাকে তুলেছি। এইটিই সনাতন ধর্ম।...তোমার অন্তরেও বাহিরে, স্থূলেও সূক্ষ্মে প্রমান দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যেই তারা উঠছে, নিজেদের জন্যে নয়, পরন্তু সমস্ত জগতের জন্যেই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে। ভারত উঠবে, তার অর্থ সনাতন ধর্ম উঠবে। ইহা যাচ্ছে জগতের জাতি সকলের মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ সনাতন ধর্ম মহান হবে ; ভারত নিজেকে বৰ্দ্ধিত ও প্রসারিত করবে তার অর্থ সনাতন ধর্ম নিজেকে বৰ্দ্ধিত ও প্রসারিত করবে এই ধর্ম্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকেই বড় করে তোলা! সকল বস্তুতে সর্বত্র আমি বিরাজ করছি। এই আন্দোলনে আমি, যারা দেশের কাজ করছে তাদের মধ্যে আমি। যারা তাদের বাধা দিচ্ছে, তাদের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের মধ্যেও আমিই কাজ করছি। কেউ আমার শত্রু নয়, আমার যন্ত্র মাত্র। বহুদিন পূর্ব থেকেই আমি এই অভ্যুত্থানের আয়োজন করছিলাম, এখন সময় এসেছে, এখন আমিই একে সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করব।'

......তাই আমি এই কথাই বলব যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি বস্তুতঃ সেটি হচ্ছে সনাতন ধর্ম, কারণ সেটি বিশ্বজনীন ধর্ম, অন্য সকল ধর্মই তার অন্তর্গত। এই ধর্মই বুঝিয়ে দেয়, ভগবান্ আমাদের কত নিকট, কত আপনার। সনাতন ধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।"

। চুয়াত্তর ।

আলিপুর বোমার মামলায় মুক্তি পেয়ে বাইরে আসার সামান্য কিছুদিন পরে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় দুখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। ইংরিজী পত্রিকাটির নাম 'Karmojogin' (কর্মযোগিন) এবং বাঙলাটির নাম 'ধর্ম' (অধ্যাত্ম ধর্ম মূলক জাতীয়তাবাদ পত্রিকা)। দু'টি সাপ্তাহিকই ধর্মীয় আলোচনায় ঠাসা।

মানিকতলার পৃথিবী বিখ্যাত বোমার মামলা শেষ হয়েছে, চতুর্দিক থম্ থম্ করছে। দেশবাসীর মনের ভেতর একটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। এই মামলায় জড়িত কতগুলোকে আন্দামানে পাঠিয়ে, আবার কতগুলোকে সশ্রমকারাবাসে ঢুকিয়ে দিয়ে—ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, পুলিস শামসুল আলম এখন মনের আনন্দে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দেশের লোক যতই মুসড়ে পড়ুক না কেন, বিদ্রোহী তরুণ বিপ্লবীদের মনের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল, সামসুলের এই মনোভাব বড়ই অসহ্য হল, তারা তক্কেতক্কে ঘুরতে লাগল কি করে 'বেটাকে' পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা যায়।

যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন) এসে পড়েছেন, আর চিন্তা নেই।

ইনি দলের ছেলেদের গোপন বৈঠকে পরামর্শ দিলেন—'এভাবে চলবে না। ডাইরেক্ট এ্যাকসান ছাড়া একে মারা যাবে না।'

যতীন মুখার্জীর নিজে হাতে গড়া, অতি বিশ্বাসী, অতিপ্রিয় শিষ্য বীরেন দত্ত গুপ্তকে বললেন, "কি বীরেন! তুমি পারবে?"

বীরেন লাফিয়ে উঠে বললে—"কেন পারব না! নিশ্চয় পারব। আপনার হুকুম হলেই হয়! কিন্তু লোকটাকে যে আমি চিনি না?

একবার চিনিয়ে দিতে পারলেই সব দায়িত্ব আমার" !

—তার জন্যে তোমার চিন্তা করতে হবে না। সতীশ সরকারকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, লোকটাকে দূর থেকে সে চিনিয়ে দেবে, দেখো ভুল না হয়! ক'লকাতা হাইকোর্টে সে এখন রোজ যাওয়া আসা করছে, ঐ জায়গাটাই, কাজ হাসিলের জন্যে সব থেকে সুবিধে জনক স্থান। সবাই সেখানে ব্যস্ত হয়ে চলা ফেরা করে, কেউ সন্দেহ করবে না, যাও! সতীশ সঙ্গে থাকছে, রিভলবারটা সাবধান।

১৮ বছর বয়সের, ঢাকার ছেলে বীরেন। ঐটুকুতো ছেলে, কি সাংঘাতিক সাহস! গুরুদেবের হুকুম পেয়ে কি আনন্দ তার। চলল শুভকাজে, গুরুদেবের পায়ের ধূল' মাথায় নিয়ে।

১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী।

সকাল থেকে ওরা দু'টিতে হাইকোর্টে ধন্না দিচ্ছে। কখন পাওয়া যায় তাকে কে জানে?

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ঘুরছে, ফিরছে। আবার এসে দাঁড়িয়েছে সবে দু'টিতে হাইকোর্টের সিঁড়ির ওপর।

হঠাৎ সতীশ বললে—ঐ ঐযে আসছে।

লোকটাকে সনাক্ত ক'রে দিয়েই সতীশ ঝাঁ করে সরে গেল সেখান থেকে।

বীরেন, টুক ক'রে সামনে এসে পজিসন নিয়ে দাঁড়াল।

যেই সামসুল তার নাগালের মধ্যে এসে গেছে, বীরেন গুলী চালাল।

ভারি সুন্দর তার হাতের টিপ। ট্রিগারে আঙুলটা পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে গুলীটা দৌড়ে গিয়ে শামসুলের বুকের ভেতর গেঁথে বসল।

ব্যাস, আর কথা নেই, আছড়ে পড়ল সেকেণ্ডের মধ্যেই শামসুল আলাম হাইকোর্টের সিঁড়ির ওপর।

সেইখানেই শয়তানটার দিনপঞ্জী শেষ হ'ল।

অদ্ভুৎ সাহস বীরেনের। পালানর চেষ্টাই নেই। সোজা

পুলিসকে বললে—'আমি ওই আপদটাকে খতম করেছি।'

বীরেন দত্ত গুপ্ত গ্রেপ্তার হ'ল—হাজতে গেল—ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে দায়রা সোপর্দ করলেন—দায়রার বিচারে ফাঁসীর হুকুম হ'ল—ক'লকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স বীরেনের ফাঁসীর হুকুম অনুমোদন করলেন। ছেলেটিকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে সরকার, আপনজন নিধনের বদলা নিল।

বীরেনের ফাঁসী হয়ে গেল আলিপুর জেলে ১৯১০ এর ২১শে ফেব্রুয়ারী।

Martyrs at a glance

Available names and particulars of Martyrs who were executed in the Presidency Jail (the then named as Alipore Jail) during Freedom Movement.

Name of Martyr	Date of Execution	Prison	Particulars
1. Kanailal Dutta s/o Late Chunilal Dutta Mother : Brajomoni	November 10, 1908	Presidency Jail (Alipore Jail)	Born on 30th August 1888 at French Chandanagar now Dist. Hooghly, accused in famous Alipore Bomb case. Shot dead approver Narendranath Goswami in the Alipore Jail.
2. Satyendra Nath Bose s/o Late Aboya Charan Bose Mother : Tara Sundari	November 21, 1908	- do -	Accused in Alipore Bomb case, shot dead approver Narendranath Goswami in the Alipore Jail.
3. Charu Chandra Bose	March 19, 1909	- do -	Village : Sovana, Dist. Khulna. Shot dead Ashutosh Biswas Public Prosecutor of Alipore Bomb Case, in Alipore Court Premises on 10. 2. 1909. High Court confirmed the death sentence onMarch 2, 1909.
4. Birendra Nath Dutta Gupta	February 21, 1910	- do -	Born in 1891. Vikrampur, Dacca, Shot dead Samsul Alam, D. S. P.—engaged in Alipore Bomb case, on January 24th, 1910 in the Calcutta High Court Building.

॥ পঁচাত্তর ॥

বিপ্লবের গণ্ডী থেকে শ্রী অরবিন্দতো কবেই সরে এসেছেন! তবুও রেহাই নেই তাঁর।

ইংরেজ সরকার থাবা তুলেই আছে তাঁর ওপর। কিছুতেই ভুলতে পারছে না অরবিন্দ ঘোষকে—সে যদি না থাকে এর মধ্যে, কে শামসুলকে মারল? ওই তো নাটের গুরু নিত্যানন্দ! বাইরে তপস্বী বেড়ালের লোমের বোরখা প'রে, ভেতরে-ভেতরে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে! এইবার ওকে পাকড়ে বেশ ভাল মত সাজা দিতে হবে। ওসব ধর্ম্মকর্ম্ম সবই ওর বুজরুকী।

পুলিস শ্রী অরবিন্দের পেছনে লাগল—একটা ছুত নাতা ক'রে তাকে গাঁথতেই হবে।

দেবতার নির্দেশ আবার শোনা গেল অলক্ষ্য কল্পলোকে—'অরবিন্দ! আর ক'লকাতায় নয়! এখুনি এখান থেকে গা ঢাকা দাও। সোজা চন্দননগরে মতিলাল রায়ের ওখানে চলে গিয়ে আত্মগোপন করে থাক। সঙ্গে আমি আছি, কেউ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না! আবার যখন সেখান থেকে অন্যত্র যেতে হবে আমিই ব'লে দেব। আমার পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই তোমার কালাতিপাত করতে হবে। নিজের ইচ্ছায় কিছু করবে না। মতিলাল শ্রদ্ধার সঙ্গেই তোমার সেখানকার ভার বহন করবে! কোন চিন্তা নেই তোমার'?

অরবিন্দ তবুও মন স্থির করতে পারছেন না কি করবেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১০) জাগ্রৎ লোকে শ্রীঅরবিন্দ স্বকর্ণে আকাশবাণী শুনলেন 'Go to Chndannagore!'

অরবিন্দ এই আদেশ শোনার পর আর বিলম্ব না করে কাউকে কিছু না জানিয়ে নির্দেশিত পথে পাড়ি জোগালেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বাগবাজারের ঘাটে তাঁকে নৌকোয় তুলে দিলেন। চন্দননগরে সোজা এসে মতিলালের বাসভবনে আশ্রয় নিয়েছেন। মতিলাল ছাড়া নরলোকে এ খবর আর কেউ জানল না।

…প্রতিদিনের মত সেদিনও অতি প্রত্যুষে শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানে বসে-ছেন. আবার এল নতুন আদেশ, বাণী শুনলেন—দেবতার নির্দেশ—"Go to Pandicharry,' এখানে আর নয়, এক মাসেরও বেশী এখানে তোমার কাটল। আর তোমার এখানে প্রয়োজন নেই, বাঙলা দেশের কাজ তোমার শেষ হয়েছে।

"তুমি যাবে পণ্ডিচেরী। সেইখানেই হবে তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ক্ষেত্র। তোমাকে দিয়ে আমি ধর্ম্মক্ষেত্র গ'ড়ে তুলব সেখানে। জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে তুমি। ধর্ম্মক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে আমার বাণী প্রচার করবে। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও। আর বিলম্ব নয়। একমাস ছ'দিন কাটল এখানে। আজই ক'লকাতায় ফিরে যাও। জাহাজে আসন তোমার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, 'ডুপ্লে' জাহাজে তুমি রওনা হয়ে যাবে। সেখানকার তোমার ব্যয় ভার মতিলালই কিছুদিন বহন করবে। তোমার চিন্তা নেই।"

১৯১০ এর ৩১শে মার্চ ঋষি অরবিন্দ পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে 'ডুপ্লে' জাহাজে রওনা হয়ে গেলেন। ৪ঠা এপ্রিল জাহাজ গিয়ে পণ্ডিচেরী বন্দরে ভিড়ল।

সুরু হল মতিলাল রায়ের নতুন তৎপরতা—শ্রী অরবিন্দের প্রয়োজন মত মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে চলেছে পণ্ডিচেরী আশ্রমের জন্যে।

॥ ছিয়াত্তর ॥

অরবিন্দের দলকে বিদায় দিয়ে ভারতের বিপ্লববাদীরা এবার নতুন সাজে নব অনুপ্রেরণায় মেতে উঠলেন। একের পর একটা খুন ক'রে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে লাগল তরুণের দল। এরপর এরা স্থির ক'রে ফেলল চুন-পুঁটি মেরে কোন লাভ হচ্ছে না, রুই কাতলায় হাত দিতে হবে। এতে দূর পাল্লার জন্যে প্রয়োজন হবে উচ্চ শক্তিশালী বোমা। শ্রীশচন্দ্রের প্রেরণায় আর মতিলালের ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ছাত্র মণীন্দ্র নাথ নায়েক চ'লে এলেন ক'লকাতায় চন্দননগর থেকে, সুরেশ দত্তের পার্শীবাগানের বাড়িতে, মারাত্মক উচ্চ শক্তির বোমা তৈরীটা ভাল ক'রে শিখে নিতে! তাও হ'ল। চন্দননগর বোমা নির্ম্মান কেন্দ্রে, অরুন চন্দ্র ঘোষের পুরনো বাড়িতে এই ভীষণ শক্তিশালী 'রাবণ বোমা' তৈরী হ'ল। এটি দিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূস্বরূপ লর্ড হার্ডিঞ্জকেই শেষ করা হবে, দিল্লীর চাঁদনীচকে বিশেষ দিনে উপযুক্ত সময়ে। পূর্ব্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী সব স্থির হয়ে গেল।

বোমা তৈরার প্রধান ঘাঁটি অরুণ ঘোষের বাড়ীতে থাকলেও, চন্দননগরের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় মালমশলা সংগ্রহ ও সেই সঙ্গে বোমাও প্রস্তুত হতে থাকল। মতিলাল রায়ের বাড়ী, মণীন্দ্র নায়েকের বাড়ি, রাসবিহারী বসুর পৈতৃক বাস ভবন আর সাগরী কালী ঘোষের বাড়িতে এসে সবই জড় হতে লাগল।

তৈরী বোমা আর রিভলবার-পিস্তলগুলো কোথায় লুকান যায়? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাখার জায়গার ব্যবস্থা হয়ে গেল—ঘোড়া পুকুরের ধারে ক্ষেত্র মোহন বসুর বাড়িতে আর ফটক গোড়ার নরেশ চন্দ্র সেনের অন্দর মহলে।

যে সব বিপ্লবীরা পুলিসের গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা

রিভলবার বোমা সমেত এসে আশ্রয় নিতে লাগল চন্দননগরের রূপ-লাল নন্দীর গালা কুঠিতে। বিপ্লবীদের জোগান দিতে বেশ কিছু বোমা, রিভলবার আর অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রও এখানে রাখা হোত। রূপ লাল বাবুর জামাই যোগেন শেঠ নিজের ভাগ্নে রাধা বিনোদ শেঠকে নিয়ে বিপ্লবীদের কাজে সাহায্য করে চললেন। চন্দননগর হাস-পাতালের ডাক্তার মঃসিয়ে গোভিন্দোঁ শতপ্রবিত্ত হয়ে বিপ্লবীদের চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রুষা করতে লাগলেন।

বোমা তৈরী হয়ে চলেছে, কি রকম কার্যাকরী হ'ল একবার পরীক্ষা হওয়া দরকার!

একটি ছোট বোমা এনে মতিলাল রায়ের বাড়ির ছাদ থেকে বাইরে উঠানে ফে'ল্বা হ'ল, ১৯১১ সালে কালীপূজ'র দিন রাত্রিতে। মণীন্দ্র নায়েক আনন্দে উচ্ছ্সিত হয়ে বোমাটি পরীক্ষা করতে গিয়ে-ছিলেন কিন্তু ফাটল না, মতিলাল রায় ওটিকে ওই অবস্থায় মাটি থেকে তুলে নিয়ে, যেই উঠানে আছাড় দিয়েছেন, ওমনি প্রবল শব্দে বিস্ফোরণ হয়ে পাশের ঠাকুর দালানের থামের কিছু অংশ ধ্বসিয়ে দিল!

কৃতকার্য্য হয়ে মণীন্দ্র নায়েক অধিক শক্তি সম্পন্ন বড় বড় বোমা তৈরীতে হাত দিলেন! সেই বোমার একটি নিয়ে ১৯১২ র ৮ই নভেম্বর রাসবিহারী বসু, শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ আর জ্যোতিষ সিংহকে সঙ্গে ক'রে মণীন্দ্র নায়েক চলে গেলেন গভীর রাত্রিতে রাসবিহারীর বাড়ির কাছাকাছি একটি বাঁশ বাগানে। বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দ প্রায় দু'মাইল দূর থেকেও লোকের কানে গিয়ে পৌঁছে গেল। কালীপূজ'র দিন বলে কেউ আর কিছু সন্দেহ করেনি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাসবিহারী ঐ বোমার একটি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন, ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর প্রয়োগের জন্যে। দিল্লী পাঠানর আগে বোমাটিকে পরীক্ষার জন্যে পাঠান হ'ল ক'লকা-তায় সুরেশ চন্দ্র দত্তের কাছে।

রাসবিহারী বসু ১৯১১ সালে দিল্লীর চাঁদনীচকে যে মারাত্মক বোমাটি, ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে মারবার জন্যে ব্যবহার করেছিলেন, সেটি ছিল মণীন্দ্রের হাতের তৈরী—এক পাউণ্ড বার আউন্স ওজনের।

এই বোমা দিল্লীতে পাচার করার সময়ে রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে বলেছিলেন,—"ছোটখাটর দিকে আমার নজর নেই, যত অসুবিধেই থাকনা কেন আমার ঐ "টারগেট"।

রাসবিহারীর হাতে ওজিনিস দেওয়ার আগে নলিনচন্দ্র দত্ত দুটি বোমা নিয়ে ছুটলেন, সুরেশচন্দ্রের কাছে। পরীক্ষা করিয়ে নিলেন ভালভাবে। ভুল হলে তো চলবে না! যেসে কাজের জন্যে তো ব্যবহাব করা হবে না! নিশ্চিত না হলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

রাসবিহারী কথা দিয়ে গেছে। অধীর আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করছে।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২র বেলা ১১টায়, ক'লকাতার পর ইংরেজ রাজধানীর প্রথম পত্তনের জন্যে লাল কেল্লায় দরবার বসার আগে লর্ড হার্ডিঞ্জ, যুগলে হাতীর পীঠে চড়ে মহানগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। চাঁদনীচকে এসে পৌঁছেছেন। বোমা গিয়ে পড়ল হাতীর ওপর। তীব্র হুঙ্কার ছেড়ে ফাটল। মাহুত সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। সামান্য ক্যালকুলেসনের ভুলে, কয়েকটা স্পিলনটার গিয়ে গায়ে বিঁধলেও হার্ডিঞ্জ বেঁচে গেলেন, লেডি হার্ডিঞ্জের কিছু হ'ল না।

॥ সাতাত্তর ॥

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সোচ্চার করে তুলতে ১৯০৫ এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর গোপাল বাবুর বাগানে এক মহতী সভায় দেশবাসীকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদেশী পণ্য বর্জনে অনুপ্রাণীত করায় ১৫ বৎসর বয়সের মণীন্দ্র, বন্ধু যুগলকিশোর দত্তের সঙ্গে 'সুহৃদ ভাণ্ডার' নামে এক স্বদেশী বিপণি স্থাপন করেন এবং বয়কট আন্দোলনে মেতে ওঠেন। ক্রমে বিপ্লবী মন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে সশস্ত্র আন্দোলনে আত্ম নিয়োগ করে। মাণিকতলা বোমার মামলার বহুদিন পূর্বেই মণীন্দ্র, নারকোলের খোলের ভেতর গান পাউডার দিয়ে বোমা তৈরী সুরু করে দেন। সতীর্থের বোমা তৈরীতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখে, এঁর দ্বারা কার্যকারী বোমা তৈরীর সঙ্কল্প নিলেন মতিলাল আর শ্রীশচন্দ্র।

হেমচন্দ্র এবং উল্লাসকর গ্রেপ্তার হতেই এঁরা মণীন্দ্রের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, রিপন কলেজের (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দত্তের সঙ্গে।

সুরেশবাবু ও মাঝে মধ্যে চন্দননগরে আসতেন বোমা তৈরীর Practical Training দিতে। ক্রমে মণীন্দ্র খুব দক্ষ হয়ে উঠলেন।

বোমার মশলা সংগ্রহে চন্দননগরের আশু নিয়োগী, সত্য কর্মকার আর সাগরকালী ঘোষ এঁকে পূর্ণ সহায়তা ক'রে যান।

কতগুলো ভাঙ্গা বাড়িতে তাঁরা এক জোটে অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, বোমার মশলা খুব গোপনে লুকিয়ে রাখতেন।

মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর চারদিকে যেমন ধর পাকড় সুরু হয়েছে অমনি ক'লকাতা বিপ্লব কার্যের কেন্দ্র চন্দননগরে স্থানান্তরিত হ'ল।

"রডা কোম্পানী" থেকে লুণ্ঠিত মাউসার পিস্তল ও গুলীর এক· বৃহৎ অংশ চন্দননগরে আনা হয়েছিল এবং তার রক্ষণা বেক্ষণের ভার পড়ে মণীন্দ্রের ওপর।

এই সময়ে তাঁকে বহু বিপ্লবীর সঙ্গে সর্ব্বদা যোগাযোগ রেখে চলতে হোত। এঁদের কয়েকজন হলেন-অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, যাদুগোপাল মুখার্জী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

১৯১১ সালে শ্রীশচন্দ্র আর মতিলাল, রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মণীন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। এর পরেই মণীন্দ্রের সঙ্গে রাসবিহারীর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও বিশেষ ক'রে বোমা তৈরীর বিষয়ে গভীর আলোচনা সুরু হয়ে যায়।

রাসবিহারী নিজহাতে বোমা তৈরীতে যদিও এগিয়ে এলেন না তথাপি মণীন্দ্রকে পূর্ণ সহযোগীতা করে চললেন।

রাসবিহারীর ফটোকগোড়ার (চন্দননগর) পৈত্রিক বাসভবনের একাংশে বোমা তৈরীর শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হোল। বোড়াই-চণ্ডীতলায় অরুণ চন্দ্র সোমের ভগ্নগৃহে ছিল বোমা তৈরীর প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া চন্দননগরের বেশ কিছু জায়গায় বোমা এবং বোমার উপকরণ তৈরী হোত।

সমস্ত কেন্দ্রই পরিচালনা করতেন মণীন্দ্র নায়েক নিজেই।

১৯১১ সালে কালীপূজর রাত্রে একটা ছোট বোমা, মতিলাল রায়ের বাস ভবনের উঠনে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ঐ ছোট্ট বোমার আঘাতেই ঠাকুর দালানের সামনের কিছু অংশ উড়ে যায়।

এরই জুড়া একটি বোমা নিয়ে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আসাম রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, মৌলভী বাজারে পুলিসের বড় কর্ত্তা গর্ডন সাহেবকে মারবার জন্যে। অসাবধানতা বশতঃ নিক্ষেপের পূর্বেই ওটির বিস্ফোরণ ঘটে এবং যোগেন্দ্রনাথ মারা যান।

মণীন্দ্রের তৈরী অনুরূপ প্রচুর বোমা বিপ্লব কার্যে ভারতের বিভিন্ন

স্থানে প্রেরিত হয়।

রাসবিহারী মনীন্দ্রের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে ১৯১২র ৮ই ডিসেম্বর এক কালীপুজোর রাত্রিতে তাঁর বাড়ির কাছে, এক বাঁশ বাগানে ছুটলেন বোমার কার্যকারীতা পরীক্ষার জন্যে। বিস্ফোরণের পর সে আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। মণীন্দ্রের সাফল্যে অভিভূত হয়ে তিনি এই জাতের অনেকগুলো বোমা দিল্লী, লাহোর, মীরাট প্রভৃতি বিপ্লব কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন এবং মণীন্দ্রকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন.

এবার রাসবিহারী দৃঢ় সঙ্কল্প হলেন, মণীন্দ্রের তৈরী এই বোমার ঘায়েই দিল্লীতে, ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল অব ইণ্ডিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে খতম করবেন। ক'লকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করাব উপযুক্ত শিক্ষা এদের দিতে হবে!

মণীন্দ্রকে অনুরোধ করলেন, অধিক শক্তি সম্পন্ন বোমা তৈরী করতে, যাতে ব্যর্থ হ'তে না হয়।

ঐ বোমা চলে গেল দিল্লীতে।

১৯০৮ এর সেপ্টেম্বরে শ্রীঅরবিন্দের চুঁচুড়া যাওয়াব পথে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, চন্দননগর ষ্টেশনে মণীন্দ্রের সঙ্গে অরবিন্দের বিশেষ যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

পণ্ডিচেরী থেকে অরবিন্দ ঘোষ অ্যাডভোকেট মিঃ যোশেফ ডেভিডের মাধ্যমে মতিলাল রায়কে যে সব ফরাসী ভাষায় পত্র দিতেন মণীন্দ্র তা মতিলালকে পড়ে শোনাতেন ও ব্যাখ্যা করে দিতেন।

১৯১০ সাল শেষ করে আর ও ৯ বছর মনীন্দ্র বিপ্লব কার্যে লিপ্ত ছিলেন এরপর মতিলালের নির্দ্দেশে তিনি এসব ত্যাগ করে সরে আসেন।

নভেম্বর—১৯২০শে, French Assembly Session এ যোগ দিতে মণীন্দ্র পণ্ডিচেরী যান। সেই সময় শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ সান্নিধ্যে আসেন। শ্রীমা (Madame Richard) র সঙ্গে তাঁর

পরিচয় ঘটে।

যে লোকটি বোমা তৈরীতে এমন সিদ্ধহস্ত, ঐ বুদ্ধিটুকু ছাড়াও তাঁর 'ঘটে' আর কিছু ছিল কিনা একটু জানতে ইচ্ছে করা স্বাভাবিক। তাঁর পিতৃ পরিচয় বা কি?

—চন্দননগরেরই ছেলে মণীন্দ্র; জন্মে ছিলেন মাতুলালয়ে ওখানকার বোড় থানার অধিনে এক পল্লীতে। মার নাম নগেন্দ্রবালা দাসী-বাবা ঈশ্বরচন্দ্র নায়েক। বোড়াইচণ্ডী তলার কাছেই মনীন্দ্রের পিতৃ নিবাস। ছেলেকে ১২ বছরের ক'রে আর একটি মেয়ে রেখে-মা পরপারের টিকিট কাটলেন। বোমা তৈরী করলে হবে কি? পড়া শোনায় ফাঁকি দিতেন না ইনি। বোড়াই চণ্ডীতলার ক্ষেত্রমোহন সরকারের পাঠশালায় হাতে খড়ি। আট বছর বয়স হতেই এলেন Dupleix college (এখন কানাইলাল বিদ্যামন্দির) এ পড়তে। ১৯০৮ এ প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এর এক বছর আগেই মণীন্দ্র তখন ১৭ তে পড়েছেন-বাবা মারা গিয়ে সংসারের সব ভার তাঁর কাঁধে চাপিয়ে গেলেন। সংসারে আছেন, সৎমা ছোট একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বাবার সামান্য ব্যবসায়ের ওপর নির্ভর। এই প্রতিকূল অবস্থাতেও ফরাসী ভাষাকে অতিরিক্ত ভাষা হিসেবে নিয়ে আই. এস. সি পাশ করলেন।

১৯১১ তে ক'লকাতার শোভা বাজারে প্রিয় গোপাল শেঠের কন্যা শান্তাশীলার পাণিগ্রহণ করেন। পরে শ্বশুর মশায়ের আস্তানায় এসে স্কটিস চার্চ কলেজ থেকে ১৯১৩তে ডিসটিংসনে বি. এস. সি পাশ করলেন। চেষ্টা থাকলেও লেখা পড়া আর এগলো না, স্বদেশীতে যুক্ত থাকায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এস. সিতে ভর্তি হতে পারলেন না। অবশেষে ল কলেজে ভর্তি হলেন কিন্তু ঐ কারনেই বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁকে হার্ডিঞ্জ হোসটেলে থেকে ল পড়তে বলায় তিনি রেগেমেগে ল পড়া ছেড়ে দিলেন।

মণীন্দ্র চন্দননগরের প্রথম সায়েন্স গ্রাজুয়েণ্ট।

১৯১৫ সালে ২রা মার্চ লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা পরিদর্শনে এলে আগের দিন পুলিস ছুটল তাঁকে শোভাবাজারের বাড়িতে গ্রেপ্তার করতে। আগে থেকে খবর পেয়েই তিনি কেটে পড়েছেন চন্দননগরে। পাঁচ বছর আর কলকাতা মুখ হলেন না।

১৯১৯ এর ডিসেম্বরে মণীন্দ্র French India Legislative Assemblyর সদস্য হিসেবে (Conseil General of Pondichery) নির্ব্বাচিত হয়ে ভারত সরকারের ছাড়পত্র নিয়ে পণ্ডিচেরী যান। ফিরে এসে মতিলালের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে পড়েন। মারা গেছেন ৯ই এপ্রিল ১৯৭৬।*

*তাঁর হাতের লেখা "A few words about myself and about India's fight for freedom" বইখানির একটি পাণ্ডুলিপি মণীনদা আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে বসে বোমা তৈরীর বহু বিচিত্র ঘটনা তাঁর মুখ থেকে শোনার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্থানাভাবে বিস্তারিত দেওয়া সম্ভব হল না। বড় অমায়িক ব্যবহার ছিল মণীনদার।

। আঠাত্তর ।

ভারত মাতার দুরন্ত ছেলেরা সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে গিয়েছে লেখা-পড়া শিখতে। মন তাদের পড়ে আছে, মাকে কি করে শৃঙ্খল মুক্ত করা যায়। অনেক দিন থেকেই এরা জায়গায় জায়গায় দল গ'ড়ে কাজে নেমে পড়েছে। ১৯০৯ সালে সানফ্রানসিস্‌কোতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, এর পরেই সেখানে হাল ধরলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী হরদয়াল।

ভারতে ফিরে পিংলে, নেমে পড়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। এঁর আত্মত্যাগের কাহিনী পড়লে মনের মধ্যে শিহরণ জেগে ওঠে। স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় পিংলের অবদান ও ছিল প্রচুর। পিংলে ছিলেন কানাইলালের বাল্য সখা। কোন এক শুভ-অশুভের সন্ধিক্ষণে চপল মতি বালকদ্বয় উভয় উভয়কে বাক-দান করেছিলেন, বিপ্লবী-জীবনই তাঁরা বেছে নেবেন।

॥ উনআশি ॥

জার্মানীতে ভারতীয় যুবকেরা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে "বারলীন কমিটি" গ'ড়ে তুলেছেন। দলে আছেন চম্পাকরণম পিল্লী এবং আর কয়েকজন বিপ্লবী।

১৯১৪ সালে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাধল।

জার্মানী আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—ভারতীয় বিপ্লবী দলকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করবে, সেখানে বসে অবিনাশ রায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন—জাহাজ ভরতী করে মাল পাঠাতে হবে। ভারতের কোথায় গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নামবে, কারা তা সমুদ্রকূল থেকে সংগ্রহ করবে চিঠি পত্রের আদান প্রদানে সেই সব ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই তো সুযোগ।

ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় সেনাদলের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ক্ষেপে উঠেছে সেনাদল। আর একটু তাতাতে পারলেই বিস্ফোরণ ঘটে।

রাসবিহারী বসু আর বিষ্ণুগণেশ পিংলে সৈন্যদলে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে লাগলেন। অন্য দিকে বিপ্লবীদলের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে চলেছেন।

বিপ্লবী দলেও প্রস্তুতি বেড়ে চলেছে।

পিংলে রাসবিহারীকে বললেন—"আর চিন্তা নেই। লাহোরের সৈন্যদলকে কব্জা করে ফেলেছি"।

রাসবিহারী বললেন,—"না! না! এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। ১৯১৫র ফেব্রুয়ারীর ২১শে তারিখটার দিকে তাকিয়ে থাক.

মাঝের কটা দিন খুব সাবধানে কাটাতে হবে। নির্দ্দিষ্ট দিনটাতে যদি ভাল ভাবে ইংরেজদের জব্দ করতে পারা যায়, তবেই বোঝা যাবে আমাদের সংগ্রাম কোন দিকে মোড় নেবে। খুব সাবধানে মাঝের কটাদিন, কাউকে না, এমন কি নিজের ডান হাতকেও বিশ্বাস করবে না! সৈন্যদল যতই বিশ্বাসী হোক তবুও খেয়াল রাখবে সেখানে নানা ধরনের লোক আছে"।

হোলোও কি ঠিক তাই! সব পণ্ড হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে জমাদার কৃপাল সিং অতি গোপনে ইংরেজ কর্তাদের, ওপরমহলে ভারতীয় সৈন্যদের অভ্যুত্থানেব প্রস্তুতির খবর জানিয়ে দিল।

এ পক্ষের তৈরী গুপ্তচর ঝটিত এসে, কৃপাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার কথা রাসবিহারীর কানে তুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটল কৃপাল সিংকে গুলীকরে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে, কিন্তু সে ততক্ষন পগার পার; বিপ্লবীদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

এদিকে তো আরও সর্বনাশ হয়ে গেল! সময় মত পিংলে সৈন্যদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যেতে পাবলেন না: প্রস্তুতি পর্বের শেষ মুহূর্তে ২০শে ফেব্রুয়ারী মিলটারী ব্যারাকের মধ্যেই বোমা সমেত ধরা পড়ে গেলেন।

বিনায়ক রাওএর সাহায্যে রাসবিহারী কোনক্রমে বেরিয়ে গিয়ে ছদ্মবেশে কাশী পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

ভারতীয় সৈন্যদলে অভ্যুত্থান ঘটানর চেষ্টায় নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে বিষ্ণুগণেশ পিংলেকে, মীরাটে ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর।

দ্বিতীয়বার ভারতীয় সৈন্যদলে বিদ্রোহের অগ্নিসংযোগ করাতে মহারাষ্ট্রের বীরবিপ্লবী বিষ্ণুগণেশ পিংলের তৎপরতাও বড় কম ছিল না। সে অন্য এক কাহিনী। এই প্রবন্ধে সেটিকে আর বড় করে তুলেধরা গেল না।

॥ আশি ॥

বিপ্লবী রাসবিহারী—

কানাইলালের সঙ্গে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রথম জীবনে জড়িয়ে ছিলেন অনেকখানি! কানাইয়ের অন্তরঙ্গ সতীর্থ, সহকর্মী, সমবয়সী শ্রীশচন্দ্র ঘোষের নিকট আত্মীয় রাসবিহারী, বয়সে এদের থেকে একবছরের বড়। জন্মেছিলেন ২৫শে মে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। কানাই এবং শ্রীশ যখন চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের এনট্রান্স ক্লাসের ছাত্র, রাসবিহারী তখন ওই কলেজে এফ্. এ ক্লাসে পড়েন। বয়সে বড় হলেও কানাই এবং শ্রীশ এঁকে রাসু বলেই ডাকত। ইনিও ডাক্তেন কানাই, শ্রীশকে—শিরে বলে।

শিশুকাল থেকেই রাসু এবং শিরে চন্দননগরেই এক সঙ্গে বড় হয়েছে। রাসুর বাবা বিনোদবিহারী ছিলেন শিরের কাকা—বামাপদ ঘোষের ভাইরা ভাই। রাসুর গর্ভধারিণীর নাম ছিল ভুবনেশ্বরী; চন্দননগরের কাছেই পারালা-বিঘাটি গ্রামে ভুবনেশ্বরীর ভিটে। নবীন চন্দ্র সিং মশায়ের কন্যা। শিরের কাকীমা ব্রজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরীর কনিষ্ঠ সহোদরা। বিনোদবিহারী বর্দ্ধমানের সুবলদহ গ্রাম থেকে চন্দননগরে চলে এসে বামাপদর সঙ্গে একই জমিতে পাশাপাশি পাকা বাড়ি তৈরী করে বসবাস সুরু করেন। ষ্টেশনের কাছেই বাড়ি।

কেউ বলে রাসবিহারীর জন্ম হয়েছিল সুবলদহে আবার কেউ বলে পারলা-বিঘাটিতে।

চার বছরের রাসু এবং তার ছোট বোন, সুশীলাকে রেখে মা মারা গেলেন মাত্র আঠার বছর বয়সে।

বিমাতার কাছে রাসু এবং সুশীলা মানুষ হচ্ছে।

বাবা সিমলা কমিশারিয়েটের প্রেসে চাকরী করেন, ছ'মাস-

ন'মাসে বাড়ি আসেন।

মাঝে মধ্যে রাসু আর তার বোন, তাদের এক দিদিমার কাছে গিয়ে থাকে। দিদিমা পারলা বিঘাটিতেই থাকেন।

রাসুর তখন একটি বৈমাত্রেয় ভাই জন্মেছে। বিনোদবিহারী ছুটিতে এসে রাসুর এক মাসীমা (সৎমার বোন) বামাসুন্দরীর জিম্বায় ছেলে মেয়েকে রেখে গেলেন। বামাসুন্দরীর স্বামী তখন চন্দননগরেই থাকতেন।

এবার আমরা বাসুর পাঠ্যাবস্থায় আসি। রাসু এবং শ্রীশ একই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। রাসু পড়ে এক ক্লাস ওপরে। পড়াশোনায় মতিগতি নেই রাসুর। ডানপিটেমি ক'রে ঘুরতে পারলেই ভাল হয়। মাসী-মেসোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকায় ছেলেটির মাথাটা একেবারেই খাওয়া গেছে; বড় হওয়ার পর তাই আর ছেলেটিকে এঁটে উঠতে পারেন না। দুষ্টুমির সঙ্গে শরীর চর্চ্চার দিকে নজর গিয়েছে তার। শিরেকে সাকরেদ বানিয়েছে। যত দুষ্টুমিই করুক, রাসু স্কুলের হার্ডল দিব্বি টপকে যাচ্ছে। শ্রীশও কোন দিন আটকে পড়েনি। বামাপদ ঘোষ রাসুর লোক্যাল গার্জেন।

১৯০১ সাল থেকে রাসু আর শ্রীশ ডুপ্লে কলেজে পড়ে।

স্কুল-কলেজ এক সঙ্গেই হয় বলে শিক্ষায়তনের নাম ডুপ্লে কলেজ।

১৯০৪ সালে কানাই ডুপ্লে কলেজে ভর্তি হয়েছে। এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে।

রাসবিহারী এফ্. এ ক্লাসে পড়ছে ওই কলেজে।

শ্রীশ এদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিল।

ওই কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক কামালউদ্দীন চৌধুরী সাহেব একদিন এফ্. এ ক্লাসে পড়ানর সময়ে ছাত্রদের বোঝাতে চাইলেন, বক্‌তিয়ার খিলিজি মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে, ভেড়ুয়া অপদার্থ বাঙালীদের পরাভূত ক'রে বাঙলাদেশ জয় করেছিলেন।

রাসু প্রতিবাদ করাতে, তিনি তাকে "রাসভ" ব'লে সম্বোধন

করেন। সাধারণতঃ এই নামে তিনি রাসবিহারীকে ডাকলেও সে সময়ে রাসুর মেজাজ সপ্তমে উঠেছে। সে তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

অধ্যাপক বেত চালালেন।

রাসবিহারী বেতখানা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, এক দোয়াত কালি তাঁর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পিট্টান দিল।

অধ্যক্ষ চারুবাবু বিচারে ব'সে রাসবিহারীর সওয়ালে তার নির্ভীকতার পরিচয় পেয়ে খুবই খুশী হয়ে রাসুকে বাহবা দিলেন। কিন্তু কলেজের ডিসিপ্লিন রক্ষার্থে ভগ্নমনোরথ হয়ে রাসবিহারী বসুকে মিডসেসনে কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট কেটে দিলেন। মন যদিও সাই দিলনা তবুও অধ্যক্ষের পদমর্যাদা রক্ষার জন্যে রাসবিহারীর প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণ করতে হ'ল তাঁকে।

ছেলেটির জীবন এভাবে ধ্বংস করলে তো চলে না! ব্যবস্থা তাঁকে একটা কিছু করতেই হবে।

রাসবিহারীর কল্যানার্থে ক'লকাতা মর্টন স্কুলের হেডমাষ্টার মশায়ের নামে, রাসুর প্রশংসা করে একটি বিশেষ পত্র তারই হাতে পাঠালেন, যাতে রাসবিহারী কোন ভাল কলেজে ভর্ত্তি হয়ে ঠিক মত পরীক্ষা দিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে।

চারুবাবুর সহপাঠী তা ক'রে ছিলেন।

রাসবিহারী আর একখানি চিঠি এনেছিল চারুবাবুর কাছ থেকে, বিপ্লব সমিতির কর্ণধার যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে তার পরিচয় পত্র, যেটিতে চারুবাবু স্পষ্ট করে যতীনবাবুকে লিখেছিলেন, রাসবিহারীর নামটি বিপ্লব সমিতিতে লিখে নেওয়ার জন্যে।

ক'লকাতায় থেকে তাকে এখন লেখাপড়া করতে হবে। মাথা গুঁজবার একটা জায়গা তো চাই! গিয়ে উঠল সে, সুবলদহ গ্রামের বাসিন্দাদের মেসে, ঠন্ঠনে কালী বাড়ির কাছে।

কলেজে ভর্ত্তি হতে তার বেগ পেতে হ'ল না। ভর্ত্তি হয়ে গেল কলেজে খোঁটার জোরে।

এক শনিবার দেখে চারুবাবুর চিঠিখানা পকেটে নিয়ে সোজা চলল সে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডেরায়।

দেখা হ'ল। চারুবাবুর ওই চিঠির জবাব রাসবিহারীর হাতেই, লিখে দিলেন তিনি।

রাসুর দুই কাকা থাকেন ক'লকাতার এই আস্তানায়। রাসু কাকাদের দেখিয়ে পড়াশোনা করতে বসে বইপত্তর নিয়ে, কিন্তু মন প'ড়ে থাকে অন্য দিকে।

অনেক দিন থেকেই ভাবছে মিলিটারীতে ভর্ত্তি হতে পারলে মন্দ হয় না! কি ভাবে নাম লেখান যায়? কাউকে কিছু না বলেই চলল ফোর্ট উইলিয়ামে, যেই সে দরজার ভেতর পা বাড়াবে, সেনা-বাহিনীর লোকেরা তাকে পাকড়াও করে, বেদম প্রহার দিল। মার-ধোর খেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পথ পায় না।

যতীন বন্দোপাধ্যায়, অরবিন্দের বিচারে বিপ্লব সমিতি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাই সেখানে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ আর হ'ল না রাসবিহারীর এযাত্রায়।

এখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নতুন বিপ্লবী দলের সন্ধানে রাসবিহারী স'রে পড়ল উত্তরপ্রদেশে। সে শুনেছে সেখানে বিপ্লবী দল দানা বাঁধছে; নিজেকে বিলিয়ে দেবে তাদের মধ্যে।

১৯০৬ সালে দেরাদুনে এসে জিতেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

জিতেন হঠাৎ এসেছেন সেখানে, তাঁর ভগ্নীপতি পূর্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর বাড়িতে তাঁর নিজের ভাগ্নের বিয়েতে।

জিতেনের সঙ্গে এখানে তার বেশ হৃদ্যতা জমে উঠল।

যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুরে বেশ নামকরা উকিল জিতেনের বাবা। জিতেন নিয়ে গেলেন তাকে সেখানে।

রাসবিহারী আর জিতেন এখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে পড়লেন দেশের কাজে।

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এখন 'নিরালম্ব স্বামী'। এদের ভাগ্যের জোরে নিরালম্ব স্বামী এই সময়ে এসে পড়েছেন সাহারানপুরে। ভালই হ'ল। এবার তাঁরা মেতে উঠলেন উত্তরভারতে বিপ্লবী দল গঠনে। দিন দিন বিপ্লবীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এগিয়ে চলল দুর্বার গতিতে সঙ্ঘের কাজ।

এই কাজের মধ্যে থেকেও, রাসবিহারী এরই মধ্যে দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ অফিসে একটা চাকরীও জুটিয়ে নিয়েছে।

বাঘা যতীনও এই দলে ভিড়ে গেলেন। বসন্ত বিশ্বাস ও এসে জুটেছে। বলিষ্ঠ মনের যুবকদের মধ্যে হিড়িক পড়ে গেছে বিপ্লব সমিতিতে নাম লেখানর।

দলের শাখা-প্রশাখা বিস্তার হয়ে পড়ল ক্রমে ক্রমে। কাজ চলছে পুর দমে।

রাসবিহারী, পিংলে এবং গদর পার্টির সদস্যেরা গোপনে সসস্ত্র বিপ্লবের সন্ধানে লেগে পড়ল।

বাঙলার বিপ্লবীদের ভয়ে ইংরেজ সরকার ভারতের রাজধানীকে ক'লকাতা থেকে গুটিয়ে নিয়ে দিল্লীতে এনে তাকে কায়েম করতে চলেছে। তখন ১৯১২ সাল।

ইংরেজ সরকারের কর্ণধার ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ভাবলেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল, এখানে বসে শান্তিতেই রাজ্য শাসন করা চলবে। শত্রু যে তাঁর আসেপাশে ঘুরছে সে খবর তো তিনি রাখেন না! দিল্লীবাসীদের জানালেন,—এই ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বিরাট শোভা যাত্রা সহকারে হাতীর পিঠে সিংহাসনে বসে তিন প্রজাদের দর্শন দেবেন রাজপথ পরিক্রমার সময়।

খবর পেয়েই রাসবিহারী চন্দননগর রওনা হয়ে গেল।

মতিলাল এবং শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায় মণীন্দ্র নায়েকের তৈরী বোমা সংগ্রহ করে ফিরে গেল দিল্লীতে।

সুরু হয়ে গেল বসন্ত বিশ্বাসকে তালিম দেওয়া।

—কোন্ পোষাকে তারা থাকবে,—কে বোমা ফেলবে হার্ডিঞ্জের ওপর,—কি ভাবে হাতীর পিঠে বোমা ফেলা হবে,—বোমা ফেলার পক্ষে কোন স্থানটি সুবিধে জনক ও নিরাপদ?

স্থির হ'ল চাঁদনীচকে সামনাসামনি দুটি বাড়ির ছাদে তারা থাকবে। দর্শনার্থীদের সঙ্গে উভয়ে মিশে যাবে। বসন্ত থাকবে পাঞ্জাবী মহিলার ছদ্মবেশে আর রাসবিহারী থাকবে পাঞ্জাবী পুরুষের বেশে। বসন্ত ফেলবে বোমা।

নানা প্রকার ছদ্মবেশে ঘোরা ফেরা করতে রাসবিহারী অভ্যস্ত, এর মধ্যেই তার পোষাকী নাম হয়েছে এক গাদা-চুচেন্দ্র নাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র, মানিকলাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য। মস্ত জৌলুস বেরিয়েছে ২৩শে ডিসেম্বর। নানা রকম বাজনা বাজছে। হাতীর পিঠের ওপর ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ডহার্ডিঞ্জ—সঙ্গে স্ত্রী। সবার নজর সেই দিকে। চাঁদনী চকের ভেতর দিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে। জায়গামত, পাঞ্জাবী মহিলার বেশে বোমাটি ওড়নার নীচে নিয়ে বসন্ত দাঁড়িয়ে আছে। অপর ছাদে রয়েছে পাঞ্জাবী পোষাকে মাথায় পাগড়ী বাঁধা গোঁফ দাড়ি ওয়ালা রাসবিহারী, কার ক্ষমতা তাকে পাঞ্জাবী না বলে; এমনই মেকয়াপ!

হাতী যেই নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে, দর্শনার্থীরা উৎফুল্ল হয়ে ঐ দিকে নজর রেখে হৈ চৈ করতে সুরু করেছে, রাসবিহারী ইশারা করল বসন্তকে। বোমা গিয়ে পড়ল হাতীর ওপর।

মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হ'ল। যে যেদিকে পাচ্ছে ছুটছে। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ। এই সুযোগে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল, রাসবিহারী আর বসন্ত।

দূর থেকে তারা শুনতে পেল, মাহুত মারা গেছে। বড় লাট

আহত। বোমার টুকর' তাঁর গায়ে গিয়ে বিধেছে। তিনি প্রাণে বেঁচে আছেন। লেডি হার্ডিঞ্জ ছিটকে মাটিতে পড়েছেন কিন্তু কিছু হয়নি তাঁর।

"সামান্যর জন্যে বেঁচে গেল। ভাগ্যের জোর বটে হার্ডিঞ্জের। হাতটা সামান্য সাফাই করতে পারলেই হয়ে যেত। মন খারাপ ক'রনা বসন্ত! তোমার চেয়ে আমার আফশোষ অনেক বেশী জেনো! সুযোগ মত আবার দেখা যাবে"—রাস বিহারী বললে।

রাতারাতি এসে হাজির হ'ল দেরাছুনে, নিজের কর্ম্মস্থলে।

পরের দিনই রাসবিহারী দেরাদুনে এক সভা ডেকে, বড়লাটকে ওভাবে হত্যাকরার চেষ্টাকে তীব্র নিন্দা করে এক বক্তৃতা দিল।

এর পর কেইবা সন্দেহ ক'রে এই রাজভক্ত লোকটিকে! এমনই অভিনয় তার! বড় বড় গোয়েন্দার মাথা পর্যান্ত সে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

—কে আততায়ী? কার এত বড় সাহস হ'ল? এই সুরক্ষিত পুলিস আর সেনাবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে শয়তান ভেগেছে! যে তাকে ধরে দিতে পারবে মোটা অঙ্কের পুরস্কার পাবে। গুরুত্ব বিবেচনায় এক লক্ষ টাকা খরচ করতেও সরকার কুণ্ঠিত হবে না। আততায়ীর মাথার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা ঘোষণা হয়ে গেল।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে একদিন জানাজানি হয়ে গেল চুচেন্দ্রের নাম।

প্রয়োজন হ'লে রাসবিহারীর পোষাক আষাক সম্পূর্ণ বদলে যায়। পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশে সে নিজেকে বেশ রপ্ত ক'রে নিয়েছে. অনর্গল গুরমুখী ভাষা বলে যায়। আফগানীদের পুস্তু ভাষা বলতেও সে খুব পটু; যখন যে বেশে সে থাকে ঠিক সেই দেশের ভাষা সে আওড়ে যায়। বিশেষ পরিচিত লোকের পক্ষেও তাকে চিনে ওটা দুষ্কর হয়। কিন্তু গোল পাকিয়ে ছিল তার বাঁ হাতের, মাঝের কাটা আঙ্গুলটায়। একবার বোমাতে এই আঙ্গুলটা উড়ে যায়।

ধাঁ-ধাঁ করে বাড়তে-বাড়তে রাসবিহারীর বিপ্লবী কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে, লাহোর থেকে বেনারস পর্য্যন্ত। দলে ন্যায়-নিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাব হচ্ছেনা। আরও এসেছেন, আসছেন—বালমুকুন্দরাম, আমীর চাঁদ, অবোধ বিহারী, বিভূতি হালদার, রাম শরণ, শচীন সান্যাল, নলিনী মুখার্জী, বিনায়ক কাপ্‌লে, দামোদর স্বরূপ, মন্মথ বিশ্বাস আর দীননাথ।

এই দলের এডভাইসার ছিলেন যতীন মুখার্জ্জী (বাঘা যতীন)।

সিঙাপুর থেকে সুরু করে কাবুল পর্য্যন্ত সৈন্যদলে অভ্যুত্থানের স্বপ্ন এঁরা দেখেছিলেন। নরেন ভট্টাচার্য্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় একদিন এসে ঢুকলেন এই দলে! এঁর বুদ্ধি সুদ্ধি দেখে বাঘা যতীন মুগ্ধ হ'য়ে বিশেষ ভাবে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন।

রাসবিহারী এঁদের নিয়ে মিলিটারী ব্যারাকে-ব্যারাকে প্রচার কাজ সুরু করে দিলেন।

ঝড়ের বেগে দিন এগিয়ে চলেছে। বিপ্লবাদের কর্ম্মতৎপরতা ভীষণ থেকে ভীষণতর রূপ ধারণ করেছে। ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্বে জায়গায় জায়গায় ভারতীয় বিপ্লবীদের ঘাটি তৈরী হয়ে কাজ সুরু হয়েছে বেশ ক' বছর হ'ল।

ইংরেজদের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ বেধেছে। বাঘা যতীন এ সুযোগ পুরোদস্তুর গ্রহণ করলেন। জার্ম্মানীর ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে ব্যবস্থা করল ভারতের এই বিপ্লবীদের জন্যে দু জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা বারুদের। যতীন মুখার্জ্জী বেঙ্গল জোনের চার্য্য নিয়েছেন। এক জাহাজ ভরতি অস্ত্রশস্ত্র রওনা করেদিল জার্মান সরকার। ঠিক হয়েছে এই অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দেওয়া হবে বালেশ্বরে। মতিলাল রায় রওনা হয়ে গেছেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে।*

---

* বালেশ্বরের ঘটনা পরে বর্ণিত হবে "আবার বহ্নি বিপ্লব"এ বা জীবন বৃত্তান্তে।

বছরগুলো ছুটে চলেছে একের পর এক। এর ভেতর অনেক ঘটনা ঘটে গেল এইসব বিপ্লবীদের জীবনে।

এঁরা শুনতে পেলেন দীননাথ পুলিসের হাতে ধরা প'ড়ে রাজ সাক্ষী হয়েছে।

লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে গর্ডনকে হত্যার চেষ্টায় বসন্ত বিশ্বাস ওরফে বিশু দাসকে পুলিস অনেক দিন থেকে অনেক জায়গাতেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। দ্বিতীয় অপরাধ তার, হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলা।

বসন্তের মা মারা গেছেন। পুলিস তক্কে-তক্কে আছে।—বাছাধনকে এবার আসতেই হবে কৃষ্ণনগরের পোড়াগাছায়, মার শ্রাদ্ধ করতে।

যেই শ্রাদ্ধের দিন বসন্ত এসে বাড়িতে ঢুকেছেন, পুলিস বাহিনী তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলল। ডি. আই. বির, ডি. এস. পি সুনীল ঘোষের হাতে তিনি সেখানে ধরা পড়ে গেলেন।

হার্ডিঞ্জের ওপর বোম ফেলার মামলায় জড়িত হয়ে ১৯১৫র ১১ই মে বালমুকুন্দ, আমীর চাঁদ আর অবোধবিহারীর সঙ্গে আম্বালা জেলে বসন্ত বিশ্বাসকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হ'ল।

রজ্জুতে গলা বাড়িয়ে দিয়ে অবোধ বিহারী চিৎকার করে বলে উঠলেন—"মরণ তো একদিন হোতই কিন্তু আজ বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারায় আমরা কত খুশী।"

রাসবিহারী পলাতক, তখনও লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরস্কারের লোভে ডি. এস-পি সুনীল ঘোষ হন্যে হয়ে তার সন্ধানে ঘুরছে। সুনীল ঘোষের সঙ্গে রাসবিহারীর আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রাসবিহারীর বোলচালে সুনীল ঘোষ মুগ্ধ হয়ে এক সময়ে এঁকে তাঁর স্পাইয়ের কাজে নিযুক্ত করে ছিলেন।

বিপ্লব সমিতির খবরা খবর, চন্দননগরের দুর্দ্ধর্ষ ছেলেগুলোর খবর এঁর মারফত্তেই তিনি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফল ফোলে ছিল উল্টো। রাসবিহারীর মুখ থেকে সত্যি কথা, তিনি কোন দিনই

শোনেননি। যা শুনেছেন সবই বিশ্বাস করেছেন। বসন্ত বিশ্বাসের ফটো সনাক্ত করতে বলায় এ ব্যাপারটাকে এমই ঘুরিয়ে দিলেন যা সুনীল ঘোষ বুঝতেই পারলেন না। বিপ্লবীদের গন্ধ থাকলেই রাসবিহারী এমনি ভাবেই পাশ কাটিয়ে গেছেন।

সুনীল ঘোষ যখন পুলিসের ইন্সপেক্টর রাসবিহারীর সঙ্গে তখন দিব্বি ঘনিষ্ঠতা। চুচেন্দ্র দত্তকে চেনেন কিনা এঁকে জিজ্ঞেস করায় ইনি তাঁকেই প্রশ্ন করে বসলেন "এ রকম অদ্ভুৎ নাম কোন বাঙালীর হয় নাকি মশায়?" সে দিনও সুনীল দারোগার হাত থেকে রাসবিহারী ফস্কে গিয়েছিলেন, সনাক্তকরনের মাল-মশলা তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও। এ ঘটনা ঘটে দেরাদুনে!

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে কাশীর বাঙালী টোলায়।

একথোকে বিশ হাজার টাকা পাওয়ার লোভে সরকারের আদুরে ছেলে সুনীল হন্নে হয়ে ঘুরছে, রাস বিহারীকে ধরে দিতে পারলেই বাজি মাত হয়ে যাবে, যেমন করেই হোক ধরতে হবেই লোকটাকে, খাঁটি খবর আছে তার কাছে 'সে এখানেই আছে লুকিয়ে'। বাঙালী টোলাটা সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয়েছে। পুলিসে পুলিসে ছয়লাপ। পুলিস বেষ্টনী ভেদ ক'রে রাসবিহারী মড়া সেজে কেটে পড়লেন। মাদুর দিয়ে দেহটাকে জড়িয়ে কাঁধে ফেলে ছু'জন হিন্দুস্থানী 'রামনাম সৎহায়' 'রামনাম সৎহায়' করতে-করতে তাঁর দেহদাকে নিয়ে পুলিসের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুনীলের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও এই ভাবে নিস্ফল হ'ল।

রাসবিরাকে পাকড়াও করবার এইবার সুনীল দারোগার তৃতীয় প্রচেষ্টা—সে ঘটনা ঘটল অমৃতসরে।

সুনীল ওঁর পেছনে পড়ে আছে। যেন তেন প্রকারেন সে এঁকে ধরবেই, খবরটা সুনীল ঠিকই রেখেছে, পাকা এক টিকটিকি খবরটা তাকে এনে দিয়েছে। রাসবিহারী এই বাড়ির ভেতরেই ঢুকেছেন। মাঝরাতে পুলিস বাড়িখানা ঘিরে

ফেলল। সেখান থেকেও 'চিড়িয়া ফুড়ুৎ হয়ে গেল'; বানবিদ্ধ হ'ল না। পুলিসের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে রাসবিহারী পালালেন মেথর সেজে। গায়ে বিষ্ঠা মেখে। অমৃত সরে খাটা পায়খানা। উলঙ্গ দেহে সামান্য একটা কৌপিন প'রে পায়খানার ফুট দিয়ে বেরিয়ে গুমাখা গায়ে বিষ্ঠার টিন মাথায় নিয়ে পুলিসকে সেলমে দিয়ে তিনি তাদের চোখের সামনে দিয়ে বেমালুম সরে পড়লেন। শুধু কি সুনীল? সে দিন আর ও দু তিন জন জাঁদরেল পুলিস অফিসারের চোখে ধূল দিয়ে অনায়াসে তিনি সরে পড়েছিলেন।

চতুর্থ প্রচেষ্টাও পুলিসের নিস্ফল হ'ল।

রাসবিহারী তখন চন্দননগরে। সুনীল খবর পেয়ে পুলিসের বড় কর্ত্তাদের জানাল। ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর। ইংরেজ পুলিসতো তাদের বিনানুমতিতে সেখানে ঢুকতে পাবে না! ক্রিমিনাল ইন্‌টেলিজেন্‌সের ডাইরেক্টর জেনারেল মিষ্টার ক্লীভল্যাণ্ড, ফরাসী সরকারের অনুমতি আনিয়ে, মিঃ ডেনহ্যাম আর ক'লকাতার ডেপুটি পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টকে পাঠালেন, রাসবিহারীকে পাকড়াও করতে। সুনীলকে ওঁরা সঙ্গে নিয়েছেন। চন্দননগর ষ্টেশনের প্রায় দরজার কাছে রাসবিহারীর পৈতৃক ভবন। এটিকে ঘিরে ফেলল পুলিস। হাটখোলার নরেন ব্যানার্জ্জীর বাড়ি আর বেড়াই চণ্ডীতলায় মতিলাল রায়ের বাড়িও রাতারাতি ঘিরে ফেলেছে একসঙ্গে ১৯১৪ সালের ৮ই মার্চ।

এবার চন্দননগরে এসে রাসবিহারী টিকিধারী বামুন সেজে বিরাজ করছিলেন। অতি পরিচিত লোকও তাঁকে এ অবস্থায় একটি দিনের জন্যেও চিনতে পারেনি।

পুলিস যে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে, এ খবর আগেই তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। বাঁচার উপায় তো একটা কিছু করতেই হবে! কোন্ উপায় না দেখে, তিনি নিজের বাড়ির একটা বড় গাছের মগডালে উঠে পাতার ভেতর লুকিয়ে থাকলেন পুলিস বাড়িতে ঢোকার আগেই।

তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে, তিন-তিনটে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে, আসবাবপত্র সব তছনছ করে, পুলিস প্রভুরা শ্রীমানের নাগাল পেলেন না। রাসবিহারী কিন্তু সব কিছু লক্ষ্য করেছেন পুলিসের কীর্ত্তিকলাপ ঐ গাছের মগডাল থেকে।

চন্দননগরে খানাতল্লাসীর পর ডেনহাম আর টেগার্ট রিপোর্ট দিলেন "রাসবিহারী চন্দননগরে নেই। উত্তর ভারতেই সে সম্ভবতঃ পালিয়ে আছে।"

লালবাজারের—Weekly Report of Bengal Intelligence Branch of 29-7-1914 থেকে জানা যায় "He (Rash Behari) was present at home on this night of 8-3-1914 when his house was searched by Mr. Denham and Mr. Tegart at Chandannagare, and he actually watched the search from behind a mango tree in his garden close by."

রাসবিহারীর চরিত্রের যে অভিনব ঘটনাটি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে তা সত্যই চমকপ্রদ। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেলে সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে রাতারাতি দেরাদুন পৌঁছে পরের দিন তার সে কি অভিনয়! এই অভিনয়ের দ্বারাই সে সরকার পক্ষের সকলের কাছে খুবই বিশ্বাস ভাজন হয়েছিল, যেন সে কত বড় রাজভক্ত! 'এই মহানুভব বড়লাটকে এমনি হীন প্রচেষ্টায় হত্যা করার চেষ্টাকে গর্হিত কাজ বলে সে তীব্র নিন্দা করেছিল'।

ক্ষতবিক্ষত দেহে হার্ডিঞ্জ যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে দেরাদুনে এসে বাস করছিলেন, শোনা যায় তখন নাকি বড়লাট প্রাসাদে রাসবিহারীর অবাধ গতি ছিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর "My Indian years 1910—1916" গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছিলেন—"At Dehra Dun when driving a car from the station to my bunglow, I passed an Indian standing in front of the gate of his house with several others. All of

whom were very demonstrative in their solemns. On my inquiring I was told that the principal Indian there had presided two days before at a public meeting at Dehra Dun and had proposed and carried a vote of condolence with me on account of the attack on my life. It was proved later that it was this identical Indian who threw the bomb at me."

যখন রাসবিহারীর নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে তখনও গা ঢাকা দিয়ে রাসবিহারী দেরাদুনে। পুলিসের হাত থেকে রক্ষে পাওয়ার আশায় তিনি কোনদিন নিজেকে ঘরের কোনে লুকিয়ে রাখেনান। দিব্যি পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনদিন পাঞ্জাবী—ফড় ফড় করে গুরমুখী ভাষায় কথা বলছেন। যে দিন আফগান বেশ, সেদিন অনর্গল বলে চলেছেন পুস্তু। অতি পরিচিত লোকেরও তাঁকে চেনা সম্ভব হয়নি, যদিও বাঁহাতের মাঝের আঙ্গুলটা কাটা ছিল তাঁর তবুও কাউকে তিনি তা বুঝতে দেননি, এমন কি পুলিসকেও না।

১৯১৪ সালে ৯ই এপ্রিল চন্দননগর থেকে রাসবিহারী তার বাবার কাছে চিঠি দেয়, সে নিরুদ্দেশের যাত্রা হচ্ছে।

এখান থেকে রাসবিহারীকে এনে দীনবন্ধু, কলকাতার হাটখোলায় একটা ভাড়া বাড়িতে লুকিয়ে রাখলেন।

এর চারমাস পর ফিরে আর রাসু একদিন ভরা দুপুরে কলকাতায় রডা কোম্পানীর বন্দুকের দোকানে ডাকাতি করল।

এখান থেকে চলে গেলেন কাশীতে। পুরো সন্ন্যাসীর বেশে কাটিয়ে দিলেন একটা বছর বারানসীতে।—'বাবার' চেলা জুটেছে শচীন সান্যাল, নলিনী মুখার্জী, আশুতোষ রায়, মন্মথ বিশ্বাস আরও অনেকে।

কাশী থেকে রাসবিহারী সরে গেলেন লাহোরে। কাটল সেখানে মাত্র ১৭ দিন। এর বেশী সেখানে থাকা চলল না।

১৯১৫র মার্চ্চ মাসে চলে এলেন লক্ষৌতে। বাস করতে হল তাঁকে এখানে এক বেশ্যা পল্লাতে।

এর দু' মাস পরেই জাপানে রওনা।

রাসবিহারী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এর মধ্যেই তাঁর দলের ন'জনকে পুলিস খতম করে দিয়েছে। এঁরা হলেন—বসন্ত, আমীর, বালমুকুন্দ, অমর সিং, নিধন সিং, জগৎ সিং, বালরাজ, রামশরণ আর পরমানন্দ।

সুনীল ঘোষের কাছ থেকে মিথ্যে টিকটিকি বেনে রাসবিহারীর স্মাগল্‌ড রিভলবার কেনার খবর পেয়ে সরকারের পুলিস দপ্তর, ভুল লোককে আই. বি এজেন্ট নিযুক্ত করায় সুনীলকে ডি. এস. পির পদ থেকে নীচে নামিয়ে দিল।

আবার ফিরে যাই আমবা পুবনো দিনে। কারণ এখনও পূর্ব্বের আলোচনার কিছু বাকি থেকে গেছে।

১৯১৪ সালে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মানীব যুদ্ধ বাধল।

জার্মানী তো আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ভারতীয় বিপ্লবী দলকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করবে বলে।

এই তো সুযোগ।

এদিকে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের চুক্তি ভঙ্গের দরুণ ভারতীয় সৈন্যদলে দারুণ অসন্তোষ।

সুযোগ বুঝে রাসবিহারী ভারতীয় সৈন্যদলে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে চলেছেন। নিজে দলবল নিয়ে তৈরী হতে লেগে পড়েছেন।

কাশীতে গুপ্ত সমিতির সভা ডাকা হ'ল।

মহারাষ্ট্রীয় গুপ্ত সমিতির বিষ্ণু গণেশ পিংলে, রাজপুতানার প্রতাপ সিং বেরিলার দামোদর স্বরূপ শেঠ আব পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি এসেছেন বিশেষ সদস্যদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগ দিতে। এখানে এঁদের নিতে হবে কঠোর সিদ্ধান্ত। প্রতিনিধি

আসছেন ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকেই। দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর, কানপুর, আজমীর আর বিহারের বাঁকীপুর থেকে এর মধ্যেই এসে গেছেন।

অধিবেশন সুরু হ'ল। একের পর এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

সভায় স্থির হয়ে গেল কর্ম্মীবা জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে সৈন্যদলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল।

সৈন্যদল থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল। জমাদার, সুবেদার এক জোটে বিদ্রোহ করবে কথা দিল। দিন নির্দিষ্ট হ'ল। এক দিনেই, সর্বত্র অভ্যুত্থান ঘটবে। সৈন্যদলে জানিয়ে দেওয়া হ'ল বিশেষ তারিখটি —২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫।

সিপাই বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি হবে লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট। সেইখান থেকেই আগুন জ্বলে উঠবে। রাসবিহারী বসু আর বিষ্ণু গণেশ পিংলে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবেন।

শেষ মুহূর্ত্তে জমাদার কৃপাল সিং বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে চুপে চাপে ওপর মহলে সব খবর ফাস করে দিল।

২০শে ফেব্রুয়ারী, অভ্যুত্থানের ঠিক আগের দিন মিলিটারী ব্যারাকে বোমা সমেত বিষ্ণু গণেশ পিংলে ধরা পড়ে গেলেন।

কৃপাল সিংয়ের বেইমানীর খবরটা ঠিক পৌঁছে গেল রাসবিহারীর কানে এসে।

কৃপাল সিংকে গুলী করে মেরে ফেলবার চেষ্টাও করা হ'ল।

এইসব বিশ্বাসঘাতকের জন্যেই তখন ভারতবর্ষে অনেক মহৎ প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারেনি। কি জানি এরা না থাকলে হয়তো ইতিহাসের পাতা অন্যরকম ভাবে লেখা হ'তে পারত।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবক বিনায়ক রাও, রাসবিহারীকে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বিশেষ সহায়তা করল। ছদ্মবেশে সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে গ্রেপ্তার এড়িয়ে কাশীতে চলে এলেন

রাসবিহারী।

ভারতের সর্বত্রই ব্যাপক ধরপাকড় সুরু হয়ে গেল। অনেক সিপাইও ধরা পড়ল।

হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় সিপাই বিদ্রোহ আরম্ভেই নির্মূল হয়ে গেল।

যে বিনায়ক রাও রাসবিহারী বোসকে লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে পালিয়ে আসতে একদিন বিশেষ সহায়তা করেছিল, তারই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় সেই রাসবিহারীকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

বিপ্লবীরাও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না, লক্ষ্ণৌতে দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে বিনায়ককে গুলী করে মেরে ফেললেন। সরকার উঠে পড়ে লাগল, রুজু করে দিল তিন জায়গায় তিনটি ষড়যন্ত্রের মামলা—দিল্লী, লাহোর আর বেনারসে।

লাহোর কন্সপিরেসী কেসে অনেক বড় বড় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। মামলা সুরু হ'ল। হ'ল বিশিষ্ট নেতাদের ফাঁসীর হুকুম। তিন কিস্তিতে এঁদের ফাঁসী দেওয়া হল, তিন রকম ভাবে মামলা চালিয়ে।

প্রথম জোটের ফাঁসী হ'ল—১৯১৫র ১৭ই নভেম্বর। সবার আগে মঞ্চে তোলা হ'ল বিষ্ণুগণেশ পিংলে আর করতারসিং সরাবাকে। দু'জনকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর, ফাঁসীর দাড়িতে পরপর লটকে দেওয়া হল বখশিস সিং, হরলাল সিং আর জগৎ সিংকে।

দ্বিতীয় মামলায় ফাঁসী হ'ল—উত্তম সিং, রূপ সিং, রঙ্গ সিং আরও কয়েক জনের—১২ই জানুয়ারী ১৯১৬।

তৃতীয় দলকে মঞ্চের রজ্জুতে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হ'ল—১৯শে মার্চ ১৯১৭তে; এঁরা হলেন—বাবুরাম, বলবন্ত সিং, সাফিজ আবদুল্লা, রূপ সিং (২) এবং আরও কজন।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে করতারসিং সরাবা বলে গেলেন—"যাদের দাস বলে সরকার মনে ভাব সেই মানুষের অধিকার আছে স্বাধীনতার

জন্যে বিদ্রোহ করা, আমি তাই দেশ-মাতৃকার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে ধন্য মনে করছি, জন্মজন্মান্তরে এইভাবে সহীদ হতে পারলে কৃতার্থ হব।"

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়ে গেলেন শচীন সান্যাল। এই মামলায় গ্রেপ্তার হলেন আর অনেক। ১৯৪০ সালে গোরক্ষপুরে শচীন মারা গেলেন। শচীন ছিলেন রাসবিহারীর হাতে গড়া বিপ্লবী।

দেরাহুন ফরেষ্ট রিসার্চ অফিসের হেডক্লার্ককে সেখানে আর পাওয়া গেল না। স্পষ্ট হয়ে গেল ইনিই সেই রাসবিহারী বসু ওরফে বিনোদ বিহারী বসু, তাই পূর্ব্বেকার গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সঙ্গে তাঁর ওপর চাপান হ'ল আর দু'টি ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-বি আর ৩০২ ধারা।

রাসবিহারীকে ধরতে না পারলে ভারত গভর্মেন্টের সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে। পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে সে অনেকবার পালিয়েছে। সারা ভারতবর্ষ মন্থন সুরু করল পুলিস; কোথায় গেল সে? তাকে চেনা এমন কি কঠিন? বয়স তিরিশের মধ্যে, গায়ের রং মাঝারি, নাদুস নুদুস চেহারা ধরা পড়বার জন্যে সহায়তা করবে তার এক হাতের চারটে আঙ্গুল যার মাঝেরটি নেই।

বেনারসে ছদ্মবেশে আর কতদিনই বা কাটাবেন, গোয়েন্দা পুলিসের চোখগুলো যে তাঁকে ঘিরে রয়েছে! সহকর্মীরা একজোটে তাঁকে ভারত ছাড়ার পরামর্শ দিলেন।

স্থির হ'ল জাপানে পালাবেন। রাসবিহারী চলে এলেন চন্দন-নগরে। প্রস্তুতি সুরু হল।

রবীন্দ্রনাথঠাকুর সে সময়ে জাপান যাওয়ার জন্যে পাসপোর্ট করাচ্ছেন।

চন্দননগর থেকে ক'লকাতায় রওনা দিলেন রাসবিহারী। ঘুরছেন ছদ্মবেশে, আত্মগোপন ক'রে থাকলেন শেয়ালদহ পোষ্ট অফিসে,

১৯১৫ সালে মে মাসে রাসবিহারী, রাজা পি. এন. টেগোরের মেকাপ নিয়ে একখানা ব্রুহামগাড়ি চ'ড়ে সোজা এসে পাসপোর্ট অফিসে হাজির হলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিতেই পাসপোর্ট অফিসার তাঁকে সসম্মানে বসালেন।

(জানা যায় এই পাসপোর্ট জোগাড়ের ব্যাপারে লীলা রায়ের বাবা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গিরিশচন্দ্র নাগ মহাশয় রাসবিহারীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।)

ছদ্মবেশী পি. এন. টেগোর, লালমুখ পাসপোর্ট অফিসারকে বললেন—"Poet Tagore is shortly going to visit Japan. I am going there as his emissary to make the necessary arrangements for his stay there."

এঁর কথা মত ভদ্রলোক কোন দ্বিধা না করে পি. এন. টেগোরের নামে জাপান যাওয়ার পাসপোর্ট ইস্যু করে দিলেন।

কাজ গুছিয়ে রাসবিহারী তাঁর গোপন ডেরায় ফিরে এলেন।

১২ই মে ১৯১৫ কলকাতার খিদিরপুর ডক্ থেকে জাপানী জাহাজ 'সানুকিমারু' জাপান রওনা হচ্ছে, এই জাহাজেই রাজা পি. এন. টেগোরের নামে ফার্ষ্ট ক্লাস কেবিন রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। কেবিনেব দরজায় রেশমী সুতায় ঝুলছে রাজা পি. এন. টেগোরের নাম।

সুযোগ মত বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে পি. এন. টেগোরের ছদ্ম বেশে রাসবিহারী জাহাজের কেবিনে এসে ঢুকেছেন।

গন্ধ পেয়ে ক'লকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার টেগার্ট দলবল নিয়ে সোজা 'সানুকিমারুতে এসে উঠেই, ব্যাপক খানাতল্লাসী সুরু করে দিলেন।

জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা। রাজা পি. এন.

টেগোরের কেবিনে কোন পুলিসকে ঢুকতে দিলেন না।

কোথায় রাসবিহারী বোস? হতাশ হয়ে নেমে গেল জাহাজ থেকে পুলিস অফিসারের দল।

জলদ গম্ভীর স্বরে 'সানুকিমারু' বিদ্রূপের হুঙ্কার ছাড়ল পুলিসের কাজের নমুনা দেখে।

নোংয়র উঠল। ঘনঘন ভোঁ দিয়ে জাপানী জাহাজ বাঙালী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর সমুদ্রে ভেসে চলল।

রাসবিহারী জাপান থেকে সংগ্রহ করবেন ভারতের বিপ্লবীদের জন্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র।

সে ফল ফলল কৈ?

জাপানে পৌঁছেও তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল বছবের পর বছর।

১৯১৮ সালেব জুলাই পর্য্যন্ত জাপান পুলিস তাঁর পেছনে লেগেছিল। একবার আধবার নয় সতেরবার তাঁকে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এখানে বাসস্থান পাল্টাতে হয়েছে।

শেষে জাপানী মেয়েকে বিয়ে করে ১৯১৮ থেকে ১৯১৩ একটানা জাপানে থাকায় জাপানের নাগরিকত্ব পেয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

১৯২৩ সালের মাঝামাঝি রাসবিহারী জাপানের নাগরিক বলে গণ্য হলেন।

বিদেশের বিপ্লবীকে জাপানে লুকিয়ে রাখায় সেখানকার বিখ্যাত ব্যবসীক তোয়ামাসোমা এবং তাঁর স্ত্রী কোক্কা সোমার সহায়তা ছিল প্রচুর।

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিস সোমা পরিবারের চোখের আড়ালে রাসবিহারীকে নিয়ে আসতে পারেনি, রাসবিহারী ঘোষের মাথার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত থাকা সত্ত্বেও।

'তোমাসা' জাপানী নামে এবং জাপানী পোষাকে রাসবিহারী সেখানে দিব্বি বিরাজ করছিলেন।

১ ১৮ সালে সোমাকন্যা 'তোসিকো'কে রাসবিহারী বিবাহ করেন।

জাপানের সামুরাই বংশের মিৎসুরো তোয়ামা সোমার প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিসের চোখের ওপর দিয়ে সূর্যোদয়ের দেশে রাসবিহারী নাগরিকত্বলাভ করলেন: এখন ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই রাসবিহারীর ঘোরা ফেরার অনেক সুযোগ এসে গেল।

১৯১৯ সালে রাসবিহারী এবং তোসিকোর একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। বিবাহের পাঁচ বছরের মধ্যে এঁদের আর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

১৯২৫শে মাত্র ২৮ বছর বয়সে তোসিকো অকালে মারা গেলেন।

স্ত্রী বিয়োগে রাসবিহারী অত্যন্ত মুসড়ে পড়েছেন, এই অবস্থায় শ্বাশুড়া কোক্কা সোমা নিজের মনকে খুব শক্ত করলেন, কন্যা শোক ভুলে তিনি বিপ্লবীর মনে অনুপ্রেরণ যোগাতে লাগলেন সর্ব বিষয়ে। শ্বাশুড়ী জামাতার দাক্ষিণ হস্ত হয়ে সহোযা করে চলেছেন।

শ্বাশুড়ীর একনিষ্ঠ সহায়তায় রাসবিহারী জাপানে, 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ', এবং 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গড়ে তুললেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং আর সরদার প্রীতম সিং রাসবিহারীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে এই কাজে সব রকম সহায়তা দিতে থাকলেন।

দিনের পর দিন ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ পরিপুষ্ট হতে লাগল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বেশ তৈরী হয়ে উঠেছে।

দেখতে দেখতে বাধল যুদ্ধ চীন আর ব্রীটেনের সঙ্গে, জাপানের।

১৯৪৩ সালে সুভাসচন্দ্র বসু জার্মানী থেকে সোজা জাপানে চলে এলেন রাসবিহারী বসুর কাছে। এর আগে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষ পালিয়েছেন ভারতবর্ষ ছেড়ে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের

প্রচেষ্টা সফল করতে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্ম্মির ভার রাসবিহারী, সুভাসের হাতে তুলে দিলেন। সেই সঙ্গে আরও দিলেন, ধৃত ভারতীয় সেনাদের সুভাসচন্দ্রের হাতে। এইসব সৈন্যরা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ম্মি'তে যোগ দিল। এই বাহিনীর নাম বদলে হ'ল "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ" সুভাস হলেন সকলের "নেতাজী"।*

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এতদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে কর্ম্মযজ্ঞ থেকে অবসর নিলেন।

রাসবিহারীর বীর পুত্র 'মাসিদে বসু' ব্রাটিশের সঙ্গে যুদ্ধে, রনাঙ্গনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

অর্জ্জুন হারালেন যেন অভিমন্যুকে।

মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সম্ভবতঃ আর পুত্র শোক সম্বরণ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই ২১শে জানুয়ারী ১৯৪৫এ রাসবিহারী বসু পরলোক গমন করলেন।

গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে এইটুকুই বক্তব্য রেখে যেতে চাই, নানান গ্রন্থাদি পাঠে এবং তথ্যাদির মাধ্যমে যা কিছু উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে এইটুকুই উপলব্ধি করেছি, যে অপরাধের জন্যে নরেন গোঁসাই দণ্ডিত হয়েছিল, বারীন ঘোষ কি অনুরূপ অপরাধে অপরাধী ছিলেন না? সমিতির নানান তথ্য কোর্টের কাছে ব্যক্ত করা, লুক্কায়িত অস্ত্রাদির নির্দিষ্ট সন্ধান তল্লাসকারীদের জানিয়ে দেওয়া, পুলিসের কাছে নরেন গোঁসাইয়ের নামটি ফাঁস করে দেওয়া কি ঐরূপ দায়িত্বশীল বিপ্লবী দলনেতার পক্ষে উচিৎ হয়েছে? পার্টি নেতা ছিলেন বলেই কি তাঁকে এসব ব্যাপারে দায়ী করা হয়নি? বারীন ঘোষ আজ জীবিত থাকলে তাঁর কাছে আমি এই প্রশ্নই রাখতাম।

*নেতাজী, "আবার বহ্নি বিপ্লব"এ আলোচিত হবেন

গ্রন্থপঞ্জী

(নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহের এবং নানা পত্র-পত্রিকার তথ্য গ্রহণে "বহ্নিবিপ্লব" রচিত হয়েছে।)

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থ প্রভৃতির নাম	লেখক অথবা প্রকাশনা
১।	Three Phases of India's Struggle for freedom.	R C. Majumder
২	Armed struggle for freedom	Kal Prakasham (1958)
৩।	History of freedom Movements in India	Dr. R. C. Majumder.
৪।	Rashbehari Basu-His struggle for India's Indipendence	Editted by R. Routh & S. P. chatterjee (1963)
৫	Dictionary of National Biography Vol III (M. R.)	April 1974, calcutta.
৬।	Mohayagi Sri Aurobindo	R. R. Divakar.
৭।	শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী- "কারাকাহিনী"	শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, পণ্ডিচেরী।
৮।	Dictionary of National Biography Volume I (A D)	Edited by S. P. Sen
৯	বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী	বারীন্দ্রনাথ ঘোষ
১০।	নির্বাসিতের আত্মকথা	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১।	বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ	নলিনী কিশোর গুহ।
১২।	বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা	হেমচন্দ্র কানুনগো।
১৩।	ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৪।	ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব	ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়।
১৫।	আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী	মতিলাল রায়।
১৬।	অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস	ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৭।	বন্দী জীবন (দুইখণ্ড)	শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।
১৮।	রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৯।	যুগ মানব শ্রীঅরবিন্দ	মণি বাগচি।
২০।	মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল	পূর্ণচন্দ্র দে।
২১।	জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী	দেবেশচন্দ্র পাল।
২১।	জগন্নাথের রথ	শ্রীঅরবিন্দ।
২৩।	বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল	মতিলাল রায়
২৪।	সঙ্ঘগুরু মতিলাল	প্রবর্তক সঙ্ঘ (১৯৬৬)।
২৫।	উত্তরপাড়া অভিভাষণ (ইংরিজি বক্তৃতার অনুবাদ) ৩০শে মে ১৯০৯)	শ্রীঅরবিন্দ
১৬।	মহাপ্রবর্তক মতিলাল	প্রবর্তক সঙ্ঘ।
২৭।	আমি রাসবিহারীকে দেখেছি।	নারায়ণ সান্যাল
১৮।	আসর পত্রিকা (অরবিন্দ স্মরণে) ২৭ বর্ষ প্রথম সংখ্যা—আশ্বিন ১৩৭৯	সম্পাদক সত্যচরণ ঘোষ।
২৯।	শারদীয়া যুগান্তর ১৩৭৫	
৩০।	"কম্পাস"—বিপ্লবী বাঙলায় প্রথম বিস্ফোরণ	পুলকেশ দে সরকার।
৩১।	Bengal Jail Code	Prisons Directorate, Govt of. Bengal.
৩২।	রবীন্দ্র রচনাবলী	বিশ্বভারতী।

N. B. Sedition committee Report (Rowlatt Report), 1918, Sri Aurobindo on Himself ; H. H. Wilson —The Great War ; Government of India files preserved at the National Archives of India, New Delhi ; Microfilmed copies of German Government War Documents preserved at the National Archives, New Delhi, and translated from Original German by Prithwindranath Mukherjee ; Quotations by Prithwindranath Mukherjee from Secret Home Department Papers preserved at the Common Wealth Library, London . Quotations by Prithwindranath Mukherjee from Lord Hardinge Papers preserved at the Cambridge University , BhupendraKumar Datta Biplaber Padachinha , Close association of the Contributor in personal and political life

(Amiya Barat) Bhupendra Nath Datta

বহ্নিবিপ্লব

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল	ঠিক
২	২০	গল	গেল
১০	৭	বিপ্লব	বিপ্লবী
১৫	৭	করেছি	করেছিল
২৮	১৬	প্রকৃতিকে	প্রকৃতিতে
২৮	১৬	সন্তনরূপে	সন্তানরূপে
৪১	১৪	ভাগিস্	ভাগিগস
৫১	৩	সেনাবাহিনী	সেনাবাহিনীর
৫২	১৯	দিয়েছে	দিয়েছো
৬৭	৮	উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
৮৫	২২	কর্মি	কর্ম্মী
১০১	১৫	সরু	সুরু
১০৪	১	ব্যারীষ্টারী	ব্যারিষ্টারী
১৫৪	৯	নোকনপ্রোমাইজ	নোকমপ্রোমাইজ
১৬০	১৬	ঔপিনিবেশিক	ঔপনিবেশিক
১৮৭	১	গম্ভবভাবী	গম্ভীরভাবে
১৮৮	১৫	যেত	যত
২২৫	৮	যোড়াযোড়া	জোড়াজোড়া
৪০১	৬	ফাঁসর	ফাঁসীর
৫১৬	২	সহীদ	শহীদ
৫১৯	১	নানে	নামে